•প•রি•চ•য়•

শারদ সঙ্কলন

১৪০০

শুভেচ্ছা

ডিসেরগড়, নিয়ামতপুর ও কুলটী বরাকর "বিজ্ঞাপিত অঞ্চল" (Notified Area) তিনটি মিলে নতুন কুলটী মিউনিসিপ্যালিটি হচ্ছে।

নাগরিক পরিষেবা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরো ব্যাপ্ত ও প্রসারিত করার পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকারের এ আরেক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

সকলের জন্য আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সুখকর ভবিষ্যতের কামনা রইল।
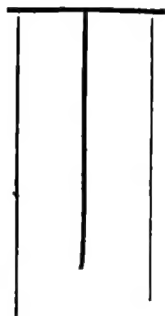
—ডিসেরগড় নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি

ডিসেরগড়,
বর্ধমান
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯০

গোপাল হালদার

জন্ম ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ মৃত্যু ৩ অক্টোবর ১৯৯৩

পরিচয়-সম্পাদনা ১৯৪৪-৪৮

১৯৫২—৫৭

উপদেশক-মণ্ডলীর সদস্য ১৯৬১-৯৩

পরিচয় ও গোপাল হালদার সমার্থক
আমরা শোকাহত

প্রকাশিত হল

প্রয়াণের শতবর্ষে বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরের প্রয়াণের শতবর্ষে সাহিত্য অকাদেমি এবং বাংলা আকাদেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনাচক্রে পঠিত প্রবন্ধের সংকলন। প্রাবন্ধিকরা হলেন অশ্রুকুমার শিকদার, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক সেন, সুমিতা চক্রবর্তী, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন মোহান্তি ও নবকান্ত বড়ুয়া — ৩৫.০০

ষাঁড় ও কিন্নর

ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকার কবিতা এবং নাটকের নির্বাচিত অংশের বাংলা রূপান্তর করেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৬৫.০০

সুদীর্ঘ দিন আর ঋতু

নির্মলপ্রভা বরদলৈ-র সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত অসমীয়া কাব্যগ্রন্থের বাংলা ভাষান্তর করেছেন মনোতোষ চক্রবর্তী — ৫০.০০

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

প্রভাকর মাচবে-র রাহুলের জীবনের ওপর এই মূল্যবান রেখালেখ্যটি অনুবাদ করেছেন স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় (পুনর্মুদ্রণ) — ১৫.০০

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত পুস্তক

বিবিধ বিদ্যা সংগ্রহ

বাঙালীর সংস্কৃতি	: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৫
ভারতের কৃষি প্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ	: গৌতমকুমার সরকার	১৫
বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত	: হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৮
সহজপাঠ অর্থনীতি	: ধীরেশ ভট্টাচার্য	১২
প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞান	: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫
বাংলার-ইতিহাস সাধনা	: প্রবোধচন্দ্র সেন	১৫
বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে	: ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৫
পরমাণুর অভ্যন্তরে	: কৃষ্ণবিহারী পাল	১৫
মুদ্রণচর্চা	: দীপঙ্কর সেন	১৫
বাংলা উপন্যাস কালিক দর্পণ	: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫

জীবনী গ্রন্থমালা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	: বিজিতকুমার দত্ত	২
সুকুমার	: লীলা মজুমদার	১৪
রাজেন্দ্রলাল মিত্র	: বিজিতকুমার দত্ত	৮
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	: নেপাল মজুমদার	৫
সুশীলকুমার দে	: ভবতোষ দত্ত	৫
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	: সরোজ দত্ত	১৫
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	: স্বস্তি মণ্ডল	১০

পরিভাষা সংকলন

প্রশাসন সংকলন গ্রন্থ,	:	১০
প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা	:	৩৬
বানান বিতর্ক	: নেপাল মজুমদার সম্পাদিত	২৫
জিয়নকাঠি	: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৪৫
সুকুমার প্রক্রিয়া	: পবিত্র সরকার সম্পাদিত	৩০
প্রেমচন্দ্র নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ	:	৪৫
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাসংগ্রহ	:	৫০

মুখপত্র

আকাদেমি পত্রিকা ১, ৩, ৪	: অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত	১০
আকাদেমি পত্রিকা ৫	: "	২৫

বিক্রয়কেন্দ্র : আকাদেমি দপ্তর, ১।১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০। আকাদেমি ভাণ্ডার, ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০। কলকাতা ইউনিভারসিটি ইন্সটিট্যুট হল কাউন্টার, ৭ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। মনীষা গ্রন্থালয়, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। বুক স্টোর, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৭৩।

॥ অশ্লীল ছবির প্রদর্শনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন ॥

কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশনের ছাড়পত্র ছাড়া কোন চলচ্চিত্র জনগণের মধ্যে প্রদর্শন করা যায় না। কোন কোন সিনেমা হাউসও ভিডিও পার্লারে বৈধ ছাড়পত্র পাওয়া ছবির সঙ্গে উক্ত বোর্ড কর্তৃক বাতিল অংশ বা ভিন্ন কোন অশ্লীল ছবির অংশ বিশেষ বেআইনী ভাবে জুড়ে এমন ছাড়পত্রহীন সম্পূর্ণ অশ্লীল ছবি দেখানোর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তবে সেই সঙ্গে প্রয়োজন জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা। এই জাতীয় অবৈধ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ঘটনা নজরে পড়লে স্থানীয় থানায় জানান। কলকাতায় ডি. সি. ডি. ডি. লালবাজার এবং জেলা পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের গোচরেও আনুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ-৩০১৭/৯০

আমরা আছি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই

হোক না তা রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা, জঞ্জাল সাফাই
অথবা বস্তি উন্নয়ন
কিংবা—
স্বাস্থ্যসেবা, পানীয় জল সরবরাহ, শিক্ষার প্রসার
বা সাক্ষরোত্তর অভিযান—

শুধুমাত্র পৌর পরিষেবাই নয়—

আসানসোলের সাংস্কৃতিক জীবনের সাথেও আমরা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত
সে কোন-দুর্গোৎসব, ঈদ-মহরম, ছট্, বড়দিন, গুরুনানকের জন্মদিন
অথবা মনীষীদের মূর্তিস্থাপনই হোক

সর্বক্ষেত্রেই আমাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি

তাই আপনিও আসুন,
কিছু করি—
আসানসোল গড়ি।

অশোক সামন্ত
পৌর-প্রধান,
আসানসোল পৌরসভা

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

পরিচয়

আগস্ট-অক্টোবর ১৯৯৩, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০০
৬৩ বর্ষ ১—৩ সংখ্যা

প্রবন্ধ

গল্প

কবিতাগুচ্ছ—১

কবিতাগুচ্ছ—২

কবিতাগুচ্ছ—৩

অনুবাদ কবিতা

প্রচ্ছদ

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

ধনঞ্জয় দাশ/কার্তিক লাহিড়ী/বাসব সরকার/বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

শুভ বসু

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার/হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়/অরুণ মিত্র/মনীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়/গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ১০৫ মনোমোহন বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত

বিজনদা

কুমার রায়

'প্রধান', 'পবন', 'প্রভঞ্জন'—এই তিনটি চরিত্র বিজনদার অভিনয়-জীবনের তিনটি স্মরণীয় অধ্যায়। শুধুমাত্র একটি বাংলা বর্ণের অনুপ্রাসের জন্য এর হাল্‌কা চমক নয়—এই তিনটি চরিত্রের আধার তিনটি নাটক-'নবান্ন', 'মরাচাঁদ' এবং 'দেবীগর্জন'—বিশ্লেষণ করলে বিজনদার—ভাবনাটাকে ধরা যায়, চেনা যায়।

"আত্মপরিচয় লাভ করতে হবে, শিল্পকে মেলাতে হবে দেশের প্রাণের সঙ্গে, জাতির অবচেতন স্তর থেকে খুঁজে আনতে হবে আবেগ আর অনুভূতি গুলিকে"—এই বোধ,—বোধ করি বিজন ভট্টাচার্যই একমাত্র নাট্যকার যিনি তাঁর সমগ্র কাজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওই বোধের কাছে তাঁর দায়বদ্ধতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিজনদা তাঁর নাটকের মধ্যে তাঁর অভিনয়ের মধ্যে চেয়েছেন একটা আবেদন সৃষ্টি করতে। সেই সঙ্গে সেই প্রাথমিক অঙ্গীকার পূরণ করতে। বাংলাদেশের মানুষের অবচেতনে ঐতিহ্যের যে মৌল উপাদান আছে, তাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন তাঁর লেখা নাটকে; চেয়েছেন গ্রামীণ মানুষের দুঃখ-তাপ-যন্ত্রণাকে বুক পেতে গ্রহণ করে তাকে নাট্যে এবং অভিনয়ে রূপায়িত করতে। বিজনদা বিশ্বাস করেছিলেন—যে-মিথ্‌ তিনি তাঁর নাটকে ব্যবহার করবেন তা থাকা চাই জাতির অবচেতনের তলায়। পূর্বপুরুষ-লালিত বিশ্বাসে। 'নবান্ন'র অভিজ্ঞতার সম্মুখ ক্রমবিবর্তিত হয়েই 'দেবীগর্জনে'-এসে পৌঁছলেন—চিন্তাশীল, আবেগী, সক্রিয় এবং সচেতন নাট্যকারেরই যোগ্য উত্তরণ।

'নবান্ন' এক দুঃখের কাব্য, বেদনার ইতিহাস। সে ইতিহাস, সে বেদনা এই বাংলার। সেই বাংলারই এক চাষী 'প্রধান'। সম্পন্ন চাষী দুর্ভিক্ষ বন্যায় সর্বস্ব হারিয়ে কলকাতায় ফুটপাতে আস্তানা গাড়ল—। তারপর কত স্বজন হারিয়ে ঐ সব ঘর ছাড়া মানুষ গাঁয়ে ফিরবে, হবে 'নবান্ন'র উৎসব। 'নবান্ন' একেবারে গ্রাম বাংলার পাঁচালী—এক বিশেষ সময়ের। তখন চিকিৎসাকেন্দ্রের প্রায় উন্মাদ প্রধানের উক্তি—"ভুলে যাও তোমার ব্যথার কথা, ব্যথার কথা ভুলে যাও" শুধু সংলাপ নয় এক মহৎ কথা হয়ে ওঠে—কথা নয় বলা যায় বাণী।

'বাংলাদেশে আয়েন গায়েন ফকির বোষ্টম পেট ভরে খেয়েছে কোন্ কালে।" —একথা বিজনদার। তিনি লিখলেন 'মরাচাঁদ'। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত দোতারা বাজিয়ে টগর অধিকারীর জীবন ইতিহাস নিয়ে মরাচাঁদ লেখা হল। বিজনদা সৃষ্ট মরাচাঁদের অন্ধ চাষী-বাউল পবন গাঁজা টানে—সেটা সত্য। সত্য, সে একদিন তার প্রাণের রাধার বিশ্বাসঘাতকতায় বসে বসে 'তার গান শেষ হয়ে গেছে'। বিজনদাও ব্যক্তি জীবনে মাঝে মধ্যে থেমেছেন—কিন্তু তাঁর পবনের অপমৃত্যু তিনি দেখান নি—নতুন জীবনের গান তার গলায় তান তোলে। পবনের প্রতি এক স্মৃতিময় মমত্ববোধ ছিল বিজনদার। শিল্পের শুদ্ধতায় টিঁকে থাকার অটল প্রতিজ্ঞার যন্ত্রণা। বিজনদা তাঁর নাটকের চরিত্র কেতক দাসের বা কথা ভাল আজকের সমাজের কেতক দাসের দাস হতে চাননি প্রধান এর মত পবন ও এক আশ্চর্য সৃষ্টি। মরাচাঁদ নাটকে কেতক দাসের চরিত্রেও অভিনয় করেছেন বিজনদা। "দলকুশী ছেড়ে কালোবরণ নিরুপায় হয়ে তেওড়া, দাদরা, বাজাতে লাগল—কি. না, অর্ডার হয়েছে কেতক দাসের। বলে, বলে, দাদা কি করবো—পেট, পেট তো চালাতে হবে?" —বিজনদা এই তেওড়া, দাদরা বাজাতে চাননি।

'দেবীগর্জন'-আর এক মাত্রা যোগ করল। সেই বড় জোতদার আর আধিয়ার প্রজা, ক্ষেতমজুর প্রজা। 'নবান্ন'র চেয়ে মহত্তর এক সত্যে এসে পৌঁছেছেন নাট্যকার। বড় জোতদার প্রভঞ্জনের চরিত্রে রূপ দিলেন বিজনদা।

প্রধান পবন প্রভঞ্জন ভীষণ বাস্তব, ভীষণ সত্য। আর যে মুহূর্তে 'সত্য' কথাটা উচ্চারণ করছি তখন বাস্তব ছাড়িয়ে অন্য এক সত্যের জগতে প্রতীক হয়ে দেখা দিচ্ছে চরিত্রগুলি এই তিন চরিত্রের আধার তিনটি নাটকও খাঁটি সত্য।

যন্ত্রনাবিদ্ধ বিজনদাকে দেখেছি—কিন্তু বিশ্বাস হারা অবস্থায় দেখিনি। মুখে যাই বলুন, কিন্তু তার নাটকের মধ্যে প্রোথিত বিশ্বাসের আলো স্তিমিত হয়নি। বিজনদাকে যদি কখনো বিভ্রান্ত দেখিয়ে থাকে তা সে বিভ্রান্তি সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি নয় শিল্পীর বিভ্রান্তি—সে বিভ্রান্তির নিরসন শিল্পীকেই করতে হয় তাঁর কাজের মাধ্যমে। বিজনদা সেই কাজটা করে গেছেন—খোঁজার কাজ।

জীবনের নাট্যরূপকার বিজন ভট্টাচার্য

(১৭. ৭. ১৯১৭—১৯. ১. ১৭৮৯)

জগন্নাথ ঘোষ

। ১ ।

বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলা নাট্যক্ষেত্রে যে-নামটি বারবার ঘুরে ফিরে উচ্চারিত হয়, তাঁর নাম বিজন ভট্টাচার্য। তিনি জন্মেছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খানাপুর গ্রামে। তাঁর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য ও সুবর্ণপ্রভা ভট্টাচার্য। বিজন ভট্টাচার্যের মাতুল আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক স্বনামধন্য সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে বিজন ছিলেন জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর পিতা ক্ষীরোদবিহারী খান-খানাপুর সুরেন্দ্রমোহিনী ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক। পরবর্তীকালে তিনি বসিরহাটে সাতক্ষীরায় (বর্তমান বাংলাদেশে) ও মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে শিক্ষকতা করেন। সেই সুবাদে বিজন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘোরার সুযোগ পেয়েছেন। তার ফলে ঐসব অঞ্চলের ভূমিচারী মানুষের নিকটসান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান, যা তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রধান পাথেয় হয়। পিতা ক্ষীরোদবিহারী ছিলেন সাহিত্য ও সঙ্গীত-প্রাণ। বিশেষ করে উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের নাট্যকর্ম ছিল তাঁর প্রধান আকর্ষণের বিষয়। পিতার সাহিত্য ও সঙ্গীতপ্রীতি পুত্র বিজনে বর্তেছিল। এতেও তাঁর সাহিত্য রচনা তথা নাট্য রচনা ঋদ্ধ হবার দুর্লভ সুযোগ পায়।

বসিরহাটের আড়বেলিয়া জে. ডি. হাইস্কুল থেকে বিজন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তাঁর উচ্চশিক্ষা শুরু হয় কলকাতার রিপন (বর্তমান

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) কলেজ ও আশুতোষ কলেজে। বি. এ পড়তে পড়তেই তাঁর উচ্চশিক্ষায় ছেদ পড়ে। তার মূল কারণ রাজনীতি।

১৯৩০ খ্রীঃ থেকেই বিজন কলকাতায় চলে আসেন মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে। তিনিই হন বিজনের অভিভাবক। ১৯৩১-৩২ খ্রীঃ তিনি মহিষবাথানে লবণ আইন ভঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবন। ১৯৩৩ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্র ফেডারেশন। তারপরের বছরই বিজন ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। তৎকালীন ছাত্র রাজনীতির প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মে তাঁর ছিল সুগভীর সংযোগ।

১৯৩০-এর দশকে দেখা দেয় বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিস্টবাদের বিভীষিকা। বিজন ছাত্রজীবন থেকেই বিশ্বরাজনীতির এইসব সংকটের খোঁজ খবর রাখতেন। তাঁর এই সময়কার ঘনিষ্ঠজনেরা হলেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সরোজ দত্ত, বিনয় ঘোষ, অরুণ মিত্র, অনিল কাঞ্জিলাল, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি। ছাত্ররাজনীতি, গান্ধীজীপ্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন, লবণ আইন ভঙ্গের আন্দোলন, বিশ্ব-রাজনীতির খোঁজ খবরে উত্তেজিত মুহূর্ত যাপনের মাধ্যমে বিজন যৌবনের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছান। ২১/২২ বছর বয়সের সময় তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ নেন। তিনি সেই পত্রিকায় লিখতেন, ছোট স্কেচ ও ফিচার। তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিজনের মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

১৯৩৯ খ্রীঃ শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তখনও বিজন আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক। গোপনে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনে সামিল হন। ইতিমধ্যে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিখিল ভারত প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ। প্রতিষ্ঠাকাল ১০ এপ্রিল ১৯৩৬। এই সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে। এই অধিবেশনের পরে পরেই প্রকাশিত হয় অগ্রণী পত্রিকা। এর প্রথম প্রকাশ ঘটে জানুয়ারি ১৯৩৯। ধনঞ্জয় দাশ বলেছেন, "বাংলাভাষায় কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত প্রথম সাংস্কৃতিক পত্রিকা হচ্ছে 'অগ্রণী'।" এই পত্রিকা তখন বেশিদিন চলেনি. মাত্র দেড় বছর। অর্থাৎ ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের জুন সংখ্যাই অগ্রণীর শেষ সংখ্যা। এই অগ্রণীতেই বিজন সাহিত্য বিষয়ক রচনাদি লিখতেন। 'জালসত্ব' নামে গল্প লেখেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুন তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রান্ত হল জার্মান বাহিনীর দ্বারা। এই ঘটনার ঠিক দুই মাস পরে প্রকাশিত হল 'অরণি' পত্রিকা। এটি ছিল রাজনীতি ও সংস্কৃতি মূলক সাপ্তাহিক। পত্রিকার প্রথম প্রকাশ তারিখ ছিল ২২ আগস্ট ১৯৪১। সম্পাদনা করেছিলেন

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন। অরণি পত্রিকা ৭ বছরেরও কিছু বেশি সময় চলেছিল।

১৯৪২ খ্রীঃ বিজন ভট্টাচার্য কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করলেন। এই বছরটি শুধু বিজনের জীবনে নয়, ভারতীয় জন জীবনের পক্ষে নানা কারণে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছরের ৮ মার্চ ঢাকার রাজপথে একটি ফ্যাসিস্টবাদ-বিরোধী মিছিল পরিচালনা করার সময় তরুণ কম্যুনিস্ট কর্মী সোমেন চন্দ ফ্যাসীবাদী গুণ্ডাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। তার প্রতিবাদে ২০ মার্চ কলকাতায় শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা থেকেই গঠিত হয় ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ। সঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত হলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও যুগ্মসম্পাদক হন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। স্থির হয় ফ্যাসিস্টবাদী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের শাখা রূপেই বাংলায় কাজ চালাবে। অনুমান করতে দ্বিধা নেই বিজন এই সংগঠিত সঙ্ঘ সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন ছিলেন। ১৯৪২ সালের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আগষ্ট আন্দোলন। এই আন্দোলনের ডাক দিয়ে ছিলেন মহাত্মাগান্ধী। বিজন তাঁর কিশোর কাল থেকেই গান্ধীজীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁর ১২ / ১৩ বছর বয়সের সময় তিনি গান্ধীজীকে প্রত্যক্ষ করেন।[৭]

১৯৪২ সালের এই সব ঘটনা বিজনের মনে প্রভাব ফেলতে শুরু করছে গভীর ভাবে। এই সঙ্গে ঘটল এক নিদারুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ। একে বলে ১৯৪২-এর সাইক্লোন। এই সাইক্লোনে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ ও প্রকৃতিকে বিধ্বস্ত করেছিল। ইতি পূর্বেই ব্রিটিশ সরকার বাঙালীর ঘর থেকে খাদ্য শস্য সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে। যেটুকু শস্য অবশিষ্ট ছিল তাও বিলীন হয়ে গেল অকস্মাৎ জাগা সাইক্লোনে। বলা বাহুল্য সাইক্লোন প্রথম দেখা দেয় ১৬ অক্টোবর ১৯৪২। এরফলে দেখা দেয় প্রবল ঝড় ও বন্যা। প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনার মানুষ। দেখা দেয় বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ। বিজন ভট্টাচার্য এইসব রাজনৈতিক প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক নানা ক্রিয়াকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী। এই সবই তৈরি করে দিচ্ছে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের নানা নাট্য উপাদান। তৎকালীন সোভিয়েট রাশিয়া জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত হবার পরই প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪০ খ্রীঃ Youth Cultural Institute (সংক্ষেপে Y. C. I)। এটি ছিল তৎকালীন প্রগতিশীল ছাত্রদলের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিষ্ঠান। বিজন ভট্টাচার্য এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন না।

অগ্রনী ও অরণি ছাড়া তখন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা প্রকাশ করেন

আর একটি পত্রিকা তার নাম 'জনযুদ্ধ'। এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১ এপ্রিল ১৯৪২। সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট মার্কসবাদী নেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। জনযুদ্ধ কাগজে ঘোষণা করা হয় ফ্যাসিস্টবাদ বিরোধী ভাবনা নিয়ে লেখা নাটকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারকে পুরস্কৃত করা হবে। তাতে সাড়া মেলেনি। তখন তরুণ কম্যুনিস্ট লেখকদের নাটক লেখার জন্য প্ররোচিত করা হতে থাকে। বলা যায় এই প্ররোচনাতেই বিজন লিখলেন তাঁর প্রথম নাটক 'আগুন'। এটি একটি একাঙ্ক। এই একাঙ্কটি প্রথম প্রকাশিত হয় অরণি পত্রিকার দ্বিতীয় বছরের ৩০ তম সংখ্যায়। তাঁর দেখা-দেখি তাঁর বন্ধু বিনয় ঘোষ ও বিশিষ্ট অভিনেতা মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অরণিতে নাটক লিখলেন। বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী' অরণির দ্বিতীয় বছরের ৩৬ ও ৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিও-প্যাথী' ঐ পত্রিকার তৃতীয় বছরের ৯ সংখ্যায়। বলাবাহুল্য, এই নাট্য রচনাগুলি সবই একাঙ্ক।

বিজন নাট্যরচনায় উৎসাহিত হয়ে আরও দুটি নাটক লেখেন 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য বিজন অরণি-তে গল্প রচনা করেই তাঁর সাহিত্য রচনা শুরু করেন। অবশ্য তাঁর প্রথম রচনা নাটক না গল্প, তা নিয়ে তর্ক আছে। বিজন নিজেই তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে তিনি তাঁর যক্ষারোগ সারাবার জন্য যখন যাদবপুর টি-বি হাসপাতালে ছিলেন তখন তিনি একটি নাটক লিখেছিলেন। তার নাম দেওয়া হয়েছিল পি. ডবলিউ. ডি। এটি ছিল বিখ্যাত লেখক পরশুরামের (রাজশেখর বসু) একটি গল্পের নাট্যরূপ। তখন বিজনের বয়স হবে ২০ / ২১ বছর। তিনি যখন ঐ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তখন সেখানে ভর্তি ছিল আরও দুটি যক্ষারোগগ্রস্ত যুবকযুবতী তারা একে অপরকে ভালবাসত। কিন্তু যেহেতু তাদের মিলনের আকাঙ্ক্ষা কোনদিন ফলবতী হবে না, তাই তারা দুজনেই হাসপাতালের নিকটস্থ পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করে। এই ঘটনা বিজনকে গভীর ভাবে মর্মাহত করে। তিনি ঐ সাক্ষাৎকারে বলেছেন—"This gave me a rude shock. This I thought arose out of solvation which I tried to break through theatre."

বিজন ভট্টাচার্য গল্প উপন্যাস লিখেছেন, একথা ঠিক, কিন্তু তিনি নাট্য-রচনাতেই তাঁর আত্মমুক্তি ঘটিয়েছেন। অরণি পত্রিকায় পরপর তিনটি নাট্য রচনা (আগুন, জবানবন্দী ও নবান্ন ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ খ্রীঃ গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের বিবরণ যথাস্থানে প্রদান করা হবে।

১৯৪৩ সালের বড় ঘটনা আগস্ট আন্দোলনের জের হিসেবে দেখা দেয়

দুর্বার গণআন্দোলন এবং সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ। এর সঙ্গে আর একটি বড়ো ঘটনা ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২ থেকে ২৫ মে, পর্যন্ত বোম্বাই শহরে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের যে চতুর্থ সর্বভারতীয় সম্মেলন হয় সেই সম্মেলনের শেষ দিনে গণনাট্য সম্মেলন হয়। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের বাংলার প্রতিনিধি হয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে যান বিজন ভট্টাচার্য। অবশ্য তৎকালীন ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদিত সিংহলী কন্যা অনিল ডি মিলতা ১৯৪১ খ্রীঃ বাঙ্গালোরে একটি নাট্য সংগঠন গড়ে তোলেন। মারাঠী ভাষায় এই নাট্য সংগঠনকে বলা হত জননাট্য। ১৯৪৩ সালে এই নামই বাংলাদেশেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু গণনাট্য সঙ্ঘ স্থাপনের পর 'জননাট্য' নামটি উঠে যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা ভাল বাংলায় গণনাট্যসঙ্ঘ ছিল ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের নাট্যবিভাগ। গণনাট্য সঙ্ঘের সর্বভারতীয় কমিটিতে বাংলার প্রতিনিধি ছিলেন স্নেহাংশু আচার্য ও মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। আর এই সঙ্ঘের বাংলার কর্মকর্তারূপে নির্দিষ্ট হন সুনীল চট্টোপাধ্যায় দিলীপ রায় শম্ভু মিত্র সুজাতা মুখোপাধ্যায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বিষ্ণু দে ও বিনয় রায়ের সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যও। বলা বাহুল্য মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছিলেন নাট্য উপদেষ্টা। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক গণনাট্য সঙ্ঘ কর্তৃক অভিনীত হয়েছে। বিজন এই অভিনয়ে অংশ নেওয়া ছাড়া পরিচালনার দায়িত্বও পালন করেছিলেন।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজন বিখ্যাত লেখক মনীশ ঘটকের (যুবনাশ্ব ছদ্ম নামে বিখ্যাত) কন্যা মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু এই সময় থেকে বিজনের সঙ্গে গণনাট্য সঙ্ঘের সম্পর্কে চিড় ধরতে শুরু করে। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে আবেদন জানান যে তাকে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালিতে যেতে দেওয়া হোক। ইতিপূর্বে তাঁর নবান্ন নাটক নিয়েও কম্যুনিস্ট পার্টিতে মতভেদ দেখা দেয়। তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক পি. সি. যোশীর হস্তক্ষেপে নবান্ন সম্পর্কে যাবতীয় বিরুদ্ধতা দূর হয় এবং নবান্ন অভিনীত হবার সুযোগ পায়। এই নাটকের প্রথম দৃশ্যেই ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের মরণপণ সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাই ১৯৪৬ সালে যখন বিজনের রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে বিভ্রান্তি জাগতে থাকে তখন থেকে তাঁর গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে দেখা দেয় সম্পর্ক ছেদের আকাঙ্ক্ষা। ইতিপূর্বে ১৯৪৪ সালের এপ্রিলের পর বিজন আনন্দবাজারের চাকরীতে ইস্তফা দিয়েছেন।

১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে লিখলেন একটি গীতি-নাট্য 'জীয়নকন্যা'। সেই সঙ্গে লিখলেন একটি নাটক 'অবরোধ' ও একটি

একাঙ্ক 'মরাচাঁদ'। এগুলির মূল বিষয় শ্রমিক আন্দোলন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল। শ্রমিক আন্দোলনের নামে নাকি বিজন বুর্জোয়া সমাজের মনস্তত্ত্বকেই প্রকাশ করেছেন। এর ফলেও তাঁর সঙ্গে গণনাট্য সঙ্ঘের দূরত্ব বেড়ে চলল। তারপর ১৯৪৮ সালে বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ করলেন।

গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ করলেও বিজন কম্যুনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেননি। এমনকি ১৯৬৪ সালে যখন কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হল—তখনও বিজন যে অংশটি সি পি আই নামে অস্তিত্ব বজায় রাখল তার সঙ্গেই গাঁটছড়া বেঁধে রেখেছিলেন। ১৯৪৮ সালে বিজন জীবিকার সন্ধানে বোম্বাই যান। সেখানে গিয়ে তিনি চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন বিখ্যাত হিন্দী চলচ্চিত্র নাগিনের স্ক্রিপ্ট্। সেই সঙ্গে তিনি শুরু করেন চলচ্চিত্রে অভিনয়।

দু বছর বাদে অর্থাৎ ১৯৫০ সালে বিজন কলকাতায় ফিরে এলেন। গড়ে তুললেন তাঁর নিজস্ব নাট্য-সংগঠন 'ক্যালকাটা থিয়েটার।' এই থিয়েটারের প্রথম প্রযোজনা বিজনের 'কলঙ্ক' নামের একাঙ্ক। ১৯৫১ সালে 'কলঙ্ক' অভিনীত হয় ই বি আর ইনস্টিটিউটে (বর্তমানে নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট। তখন ক্যালকাটা থিয়েটারে অভিনয়সূত্রে জড়িত ছিলেন প্রভাদেবী, শোভা সেন, গীতা সোম (সেন) প্রভৃতি। আলোক সম্পাতের দায়িত্বে ছিলে তাপস সেন।

ক্যালকাটা থিয়েটারের পরবর্তী প্রযোজনা 'গোত্রান্তর' 'মরাচাঁদ' 'ছায়াপথ' 'মাষ্টার মশাই', 'দেবীগর্জন' ও 'গর্ভবতী জননী'।

ক্যালকাটা থিয়েটার চলেছিল ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। তারপর তিনি গড়ে তুললেন তার পরবর্তী নাট্য প্রতিষ্ঠান কবচকুণ্ডল। এখানে অভিনীত হয়েছে বিজন ভট্টাচার্যের 'কৃষ্ণপক্ষ', 'আজ বসন্ত', 'সোনার বাংলা' ও 'চলো সাগরে'।

উল্লিখিত নাট্যরচনা ছাড়াও বিজন লিখেছেন আরও নাটক। সেগুলি হল—'জননেতা', 'জতুগৃহ', 'ধর্মগোলা', 'সাম্নিক', 'স্বর্ণকুম্ভ', 'লাস ঘুইর‍্যা যাউক', 'গুপ্তধন', 'চল্লিশ হাঁসখালির হাঁস'। উল্লিখিত নাট্যরচনাগুলির মধ্যে 'মাষ্টার মশাই' ও 'গুপ্তধন' দুটি হল রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাট্যরূপ। নাট্য-রচনা ছাড়াও বিজন গল্প ও উপন্যাসও লিখেছেন। সেগুলি হল জলসা (ছোট গল্প), জনপদ (উপন্যাস) ও রাণী পালঙ্ক (উপন্যাস)। বিজন ভট্টাচার্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। শোষিত মানুষের বঞ্চনার নাট্যরূপ দিতে তাঁর ছিল ঐকান্তিক আগ্রহ। এই চিন্তাতেই তিনি গণনাট্য সঙ্ঘে যোগ দেন। তারজন্য তিনি নাট্যরচনা অভিনয় ও পরিচালনা কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। কিন্তু তবুও দেশের লোকায়ত

ধর্ম ও দর্শন ও হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণকে সরিয়ে আনতে পারেননি। 'দেবীগর্জন' রচনার সময় থেকে (১৯৬৬) তিনি গ্রেট মাদারতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন।

এই মাতৃকা শক্তির ও লোকায়ত জীবনের প্রতি আকর্ষণ বিজন ভট্টাচার্যের শেষ জীবনের নাট্যরচনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর মার্কসবাদী চেতনায় এই সব প্রভাব কতখানি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল তার পরিমাপ করা দুরূহ। তাঁর নাট্যরচনার দিকে তাকালে এটাই স্পষ্ট হয় যে তিনি মার্কসবাদের কঠোর অনুশীলন অপেক্ষা আপন অন্তরের প্রেক্ষাপটকেই বেশি মর্যাদা দিয়েছিলেন।

বিজন পেশাদারী মঞ্চের সঙ্গেও যুক্ত হন। পেশাদারী মঞ্চের যে নাটকগুলিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন সেগুলি হল—'তিতাস একটি নদীর নাম', 'হাসি' ও 'রাজদ্রোহী'। মঞ্চাভিনয় ছাড়া তিনি চলচ্চিত্রাভিনয়ের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যে সব চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন তার তালিকা নিম্নরূপ : ছিন্নমূল, তথাপি, বাড়ি থেকে পালিয়ে, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার, সুবর্ণরেখা, যুক্তি তক্কো আর গপ্পো, পদাতিক, স্বপ্ন নিয়ে, ভোলা ময়রা অর্জুন, স্বাতী, দুরন্ত প্রভৃতি।

চলচ্চিত্রে অভিনয় ছাড়া বিজন ভট্টাচার্য কয়েকটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখেন। তার মধ্যে হিন্দী নাগিনের চিত্রনাট্য রচনার কথা উল্লিখিত হয়েছে। তিনি যে কটি বাংলা চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা করেন সেগুলি হল সাড়ে চুয়াত্তর, বসুপরিবার, ডাক্তারবাবু, তৃষ্ণা। ১৯৭২ সালে রবীন্দ্র সদনে অভিনয়ের জন্য বিজন নীল দর্পণ নাটক সম্পাদনা ও প্রযোজনা করেছিলেন। মাত্র ষাট বছরের মর্ত জীবনের অধিকারী হয়ে বিজন ভট্টাচার্য যে নাট্যকর্মের সম্ভার জাতিকে উপহার দিয়ে গেছেন, তার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন আজও সম্পূর্ণ হয়নি।

॥ ২ ॥

বিজন ভট্টাচার্য মূলত নাট্যকার ও অভিনেতা। অন্যের আচার আচরণ ও হাবভাব অনুকরণ করা ছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনয় করার সুযোগ তাঁর বোধ হয় আসে গণনাট্য সঙ্ঘ স্থাপনার সময় থেকে। কিন্তু তার আগেই তিনি নাট্য রচনায় মনোযোগী হয়েছেন। তাঁর ২০/২১ বছরের সময় তিনি P. W. D নামে যে একটি নাটক রচনা করেছিলেন সে কথার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। তারপর অরণি পত্রিকাতেই বিজনের নাটক রচনার পালা বিধিবদ্ধভাবে শুরু হয়। অরণি পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত হয় 'আগুন' নামে একটি একাঙ্ক। কিন্তু তার আগেই বিজন একটি নাটক রচনা করেছিলেন যা প্রকাশিত হয়নি এবং তার উল্লেখ পাওয়া যায় সুধীপ্রধানের একটি প্রবন্ধে।

সুধী প্রধান উক্ত বিজনের উল্লিখিত নাটকের পরবর্তী একাঙ্ক হল 'আগুন'। একাঙ্কটি অরণি পত্রিকায় প্রকাশের (২৩ এপ্রিল ১৯৪৩) এক মাসের মধ্যে নাট্যভারতী মঞ্চে (বর্তমানে গ্রেস সিনেমা) অভিনীত হয়। এটি গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম প্রযোজনা। একাঙ্কটি প্রযোজিত হয় ১৯৪৩ সালের মে মাসে। এই প্রযোজনার ভূমিকালিপি সংগ্রহ করা যায়নি। তবে জানা গেছে, নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান ও তৃপ্তি মিত্র অবতীর্ণ হয়েছিলেন যথাক্রমে কৃষাণ, অন্য একটি কৃষক ও কাপড়াটে বউ এর ভূমিকায়। অভিনয় ছাড়াও নাট্যপরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বিজনও। আগুন নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে বিজনের নানাবিধ পরিচয় উদ্ঘাটিত হল।

পাঁচটি ক্ষুদ্র দৃশ্যসমন্বিত এই একাঙ্কটি আজও কোনও গ্রন্থভুক্ত হয়নি। কৃষকরা শহরের রেশনের দোকানে লাইন দিয়েছে চালের জন্য। সেই সঙ্গে শহরে মধ্যবিত্ত মানুষেরাও রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে চালের আশায়। দোকানীর চাল মজুত করে রাখার যে উপায় নেই, তাই নাটিকাটিতে বলা হয়েছে। দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা ও অভাব সব মিলে আগুন নামটি সার্থক।

তৃপ্তি মিত্র আগুন নাটিকায় অভিনয়ের স্মৃতিচারণা করেছেন তাঁর একটি প্রবন্ধে। সেখানে তিনি লিখেছেন "তারপর আমি ম্যাট্রিকুলেশন দিলাম, আর ঠিক ঠিক তারিখ বলতে পারব না সেই সময় বিজন ভট্টাচার্য একটি নাটিকা লিখেছিল, সেটা আমাদের বাড়ীতেই বোধ হয় প্রথম পড়েছিল যতদূর মনে পড়ে।...সেই নাটকটার নাম 'আগুন'।....অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট রাইটার্স এন্ড আর্টিস্টস এসোসিয়েশন বলে একটা সংস্থা গড়ে উঠেছিল।...সেইখান থেকে ওর নাটিকাটির করার কথা হয়।...তা আমি ওর মধ্যে থাকছি বলে ভাবিওনি কোনদিন ; এমন সময় একদিন হন্তদন্ত হয়ে গোষ্ঠদা (বিজন ভট্টাচার্য) এসে বলল মণি (আমার ডাক নাম মণি) তোকে একটা পার্ট করে দিতে হবে। কারণ খুব সম্ভব যিনি এটি করছিলেন তিনি চলে গেছেন।" এইভাবে বিজন ভট্টাচার্যের অনুরোধে তৃপ্তি মিত্র (তখন ভাদুড়ী) বাংলা নাট্যাভিনয়ের জগতে চলে আসেন।

'আগুন' নাটক হিসাবে দুর্বল কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে এই নাটিকাটি অবিস্মরণীয়। 'আগুন'-এর পরবর্তী যে নাটক বিজন লিখলেন তার নাম 'জবানবন্দী'। এটিও একাঙ্ক।

'জবানবন্দী' গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় প্রথম অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে। অভিনয় তারিখ ৩ জানুয়ারি ১৯৪৪। বিভূতি মুখোপাধ্যায় 'জবান বন্দী' নাটকে মুদ্রিত 'নবনাট্য ও জবান বন্দী' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন—"নাট্যাচার্যের (শিশিরকুমার ভাদুড়ী) মঞ্চে (শ্রীরঙ্গম) ১৯৪৪ গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় নাট্যকার স্বয়ং নাটকটি মঞ্চস্থ করে আগামী দিনের

শিল্প ও শিল্পীর মানসপটে এক বলিষ্ঠ আদর্শবাদের অভিজ্ঞান চিরকালের জন্য স্বাক্ষরিত করে তুলতে সার্থক হন।

শ্রীধনঞ্জয় দাশ তাঁর 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক প্রসঙ্গে' শীর্ষক নিবন্ধে জানিয়েছেন যে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের যে দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৪ সালের ১৫-১৭ জানুয়ারি সেই সম্মেলনের শেষদিনে অর্থাৎ ১৭ জানুয়ারি ১৯৪৪ জবানবন্দী মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়।

জবানবন্দীর মুদ্রিত অভিনয় তালিকায় জানা যায় বিজন ভট্টাচার্য নিয়ে ছিলেন বেন্দার ভূমিকা। তাছাড়া পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর ছিল। উক্ত মুদ্রিত তালিকায় রুমজানের ভূমিকায় শম্ভু মিত্রের নাম দেখা গেলেও, শম্ভু মিত্র এই ভূমিকায় নিয়মিত অভিনয় করেননি। তিনি কখনও কখনও অভিনয় করেছিলেন, যখন ঐ ভূমিকাভিনেতা গঙ্গাপদ বসু অনুপস্থিত থাকতেন। এ ছাড়া অন্য কোন অভিনেতা অনুপস্থিত থাকলে, শম্ভু মিত্র সেই ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হতেন কখনো কখনও। এ ছাড়া অভিনয় করেছিলেন সুধী প্রধান (পদা), তৃপ্তি মিত্র (বেন্দার বৌ) জনক চট্টোপাধ্যায় (রাইচরণ) ইত্যাদি।

চারটি দৃশ্য সমন্বিত এই একাঙ্কটিতে একটি গ্রাম্য কৃষক পরিবারের অভাবের তাড়নায় কলকাতায় আসা, শিশু ও বৃদ্ধের মৃত্যুবরণ এবং এবং কৃষক বধূর সতীত্বনাশের মর্মন্তুদ কাহিনীর বর্ণনা প্রধান হয়েছে। তার ফলে একটি নিটোল কাহিনী এখানে রূপায়িত হয়েছে। নাটকটির হিন্দী অনুবাদের নাম 'অন্তিম অভিলাষ'। হিন্দী অনুবাদের অভিনয়ে পরাণ মণ্ডলের ভূমিকায় অভিনয় করতেন শম্ভু মিত্র। সুধী প্রধান তাঁর 'গণনাট্য ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য', শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন "এই নাটকের (জবানবন্দী) পরিচালক ছিলেন বিজনের সঙ্গে শম্ভু বাবু।" সুধী প্রধানের এই উক্তি থেকে জানা গেল গণনাট্য সঙ্ঘে এসে শম্ভু মিত্র প্রথম অভিনয় ও পরিচালনার দায়িত্ব পান 'জবানবন্দী' নাট্যাভিনয়ে। ঘটনাটি নানাকারণে ঐতিহাসিক। গণনাট্য সঙ্ঘে প্রথম যে পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রযোজনা করা হয় তা বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। নবান্ন প্রথম প্রযোজিত হয় ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গমঞ্চে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন' অভিনয়ে গ্রহণ করেন প্রধান সমাদ্দারের ভূমিকা। আর তার সঙ্গে ছিল তাঁর পরিচালনার দায়িত্ব। অবশ্য পরিচালনার যুগ্ম দায়িত্ব ছিল শম্ভু মিত্রেরও। অরণি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যে নবান্ন অভিনীত হয়। নবান্ন গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে, তারপর এই নাটকের বাংলা সংস্করণ হয়, চারটি হিন্দী সংস্করণ হয়। শেষ বাংলা সংস্করণটি হয় ১৯৮৪ সালে। নবান্ন-র প্রথম অভিনয়ের স্মারক পত্র থেকে এর অভিনয় লিপি, পরিচালক ও আরও

নেপথ্যকর্মীদের বিস্তৃত পরিচয় জানা যায়। বাহুল্য বোধে তার উল্লেখ করা হল না। নবান্ন নাটক রচনায় পূর্বে বিজন লিখেছিলেন আরও দুটি একাঙ্ক—আগুন ও জবানবন্দী এবং একটি গল্প জালসত্ব। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় অগ্রণী পত্রিকায় ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। সাধু ভাষায় লেখা এই গল্পটির প্রধান বিষয় গ্রাম্য কৃষকের জমির মালিকানা হারিয়ে উচ্ছেদ হওয়া। এই গল্পের অনেক চরিত্রের দেখা মেলে 'নবান্ন', নাটকে। এমনকি জমিহারা কৃষকের মস্তিষ্ক বিকারের প্রসঙ্গ যেমন আছে 'নবান্ন'র, তেমনি 'জালসত্বে'ও। 'আগুন' ও 'জবান বন্দীর' কথা আগেই বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার আমরা 'নবান্ন'র যে মুদ্রিত রূপ পাই, তা কিন্তু হুবহু অভিনীত হয়নি। নবান্নর যে পাণ্ডুলিপিটি অভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল যাকে বলে Prompters' copy, সেটি এখনও রক্ষিত আছে সুধী প্রধানের কাছে। এ কথা জানা যায় সুধীপ্রধানের নবান্নর প্রযোজনা ও প্রভাব গ্রন্থে।

নবান্ন সম্পর্কে যে সব আলোচনা ও প্রতিবেদন মুদ্রিত হয়ে আসছে তা সবই ঐ Prompter's copy অবলম্বনে। নবান্ন অভিনয়ের পর বিভিন্ন পত্র পত্রিকার নানা বিদগ্ধ সমালোচক সেই অভিনয়ের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করেছেন। এই সব সমালোচনার সম্মুখীন হলে দেখা যাবে অনেকেই নবান্নকে গণনাট্যের আদর্শ নাট্যরূপ বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। নবান্ন-এর অভিনয় নিয়ে অজস্র স্মৃতিচারণা ও কেতাবী গ্রন্থ রচিত হয়েছে। 'নবান্ন-এর অভিনয় নিয়ে এই সব রচনার তালিকা প্রস্তুতি বিশাল গবেষণাকর্মের অপেক্ষা রাখে। সেকাজ অনেকখানি সমাধান করেছেন ধনঞ্জয় দাশ তাঁর মার্কসবাদী সাহিত্য গ্রন্থে। এ ছাড়া প্রশ্নের সুধী প্রধান, তাঁর একাধিক গ্রন্থে বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যচর্চার পরিমাপ করতে গিয়ে 'নবান্ন'-র প্রসঙ্গ নানাকারণে ও নানা পরিপ্রেক্ষিতে উত্থাপন করেছেন। এমনকি একথাও বলা হয় নাট্যাচার্য শিশির কুমার 'নবান্ন'র অভিনয় দেখে তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' নাটকের প্রযোজনার কথা ভাবেন। এ সবই নবান্ন নাটকাভিনয় সম্পর্কে প্রশংসার কথা। হিরণ কুমার সান্যাল 'পরিচয়' পত্রিকায় পর পর দুটি প্রবন্ধ লেখেন 'নবান্ন' নিয়ে। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৩৫১ সালের কার্তিক সংখ্যায় এবং দ্বিতীয় ১৩৫১ সালের পৌষ সংখ্যায়। 'নবান্ন' অভিনয় দেখার পর তিনি তাঁর প্রথমোক্ত রচনায় মন্তব্য করে ছিলেন "নাটক হিসাবে 'নবান্ন'কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলেনা। এতে গল্পের অখণ্ডতার চেয়ে ঘটনার ব্যাপ্তি এবং নাটকীয় আবেগের একাগ্রতার চেয়ে বৈচিত্র্যই বেশী লক্ষণীয়।" হিরণ কুমারের মতে 'নবান্ন' নাটকের যাবতীয় ত্রুটি অভিনয় গুণে ঢাকা পড়ে যায়।

'নবান্ন' অভিনয়ের এই সমালোচনা পাঠ করে স্বর্ণ কমল ভট্টাচার্য ১৩৫১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার পরিচয় পত্রিকায় যে চিঠি লেখেন তাতে তিনি বলতে চেয়েছিলেন হিরণ কুমার সান্যালের 'নবান্ন' সম্পর্কিত উক্তিগুলি 'অনবধানতা প্রসূত'।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দ্বিতীয়োক্ত রচনায় জানান "গণনাট্য সঙ্ঘ সাহসের সঙ্গে আসরে নামলেন, বিজন বাবুও সাহসের সঙ্গে রচনা করলেন প্রথমে 'জবানবন্দী' ও পরে 'নবান্ন' ঠিক গণ-নাটক বোধ হয় হল না, কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে পুরোদস্তুর গণনাটক হতে পারে তার অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এখন গণনাট্য সঙ্ঘকে এগোতে হবে! পরীক্ষণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে। 'জবানবন্দী' বা 'নবান্ন' সার্থকতা অর্জন করল সাহিত্য হিসেবে নয়, গণনাট্য সঙ্ঘের এই পরীক্ষণ ও বর্জনের পথকে প্রশস্ত করার জন্যে।"

'নবান্নর প্রম্পটারস কপিকে কেন্দ্র করে উল্লিখিত আলোচনা প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণগুলি বিশেষ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পাঠ করলে বোঝা যায় 'নবান্ন'-র মধ্যে গণনাট্যের লক্ষণ সুপ্ত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই সুপ্ত লক্ষণগুলি সম্পর্কে নাট্যকার বা অন্যান্যরা ততখানি সচেতন থাকেননি। নবান্নতে পর পর দৃশ্যগুলি চিত্রধর্মী হয়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রথম দৃশ্যেই আগস্ট আন্দোলন জনিত গ্রামীণ নর নারীর উত্তেজনা ও অসহায়তা। এই দৃশ্যটি নাট্যকার এমনভাবে অঙ্কন করেছেন যার ফলে আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির মতামতের মিল পরিলক্ষিত হয়। কংগ্রেসের ডাকে গড়ে ওঠা আগস্ট আন্দোলন শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকেনি হয়ে উঠেছিল হিংস্র ও ধ্বংসাত্মক। তারজন্যই তৎকালীন ইংরেজ সরকার নিষ্ঠুর দমনপীড়নের আশ্রয় নেয়। তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টিও আগস্ট আন্দোলনকে ধ্বংসাত্মক করে তোলার বিপক্ষেই ছিল। কুঞ্জ চরিত্র এই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম দৃশ্যে বারবার 'কিন্তু' শব্দ উচ্চারণ করেছে। প্রধান সমাদ্দার ঐ কিন্তুকে টুঁটি টিপে মারতে চেয়েছিল। এ ব্যাপারে তাকে প্ররোচনা দিয়েছিল যুধিষ্ঠির চরিত্র। নাট্যকার তাকে আন্দোলনকারী রূপে চিহ্নিত করেছেন। এখানেই তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কিত মতামত নিহিত আছে। সুধী প্রধান এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, মোটের উপর 'নবান্নর' প্রথম দৃশ্য ১৯৪২-আন্দোলনকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে প্রতিফলিত করেছে যদিচ ঐ দৃশ্যের স্বদেশী-বাবুকে একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন প্ররোচনাকারী হিসাবে চিত্রিত করে পার্টি লাইনকে রক্ষা করা হয়েছে।"

গ্রামীণ কৃষি জীবনের সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের ছিল গভীর সম্পর্ক। সেই সুবাদে তিনি লোকায়ত জীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান।

এই গ্রামীণ ও লোকায়ত জীবনের চাওয়া পাওয়া কামনা বাসনা, সংস্কার, আচার নীতি, পূজো পদ্ধতি, অধ্যাত্ম চেতনা সবকিছুই বিজন সুতীক্ষ্ণ নজরে পর্যবেক্ষণ করেন। বলা যায় তাঁর নাট্যরচনায় তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও সহানুভূতি তাঁকে নাট্য উপাদান যুগিয়েছে। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েও তিনি ব্যক্তিগত শিল্প প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। নবান্নর শেষ দুটি দৃশ্যে আছে ফকিরের গান, মোরগের লড়াই, মেলার পরিবেশ। এ সমস্তই এসেছে বিজনের গ্রামীণ জীবনলব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। অবশ্য তিনি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়াতে যে তাঁর নাট্যকার সত্তা সমৃদ্ধ ও উৎসাহিত হতে পেরেছিল সে কথা তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্বীকার করা দরকার যে বিজন ভট্টাচার্য নাট্যরচনায় আপন অন্তরের প্রেরণাকেও মূল্যহীন মনে করেন নি। তার ফলেই বোধ হয় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব ক্রমশই বাড়তে থাকে।

নবান্ন রচনার পরপর বিজন লিখলেন একখানি গীতিনাট্য ও একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। সে দুখানি হল যথাক্রমে 'জীয়নকন্যা' ও 'অবরোধ'। 'জীয়ন কন্যা' গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়নি। এইটুকু তথ্য মিলেছে যে গীতিনাট্যটি মঞ্চস্থ হয়েছে রঙমহল মঞ্চে ১৯৪৭ সালে। প্রযোজনার কোনও খবর মেলেনি। এই গীতিনাট্যটি বিজন ভট্টাচার্য লিখেছিলেন নাট্য সঙ্ঘের প্রথম বুলেটিন (জুলাই ১৯৪৩) এর নির্দেশ অনুসারে।

নবান্ন প্রযোজনার পরে ১৯৪৮ সালের শুধু রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' অভিনয় করা ছাড়া অন্য কোনও নাটক বা একাঙ্ক গণনাট্য সঙ্ঘ কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়নি। পরিবর্তে গণনাট্য সঙ্ঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছে গান ও নাচের অনুষ্ঠান। গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গীত বিভাগ থেকে জন্ম নেয় একটি নাচের দলের যার নেতৃত্ব দেন জ্ঞান মজুমদার। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পর অনুষ্ঠিত হয় 'শহীদের ডাক'। এটি নৃত্যগীত সমন্বিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া বোম্বাই-এর কেন্দ্রীয় নাচের দল ১৯৪৪ এর ডিসেম্বরে কলকাতায় 'ভারতের মর্মবাণী' নৃত্যনাট্য অভিনয় করেন। এ ছাড়া তো ছিল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নবজীবনের গান এর উদ্দীপক আবৃত্তির ঘটনা। গণনাট্য সঙ্ঘের এই সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের পরিমণ্ডলের কথা চিন্তা করেই বোধ হয় বিজন ভট্টাচার্য রচনা করেন তাঁর 'জীয়নকন্যা' গীতিনাট্যটি। এর শৈল্পিক প্রেরণার মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা'ও 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের গঠনশৈলী। গীতিনাট্যটির কাহিনী গৃহীত হয়েছে বেদেদের জীবনকে কেন্দ্র করে সাধারণত সাপ খেলা দেখানো যাদের পেশা। খুব ছোটবেলাতেই বিজন এই বেদে সাপুড়েদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন। সে কথা তিনি জানিয়েছেন তাঁর "অভিজ্ঞতার থিয়েটার" প্রবন্ধে। বলাবাহুল্য এটি একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারে বিজন 'জীয়নকন্যা' কেমনভাবে রচনা করেছিলেন তার

ইতিবৃত্ত জানিয়েছেন—"১৯৪৫-এ দেশভাগের আশংকায় 'জীয়নকন্যা' লিখি। 'ক্যালাস' দেশনেতা ও 'ক্যালাস' সরকারের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ। আঠারো দিনে নাটক লিখি।'' গীতিনাট্যটি নিশ্চয়ই বিজন গণনাট্য সঙ্ঘের জন্যই লিখেছিলেন গণনাট্য সঙ্ঘের উল্লিখিত ঘোষিত নির্দেশেই। দুঃখের বিষয়, গণনাট্য সঙ্ঘের দ্বারা গীতিনাট্যটি মঞ্চস্থ হয়নি। তার পরিবর্তে সেটি মঞ্চস্থ হয় রঙমহল থিয়েটারে ১৯৪৭ সালে—অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন মহম্মদ ইজরাইল, শোভেন মজুমদার, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য আর স্বয়ং নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। এছাড়া গীতিনাট্যটি সুধীপ্রধানের সহযোগিতায় ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট কলকাতা বেতার কেন্দ্রে অভিনীত হয়। সুধীপ্রধান শম্ভু মিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে লিখেছেন "শম্ভুবাবু (মিত্র) কোনো দিনই এই দুটি গীতিনাট্য (জীয়ন কন্যা ও নব জীবনের গান) প্রযোজনায় উৎসাহ দেখাননি।" সুধী প্রধান শম্ভু মিত্রের উপর অভিযোগের তর্জনী তুলে আবার বলেছেন, কিন্তু জীয়নকন্যায় শেষ পর্যন্ত শ্রেণী চেতনাহীন ও সংগ্রামহীন ঐক্যের আবেদন নানা সুরবৈচিত্র্যে পূর্ণ হলেও সামগ্রিকভাবে সহানুভূতি ও চিন্তাকে জাগ্রত করতে পারেনি।" প্রশ্ন জাগে, কি কারণে তাহলে গণনাট্য সঙ্ঘ কর্তৃক জীয়নকন্যা মঞ্চস্থ হল না ?

ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে 'অবরোধ' নাটকের বেলাতেও। নাটকটি বিজন লিখেছিলেন ১৯৪৬ সালে। নাটকটি শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত। ছয় অঙ্কের এই নাটকটি সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের এক যুগান্তকারী নাট্যরূপ। কিন্তু এই নাটকও গণনাট্য সঙ্ঘ কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়নি। সুধী প্রধান এর কারণ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন "কারণ দুটি। একটি বিজনের কারখানা ও পুঁজিবাদী ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব এবং দ্বিতীয় 'জনযুদ্ধ'র রাজনীতিতে শ্রমিক আন্দোলন তখন যে ভাবে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার সর্বাপেক্ষা ন্যূনতম স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল তার মধ্যেকার বিরোধের কৌশলগত রূপকে বুঝতে না পারা।....বিজন গ্রামের কৃষকদের যত চেনে কারখানা ও পুঁজিবাদ এবং শ্রমিককে তত চেনে না। ফলে 'অবরোধ' নাটকের শোষিত শ্রমিক এবং মালিকের বঞ্চিতা স্ত্রীর জীবন 'জবান বন্দী' ও 'নবান্নর' বঞ্চিত কৃষকের দুঃখের প্রতিধ্বনি তুলতে অক্ষম হল।"

শ্রীপ্রধান যে যুক্তিই দেখান না কেন, অবরোধ গণনাট্যের আঙ্গিককে অবহেলা করেনি। শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের যন্ত্রনা মথিত সংগ্রাম এবং সেই সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর গার্হস্থ্য জীবনের দ্বন্দ্ব 'অবরোধ' নাটকে নাট্যকার বিশ্বাসযোগ্য ভাবেই অঙ্কন করেছেন। শুধু তাই নয়, নাটকটিতে শ্রমিক সমাজই চিত্রিত হয়েছে। অতএব শ্রমিক সমাজ সম্পর্কে বিজন ভট্টাচার্যের তেমন সম্যক জ্ঞান ছিল না বলার মধ্যে অন্য কোন গূঢ় অভিসন্ধি লুকিয়ে থাকতে পারে।

নাটকটির ষষ্ঠ অঙ্কের রোধ দৃশ্যে প্রচণ্ড শ্রমিক অসন্তোষ পাঠকের নজরে পড়ে। বাইরের শ্রমিকদের কারখানা খুলে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় কারখানার শ্রমিকরা। গজানন কারখানার দরজা খুলতে গিয়ে মালিকপক্ষের দ্বারা আহত হয়ে প্রাণ দেয়। নাট্যকার লিখেছেন, অনেক মজুর ইতিমধ্যেই শবাধারের পেছনে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। শবযাত্রা এগিয়ে চলে।

"কম্বুরেখাম্বিত সিঁড়ি পথ বেয়ে শ্রমিকদের আহ্বান পর্ব কিন্তু তখনো দেখে যায়নি।" উল্লিখিত শেষ দৃশ্যের পাঠকরণে বোঝাবার নাট্যকার কেন নাটকটির নামকরণ করেছিলেন 'অবরোধ' নাটকটির প্রকাশক যথার্থই নাট্য-পরিচিতিতে লিখেছিলেন—"অবরোধের প্রবল পরাক্রান্ত মিলমালিক জনশক্তির কাছে অসহায়ভাবে বন্দী, নিষ্করুণ ভাবে অবরুদ্ধ। ঘরে বাইরে নতুনের পদধ্বনি। নতুন মানুষ আসছে এসেছে। গণনাট্যের আদর্শে লেখা নাটকটি গণনাট্য সঙ্ঘ কর্তৃক প্রযোজিত হয় নি। এরচেয়ে পরিতাপের আর কি থাকতে পারে।"

॥ ৩ ॥

১৯৪৮ সালে বিজন গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ করে বোম্বাই যান। সেখানে তিনি দুবছর থাকার পর ফিরে এলেন কলকাতায়। গড়ে তুললেন তাঁর নিজস্ব থিয়েটার—ক্যালকাটা থিয়েটার। এখানে প্রযোজিত হয়েছে তাঁর একাঙ্ক কলঙ্ক (ই. বি. আর ম্যানশন ইন্সটিটিউট ১৯৫১) গোত্রান্তর (নিউ এম্পায়ার ১৬. ৮. ৫৯ রবিবার সকাল) একাঙ্ক মরাচাঁদ (নিউ এম্পায়ার ৩১. ৩. ১৯৬১) ছায়াপথ (মিনার্ভা থিয়েটার ১১, ১০, ১৯৬১) মাস্টার মশাই (পার্ক সার্কাস ময়দান রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব ১৯৬১) দেবী গর্জন (ওয়েলিংটন স্কোয়ার জাতীয় সংহতি সম্মেলন ২১. ২. ১৯৬৬। গর্ভবতী জননী ও জালসত্ব মঞ্চস্থ হয়েছে যথাক্রমে মুক্তঅঙ্গনে ১৯৬৯ এবং আকাডেমী মঞ্চে ক্যালকাটা থিয়েটারে এই অভিনয়ের পর আরকোন অভিনয়ের সন্ধান মেলেনি। যদিও এর পর আরও কিছুদিন ক্যালকাটা থিয়েটারের অস্তিত্ব বজায় ছিল।

১৯৭০ সালে বিজন গড়ে তোলেন তাঁর দ্বিতীয় নিজস্ব থিয়েটার দল—কবচ কুণ্ডল। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকার চলাকালে বিজন লেখেন 'ধর্মগোলা' নামে একটি নাটক যা মঞ্চস্থ হয় ১৯৬৭ সালে লোকরঞ্জন শাখার প্রযোজনায়। কিন্তু কোথায় মঞ্চস্থ হয় তা জানা যায় না।

কবচ কুণ্ডলে বিজনের প্রথম প্রযোজিত নাটক 'কৃষ্ণপক্ষ' মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্র-সদনে ১২. ১, ১৯৭৩ তারিখে। এর পরে কবচ কুণ্ডলে প্রযোজিত হয় আজ

বসন্ত, (রবীন্দ্র সদন ২২.-৭৫)। ইতিপূর্বে ১৯৭১ সালে ইডেন গার্ডেনে বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদের উদ্যোগে 'সোনার বাংলা' মঞ্চস্থ হয়। এরপর কবচ কুণ্ডলের প্রযোজনায় অভিনীত হয় 'চলো সাগরে' (তপন থিয়েটার ৩০. ৩. ১৯৭৭)।

গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে আরম্ভ করে কবচ কুণ্ডল পর্যন্ত বিজনের যতগুলি নাটক ও একাঙ্ক অভিনীত হয়েছে, সবগুলির পরিচালনার দায়িত্ব বিজনের ছিল। এ ছাড়া কোন কোন ও নাটকের অভিনয়ে সঙ্গীত রচনাও তাঁকে করতে হয়েছে। বিজন ভট্টাচার্য নাটকের বহুরূপী—নিজে নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্যশিক্ষক, গীতিকার, পরিচালক, নাট্যসংগঠক ও নাট্যভাবুক।

বিজন ভট্টাচার্য যে-সালে জন্মেছিলেন, সেই সালটি নানা কারণে উল্লেখ-যোগ্য। কেননা ঐ সালে শুধু প্রথম মহাযুদ্ধের তীব্র কোলাহলই ছিল না, দেখা দিয়েছিল রুশ বিপ্লব যার মূলকথাই ছিল শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তি। বলা বাহুল্য সেসালটি ১৯১৭। তারপর একটানা প্রায় ৬১ বছর ধরে বিজনের যাবতীয় নিষ্ঠা ঐ বঞ্চিত জনগণের জীবনের বিশ্লেষণে নিয়োজিত হয়েছে।

বুড়ো

কার্ত্তিক লাহিড়ী

ব্যাঙ্ক থেকে পেনশন তুলে আনার পর দু-চার দিন বেশ মেজাজে কাটে, হাতের মুঠো আলগা হয় অনেকখানি, যেমন হতো মাইনে পাওয়ার পর। অদ্রীশ তখন তুলে যায় তার আয় এখন অর্ধেকের চেয়েও বেশ কম। কিন্তু মেজাজ শরিফ থাকলে তখন দুশো পোনা কেনার বদলে নিতে ইচ্ছে করে গোটা ইলিশ কিংবা চিতলের পেটি, দিশি আলুর বদলে ললিত আলু (নৈনিতালের আলু), পটল-টমাটো ইত্যাদি।

আজও তাই বেশ মৌজে আছে অদ্রীশ, আর কপাল এমন যে সে যা যা কিনবে মনে করে তা সব পেয়ে যায় ঝটপট। অদ্রীশ খুব খাইয়ে নয়, কিন্তু মনে মনে বাসনা রাখে অনেক খাওয়ার, তবে নিজের চেয়ে শান্তাকে তাক লাগানোতে বেশি আমোদ। তাই সে কিনে ফেলে একে একে ললিত আলু পটল চিতলের পেটি আর অবাক কাণ্ড পেয়ে যায় স্কোয়াশ শান্তা যা পছন্দ করে খাবে। এসব কিনে নিজেও মনে মনে উত্তেজিত হয় অদ্রীশ, পছন্দসই বাজার হলে যে কোনও গৃহিনী খুশি হবে তা বলাই বাহুল্য, তাছাড়া নিজেও সে পছন্দ করে যা যা, সেগুলো এর বাইরে নয় মোটেই। অবশ্য ওদের ভালো লাগবে কিনা সে বলতে পারবে না। ছেলেরা বড় হয়ে যাওয়ার পর কেমন হয়ে যায় যেন—আগে, মানে স্কুলের গণ্ডি পর্যন্ত বেশ বলে দিতে পারত ওরা কি কি পছন্দ করে, কি করে না, তারপর যে কি হয়ে যায়, অদ্রীশের দীর্ঘশ্বাস পড়ে, ওদের বুঝতেই পারি না আর...

কিন্তু এখন এই মনমত বাজার করার সুখে মশগুল হয়ে সে দীর্ঘশ্বাস, না বুঝতে পারার দুঃখ আমল দেয় না মোটে। পুরনো ব্যথাটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার আগেই বাজার সামনে ফেলে দিলে আনাজপাতি মাছ দেখে শান্তার কি প্রতিক্রিয়া হবে তা মনের চোখের উপর ভেসে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে তখন—

থলে থেকে স্কোয়াশ মেঝেয় ছিটকে পড়লে চোখ কপালে উঠে যাবে, ওমা! এযে..., সেই অবাক হওয়ার মধ্যে চিতলের পেটি বের করলে মুখ থেকে শব্দই বের হবে না কোনো, তারপর সেই অভিভূত বিহ্বলতার রেশ কাটতে থাকলে —ইস্ কি কাণ্ড করেছো তুমি, সব টাকা উড়িয়ে দিলে একদিনে, এর পর চলবে কিভাবে ভেবেছো কখনো, আমি কিন্তু পারবো না, চাইলেও···শান্তার গজগজানির মধ্যে আমি হাসতে থাকব মনে মনে, জানি যে শান্তা বকবক করতে থাকলেও খুশি হয়েছে খুব, এবং মনে মনে ঠিক করছে কি রাঁধবে আজ, হয়ত তাক লাগিয়ে দেবার জন্য নতুন কিছু রেঁধে ফেলবে, কিন্তু শান্তা সে কথা পেটে রাখতে পারবে না, আলু, পটল ডালায় তুলতে তুলতে বলবে, চিতলের কোরানি করি তবে পিঠ দিয়ে, আর কাঁটাকুটি দিয়ে তেল চড়চড়ি? হেসে বললে ভারি বয়ে গেছে করতে বলে ডালায় তরকারি না তুলেই চলে যাবে, বিয়ের পর থেকে আজ অব্দি এই করে এসেছে শান্তা অভিমান বা রাগ হলে...

অদ্রীশ সেই দৃশ্য সমূহের রেশ নিয়ে এগিয়ে আসতে গিয়ে থমকে যায়, বুড়ো বয়সে এসব কি ভাবছি আমি, দু ছেলেরই বিয়ের বয়েস হয়েছে, আগের জমানা হলে কবে বিয়ে হয়ে যেত ওদের, এখন আমার পরিচয় ওদের বাবা হিসেবে, শান্তার পরিচয় ওদের মা ব'লে, পাড়ার লোকে বলে অর্জুন অজয়ের মা কিংবা শুধু অজয়ের মা।

সে-ও কি কখনো কখনো ডেকে ফেলে না শান্তাকে অজয়ের মা বলে? অদ্রীশ লজ্জা পায়, কিন্তু সেই লজ্জার রেশ বেশিক্ষণ থাকে না, যেতে যেতে এর ওর তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়, চেনা হাসি কিংবা কথা বিনিময় করতে হয় কেমন আছেন, ভালো তো ইত্যাদি।

কখনো সখনো কেউ বা আগ বাড়িয়ে বেশি বলে ফেলে, সেরে ফেললেন এর মধ্যেই, ভাগ্যবান বটে, আমাদের জন্য কিছু রেখেছেন তো, কেউ বা বলে মর্নিংওয়ার্ক এ যাচ্ছেন তো, প্রেসার কেমন, করলার রস খান বুঝলেন সুগার সাত হাত দূরে পালাবে, আমার আবার প্রস্টেটটা জ্বালাচ্ছে ইত্যাদি....

অদ্রীশ চুপ চাপ থাকতে চায় এই সব গায়ে পড়া আলাপ সল্লাপের তীর বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে, পারে না তবু। যত নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে তত হুলের মত তীর এসে বেঁধে গায়ে, দিব্যি আছেন মশাই, দুটো ছেলেরই হিল্লে করে

ফেলেছেন, তা আমার ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে দিন না, আপনার কত চেনা শোনা।

কিংবা বলে, আপনের লাগান ভাইগে পাইলে আহ দেকতাম, আমার পুলাটারে পাটাইয়া দিমু, একটু কয়্যা দিলে—

এই সব জ্বালা ধরানো বাক্য বা সিদ্ধান্তর জবাবে কি বলা যায়? এক বলা যায়—বেশ করেছি, আপনাদের মুরোদ থাকলে করুন গিয়ে, আর নয়ত হেসে চুপ করে থাকা যায়। কিন্তু এসব শোনার পর ধৈর্য রাখাই মুশ্কিল হয়, তবু রাখতে হয়, নইলে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে হয়। ঝগড়া করে কি অন্যের মুখ বন্ধ করা যায়?

মধ্যে মধ্যে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে অচ্ছ, এখন রিটায়ার করেছি তবু....

অদ্রীশ কড়া কথা শোনাতে পারে না অচ্ছ। ভাবে—কড়া কথা শুনিয়ে দিলে ভবিষ্যতে দরকার পড়লে কোনো সাহায্য পাবে না তার কাছে। সে জানে, কথার মার খুব বড় মার, লোকে সে আঘাত ভোলে না কখনো। তাছাড়া সে দেখেছে, যাকে সে একটু কড়া কথা বলেছে বা যার সঙ্গে সামান্য রূঢ় ব্যবহার করেছে, কপালের ফেরে তার কাছেই যেতে হয়েছে কোনো না কোনো জরুরি কাজে। তাই সে অনেক সময় আঘাত হজম করেও পালটা আঘাত হানে না।

আজ অবশ্য তেমন কোনো ঘটনা ঘটে নি, এমন কি অনেকের সঙ্গে হাসি বা সৌজন্য বিনিময়ও বড় একটা হয় নি। দু-চারটে মামুলি কথা হয়েছে যদিও, মনে কোনো গ্লানি জন্মায় নি তাতে। বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে ফিরতে পারছে, কেউ ধৈর্য ভাঙছে না তার—

অর্জুন কি কলকাতার দিকে চাকরির চেষ্টা করছে? অজয়টার মতিগতি দেখে মনে হচ্ছে এ জায়গা থেকে সে নড়বে না মোটে, আর নড়বেই বা কি করে? আর্টস পড়ে চাকরি পাওয়া সহজ নয়, অর্জুন চেষ্টা করলে বরং পেয়ে যাবে কোনো ভালো ফার্মে। শান্তাও বোধও চায় কলকাতায় একটা ঠাঁই হোক আমাদের, কিন্তু দু-ছেলে এখানে পড়ে থাকলে কি করে কলকাতায় ফ্ল্যাট কেনার কথা ভাবা যায়?

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে আসতে থাকলে মধ্যে মধ্যে একটা ডাক আছড়ে পড়ছে পিঠে। কেউ যেন ডাকছে, তাকে কি? অদ্রীশ চলার গতি একটু কমায়, হাঁ, ডাকছে কেউ, কিন্তু কি বলে ডাকছে সে কান খাড়া করে ধরতে পারে না, একটা অ অ শব্দ।

অদ্রীশ চলার গতি বাড়ায় আবার, নাহ, তাকে কেউ ডাকছে না

কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে যেতে অ অ ডাকটা তার কানের খুব কাছেই হয়, সে তা উপেক্ষা করেই এগিয়ে যেতে থাকে।

আরে, তোমাকেই ডাকছি সেই কখন থেকে অ

আমাকে ?

তোমাকেই, আগন্তুক একবার চারপাশ দেখে হাসে, এখানে তুমি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

কিন্তু, অদ্রীশ আগন্তুককে দেখছে তখন

কি ? আগন্তুক হাসতেই থাকে তবু, চেনা গেল ?

মানে, অদ্রীশ আমতা আমতা করতে থাকে, আমি ঠিক চিনতে পারছি না, মানে লোকেট্ করতে পারছি না, আপনি—

আমি কিন্তু তোমাকে ঠিক চিনতে পেরেছি, তুমি অবিকল প্রায় একই রকম আছ।

অদ্রীশ আগন্তুক-কে তীক্ষ্ণ ভাবে দেখতে চেষ্টা করে

চিনতে পারছো না ? আগন্তুক হাসছে, আমি কচি।

কচি ?

হ্যাঁ, কচি মজুমদার, কচি হাসছে আরও, যার ডাকনাম ভালো নাম একই, মনে পড়ছে ?

অদ্রীশ মনে করতে চেষ্টা করছে

ভুললে চলবে নাকি, কচি একটু আক্রমণাত্মক ভঙ্গি নিচ্ছে যেন, সেই ফোর্থ ক্লাশ থেকে বি. এ. অব্দি একসঙ্গে উঠলাম বসলাম

কচি, কচি, অদ্রীশ মনে মনে আবৃত্তি করতে থাকে, কোথায় কখন ? যেন সে জালের আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করছে তাকে—কচিকে

কেন কত জায়গায়, মনে পড়ছে সেই আমতলায় জমায়েত হওয়া, আবার হৈ হৈ করতে করতে স্কুলে যাওয়া, পাথরতলা টেকনিক্যাল স্কুল আমতলার বাঁধ দিয়ে কামিনী গার্ডেনস পেরিয়ে, মনে পড়ছে না ?

আমতলা পাথরতলা টেকনিক্যাল স্কুল, অদ্রীশ এবার স্পষ্টভাবে আওড়ায়

হাঁ, হাঁ, বিশ্বাস মোটরের গ্যারেজ, টিফিনে নকুলদানা, তারপর বেরিয়াল গ্রাউণ্ডে খেলা আজাহারদা ওহাব বিধুদা, পরিতোষদা, আর আমরা চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে গলা চিরে ফেলছি, মাঠ কাঁপছে—, মনে পড়ছে এবার ? আমি আমি, আমায় অদ্রীশ উচ্চারণ করতে পারতাম না, তাই তোকে ডাকতাম অ বলে—

অ ?

ঠিক, ঠিক ধরেছি, কচি উৎসাহিত হয়ে বলতে থাকে, গোপালচন্দ্র ইন্সটিটিউশন তারপর এডওয়ার্ড কলেজ, মনে আছে ডি এম বাংলোর কাছে বসন্তপার্কে গিয়ে আমি বাচ্চু অনু বিড়ি টানতাম আর তুই আমাদের দিকে তাকাতিস করুণা করে যেন আমরা কত পাপ কাজ করছি, তারপর....

আমার তো কিছু মনে পড়ছে না, অদ্রীশ অস্থির হয়ে বলে ওঠে, আপনি কোথাকার কথা বলছেন ?

কেন ? পাবনার কথা বলছি, তুমি গেলে দিদির বাড়ি পড়তে, আমিও তাই, হয়ত এজন্যই তোমার সঙ্গে ভাব জমে গেল, দুজনে অভিন্ন আত্মা, বন্ধুরা আমাদের খেপাত অকচি বলে, তারপর এমন কাণ্ড, কচি কথা বলতে বলতে মগ্ন হয়ে যাচ্ছে কেমন, কলকাতায় এসে ভর্তি হলাম একই কলেজে, ভগবান আমাদের একটা সুতোয় গেঁথে দিয়েছিল তখন, তারপর, কচির দীর্ঘশ্বাস পড়ে, যাক্ সে কথা, কচি একটু দম নিয়ে বলে, তা তুই কেমন আছিস ? আমার ছেলে এখানে বদলি হয়ে এসেছে, আমি এসেছি বেড়াতে, হঠাৎ একটা ছেলের মুখে অদ্রীশবাবু নামটা শুনেই বেশ কৌতূহল জাগে, জানতে ইচ্ছে করল—ওরা কোন্ অদ্রীশবাবুর কথা বলছে....

অদ্রীশ ভুরু কোঁচকালে কচি আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করে, চেনো নাকি ছেলেটিকে ?

কোন ছেলে ?

কচি আত্মমগ্ন হয়ে বলছে তখন; বেশ ছেলেটি, ছিপছিপে চোখে হালকা ফ্রেমের চশমা, গায়ের রং মাজা, চোখ দুটো ভারি উজ্জ্বল, দেখে তোমার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। তুমিও ঠিক তেমন ছিলে, আরও তোমার ডেসক্রিপশন দিতে আমি লাফিয়ে উঠি, আরে এযে আমাদের অ। কচি একটু থামে, তারপর হাসে, ও কিন্তু বুঝতে পারে নি অ-এর রহস্য, তখন খুলে বললাম, শুনে তার সে কি হাসি, হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে, ঠিক তুমি যেমনটি গড়িয়ে পড়তে হাসতে হাসতে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, এখনও কি তুমি তেমন হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ো ?

অদ্রীশ মনে করতে পারছে না কিছুতেই যে সে ওরকম হাসি তো দূরের কথা, অতি মৃদু শব্দ তুলেও হেসেছে কিনা কোনোদিন। তার হাসি ঠোঁট ছাড়িয়ে মুখে পড়েছে কিনা, সে বিষয়েও তার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অদ্রীশ কচি-র দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু

সে একটা সময় ছিল বটে, কচির দীর্ঘশ্বাস পড়ে, সে সব কথা মনে পড়লে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, বলতে বলতে কচি নিজের গভীরে চলে যেতে থাকে, আজকাল ছেলেরা ক্রিকেট নিয়ে হইহই করে, কিন্তু ডাংগুলির মধ্যে যে থ্রিল ছিল, কি বলো ? আর তোমার আমার পার্টনারশিপে খেলা, আহ্....

কচি যে তন্ময়তা নিয়ে শৈশব কৈশোর যৌবনের কথা বলে যাচ্ছে ; তাতে অদ্রীশ স্পষ্ট হওয়ার বদলে অবাক হয়ে যাচ্ছে শুধু, একে আমি দেখিনি কখনো, আর যে সব কথা বলছে—তার কিছুই বুঝতে পারছি না, কেন সে এসব কথা বলছে, আমাকে কি ব্ল্যাকমেল করতে চায় ?

অদ্রীশ একটু কঠোর ভাবে তাকায় কচির দিকে, আমি কিছু কিছু মনে করতে পারছি না,—

কিছু না ?

বলছি তো কিছু না, তারপর সে একটু জোরেই জিজ্ঞেস করে, আপনি কে, কি চান আপনি আমার কাছে ?

অদ্রীশের কথা শুনে কেমন থত মত খায় কচি। অসহায়ের মত এদিক ও দিক তাকিয়ে কাতর স্বরে জিজ্ঞেস করে ওঠে, পাবনার কথাও মনে পড়ছে না ? পদ্মার চর, ইছামতী, জামতলা, ডাক্তারপাড়া ?

না-না, কিছু না, কিছু মনে পড়ছে না

কচি অদ্রীশের দিকে তাকিয়ে আছে তবু

আপনি বোধ হয় ভুল করছেন, আমি অদ্রীশ রায়, কলেজে পড়াতাম, এখন রিটায়ার করেছি—

আর কিছু মনে পড়ছে না এ ছাড়া ? কচি করুণভাবে প্রশ্ন করে

বললাম তো আপনাকে ; যথাসম্ভব শুকনো গলায় উত্তর দেয় অদ্রীশ

তাহলে আপনি কোথায় পড়েছিলেন ? কোন্ স্কুলে, কোথায় ? সে প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে দেয় তার দিকে তখন আলতোভাবে

খুব নিরীহ প্রশ্ন, কিন্তু প্রশ্নগুলো তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে এক শেষ করে দিতে থাকে। শেষে একটা ঠান্ডা হাওয়ার ঝোঁয়ায় অদ্রীশ আস্তে আস্তে তার স্বাভাবিক ছন্দ লয় পেতে থাকে, তখন দেখে—কেউ নেই সেখানে, কি নাম যেন তার, হাঁ হাঁ, সে গেল কোথায় তবে ?

ফিরতে ফিরতে কচির প্রশ্নের জবাব সে পেতে চেষ্টা করে, নাহ্, মনে করতে পারছে না কিছুতেই—কখন কোথায় কোন্ স্কুলে পড়েছিল সে, কিংবা কলেজে, বুকের দোলন দ্রুত হয়ে উঠলে অদ্রীশ দু-একদিন আগের কথাও মনে করতে চাইছে না তখন....

একি, পাখা চালাও নি কেন ? ঘেমে নেয়ে গেছ, অফ···শান্তা গজ গজ করতে করতে সুইচ অন করে, এত আলসে হলে কি চলে ? কখন আমি আসব,সুইচ অন্ করবো, ততক্ষণ....

কথা বলতে বলতে শান্তা অদ্রীশের কাছে চলে আসে। তাকে নিরুত্তর দেখে বলে, কি উত্তর দিচ্ছো না যে বড়, শরীর খারাপ লাগছে নাকি ? সে ব্যস্ত হয়ে কপালে হাত দেয়, কি হলো, উত্তর দিচ্ছো না যে বড় ?

কিছু হয় নি

কিছু হয় নি তো শুয়ে পড়লে কেন ?

ভাবছি

ভাবছো ?

হ্যাঁ

কি এমন হয়েছে যে আমাকেও বলতে চাইছো না

আহা, একটু জিরিয়ে নিতে দাও, তারপর বলছি

ততক্ষণ চা করে আনি ?

থাক্ এখন, বলেই অদ্রীশ উঠে বসে, বুঝলে একটা কাণ্ডই হয়েছে।

কাণ্ড, শান্তা চমকে ওঠে।

না-না তেমন কিছু নয়, হাসে অদ্রীশ, তবে....

আরে বাবা, খুলেই বলো না কেন ?

বলছি বলছি, অদ্রীশ একটু থামে, বাজার থেকে ফিরছি, টিলার মুখটায় যেই এসেছি শুনি কে যেন্ ডাকছে অ অ

সে আবার কি ?

আরে শোনোই না ছাই, অদ্রীশ একটু বিরক্ত হয় তখন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সহজ হয়ে যায় আবার, অ অ করে যে আমাকেই ডাকছে, বুঝতে পারি নি আমি, আর বুঝবোই কেমন করে, তা ভদ্রলোক কাছে এসে বললেন আমাকেই ডাকছেন তিনি....

আচ্ছা, তারপর ?

বললেন স্কুলে আমার সঙ্গে পড়েছেন, এমন কি কলেজেও। শুধু পড়াই নয়, আমরা নাকি একসঙ্গে স্কুলে যেতাম খেলতাম বেড়াতাম—আরও কত কি ! বললেন কত কত জায়গার কথা, সে সব জায়গায়—

তা ভদ্রলোকের নাম কি ?

নাম ? অদ্রীশ স্মৃতির দরজায় ধাক্কা মারছে, খুলে বের করে আনতে চাইছে নামটা, না পেরে সে বলে ওঠে, বললেন স্কুলে যাওয়ার আগে আমরা আমগাছের তলায় জড়ো হতাম, তারপর পাথরতলা টেকনিক্যাল স্কুল জামতলা পেরিয়ে নাকি স্কুলে পৌঁছতাম....

আচ্ছা আচ্ছা, শান্তা মনে করতে চেষ্টা করছে, তুমিও তো বলতে আমায় যে তোমরা একসঙ্গে স্কুলে যেতে, কত গল্প করতে পাবনায়, সে থেমে পড়ে এবং হঠাৎ মনে পড়লে কথাটা জোরে হয়ে যায় যেমন, তেমন জোরে শান্তা বলে ওঠে, হাঁ হাঁ তুমি কচিবাবুর গল্প খুব করতে, ভদ্রলোকের নাম কি কচি মজুমদার ?

কচি, কচি, কপালে টোকা মারছে অদ্রীশ, যেন সেখানে টোকা মারলে খুলে যাবে স্মৃতির ঝাঁপি হঠাৎ ঃ

কচি মজুমদার তোমার বন্ধু ছিলেন, তাঁর সঙ্গে তুমি ফোর্থ ক্লাশ থেকে বি. এ অব্দি একসঙ্গে পড়েছিলে পাবনা কলকাতায়।

অদ্রীশ অবাক হয়ে তাকায় শান্তার দিকে।

হাঁ হাঁ মনে পড়ছে, শান্তা খুশিতে উছলে উঠছে, ওরা নাকি তোমার নাম ঠিকঠাক উচ্চারণ করতে পারতো না, তাই ডাকত অ বলে, মনে হচ্ছে তিনিই

হবেন, তুমি খুব তাঁর কথা বলতে, আর সেজন্য আমরা তোমাকে খেপাতাম খুব....

খেপাতে ?

বারে, অজয় যখন ছোট ছিল তখন সে তোমাকে কাঁচ বলে ডাকতো।

কিন্তু আমি যে কিছু মনে করতে পারছি না।

পাবনার কথা, স্কুলের কথা ? এই যে আমি মনে করিয়ে দিলাম।

তবু না, একটা কথাও মনে পড়ছে না—

কোন্ স্কুলে পড়েছিলে—সেটা মনে আছে তো ?

নাহ্, তাও মনে পড়ছে না, কিছু মনে পড়ছে না।

শান্তা খুব শান্তভাবে তাকায় অদ্রীশের দিকে।

অদ্রীশ মুখ তোলে, আমার কি হবে শান্তা ? তার কথা ঘরের দেয়ালে লেগে আর্তনাদ করে ওঠে।

কি আর হবে ? কিছু না, শান্তা অদ্রীশের অসহায়ত্বকে আমল না দিয়ে তাকে সহজ স্বাভাবিক করতে চায়।

কি বলছো তুমি ? অদ্রীশ অবাক হচ্ছে শান্তার কথায়, আমার কিছু মনে পড়ছে না, আর তুমি বলছো—

কথার মধ্যেই শান্তা বলে ওঠে, আমাদেরও কি ছাই সব কথা মনে আছে; না, মনে পড়ে এখন ?

কিন্তু কিছু কিছু কথা মনে পড়ে ?

শান্তা কি বলবে ভেবে পায় না, সে আশ্বস্ত করতে চায় অদ্রীশকে, তাই চুলে বিলি কাটতে থাকে।

আমার কিছু মনে পড়ছে না

পড়বে পড়বে, অত ব্যস্ত হয়ো না, বয়েস বাড়লে এরকম হয়েই থাকে

মানে স্মৃতি লোপ ?

শান্তা হেসে ওঠে, স্মৃতি লোপ পেলে কি আমাকে চিনতে পারতে ?

তাহলে ?

শান্তা কপালে হাত বুলোতে থাকে, আর ভাবতে হবে না, বয়েস বাড়লে....

কথাটা লুফে নেয় অদ্রীশ, তার মানে বুড়ো হলে আবেগ অনুভূতি সব খসে খসে পড়ে, পুরনো কিছু মনে পড়ে না, পড়বে না, আমি আমি—

অত অস্থির হচ্ছ কেন ? একটু শান্ত হও তো—

অস্থির হবো না ? স্মৃতিহীন মানুষ তো একটা জরদ্গব জড়পিণ্ড মাত্র, যার জীবন থেকে স্মৃতি খসে গেছে, তার বেঁচে থাকার কি মানে হয় ?

বলেই অদ্রীশ কেমন বিহ্বল হয়ে যেতে থাকে। প্রশ্নটা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার আগেই সে এলিয়ে পড়ে বিছানায়। অদ্রীশ বুঝতে পারছে না—

জীবনে বাঁচার বেলায় স্মৃতির ভূমিকা কতটুকু....

চর প্রহরী

যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

প্রথম আঁধার মিনিট ঘণ্টায় জমাট হয়ে এখন শেষরাত। জেনারেটারে জ্বালানো পাইপ লাইট দু-একখানা টুপটাপ নিভে যায়। সাদা বালির পিছনে ফরেস্ট বিভাগের বসানো বাইন গরানের চারার ঝোপে জমাট অন্ধকার ছিটকে আসে চরে। তারপর তো নোনাজলের সমুদ্র। সমুদ্রের উপর ভেসে থাকা শীতের অন্ধকারে মিশে যায় চরের আবছা অন্ধকার।

পুরোনো কম্বল গায়ে মাথায় মুড়ি দিয়ে জীবন দাস জবুথবু বসে। নোনাজল ছুঁয়ে শীতের হাওয়া। পায়ে বাঁধা হাওয়াই চটিসুদ্ধ মুড়িসুড়ি দিয়ে শীত আটকায়। নিচে হিমে ভেজা ঠান্ডা বালি। শুধুমাত্র খড় বিছিয়ে জাল পাতা। তার উপরই সারাদিনের রোদে শুখনো শুটকি মাছগুলো আরও রোদ খাওয়ার আয়োজনে রাত কাটাচ্ছে।

খটির চারদিকে গরান খোঁচা পুঁতে পুঁতে আট দশ বিঘার মতো এরিয়া। খোঁচা থেকে খোঁচা দড়ি টাঙিয়ে রুপোবাটি বোমলা মাছ শুখোয়। বালির উপর লালপাতি সালপাতি ছুরি মাছ। মাছগুলোকে পাহারা দেয় জীবন দাস।

খটিগুলোর সমুদ্রমুখো এরিয়া ধরে চরের বালিতে হাঁটা চলার বেশ শক্ত পথ পড়েছে ক'দিনে। হাওয়াই চটি পায়ের গোড়ালিতে লেগে ফটাস্ ফটাস্ শব্দ। হাওয়া বেয়ে শব্দটা বালিতে ছড়িয়ে যায়। গায়ে চাদর জড়িয়ে কানে মাথায় মাফলার। বাঁ-হাতের তিন আঙুলে বিড়ির খুঁট ধরে হেঁটে আসে

লোকটা। পায়ের খটি, নিবারণ দাসের খটি পার হয়ে ক্রমশ এগিয়ে আসে। দূরেঘ ভাঙতে ভাঙতে যত এগিয়ে আসে পায়ের শব্দ হাওয়া বেয়ে বালির চরে ছড়িয়ে পড়ে।

শীতে জবুথবু জীবন দাসের কম্বল ভেদ করে শব্দটা কানে বাজে। তখনই নড়ে চড়ে বসে। কান খাড়া করে সতর্ক। হাওয়াই চটির আওয়াজ আর লোকটার ক্রমশ নিকটতর হাওয়ার গতি আন্দাজ করে বৃদ্ধ শরীরে ধীরে ধীরে উটে এগোয়।

বালির উপর পাতা জাল সামলে সামলে পা ফেলে। নিজের হাওয়াই চটি শুদ্ধ পা ধীরে ধীরে পাতে। একদম বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা। এত রাতে কেউ কোথাও নেই। পিছনে খটি ঘরে মালিক শুয়ে, ম্যানেজার, খাতালেখা মাষ্টার সকলেই আড়তের বাঁখারি মাচায় বিছানা পেতেছে। হোগলা ছাউনি দিয়ে শীতে চার মাসের জন্যে খটি ঘর। খটি ঘরের উঠোনে ঠাকুর থান। রঙিন কাগজে দেবস্থানটুকু সাজানো। সারারাত আলো জ্বলে। লালচে আলো শেষ রাতেরও উঠোনময়।

হাওয়াই চটির শব্দ কাছে আসতেই জীবন দাস ঝোলানো শুটকি মাছের মধ্যে থেকে মুখ গলিয়ে শুধোয়, কে যাইতিসেন গো ?

নিজের ছন্দে নিজের চলা ফাঁকা পাও চরে। থমকে দাঁড়িয়ে বলে, আমি। বুড়ো জীবন দাস একই মাত্রায় স্বর রেখে জানতে চায়, তবু কে ? কইবেন না ?

শীতের কাল গায়ে চাদর, চিনি ক্যেমনে ?

—আমি,, লাল কলোনির ধীরেন বেরা—

ধীরেন এগিয়ে আসে বেড়ার কাছে। দূরের আলোয় আঁধার কাটে না। তবুও মুখের চাদর সরিয়ে বলে, চিনতে পারছেন নি গো আমাকে ?

এত রাতে ? বেশ জোর গলার স্বরে। হঠাৎ মনে হয় জীবন দাসের, এই জিজ্ঞাসাবাদ তো তোর কাজ। আড়তদার চিত্র দাস জানবে কেমন করে ? পাহারা ঠিক হইতেছে কি না ?

ধীরেন বলে, ওই খালেদের ঘাটির উপাশকে বিষ্টু দাসের খটিতে যাইবো।

—বিষ্টু দাস। অক্ষয় নগরের বিষ্টু দাস ? না, আটে নম্বরের বিষ্টু ? জানতে চায় জীবন দাস।

—অক্ষয় নগরের বিষ্টুবাবুকেই চিনি। আর কে আছে জানিনি তো ? দাঁড়িয়ে একটু কথা হয়। গলার আওয়াজ হলে চিত্রবাবুর আড়তের কেউ জেগে ওঠে। শোয়ার সময় ঠান্ডা আটকাতে আড়তের ছাঁচ গোড়ায় হোগলার ঝাঁপ আঁটা। ঝাঁপ সরিয়ে নৈশকৃত্য সারতেই বেরোয়। খটি এরিয়ার ও প্রান্তে কথাবার্তা শুনে থমকে দাঁড়ায়। আচমকা সন্দেহ জাগে, পাহারাদার বুড়ো কি কাউকে চুরি করে শুটকি মাছ বেচে দিচ্ছে।

সুতরাং ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে খাতালেখা মাস্টার আড়ত চালার ওপাশে গিয়ে নিজেকে হালকা করে।

জীবন দাস জোরে জোরে কথা চালায়, বিষ্টুবাবুকে সারাদিন বোধ হয় দ্যাখীছনি গো ভাই—

দমে গিয়ে বিপন্ন ধীরেন বেরা। হঠাৎ জোরে বলে, তা হইলে। বিষ্টুবাবুর দাদা যে খবরটা দিতে কইলে?

—কী খবর?

একলা মানুষ রাত জেগে চরের বুকে মাছ পাহারার কাজ। তবু কথা বলতে দু-দণ্ডের সঙ্গি।

গরান খোঁটার বেড়ার ওপার থেকে ধীরেন বলে, ওর দাদা কয়ে পাঠাইলে যে আসামের এক বড় ব্যাপারি সকাল দশটা এগারোটায় কাকদ্বীপে আইসবে। তার সঙ্গে বিষ্টুবাবুর কথাবার্তা হইবে কাকদ্বীপে—

খাতা পত্তরে হিসেব লেখার মাস্টারবাবু তার বেঁটে খাটো চেহারায় শালটা মুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে খটির মাছ শুখোনো পাড়ন ধরে হাঁটে। দেড় দু-হাত রুপোবর্ণ মাছ বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে শুকনো হচ্ছে। এপাশের লোককে ওপাশ থেকে বোঝা যায় না। ফলে বেঁটে খাটো চলন্ত লোককে টের পায় না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এত মাছ—চালান না পাঠাইলে বিকিকিনি হইবে ক্যামনে? কিসের এত মাছ! কিসের এত বিক্রি…তেমন ধরতে পারে না খাতালেখা মাস্টারমশাই। বালির দানার মতো গুঁড়ো গুঁড়ো সংশয় জন্ম নেয় মাস্টারের বুকে। গোটা খটির খরচ খরচা লাভ লোকসান তো তার লম্বা লম্বা জাবদা খাতায়। দিনের শেষে, না হয় সপ্তাহ অন্তে মালিক চিত্র দাসের সঙ্গে বসে বোঝাতে হয়। সুতরাং কথাবার্তায় ধারা বুঝবার জন্যে মাস্টার চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকে। বুকের মধ্যে ভোমরা বাজে, মালিককে এই কাণ্ড-কীর্তির কৌটো খুলে দেখাতে পারলে তো মালিক অনেক কাছের হয়ে উঠবে। এত লাখ টাকার কারবার মালিকের। এমন যুক্তিতে মাস্টারবাবু চরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় হিমে ভেজা বালিতে দাঁড়িয়ে একটু ওম পায়।

(২)

মরা তিথি। শীতের দুপুরে চারদিক থম মারা। ফলত সমুদ্রের জলে তেমন উচ্ছ্বাস নেই। মাথা পার হয়ে সূর্যটা আকাশের কাঁধে। গুঁড়ো গুঁড়ো রোদ্দুরে নোনাজল চিকমিকোয়। হঠাৎ এক ঝাঁক বক আকাশে পাক মেরে জলের দিকে উড়ে যায়। নরম পালকে সাদা গোল গাল ঠোঁট-কাটা অনা পাখি। ডানা মেলে শূন্যে খানিক চক্কর দিয়ে থপ্ করে জলের উপর বসে। মৃদু ঢেউয়ে দোল খায়।

চরের পিছনে গাছপালার লাইন থেকে দলছুট হয়ে ক্যাওড়া গাছটা একদম বালিচরে। সারা বছর একলা উদোম সমুদ্রের ঝড় বৃষ্টিতে যুঝে বাঁচে। শীত এলেই চিত্রবাবুর খটি গাছটাকে ঘিরে তৈরি হয়। গাছটার গায়ে বাঁশ বেঁধে ডগায় একখানা নীল নিয়ন বাতি। রাতের বেলায় মাঝ সমুদ্র থেকে জেলেরা ডিঙিগুলোর নিয়ে বাইতে পারে, হাই-যে নীল বাতি—ওইটা চিত্রবাবুর আড়ত…। তখন ধূ-ধূ জলের উপর ভেসে আসে মাটির আশ্বাস।

পাকা দাড়ি আকাটায় খোঁচা খোঁচা। লম্বাটে ভারি মুখ। পঞ্চাশোর্ধ পুরুষ। মাঝখান থেকে সিঁথি কেটে ভারি চেহারায় বেশ লম্বা। বেলা ন'টার শীতে একখানা গেঞ্জিতে সড়গড়। আড়তের বাখারি মাচানে বসে বিড়ি টানছে আর সামনের ফাঁকা বালিপথ বেয়ে সমুদ্র দেখছে। বারবার মনে হয় চিত্রবাবুর, খুলনা চিটাগাঙের সমুদ্র জল…সেইখানেও তো মাছ ছিল! পয়হা ছিল। জায়গা জমিন আত্মীয় স্বজন লইয়া বসবাস ছিল। এ্যাহন্ এইখানে…। দেশ…জম্মদেশ ছাড়াছি কিন্তু শিশুকালে নোনাজল খুলনায় যা—এই লাটেও তো তাই…। ঠাকুরণ গাঙ বইছে…জল টানতে এইপার থেকে ওইপার। ওই পার থেকে এই পার…বাতাসও তো তাই। আকাশ সূর্য? সেও তো এক। তা হইলে…। বারে বারে সেই বাঙলা দেশের মাটি…টিন বিছানো জ্বালাসন…চেউ মারে কেন বুকের গাঙে। মন বসে নাই। এইখানেও তো আপনজনও আইছে। তবু…। হঠাৎ মনে পড়ে চিত্রবাবুর, সেই দ্যাশে তো বাবার হাত ধরি পথ হাঁটছি…মায়ের কোল ধাস্‌সি। সেই বাবা—সেই মা ও দ্যাশের মাটির সঙ্গে মিশে আছে…সাত পুরুষের মাটি! আর এই দ্যাশে? সবে মাত্র দিন কাটাইতেছি…এক পুরুষও পার হয় নাই। খুঁড়লে মাটি ফুঁড়লে মাটি ছাড়া আর কিছু তো বাহির হয় না।

একটু একটু করে জেগে ওঠে বুকের মধ্যে। এই বঙ্গের শেষ প্রান্তভূমিকে বসে প্রবাহিত নোনা জল ধারা বেয়ে মনটা ছুঁয়ে যায় ও বঙ্গের মাটি গাছ পালার ছায়ায়। চিত্র দাসের স্পষ্ট মনে পড়ে, সেই শিশুকালে পথ চলতে চলতে পায়ে হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়তেই, ফট করে মা কোলে তুলিইছিলো। হোঁচটের ক্ষতে হাত বুলিয়ে দিতেই ব্যথা কমে। ভুলাইতে নরম-হলুদ পালকে কালো ঠোঁটে পাখিটা দেখাইয়া মা কইসিলো, চিত্তির দ্যাহ দ্যাহ বউ কথা কও ডাহে—

ব্যথা হারিয়ে মাকে বায়না ধরছিলাম, ওই পাখিটা ধরি দিবে?

—দিবো। ঘরো চলো—

সেই পথ…সেই গাছ…সেই পাখি…আজ এই দেশে আট দশ বছরে তো একটাও দেহি নাই!

আড়তের মাচায় বসে আপশোশ হয় চিত্র দাসের। মায়ের জন্যে ? না, মাসহ সেই ভূমি দেশ। নাকি, হারানো শৈশবের জন্যে, ঠিক বুঝতে পারে না।

সাদা ধব ধবে সরু চালের গরম ভাত। স্টীলের থালায় এক থাবা সুন্দর করে সাজানো। সরু রেখায় ভাতের ধোঁয়া দু-একবার কাটে। থালায় কাঁচা পেঁয়াজ আলু ভেসে এক ঝোলা। রাঁধুনি ছোকরা জগন্নাথ থালাটা এনে মাচার কাছে দাঁড়ায়, বাবু-উ-চিত্র দাস তাকায়।

—জল খাবার লেন গো, বাঁ-হাতে স্টীলের গ্লাসে জল ভর্তি। ডান হাতে জলখাবারের থালা।

চিত্রবাবু মাচায় বিছোনো চটটা খানিক গুটিয়ে ভাতের থালা রাখার জায়গা করে নেয়। জগন্নাথের হাত থেকে গ্লাসটা বাতার ফাঁকে গোঁথে বলে, দাও গো পূজারি। একটু পাশে তাকিয়ে হিসাবরত মাস্টারবাবুকে দেখে জানতে চায়, স্বপনবাবুকে দিবে না ?

—হুঁ। আপনারটা দিই—

—ঠিক আছে। মাস্টারবাবুর খাবার আনি দাও। তবে খাইবো—

লাল লাল লম্বা জাবেদা খাতা যত্নে সরিয়ে রাখে স্বপনবাবু। টিনের সুটকেসের মধ্যে টাকা পয়সা। গুছিয়ে রেখে স্বপন বলে, আপনি শুরু করুন। আমাকে দিচ্ছে—

—উঁহু। এক সঙ্গে—এই ফাঁকা গাওগেরামে ঘর সংসার ছেড়ে সব এক। এক সঙ্গেই খাইবো—

চালা শেষে রান্নাঘর। গুচ্ছের ছেলে মেয়ে বউ ছোকরাদের হাকা-হাঁকি, কথাবার্তা। যে যার থালা পেতে লাইন ধরে বসে। জগনের প্লাসটিক জারটা থালা থেকে থালা হটে হটে চলে যায় প্রত্যেকের পাতে। শুটকি মাছ বাছাইয়ের কাজে এখন খানিক বিরতি। টিফিন খেয়ে পেটে জল কয়লা পুরে আবার কাজ বেলা আড়াইটা তিনটে।

টাকরা অব্দি জল টেনে চিত্র দাস বাইরের রোদে মাচায় বসে। আড়ে দশ লম্বায় পঁচিশ হাত বড় মাচা। তলায় দেড় দু-হাত খুঁটি পুঁতে বাঁশ বাখারি বিছিয়ে বড় জায়গা। একেবারে বাড়াই বাছাই শুটকি মাছগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে স্তূপ। বস্তা- ভর্তি হবে বিকাল বেলায়। চিত্র দাস মাচার ফাঁকা জায়গায় বসে বিড়ি খায়। উশার তোলে। টাটকা ভাতের গন্ধ।

সামনে সমুদ্র প্রায় স্থির। দু-চারখানা ডিঙি পালে হাওয়া খাইয়ে এগোয়। ডিঙি টপকালে সমুদ্র ছাপিয়ে পুবের মাটি। গোবর্দ্ধনপুরের শেষ। ক'খানা গাছপালার সবুজ রেখা। দ্বীপটার চাল বেয়ে চকচকে সাদা বালি। রোদ পড়ে জায়গাটা রুপোলি চর। একদম ফাঁকা। হঠাৎ

মনে হয় চিত্র দাসের, এই চরে বসতে পেলে তো ফরেস্টের নানা ঝামেলা। লোক পিছু ষোল টাকার পাশ চার মাসের জন্যে। গাছের ডাল পালায় হাত লাগাতেও নিষেধ। রান্নার জ্বালানি সংগ্রহও কঠিন।

যেহেতু নিষেধ, আইনের বাধা—মনটা উশপাশ করে। সামনের উদোম সমুদ্দুরে জেলে মাছ মেরে রোজগার—। কেউ তো তেমন দেখবার নাই, উপকার করণের নাই—মাটিতে, বালিতে একটু আশ্রয় লইলে আইনের চাপ। নিয়ম।

সাদা কাপড়ে বড় করে কালোপাড়। রোগা চেহারায় কালো শরীরটা ঢেকে ধীরে ধীরে হাঁটে। বাঁকা বাঁকা পায়ে বালি ভাঙে। পায়ের পাতা ডুবে যায়। টেনে টেনে হাঁটে বৃদ্ধা। চোখের সামনে আড়ত। পৌঁছতে কষ্ট—কষ্ট বলেই কাছে এসেও দূরেই মনে হয়। ডাইনে বাঁয়ে রুপোবটি মাছগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। এমন মাছে যে কত স্বাদ। একবার মাত্র মনে হয়েই পায়ের চাপে খোঁদল, পাশের বালি ঝরে ঝরে খোঁদল ঢেকে দেয়। বৃদ্ধার জিভের ইচ্ছাটাও ঢেকে যায়। মনের মধ্যে তো আশঙ্কা। দীর্ঘ আশঙ্কা।

বালিতে বিছোনো শুকনো মাছ। কটা বউ মাথা নিচু করে হাতে বাখারি কাটা ছুরির মতো পাটি দিয়ে মাছগুলোকে উলটে দেয়। মাছের শিরা পেটের কাঁটা এখন শুকিয়ে সুচ। ভূমিমুখো চোখ মাথা, কোমর পাছা উঁচু হয়ে সারিবদ্ধ কর্মী মেয়েগুলো। বক বক করে, সুর করে গান গায়। মাছগুলোকে উলটে পালটে রোদ খাওয়ায়। মেয়েগুলোর মনোযোগ কাড়তেই বৃদ্ধা জোরে বলে, ও মায়েরা—প্রায় একই সঙ্গে চার পাঁচ জন ঘাড় ফেরায়।

বেগুনি রঙের শাড়ি জড়িয়ে বুক এঁটে কোমরে গোজা। বলে,—কি গো ?

—এইটা চিত্তিরবাবুর আড়ত ? ফাঁকা মাড়িতে গলা কেঁপে যায় বৃদ্ধার।

—হাঁ।

—বাবু আছে ?

—হুঁ, আরও যাও

জীবন দাসের গোলগাল মুখ। বেলা অব্দি ঘুমিয়ে রাত পুষিয়ে নিয়েছে। চোখ মুখ ফোলা। ভারি গাল গণ্ডে বুড়ো মানুষ। চোখের ভ্রু কাঁচা পাকায় শুকনো ঘাসের চাবড়া। গালময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গেঞ্জি গায়েই চিত্র দাসের মুখোমুখি বসে।

—তালুইমশাই ?

—অঁ

—গাঙ দেহি কি মনে হয় গো আপনের ? মাছ উঠবে।

বহু বছর ফাড়ে মাঝি গিরি করে এখন বাতিল বৃদ্ধ। তবু যে মালিক পরামর্শ চায়, এইটুকুতে মুক্ত সম্মান ফেরত পেল। সুতরাং একটু দায়িত্ব

নিয়ে ভাবে জীবন দাস, বলে, যে হানে জাল পাতছে সেইখানকার জল দ্যাহনে লাগবে।

তালুইমশায়ের কথায় আশা জাগে না। তাই শুনেতে তেমন আগ্রহ নেই চিত্র দাসের। তালুইমশাই ধরতে পেরে আশ্বাস দেয়, হাঁ। জলের যা চিকন মাছের গন্ধ বলে মনে লাগে—

—চালানটা ভালো হইবে মনে হয় ? আকুল চিত্রবাবু।

বুড়ো জীবন দাস কাছেই ঠাকুরস্থানে চোখ ফেলে, হাঁ। মা গঙ্গা—বাবা নারায়ণ মাছ দিবে—দিবেই। এতগুলা মানুষের পেটের ভাত—আর সন্তানদের দ্যাখতে হইবেই হইবে—

বৃদ্ধা কাছে এসে বলে, হ্যাঁ বাবু আড়তদার ?

চিত্র দাস চমকে ডাকে, আরে! পিসি আইস গো—, মাচার উপর চাপড় মেরে বসতে দেখায়। শুটকি মাছ সহ মাচাটা নেচে ওঠে।

—বসবো নাই গো বাবু। আমার পোলা রবিন কোথায় ?

চিত্র দাস ধাঁধায় পড়ে।

—বড় বিপদ গো। রবিনকে চাই, বৃদ্ধা আবার বলে।

চিত্র-দাস মুহূর্তে খাড়া হয়ে বসে, হাঁ পিসি—কিসের বিপদ ?

—বউ মাটার বড় অসুখ!

—ডাক্তার দেহান নাই ? চিত্র দাস দম নিয়ে কথাটা বলে।

—হাঁ। তবু অসুখ কমছে না।

—সে কি! ট্যাবলেট—শিশির ঔষধ দেয় নাই ? চিত্র দাস পরামর্শ দিয়েও সন্তুষ্ট নয়।

—দিসে। পাঁচ ছয় দিন জ্বর কমছে নাই! বউটা গলা জড়িয়ে কাঁদসে, মা গো—আপনার ছেলেকে একবার ডাকি আনেন। চোখে দ্যাখতে মন চাইছে গো—, বলতে বলতে শয্যাগত অল্প বয়েসী মেয়েটার আকুতি বৃদ্ধা মায়ের বড় মনে লাগে। হোক বউ পরের মেয়ে, চোখের সামনে নিজের পেটের সন্তানের জন্যেই বউটার এমন ব্যথার্ত নিবেদন! ভালো লাগে। বৃদ্ধার মনটাও ভিজে যায় বউয়ের চোখের জলে।

তালুইমশায় বৃদ্ধার মুখটা দেখে গাঙের দিকে তাকায়। ক্রমশ সমুদ্র মুখে গাঙটা মিশে ধু ধু জলরাশি। কোন মাঝ সমুদ্রে যে রবিন খাড়ে ডিঙি থেকে জাল পড়েছে সমুদ্রের বুকে। পঁচিশ তিরিশ জন সঙ্গি ছোকরা মধ্যবয়সী জেলেদের সঙ্গে ভেসে আছে। ট্রলার দাঁড়িয়ে তাদেরই গায়ের কাছে। মাছ না পাইলে ট্রলার আইসে অতো তেল মবিল পুড়াইয়ে! অ্যাহন্ খরচ—! বউ ডাকছে, চোহে দ্যাখবে! কিন্তু....! রেলগাড়ি নয়...লরি ট্যাক্সি নয়... কোন টেলিগ্রাম নয়...! খবরটা যাইবে কেমন করে ওই মাঝ সমুদ্রে! রাতে

মাছ পাইলে ট্রলার যদি আইসে তবে তো মুখে মুখে খবর পাঠানো! না আইসলে! জল নাচে...। বাতাসের শব্দ হয়। কূল কিনারাহীন জলের উপর মাটির খবর পাঠানো যে কী কঠিন! মাটির খবর মাটিতে জমে জমে স্তরীভূত হয়। জলের পৃথিবী মাটির পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব হয়েও দূরত্ব যে কী অসীম! দুর্গম!

তালুইমশাই মুখ ভারি করে বৃদ্ধার দিকে চেয়ে থাকে।

চিত্রদাস বিপন্নতার সঙ্গি পেয়ে বলে, পিসি—ভালো ডাক্তার দেহাও। পথ্যি দাও। বউ মা ভালো হইবে।

বৃদ্ধা চুপ চাপ। কোন প্রতিপ্রশ্ন নেই। তখনই হাঁক দেয় চিত্রদাস, মাষ্টারবাবু—রবিনের নামে দুই'শ টাকা লিখেন তো। পিসিকে দিতে হইবে—

বৃদ্ধা মাচায় বসে না। মাচা ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাথার উপর সূর্য। বৃদ্ধার শরীরের ছায়াটা ক্রমান্বয়ে হয়ে মাচার নিচে হেলে গেছে। লালপাতি, বড় বড় ভোলামাছ শুখনো হয়ে সাজানো মাচার উপর। মাঝে মাঝে গুলোনো হাওয়ায় শুঁটকি গন্ধ।

তালুই মশাই বৃদ্ধা মায়ের দিকে তাকিয়ে চেনা বউটার শয্যাগত দুরবস্থা চোখে আনে। কত দূরে....কত ক্ষতি হত গভীর জলের উপর ভাসছে তার পরম নির্ভর পুরুষ মানুষটা....এই বালিচর থেকে কত মাইলের পর মাইল জলের দূরত্বে। বৃদ্ধাকে দেখে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, খাওয়া হইসে আপনের? বৃদ্ধা মলিন মুখে হাসে।—না। গিয়া খাইবো—

—খাইবেন কিসু এহানে? খোদ মালিক চিত্রদাস শুধোয়।

তালুই মশাই আন্তরিক হয়ে বলে, বোধ হয় সব পাক হয় নাই। শুধু ভাত দুটা আলু দিয়া খায়েন—

—না গো বাবু। বাড়ি যায়ে খাইবো। বউটা একলা বড় কাঁদে...., বৃদ্ধা বিনীত স্বরে জানায়।

ফটফট চটি জোড়ার পায়ে গলিয়ে দাঁড়াতেই লুঙি আলগা মনে হয়। কোমরে টান করে গিঁট মারে খাতা লেখা মাষ্টার। চিত্রবাবুর মাচার কাছে দাঁড়িয়ে দুটো একশ টাকার নোট ধরে। চিত্রবাবু পিসির হাতে দিয়ে বলে, পিসি—বউমার জন্যে। বড় ডাক্তার দেখাইবেন। ফল মাছ খাওয়াইবেন—।

বৃদ্ধা পিসি অবাক হয়ে বলে, লইতেছি। কিন্তু ছেলেটাকে গাঙে খবর দিবেন নি!

—দিবো। নিশ্চয় দিবো—খরচ লাগে লোক পাঠাইবেন।

বুড়ো তালুই মশাই সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। বৃদ্ধা পিসি পাশে পাশে। বেড়ার দু-দিকে শুঁটকি মাছ গুলো ঝুলছে। বৃদ্ধার হাতে একখানা ছোট্ট ব্যাগ

পান সুপুরির ডিবের ঠনঠন্ শব্দ। ব্যাগটা নজরে লাগতেই তালুই মশাই বলে, পিশি থামেন।

বুড়ী থমকে যায়। পায়ের তলায় বালি। রোদে ঝুর ঝুরে। পা রাখতেই শরীরের ভর পেয়ে গোড়ালি ডোবে।

ঘাটির পাড়নে কর্মী মেয়েদের উদ্দেশে হাঁকে তালুইমশাই, ও কালীবউ—কালীবউ—

—আজ্ঞা? সাড়াদেয় বেগুনি শাড়ি। পাশ গ্রামেরই বাসিন্দা মহিলা কর্মী।

—মুঠা চারেক লাল পাতি মাছ দিবে তো এই বুড়ি মাকে।

তালুই মশাইয়ের কথায় চমকে ওঠে পিসি। মুখ চোখে দেখে। ভাবে, বুড়া—মন জানলে ক্যামনে।

ঝাঁকা বুক। ভারি ব্যাগ। পায়ের তলায় নরম বালি। ধীরে ধীরে এগোয় পিসি। পাশাপাশি বুড়ো তালুইমশাই। খানিকটা এগিয়ে দেয়। রাতের পাহারায় দেখা কর, রোদ্দুরে কেমন মায়াময়। সাদা বালির উপর বক গাঙ চিল মনাপাখি ওড়ে। সমুদ্র শান্ত এখন। জেনারেটারের আলোর খুঁটি খাটা কিমুচ্ছে চড়া রোদে। পালের খটি নিবারণ দাসের বাটি পার হয়ে জলতলার কাছাকাছি আসে। তালুইমশাই বলে, পিসি সাবধানে যায়েন—

—যাইসি। কিন্তু নি—, বলতে বলতে গলা ধরে যায়,—ছেলেটারে খবর করিবেন গো—

—হুঁ, হুঁ।

বুড়ী বহু ব্যথায় আবার পেছন ফেরে। তালুইমশাই আকাশ দেখে পাণ্ডে তাকায়। ভাবে, যখন মাঝি হইলাম···দুমাস পরে ফিরিনি, রোগে ভুগে রোগা বউটা দু-বাহুতে গলা জড়িয়ে কইত—আইসছো গো তুমি....! মনে ভয় হইত···জীবন থাকতে তোমার সনে দেখা হইব...।

যৌবন হারিয়ে...রোজগার হারিয়ে পাহারাদার তালুইমশাই কূল কিনারা-হীন যোজন দূরের জলভাসি রবিনের মুখ চোখ কালো চুল দেখতে পায়।

সেমিনারজীবি

কিন্নর রায়

১. মেট্রো চ্যানেল

'চোলিকে নিচে ক্যেয়া হ্যায় / চুনরিকে পিছে ক্যেয়া হ্যায়....' ধম ধম ধম ধম—তারপরে আরও ধম ধম ধম, ধম ধমা ধম বাজনায়, হৈ-রৈ চিৎকারে—সঙ্গে খলনায়ক খলনায়ক খলনায়ক'—এসব কোনো উচ্চারণে সুদেব কান্তি বুঝতে পারছিলেন, টি ভি-র সেকেণ্ড চ্যানেলে মেট্রো আওয়ার লেগে গেছে।

ফ্ল্যাট বাড়ির তিন ইঞ্চি দেয়াল সেভাবে শব্দ আটকাতে পারে না। আর শব্দ যেন বা ব্রহ্মই—যেমনটি বর্ণনা হিন্দুদের প্রাচীন সব শাস্ত্রে, তার আরটুকু সুদেব কান্তি বুঝতে পারছিলেন। ঢেউ ঢেউয়ের পর ঢেউ। গান ও নাচ নামের যন্ত্রণা তিন ইঞ্চির দেয়াল ফুঁড়ে যে ভাবে আসে, তখন আর কোনো কাজ করা যায় না।

এখন বিদ্যুৎ নেই, শুধু লোডশেডিংয়ের ভেতর আলো দেয়া জেনারেটার মাসকাবারি একটি পয়েন্ট একদিন ব্যবহার করার জন্যে টাকা, নিজের পড়া, ফ্যান চালানো—এরকম গোটা চারেক পয়েন্ট সুদেব কান্তির। মাস গেলে গুনে একশো কুড়ি টাকা দিতে হয় জেনারেটারের ছেলেটিকে। একত্রিশে মাস হলে একশো চব্বিশ।

পাখার শেড ঘরের বাতাস নাড়িয়ে দিচ্ছিল? তার সঙ্গে তাঁর প্রিয় তামাক ফ্লাইং ডাচম্যান পুড়তে পুড়তে এক ধরনের গন্ধ মিশিয়ে দিতে পারছিল। নিকোটিন একটু একটু করে রক্তের গভীরে তলিয়ে যেতে, শরীর

বোধহয় সামান্য চলমানে হয়ে ওঠে, অন্তত এই পঞ্চাশ পেরিয়ে বড় টেবিল, টেবিল ল্যাম্প, পাঁচ পয়েন্ট ঘোরা ফ্যান—সব দেখতে দেখতে সুদেব কান্তি এরকমটি ভাবতে পারছিলেন।

'দিল ধক ধক করনে লাগা / মেরারা জিয়োরা ডর নে লাগা…' গানের কথা স্পষ্ট ঢুকে পড়ছে এই ঘরের হাওয়ায়। পাশের ঘরে নীলিমা লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। সেখানে এখন হাওয়া নাড়ানো একটি ফ্যান। সুদেবের মনে পড়ল পাশের ঘরে আলো না জ্বালালেও জেনারেটারের টাকা কমবে না। তবু অভ্যাস। নীলিমা আলোয় ঘুমোতে পারে না।

এই গানের সুরে যে মাদকতা, সেটুকু মাথার ভেতর ছড়িয়ে গেলে সুদেব কান্তির মনে পড়ল দিন চারেক আগে, তাঁদের হাউজিং কমপ্লেকসের সামনে কুড়ি ফুট পিচ রাস্তাটি পেরিয়ে ওপারে সেলুনে চুল কাটতে গেলে এই গানের কথাগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নাচ। তাঁকে দেখতে হচ্ছিল।

চুল কাটানো ছেলেটির নাম রণজিৎ ঠাকুর, সে নিজস্ব উচ্চারণে রঞ্জিত হয়ে যায়। আর বিহারের একদা মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর যে সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন—অর্থাৎ এই ঠাকুর'রা রাজপুত ঠাকুর—সিং নয় হিন্দি ফিল্মে যাদের প্রায়ই ডাকা হয়ে থাকে 'ঠাকোর' বলে—তার সঙ্গে রণজিৎ ঠাকুরদের কোনো রিস্তা নেই। কর্পূরীকে তাঁর দেশের অনেক মানুষই 'কাঁরপুরী' বলে ঠাট্টা করতেন। এমন অভিজ্ঞতা সুদেবের নিজস্ব, তারা হয়ে বক্তিয়া যাওয়ার পথে—তাঁর ফিল্ড ওয়ার্কের কাজে কোনো এক শীতের দুপুরে বিহার রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসের ভেতর এমন উচ্চারণে তিনি কিন্তু চমকেই উঠে ছিলেন। তাঁর পাশে যে বিহারি বাবুটি, তার পরণে গলাবন্ধ নীল প্রিন্স কোর্ট, ছাই রঙের ফুল প্যান্ট। পায়ে ফিতে বাঁধা কালো জুতো। গালে পান। বাইরে পিক ফেলার জন্যে তিনি প্রায়ই তাঁর ভালো করে তেল দিয়ে, পাট পাট আঁচড়ানো কালো মাথাটি সুদেবকে পেরিয়ে জানলার কাছে নিয়ে আসছিলেন। পান-জর্দার ঝাঁঝাল গন্ধ এসে লাগছিল সুদেব কান্তির নাকে। সিটে বসা বিহারিবাবু বলে উঠেছিলেন, 'কাঁরপুরী'-কা জমানা চল রহা হ্যায়। প্রথমটায় না বুঝতে পারলেও পরে আলোচনার ধারা মন দিয়ে শুনতে শুনতে সরকারি গ্রান্টের টাকার সেন্টেনটিজ-এর রুর‍্যাল ভায়োলেন্স-এর রুট খুঁজতে আসা সুদেব সেই নীল কোট আর ছাই রঙা প্যান্টের রসিকতায় নিজের মনেই হেসে ফেলতে পারেন। বাস তখন কোনো ছোট নদীর ওপর বাঁধা ঢালাই সেতু পেরিয়ে তীরবেগে ছুটে যাচ্ছিল।

রণজিতের চুল কাটানোর দোকানে ছুটির দিন ছাড়া তেমন ভিড় থাকে না। সুদেব তখন কাঁচির নিচে নিজের মাথাটি সঁপে দিতে দিতে প্রায় প্রতিবারের মতোই বলে ওঠেন, খুব ছোট করে কাটবেন। এমন ছোট যাতে প্রাইভেট বাস কন্ডাকটার হিন্দিতে টিকিট চায়।

এমন অভিজ্ঞতাটিও হয়েছে তাঁর জীবনে। বাসে চলতে চলতে তিনি শুনতে পেয়েছেন, আপকা টিকিট!

ঘাড় নেড়ে সুদেবের জবাব—দে রাঁহা হুঁ।

আস্তে আস্তে দীজিয়ে, নাহি তো উস্‌কে বাদ ভিড়—

বাসে তেমন ঠাসাঠাসি নেই। গুরুনানক আর বালগোপালের ছবির মাঝখানে যে চৌকো আয়না তার ভেতর নিজের চুল কাটানো মুণ্ডটি দেখতে পেয়ে সুদেব কাস্তি বুঝতে পারেন, তাঁর জন্যে কেন এই হিন্দি সম্ভাষণ। মাথায় একবার বাঁ হাতের তেলোটি বুলিয়ে নিয়ে, গরমে খুব আরাম পাচ্ছি —এমন ভাবনার ভেতর সুদেব টিকিট দিয়ে দিতে পারেন।

ক্লিপের ব্যবহার বহুদিন ভুলে গিয়েছে রণজিৎ। এখন কাঁচিতেই ছোট করে কেটে নিতে পারে। সুদেবের মনে হয় ক্লিপ হলে তাঁর মাথাটি আরও সহজে চুলের ভার মুক্ত হতে পারত। কাঁচি আর চিরুণি দিয়েই রণজিৎ সমান করে দিতে থাকে। আর তখনই সুদেব দেখতে পান রণজিতের বছর চার পাঁচের মেয়েটি, যার ডাক নাম রুপা, সে তার ছোট শরীরটি নিয়ে চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ায়। রুপা সকালের নাশ্‌তার জন্যে পয়সা চাইছে। তেমন লম্বা নয়। মাথা আর পেট দুটোই বেশ বড়। খালি পা। দু চোখে পিচুটি আর গত রাতের ঘুম।

এ বাবু পাইসা—

রণজিৎ চুপ। খালি কাঁচির শব্দ। পাশের চেয়ারে রণজিতের ভাই অজিত সাবান মাখা, সাদা ফেনায়িত কোনো গাল থেকে ধারাল ক্ষুরের টানে দাড়ি আর সাবান একই সঙ্গে কামিয়ে নিচ্ছে। ক্ষুরের এই টানাটানির একটা নিজস্ব ধ্বনি আছে। সেই চড়া শব্দ এই ঘরের হাওয়ার ধীরে মুছে যাচ্ছিল।

এ বাবুজি, পাইসা—

দেব্—রণজিৎ ঘাড় নাড়ে তারপর কাঠের ক্যাশ বাক্স খুলে একটা এক টাকার কয়েন। রুপা টাকাটি নেয়। অতঃপর দ্রুত দোকানের বাইরে।

কর্পূরী ঠাকুর হামারে গাঁও কা হি হ্যায়। অ্যায়সে তো বিরাদার ভি— কাঁচি দিয়ে কাটার খপ খপ শব্দের সঙ্গে রণজিতের কথাও কুচি কুচি হয়ে যাচ্ছিল। কর্পূরী ঠাকুর আমাদেরই জাতের লোক, এমনটি বহুবার শোনা আছে সুদেবের। এখন চুল কাটানো হয়ে গেলে, দোকানের বাইরে আসার আগে রণজিৎ সস্তার পাউডার ছড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে তাঁর ঘাড়, গালে লেগে থাকা কাটা চুলের টুকরো পরিষ্কার করে দেবে। গলা অব্দি জড়ানো সাদা চাদরটি ঝেড়ে ঝেড়ে লেগে থাকা চুলে কুচি যতটা সম্ভব মুক্ত করে চারপাট করে গুছিয়ে রাখবে। আর সুদেব অনেকটা উঁচু চেয়ার থেকে নেমে এসে চার টাকা দেয়ার পর, রাস্তার এপারে এসে হার্ডওয়ার্সের দোকানের সামনে

'মেরা দিল ধক ধক করনে লাগা / মেরা জিয়া ডরনে লাগা'—রূপা তার উচ্চারণে এইসব শব্দ যতটা শুদ্ধ বলতে পারে, ততটাই শুদ্ধ উচ্চারণে—গানটি শোনাতে থাকে। আর গান শোনানোর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে গালি পড়ে। জোরে জোরে হাততালি।

রূপা জানে এভাবে নাচলে পয়সা পাওয়া যাবে। এমনিতেই প্রতি সকালে আশপাশের কয়েকটা দোকানে জল, চা, মুড়ি সিগারেট বা এরকম হালকা ফুলকা কিছু এনে দিয়ে রূপা সামান্য দু-চার আনা পায়। সেই পাওনার দাবি আরও জোরদার করতে—তার 'দিল ধক ধক করনে লাগা....'

সুদেব কান্তি দেখতে পান গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে রূপা তার রঙিন সস্তা ফ্রকের পিঠের বোতাম আলগা করে দেয়। তারপর জামাটি অনেকখানি নামিয়ে এনে, তার শিশু কাঁধের হাড় দেখাতে দেখাতে প্রবল হাততালি, হালকা সিটির ভেতর, জামাটি আরও নামিয়ে, যেমন করে 'যেটা' ছবিতে মাধুরী দীক্ষিত তার স্তন চূড়ার প্রায় কাছাকাছি—স্তন সন্ধির অনেকটা নিচে পরনের ফ্রক রাখে—বিষয়টি পরে নীলিমার কাছ থেকে জেনেছেন সুদেব—সেভাবে ফ্রক সাজিয়ে দিয়ে রূপা তার আধো বলার ভেতর ক্রমাগত 'দিল ধক ধক করনে লাগা' বলে যেতে থাকে আর তাকে ঘিরে তীব্র চিৎকার, হৈ-হৈ, সিটি। সুদেব বুঝতে পারছিলেন রূপার আজকের রোজগার ভালো হবে। তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন এই ভিড়ের পেছনে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক চোখ জোড়া নিয়ে। আর রূপা তার কণ্ঠের সুর কথা বদল করে—'কেত প্যারে বাবা বাজার প্যারে মা' বলতে বলতে 'আঙ্না পে বাবা / দুয়ারে পে মা'—তে চলে যেতে পারে।

এখানেই শেষ হয় না। যারা রূপাকে খুচরো দিয়েছে, তারা সবাই 'আর একটা আর একটা' বলার পর রূপা 'তু তু তু তু তু তারা তোড়ো না দিল হামারা'-তে পৌঁছে যায়।

কুড়ি ফিট রাস্তার ওপারে তার বাবা নিশ্চিন্তে চুল-দাড়ি কাটে। শ্যাম্পু, কলপ করে। মহেঞ্জাই কীভাবে লাফ দিয়ে দিয়ে বাড়ছে, সে বিষয়ে হা-হুতোশ করে। তারপর কখনও বা তার দিহাতের গল্প—নকসালবাদীরা কীভাবে আসে, রাতের বেলা মিটিন করে, তারও বিবরণ থাকে।

রূপাকে গিলে ধরা ভিড় ঠেলে সুদেবের এগিয়ে যাওয়া হয় না। পরে তিনি রণজিৎকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছেন তাদের টি ভি আছে। সাদা-কালো। রাত আটটা থেকে দশটা তারা মেট্রো চ্যানেল দেখে। বাচ্চারাও দেখে। হমনি লোপ সব এক সাথ ব্যায়টকে—। রণজিতের এই কথায় সুদেব দেখতে পান রাত আটটা থেকে দশটায় মেট্রো আওয়ার—কি খাব, কি মাখব, কি পরব—তার বিজ্ঞাপন, তারপর নাচ, নাচের সঙ্গে গান—দুটোকে কি শুধু উৎকট বলে

ছেড়ে দেয়া যাবে নাকি আরও বেশি কিছু! গান, গানের সঙ্গে চুম্বন, নাচ, নাচের সঙ্গে ঝাপটা ঝাপটি। কোমর নিতম্ব, স্তন, জঙ্ঘা, বুক পেট পিঠ— সব, সব কাঁপছে।

রূপা, রূপার বাবা রূপার মা, রূপার কাকা, রূপার কাকিমা ভাই বোন— সবাই দেখছে। রেশনের গম ভাঙানো আটার শুকনো রুটি—সুদেব সুন্দর দৃশ্যটি কল্পনা করে নেন—তার সঙ্গে আলু ভিণ্ডি দিয়ে একটি কোনারকম তরকারি—টি.ভি-র পর্দায় বিজ্ঞানের গুলাব জামুন, পুরী, মুরগির ঠ্যাং ভাজা হচ্ছে। যে তেলে কোলেস্টরেল হয় না, ফ্যাট থাকে না।

রণজিৎ তার বৌ দুখিয়াকে বলছে—ইয়ে রোটি কাহে কো ইতনা কড়া—

রুটি এত শক্ত কেন—স্বামীর প্রশ্নের এই জবাবে দুখিয়ার জবাব—ইসসে তো দেশি ঘি আচ্ছা হ্যায়—রণজিৎ মাজরা বুঝে উঠতে পারে না। কার থেকে দেশি ঘি ভালো?

টেলিভিশনের পর্দায় তখনও সুস্বাদু খাবারের তালিকা। কড়াইয়ের ভেতর ফুলকো লুচি। কি সাদা, কি ফোলা। কারা এসব খায়—রণজিৎ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সে টি ভি-র খাবার দাবার, তার বৌয়ের উত্তর— সব মিলিয়ে বিষম খেয়ে ফেলে জলের ঘটি খুঁজতে থাকে। টেলিভিশন পর্দায় তখন পরিচিত ফিল্মি হিরোইন তার লম্বা এলো চুল মেলে দিয়ে 'ঘনে বালোঁ কা রাজ ক্যেয়া হ্যায়' বোঝাতে চাইছে।

এসবই সুদেবসুন্দরের কল্পনা, হয়ত বা বাস্তব—তবু পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা চিৎকার ভেদ করে তাঁর দরজায় কেউ খট খট করলে তিনি কান খাড়া করে বুঝে নিতে চান এত রাতে আবার কে এলো। দরজায় আই হোল এ চোখটি রেখে কিছুই বুঝতে পারেন না। লোডশেডিং—স্টেয়ার কেস-এর সামনে আলো নেই। তাই আন্দাজ দরজা খুলে টিনাকে দেখতে পেয়ে, তুই এখনও ঘুমোস নি, বলার আগেই সিক্স প্লাস টিনা জ্যেঠিমা শুয়ে পড়েছে কিনা খবর নেয়। জ্যেঠিমা শুয়ে পড়ার অর্থ টিভি চলবে না। তার মানে কালারে 'হ্যালো বম্বে' বাদ। জ্যেঠু তো আর এসব দেখে না—টিনা জানে— 'আমি যাই গো' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে টিনা ডায়েনিং স্পেস-এর আঁধারে স্থির দাঁড়ানো জুতো রাখার বাক্সটিতে ধাক্কা খেয়ে 'আউচ্' এমন একটি অস্ফুট উচ্চারণে যেতে পারে।

'আউচ্' কথাটি খট করে কানে লাগে সুদেবের। অন্ধকারে আচমকা ধাক্কা খেলে আমরা কি বলি! উফ্, মাগো! ওরে বাবারে! আঃ! তার বদলে—'আউচ্'। শব্দটি বাংলা উচ্চারণে, বর্ণমালায় নতুন সংযোজনে মনে হয়। যেমন অনেক আরবি, ফারসি, ইংরেজি, ফরাসি, পর্তুগিজ, দিনেমার শব্দ আমাদের ভাষায়, তেমনই 'আউচ্'—টি ভি বিজ্ঞাপনের কোনো ব্যথা নাশক মালিশের বিজ্ঞাপনকে আচমকা ধাক্কা লাগা নারী 'আউচ্' বলে ওঠে—

সুদেব সুন্দরের স্মৃতিতে আলো পড়ে। তিনি আবারও টি ভি মুদু আলো লাগা পরদাটি দেখতে পান। সেখানে চোট পাওয়া কোনো শিশু অথবা নারী, কোমরে খটকা লাগার মাব বয়েসি—তাদের সবার মুখেই 'আউচ'।

টিভির বিষয়ে টিনাকে দরজা খুলে দিতে দিতে সুদেব পরিষ্কার দেখতে পান কুড়ি ফিট রাস্তার এপারে হার্ডওয়ার্স-এর দোকানের সামনে রূপা নামে এক বালিকা নেচে নেচে গেয়ে যাচ্ছে—'তু তু তুতু তারা'....'দিল ধক ধক ধক করানে লাগা।'

বাইরে, সিঁড়ির মুখে অনেকটা অন্ধকার। টিনা রায়, সি ইউ বলে পাশের ঘরে নিজেদের দরজা ঠক ঠক করছিল। তাকে সাদা-কালোতেই 'হ্যালো বম্বে' দেখতে হবে।

২. ফাঁসি যেন হয়

সকালের দিকে কেউ এসে গেলে, কথা বলতে বলতে অনেকটা সময় চলে যায়। সেভাবে মুখ ফুটে ব্যাপারটা বলতেও পারেন না সুদেব। অথচ ঘাড়ের ওপর কাজ জমে থাকলে মেজাজ হয়ে ওঠে তিরিক্ষি। নীলিমা তখন কাছে ঘেঁষেন না। সুদেব নিজের স্টাডিতে, টাইপ রাইটারের সামনে, ক্রমাগত অক্ষরের বোতাম টিপতে টিপতে—পার্সোন্যাল কমপিউটারটা এসে গেলেই, সব মেমারিতে রেখে দেব, এমন ভাবনার ভেতর মনে করতে পারেন তাঁর ও নীলিমার একমাত্র সন্তান সুধন্য—সুধন্য সেন স্টেটসে সেটলড।—এত পরিশ্রম করার দরকার কি তোমার—হোয়াই সো ব্যাকডেটেড—লাইক আ প্রি হিস্টরিক ক্রিচার—এত নোটস, এত টাইপ করা, ম্যানুয়াল লেবার—হরিবল্ আই উইল সেনড্ ইউ আ কমপিউটর। আ পার্সোন্যাল কমপিউটার ফর ইউ। ওদেশে সবাই তাই করে। তাছাড়া তুমি যে ধরনের রুর‍্যাল প্রবলেমস নিয়ে কাজ করছ—এত ডাটা, ফিল্ড ওয়ার্ক—বলতে বলতে সুধন্যর হাতে বাঁধা সোনালি কোয়াজ বেজে ওঠে। তখনও ওর জেট ল্যাগ কাটেনি। দু চোখে ক্লান্তি, ঘুম। এরই মধ্যে রিস্ট ওয়াচ থেকে বেরিয়ে আসা রিন রিনে শব্দে সুধন্য ঘড়ির ডায়ালে চোখ রাখে। খুব আস্তে বলে, ম্যারিকান স্ট্যান্ডার্ড টাইম—সে মতোই ঘড়ি চলছে। তার ঠোঁটে কেমন যেন এক তাচ্ছিল্য আটকে থাকে। সুদেব হয়ত ঠিক বুঝতে পারেন না। কিন্তু এরকমই মনে হয় তাঁর।

টেররিস্ট। এভরি হোয়ার। শোনে উঠলে গলার কাছে প্রাণ আটকে থাকে। এই বুঝি বম্ব ব্লাসট্। এইবার হাইজ্যাকড হলাম। বলতে বলতে আরারও হাই তুলছিল সুধন্য।

টেক রেস্ট। টেক রেস্ট মাই বয়। নিজের খুব ছোট করে ছাঁটা চুলের ভেতর বাঁ হাতের পাঁচ আঙুল ডুবিয়ে দিতে দিতে নিজের একমাত্র সন্তানকে অধ্যাপক সুদেব ক্লান্তি সেন এরকমই বলতে পারেন। বাইরে তখন অনেক রোদ।

হঠাৎ দরজায় বেল বেজে উঠলো, এই সকালে সুদেব সবে একবার চা খেয়েছেন, তাঁর সামনে চ্যাপ্টা বিদেশি টাইপ রাইটার, রয়্যাল ভায়োলেন্স তার রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক প্রেক্ষিত—গ্রামীণ হিংসা কেন. এর কতটা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্যে, কতটাই বা বাঁচার ন্যূনতম দাবিটি নিয়ে তা নিয়েও কাজ করতে করতে নানা সংশয় সুদেবকান্তির সামনে। ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর এই হত দরিদ্র অবস্থাতেও আমলারা যদি একটু সৎ হন, তাহলে নানা রকম ক্যাশ ডোল, বীজ ও সারের জন্যে লোন, আর্থিক ঋণ মানুষকে তার স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং তুলে ধরার ব্যাপারে সাহায্য করবে, তখন হয়ত গ্রামের ভূমিহীন কৃষক আর ততটা বিপ্লব মুখীই থাকবে না—এমন কথা সুদেবের সমীক্ষা বলে দিতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন, এই সিস্টেমে কতজন আমলা সৎ থাকবেন।

ঠিক সকাল নটায় নীলিমার অফিস যাওয়ার চাটার্ড বাস। বাড়ি থেকে আটটা চল্লিশ, বড় জোর পৌনে নটায় নীলিমা বেরিয়ে পড়ে। সুদেব জানেন এখন তাঁর প্রায় একতিরিশ বছরের বিয়ে করা বৌ শাড়ির সামনের প্লিট ঠিক করছে, বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। নীলিমা আয়না ভালোবাসে। রান্নার মহিলাটি দুবেলার মতো রেঁধে দিয়ে চলে গেছেন। যিনি বাসন মাজেন, তার উপস্থিতি এখন রান্নাঘরে।

সুদেব উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। আই হোলে চোখ রেখে বুঝতে পারেন নি। অপরিচিত দুই যুবক—

আমরা আপনার কাছে—

হ্যাঁ বলুন—সুদেব বোধহয় একটু রুক্ষই হলেন গলায়।

সকালে কাজের সময় যত ডিস্টার্বেন্স। একটা সকাল নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে। ভেতরে ভেতরে রাগ হলেও এখন বাইরে নিজের ওপর একটা ঘন পালিশ আনতে পারেন সুদেব। তাঁর মনে পড়ল ছেলেবেলায়, এমন কি প্রথম যৌবনেও তিনি হুটপাট রেগে যেতেন। বড় ভাই মারা যাওয়ার দু বছর পর এই ছেলে। কেউ সেভাবে বলতে সাহস পেত না ন্যায় অন্যায়। সুদেব খুব রেগে গেলে—সুদেব দেখতে পাচ্ছিলেন মা তাঁর পায়ে পেতলের ঘটি করে জল ঢেলে দিচ্ছে। এক ছেলে মারা যাওয়ার পর এই ছেলে। কথায় বলে, 'মল্লির ছেলে'—রাগ তো একটু বেশি হবেই দু তিন ঘটি জল পায়ের পাতায় ঢালার পর আমার রাগ কোথায় যেন নেমে যেত। মা-র ঠোঁটের কোণে তখন এক টুকরো হাসি!

আমরা একটু ভেতরে যেতে পারি। একটু বসে কথা বলব।

আসুন। সুদেব দরজা থেকে সরে যেতে যেতে এটুকু বলার মধ্যেই গলায় সামান্য বিরক্তির বাঁধ ফুটে উঠল কিনা ভেবে নিজেরই ভেতরে ভেতর ভয়।

আমরা আসলে একটা ব্যাপারে সই নেয়ার জন্যে—আপনি যদি একটু

দেখেন। ডায়েনিংরুমের ফাঁকা স্পেসটুকু পেরিয়ে কতক্ষণে সেই দুজন সুদেব-কান্তির পেছনে পেছনে তাঁর স্টাডিতে।

সুদেব নজর করে দেখলেন বছর তিরিশের ভেতর দুজনের বয়েস। একজনের শাদা পাজামা, খাদির রঙিন পাঞ্জাবি। পাজামা-পাঞ্জাবি-কোনোটাতেই ইস্ত্রি নেই। অন্যজনের বুকে কাটা ফুল হাতা শাদা শার্ট, জিনসের টাইট প্যান্ট।

আমি বেরলাম। ফ্রিজে জল আছে, বের করে নিও—বলতে বলতে নীলিমা দরজার দিকে এগোয়।

আমরা একটা সইয়ের ব্যাপারে—

কালই তো দিলাম একটা, টিভি-তে মেট্রো আওয়ার নিয়ে, দুঘন্টা ধরে কুৎসিত অনুষ্ঠান। বাংলা ভাষা বিপন্ন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নাহ্,—আমাদের ইস্যু অন্য।

বলুন তা ব্যাপারটা কি।

এই কাগজটা যদি একটু দেখেন।

পাঞ্জাবি-পাজামার হাত থেকে কাগজটা নিলেন সুদেবকান্তি। টেবিলে রাখা রিডিং গ্লাস তুলে চোখে লাগিয়ে পড়তে পড়তে বিহার, ভূমিসেনা, সানলাইট সেনা, ব্রহ্মর্ষি সেনা, কুঁয়র সেনা, সাবর্ণ লিবারেশন ফ্রন্ট—দলালচক বাঘৌরা, আওরঙ্গাবাদ হাইকোর্ট—আট জন ক্রান্তিকারী কৃষক—কেশর, রামপ্রবেশ, ব্রহ্মদেব, বাবুরাম, চন্দ্রদীপ, রাজারাম, জগনারায়ণ, চিত্তাবন—এঁরা সবাই যাদব—সকলে যাদব, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদও যাদব, তিনি নাকি যাদবদের জন্যে 'সব কুছ কর সকতে হ্যায়'—জাতপাতের সমীকরণে পরিষ্কার ভাগ হয়ে যাওয়া এই যে বিহার, সেখানেও তো আটজন যাদব পদবীর কৃষকের ফাঁসি হচ্ছে, তাহলে ক্লাস কি কাস্টকে নিয়ন্ত্রণ করে—এই ভারতবর্ষেও, এমন জিজ্ঞাসার ভেতরই তিনি ভারি ফ্রেমের চশমাটি খুলে হাতে রাখেন। চশমা খুললে তাঁর একটু লালচে বড় বড় দুটি চোখ আরও ভাবুক দেখায় সুদেবকান্তি তা জানেন আর চশমার একটি ডাঁট কামড়ে নিয়ে তিনি শাদা ফুলস্কেপে দুএকটি ভুল বানানে, বাংলার লেখা লিফলেটের খসড়াটির ওপর আবারও চোখ বোলান।

১৯৮৭-তে দলালচক বাঘৌরার জমিদার মহাজনেরা ছেচকি-ছেচানিতে যে গণহত্যা চালায়, তারই বিরুদ্ধে দলালচক, বাঘৌরা—১৯৮৭-র ২৭মে জোতদার মহাজন পরিবারের বাহান্ন জন খুন, নাকি খতম কি বলবেন সুদেবকান্তি—আসলে এই কৃষকেরা বীর—লিফলেট-এর বাংলা ড্রাফটিং এমনটিই বলছিল। ১৯৯২-র ৪ নভেম্বর লোয়ার কোর্টে তাঁদের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। দু হাজার মানুষ দলালচক্-বাঘৌরার ঘটনায় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেছে বেছে আটজনকে—

আসলে আপনি তো রুর্যাল ডায়োলেন্স-এর ওপর কাজ করেছেন. বহুদিন ধরে ফিল্ড ওয়ার্কের অভিজ্ঞতা, বই আছে এই বিষয়ে—আমরা চাইছিলাম এই আট জন কৃষকের ফাঁসি আটকানোর জন্যে একটি কমিটি তৈরি করা—সব শেডের বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে, আপনিও যদি সেই কমিটিতে থাকেন—ফিল্ম মেকার, লেখক, অভিনেতা, খবরের কাগজের লোক—আমরা সবাইকেই রাখছি—জিনস আর শাদা শার্ট তার গালের ঘন দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে খুব আস্তে আস্তে এমনটি বলতে পারে।

বরুণ, জারের ফায়ারিং স্কোয়াড থেকে ডস্টয়েভস্কি বেঁচে গেছিলেন শেষ পর্যন্ত। রঙিন খাদির পাঞ্জাবি তার পিছনে টেনে আঁচড়ানো লম্বা চুলের ভেতর আঙুল ডুবিয়ে বলছিল—মিসেস গান্ধী কিন্তু ইমারজেন্সির সময় কিস্ট্যা গৌড়, ভূমাইয়ার ফাঁসি অনেক আবেদন নিবেদনের পরেও রদ করেননি। আর তখন যে জর্জ ফার্নান্ডেজরা এসব নিয়ে চিৎকার চাপাটি প্রতিবাদ করেছেন, এখন তাঁরই পার্টির লোক লালুপ্রসাদ, তাঁর রেজিমে আট জন কৃষকের ক্যাপিটাল পানিশমেণ্ট—ক্ষমতা মানুষকে—আসলে সিস্টেম, সিস্টেম—রাষ্ট্র ব্যবস্থা। রাষ্ট্র হলো রিপ্রেশনের···

আপনারা কি চা খাবেন?

আপনাকেই তো করতে হবে। থাক—

তাতে কি? গ্যাস জ্বালালেই তো—কতক্ষণ লাগবে?

নাহ্, থাক। আমি বরং আমাদের কমিটিতে—আমরা এর একটা ওয়াইড চেহারা দিতে চাইছি—

দেখুন, আমি সই দিয়ে দিচ্ছি। সভ্য জগতে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট কারোরই হওয়া উচিত নয়। তবে আপনাদের সশস্ত্র সংগ্রাম, পার্লামেণ্টকে বিশ্বাস না করা—এসব ব্যাপারে আমার ভিন্ন মত আছে। ভারতীয় পার্লামেণ্ট এই গোটা সাউথ ইস্ট এশিয়াতে ডেমোক্রেসির নানা অগ্নি পরীক্ষার ভেতর দিয়ে গেছে যাচ্ছে। আমি পার্লামেণ্টে আমার কথা যদি বলতে পারি, কেন বলব না! বলব। নিশ্চয়ই বলব। আর গোটা পৃথিবীর যা চেহারা, টেকনোলজি যে জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে স্যাটেলাইটে দরকার পড়লে আমার হাঁড়ির খবর সি. আই. এ ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারে। সেখানে ইয়েনানের গুহায় বসে মাও-সে তুঙ—স্যরি, আপনাদের এখনকার প্রোনাউন-সিয়েশনে মাও-দে-জং বলতে পারব না, যেভাবে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, কিংবা চে গেভেরা, ফিদেল কাস্ত্রো যে পদ্ধতিতে কিউবায় জাহাজে করে লোকজন নিয়ে বাতিস্তার বিরুদ্ধে—আমি জ্ঞান দিচ্ছি মনে করবেন না—বলতে বলতে সুদেবকান্তি আবারও চশমা তুলে দিতে পারেন চোখে।

না। না। আপনি বলুন। আমাদের তো কতই জানার আছে।

মধ্যবিহারে আপনারা যা করছেন, অবশ্য তা না করেও উপায় নেই। ভূমিহার, ব্রাহ্মণ, ঠাকুরের খাটিয়ায় হরিজন বসলে তাকে এখনও পিটিয়ে মারা হয়—এত জাতপাত—সংকীর্ণতা—অন্ধ্রেও তাই—সেখানে বন্দুকের বদলে বন্দুক—আমার বইতে এসব কথা লিখেছি, কিন্তু সেটা কতখানি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লড়াই আর কতটাই বা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম—তা নিয়ে আমার কনফিউশন—ঘোর সংশয়—এত করেও মানুষ তো খুব বেশি আপনাদের সঙ্গে আসছেনা। তার ভোটের আকাঙ্ক্ষা আছে।

ধীরে ধীরে হবে—আপনি যদি এইখানে আপনার সিগনেচার।

কই দিন।

কাগজতো আপনার হাতে।

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুদেবকান্তির সই করাও শেষ।

আপনাকে আমরা কমিটিতেও রাখছি। এর মধ্যে একদিন আমরা বসব। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রোগ্রাম।

কে কে আছেন কমিটিতে?

ড. অজিত ত্রিবেদী সেণ্টার ফর সোশ্যাল সায়েন্স, স্টেটম্যান-এর অনিল চৌধুরী-ওরা গড় গড় করে বলেছিল।

তাহলে শুধু সই দিলেই হবে না—এরপরে আরও কিছু—এমন ভাবনা নিজের ভেতর চিবিয়ে ফেললেন সুদেবকান্তি।

৩. একটি ঘরোয়া সভা

ঠিক সাড়ে চারটে, শনিবার বিকেল। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে 'হায়াতবু'। বড় হাউজিং কমপ্লেকস-এর ফ্ল্যাট নম্বর....। নিজের গাড়িতে পৌঁছতে কোনো অসুবিধে হয় নি সুদেবকান্তি। তার ওপর তেওয়ারি এসে পড়াতে সুবিধেই হলো। ড. সুলেমানের ফ্ল্যাট। সেকেণ্ড ফ্লোর। ডোর বেল বাজাতেই ইতিহাসের অধ্যাপক ড. সুলেমান সিদ্দিকি নিজেই দরজার সামনে।

আসুন, আসুন প্লিজ। অধ্যাপক সরকার এসে গেছেন। সেণ্টার ফর সোশ্যাল সায়েন্স-এর ড. অজিত ত্রিবেদী। হাইকোর্ট বন্ধ। মোহন শর্মা বাড়ি থেকে ফোন করেছিলেন, আসছেন। স্টেটসম্যান-এর স্পেশাল করেস-পনডেণ্ট অনিল চৌধুরীও এসে গেছেন।

সুন্দর সাজানো ঘর। সুদেবকান্তি দেখতে পাচ্ছিলেন। নিচু সোফা-সেট, টেবিল, দেয়ালে চোখ আরাম পায় এরকম রং। গণেশ পাইনের ছবির প্রিন্ট।

মোহন আসুন, তার আগে আমরা এক রাউণ্ড চা বলতে ড. সুলেমান তাঁর কাজের ছেলেটিকে ডেকেছেন—আসিফ, ইন সবোঁকে লিয়ে চায়—আপনাদের শুগার চলে তো—

আমি চিনি ছাড়া, কালো—অনিল চৌধুরীর ভারি গলা শোনা গেল।

আমিও ব্ল্যাক—সুদেবকান্তি পাইপে টোব্যাকো ঠাসতে ঠাসতে বলেন।

আসিফ গিন গিন কে চায় করো—ড. সুলেমান সিদ্দিকি তাঁর পাজামা-পাঞ্জাবি পরা দীর্ঘ, স্বাস্থ্যবান চেহারাটি নিয়ে একবার সোজা দাঁড়িয়ে সুদেব-কান্তির প্লাইং ডাচম্যান-এর গন্ধে খানিকটা বিভোর হয়ে, আমার এক সময় পাকিয়ে খাওয়ার অভ্যেস ছিল—সস্তার টোব্যাকো—এই ধরেন প্রিন্স হেনরি বা ক্যাপস্টেন—তা একটা অ্যাটাকের পর এখন ইনজুরিয়াস টু হেলথ—কাঁটায় কাঁটায় ফলো করি বলতে বলতে সুলেমান সিদ্দিকি একটু গলা তুলেই হেসে ওঠেন। আর তখনই ডোর বেলের শব্দে দরজা খুলেই আসুন মিঃ শর্মা বলতে বলতে মোহন শর্মাকে নিয়ে বসার ঘরে পৌঁছে যান ড. সুলেমান সিদ্দিকি।

তাহলে আরম্ভ করা যাক। বলতে বলতে সুলেমান সিদ্দিকি চার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। সুদেবকান্তির পাইপ নিভে গিয়েছিল। আবার পাইপে আগুন দিতে দিতে দেখতে পেলেন তাঁর ফ্ল্যাটে খাওয়া সেই পাজামা-পাঞ্জাবি আর শাদা ফুলশার্ট-জিনস—দুজনেই এসে গেছে।

গ্রিকো-রোমান যুগে স্লেভ সোসাইটি—ড. সুলেমান সিদ্দিকি শুরু করেছেন—ফিউডাল ব্যারনসরা ইউরোপ দখল করার আগে পর্যন্ত এমনই স্লেভ সোসাইটি ছিল সমস্ত ইউরোপ জুড়ে। ফোরটিনথ ফিফটিনথ সেঞ্চুরিতে নানা জিনিস ইউরোপে ঢুকেছে। সেই সব বার্ডেন—বোঝা চেপেছে চাষীর ঘাড়ে—

সুদেবকান্তির তামাক ধোঁয়া হয়ে একটু একটু করে মিশে যাচ্ছিল হাওয়ায়।

ইফ য়ু ডোণ্ট মাইণ্ড মিঃ সিদ্দিকি, অ্যাজ আ ভেটারেন চেইন স্মোকার হিসেবে আপনাকে মনে আছে, তাই বলছি, আমি কি একটা সিগারেট খেতে পারি আপনার পারমিশান নিয়ে—অজিত ত্রিবেদী বলতে বলতে তাঁর বুক পকেটে সিগারেটের প্যাকেট হাতড়াচ্ছিলেন।

হোয়াই নট। প্লিজ—আগে কেউ খেলে আকাঙ্ক্ষা হতো—এখন অনেক কষ্টে ত্যাগ করেছি।

সাংঘাতিক কষ্ট মশাই—সিগারেট ঠোঁট ঝোলানো অজিত ত্রিবেদীর কথার পিঠেই বলে উঠলেন সুলেমান—এর পেছনে কোনো আত্ম-সংযমের মহত্ব বা ঐ ধরনের কোনো অরা কাজ করে নি। মৃত্যু ভয়। স্রেফ প্রাণের ভয়ে বুঝলেন—সিগারেট ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। বলতে বলতে আবারও তাঁর প্রাণখোলা হাসি। —এখন জোরে হাসতেও ভয় হয় বুঝলেন। মিসেস বকে। যদি দম আটকে যায় বুড়োর—

শুভেন্দু নোট নিন। জিনস প্যান্ট চাপা গলার পাঞ্জাবি-পাজামাকে বলছিল।

হ্যাঁ—কি যেন বলছিলাম, ইউরোপের কৃষক—সে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। বিদ্রোহ করে। জার্মানিতে যুনশ্যু মুভমেন্ট—এর একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে।

সবাই কেমন যেন একটু উশ খুশ করছিলেন ড. সিদ্দিকির কথা শুনতে শুনতে। ইওরোপের ইতিহাস যদি এতক্ষণ ধরে চলে....আর আসিফ তখনই চায়ের পট, লিকার, কাপ, চামচে মিল্ক পটে দুধ দিয়ে যায়। একটু পরে একটা চিনে মাটির বড় বজলে ব্যাসন-পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা দিয়ে ভাজা পকোড়া। তার সঙ্গে চিলি সস, টোম্যাটো সস।

খান খান। গরম আছে। সান ফ্লাওয়ার তেলে ভাজা। অ্যাসিড, কোলেস্টরেল—কিছুই হবে না। বলতে বলতে ড. সুলেমান সিদ্দিকি দুটো পকোড়া একসঙ্গে তুলে নেন, তারপর সিনথেটিক টোম্যাটো সস মাখিয়ে খেতে খেতে বলতে থাকেন, জাহানাবাদে—আই মিন বিহারের জাহানাবাদে, আরায়, গয়া, ভোজপুর. পালামৌ, হাজারিবাগে যে আর্মড স্ট্রাগল গড়ে উঠেছে, এমনকি পূর্ণিয়াতে যে কৃষক স্ট্রাগল চলছে, তার বিরুদ্ধে জোতদার মহাজনরা প্রাইভেট আর্মি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তাদের হাতে সফিসটিকেটেড ওয়েপনস—তাই বন্দুকের মোকাবেলা বন্দুক। শুধু বন্দুক নয়, কখনও ল্যান্ড মাইন—প্যারা মিলিটারি গ্রুপসকে আটকাতে—শব্দ না করে চা খেতে খেতে সবাই ড. সিদ্দিকির কথা শুনছিলেন।

এধরনের বন্দি মুক্তি কমিটি এই প্রথম নয়। কাইয়ুরের কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে এরকম কমিটি হয়েছিল এবং আগে। চিত্তপ্রসাদ তার অবিস্মরণীয় স্কেচ করেছিলেন বিষয়টিকে মনে রেখে। গান বেঁধেছিলেন বিনয় রায়—'ফিরাইয়া দে, দে রে আমার কাইয়ুর বন্ধুরে....।' সুদেব কান্তি তার ওয়াকিবহাল থাকার ব্যাপারটি জানিয়ে দিচ্ছিলেন। হ্যাঁ ঠিকই। রাইট। সুলেমান সিদ্দিকি ঘাড় নাড়লেন।

আমি বলছিলাম, এদের ফাঁসির অর্ডার তো হয়েছে লোয়ার কোর্টের সেশনসে, এখনও হাইকোর্ট আছে। তারও পরে সুপ্রিম কোর্ট। রুমালে কপালের ঘাম মুছে নিতে নিতে মোহন শর্মা তার ল পয়েন্টের জায়গা থেকে বিষয়টি ভেবে নিতে পারেন।

সুপ্রিম কোর্ট না হলে প্রেসিডেন্টের কাছে অ্যাপিল—আমাদের সমস্ত আইনি পথই খোলা রাখতে হবে। বলতে বলতে আরও এক দফা কপালের ঘাম রুমালে মুছে নিতে পারেন মোহন শর্মা।

সার্টেনলি—নিজের সামনে টেবিলে মাঝারি ওজনের একটা মুখ বসিয়ে

দিতে দিতে সিদ্দিকি এমনটি বলতে পারেন। আমরা অবশ্যই আইনি পথে যা করার করব, আমাদের সঙ্গে হিউম্যান রাইট রক্ষা করার নানা সংগঠনও নিশ্চয়ই থাকবে—যেমন এ পি ডি আর, পি ইউ সি এল—আরও একটা বড় পয়েন্ট আছে ভাবার—বাবরি মসজিদ ভাঙার পর গোটা বিহারে যেমন করে দাঙ্গা না লাগার জন্যে যে লালুপ্রসাকে এত বধাই দেয়া হচ্ছে, তার বেসটা কিন্তু অন্য জায়গায়। শুধু পুলিশ বা প্রশাসন দিয়ে তো দাঙ্গা রোখা যায় না। যেখানে যেখানে এইসব আর্মড র‍্যাডিক্যাল ফোর্সেস রয়েছে, তারাই আটকে দিয়েছে দাঙ্গাবাজদের—বলতে বলতে প্রায় একই সুরে ডাক দেন সিদ্দিকি—আসিফ, আওর এক রাউণ্ড চায়—

তাহলে ডঃ সিদ্দিকি আপনার কথা অনুযায়ী যা বেরিয়ে আসছে, আমরা প্রথমে একটা কমিটি তৈরি করে তার নাম দেব। তারপর আমরা সেমিনার করব কলকাতায় একটা-দুটো-তিনটে—বলতে বলতে সুদেবকান্তি নতুন তামাক চুকিয়ে দিচ্ছিলেন পাইপে।

দরকার হলে বিহারে যাব, পাটনায়। প্রেস কনফারেন্স ডাকব। ওখানে একটা সেমিনার—বলতে বলতে ডঃ অজিত ত্রিবেদী নতুন সিগারেটে যেতে পারেন।

হোল কন্সেপশনটা আমাদের দেখতে হবে—বলতে বলতে খুব মন দিয়ে নোট নিচ্ছিলেন অনিল চৌধুরী—খবরটা ঠিক মতো খেলিয়ে লিখতে পারলে ফ্রন্ট পেজে ডাবল কলাম স্টোরি চোখ বুজে—বিহারে কৃষক সংগ্রামের একটা ছোট ব্যাক গ্রাউণ্ড দিয়ে সত্তর দশকের ভোজপুর। নোটস নিতে নিতে স্টেটসম্যান-এর স্পেশাল করেসপণ্ডেন্টের মনে হলো, কবে যেন শুনেছিলাম —বিহারে ডাণ্ডা যার ভঁইস তার। আতঙ্কবাদী, নকসালবাদী, নাম দিয়ে যাদের পুলিশ মারছে, তারা আসলে তারাই তো ক্রমশ বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে বিহারের রাজনীতিতে।

পাইপে খুব ধীরে ধীরে টান দিতে দিতে রুর‍্যাল ভায়োলেন্স-এর ওপর আরও নতুন গোটা দুই চ্যাপ্টার তৈরির কথা ভাবছিলেন সুদেবকান্তি—ডাটা স্ট্যাটিসটিক্স টেবল দিয়ে—কীভাবে গ্রামীণ হিংসা জড়িয়ে ধরছে বিহারকে। হিংসা-প্রতিহিংসা—বদলা-ফিন বদলা—লাশের পাহাড়। শুভেন্দু নামের এই পাঞ্জাবি পাজামা পরা ছেলেটি, তার পাশে জিন্স প্যান্ট আর সাদা শার্ট—নিশ্চয়ই তথ্য দেবে আমায়। ওদের কাছে এসব থাকে।

তাহলে আজ এই পর্যন্ত—বলতে বলতে সুলেমান উঠে পড়তে চাইছিলেন। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। ঠিক তখনই আলাদা আলাদা সলিটারি সেলে দিনের শেষে গুনতি খেলানোর পর একা একা থাকতে কেশর, রামপ্রবেশ, ব্রহ্মদেব, বাবুরাম, চন্দ্রদীপ, রাজারাম, জগনারায়ণ, চিতাবন বুঝতে পারল আর একটা দিন ফুরিয়ে গেল।

জেলখানার পাঁচিলের মাথায় এক হাতা লাগানো বুড়ো হয়ে জেগে থাকা ঘোলা চাঁদ তার গা থেকে একটু একটু করে গলে গলে নামা জ্যোৎস্না জেলের উঠোনে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। একটু আগে এক পশলা হয়ে গেছে। বাতাসে ভিজে ধুলোর গন্ধ মিশেছে। জেল কম্পাউণ্ডের ভেতর কোনো বড় গাছ নেই। ফলে গোটা উঠোন জুড়েই ফট্ ফটে জ্যোৎস্না।

ফাঁসির হুকুম হয়ে যাওয়া সলিটারি সেল থেকে এতসব দেখা যায় না। খুব কম পাওয়ারের ডুম আলোয় তারা আটজন পাহারাদারের বুটের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

দেশে এমন একটা ক্লান্তি হয় না—যা আমাদের জেল থেকে হুটকরা পাইরে বাইরে নিয়ে যেতে পারে। মাথার ওপর মুক্ত নীল আকাশ। পায়ের নিচে নরম মাটি, সবুজ ঘাস। দু পায়ের ওপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান—যা এই সলিটারি সেলে একেবারেই হয় না। চব্বিশ ঘণ্টা লক আপ। পায়খানা-পেচ্ছাপ সব ভেতরে। একটা দুর্গন্ধ সব সময় আটকে থাকে এই সেলের বাতাসে।

একটা ক্লান্তিকারী ঢেউ যেন আছড়ে পড়ে না এই সেলের দরজায়—আমরা ভাসতে ভাসতে বাইরে, যেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান যায়। পিঠ ঠেকে যাবে না সলিটারি সেলের দেয়ালে।

এতসব ছবি দেখতে পাচ্ছিল শান্তনু। তার পাজামা পাঞ্জাবি পরা চেহারাটি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল বারে বারে; যদি ফাঁসি না আটকানো যায়—তাহলে। তাহলে কি হবে বরুণ—জিনস আর শার্টকে জিগ্যেস করছিল শান্তনু।

কিসের কি হবে?

এই যে আটজনের ফাঁসির।

দাঁড়ান, এই তো সবে কমিটি হলো। কমিটি ফাংশান করতে শুরু করুক আগে—

আপনারা যাবেন কোনদিকে—ধর্মতলা হলে আমার গাড়ি আছে। আসতে পারেন, অনিল চৌধুরী তাঁর নোটস গুছিয়ে উঠতে উঠতে শান্তনু বরুণকে ডাকছিলেন।

আমরা একটু সাউথে যাব। কাজ আছে।

বেশ তো আমার গাড়িতে আসুন না। আমি সাউথেই—

সুদেব কান্তির দুপাশে বরুণ আর শান্তনু। সুদেব নিজেই গাড়ি চালিয়ে আসবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু আমার পুরণো ড্রাইভার তেওয়ারি এসে গেল; মাঝে মাঝেই দেখা করতে আসে, ডিউটির পর। বলল, সাহেবকে আমি আজ গাড়ি চাপাব। আমি বললাম, ঠিক আছে। এমন ভাবনার ভেতরই সুদেব কান্তি বলে ওঠেন, তেওয়ারিজি বালিগঞ্জ ফাঁড়ি হোক যানা।

আচ্ছা জি। তেওয়ারি ঘাড় নাড়ে।

আপনাদের কাছে আরও যা যা তথ্য আছে দিন। জানেন তো রুর‍্যাল ভায়োলেন্স আমার বিষয়। একটা বই তো অলরেডি পাবলিশড—শুধু সিকস্‌টিজ অ্যাণ্ড সেভেনটিস নিয়ে। এখন পরের পার্ট, অনেক মোটা হবে। এইটটিজ, নাইনটিজ-এর রুর‍্যাল ভায়োলেন্স যেমন থাকবে, তেমনই সিকটিজ সেভেনটিজ-এর কিছু নতুন তথ্য—তার অ্যাসেসমেন্ট। আপনারা আমায় মেটিরিয়ালগুলো দিন। এই দলালচক—বাথোয়া, ছেচোকি-ছেচানি, যা কিছু—যতটুকু জানেন আপনারা—বলতে বলতে নতুন করে পাইপে তামাক ঠাসতে থাকেন সুদেবকান্তি—তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শান্তনু বরুণ।

বইয়ের প্রিফেসে আপনাদের অ্যাকনলেজ করব। খালি ইনফরমেশনগুলো আমার দরকার। আর কিছু না, ব্যস। ওনলি ইনফরমেশন্‌স। রুর‍্যাল ভায়োলেন্স-এর সেকেন্ড পার্টের লাস্ট দুটো চ্যাপ্টার এমনভাবে লিখব না, পাঁচ পাবলিক চমকে যাবে—হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি। বলতে বলতে গাড়ির ভেতরই পাইপের ধোঁয়া ছুঁড়ে দিলেন সুদেবকান্তি।

শান্তনু বা বরুণ এইসব কথার কিছুই তেমন করে শুনতে চাইছিল না। তাদের সামনে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা বিশাল জায়গা নিয়ে দাঁড়ান জেল কম্পাউন্ডের উঠোনে চাঁদ মুখ থুবড়ে পড়েছে। সলিটারি সেলে এখন ঘুমের সময়। তবু ফাঁসির আসামির ঘুম আসে না। একদম প্রায় নিস্তব্ধ জেল কম্পাউন্ডের উঠোন থেকে শুধু পাহারাদারি জুতোর মস মস মস মস শোনা যায়। বরুণ শুনতে পায়, শান্তনু শুনতে পায়। নির্জন সলিটারি জেলের ভেতর খুব অল্প পাওয়ারে ডুম জেগে থাকে।

আমি এখানে নামব। বরুণ বলে।

সুদেবকান্তি দেখতে পান তাঁর সামনে গড়িয়াহাটার মোড়।

আমিও নেমে যাই। শান্তনু নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছিল।

সে কি! আপনারা যে বললেন সাউথে—

নাহ্‌, এখানে কাজ আছে। একটু যদি গাড়িটা সাইড করেন। বরুণ দরজার কাছে এগিয়ে গেছে।

তেওয়ারিজি!

হাঁ জি।

গাড়ি একটু সাইড করুন। ওঁরা নামবেন।

ঠিক আছে, তাহলে ব্যাপারটা মনে রাখবেন। অনেক, অনেক ইনফরমেশন চাই আমার। রুর‍্যাল ভায়োলেন্স-এর দুটো চ্যাপ্টার তৈরি করব। অমর করে রাখব আপনাদের আন্দোলনকে। লোকে জানবে।

যেন কিছুই শুনতে পায় নি, এভাবে গড়িয়াহাটার ভিড় ভাঙতে থাকে বরুণ, শান্তনু। তাদের এখন কিছুই করার নেই। এখানে তবু সুদেব কান্তির নাগাল থেকে দূরে, আরও দূরে কোথাও চলে যেতে চাইছিল তারা।

গড়িয়াহাটে সন্ধেবেলায় আলো জ্বলে উঠেছে। দারুণ লাগছে এই চেনা শহরকে। বরুণ, শান্তনু দুজনেরই নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছে করছিল।

সীমার বর্শায় দ্যাখো

মণীন্দ্র রায়

মানুষ কাটছে রোজ মানুষের গলা,
মানুষ খেপেছে রক্ত-স্নানে।
মানুষ কাটছে গাছ, শস্যখেত মরুতে নিস্ফলা।
টান পড়ে নিত্য অন্নপানে।

ক্রমেই মানুষ আজ সার্বিক বিনাশে
চণ্ডমূর্তি, হিত-হন্তারক।
মানুষের মনে বুঝি জেগেছে মড়ক।
পৃথিবী ডাকিনী আজ মর্গের উল্লাসে।

বৃক্ষহীন মরু হলে সমস্ত ভূগোল,
মানুষেরা ক্রমে হবে কলের রোবট।
কারবালা প্রান্তরে উঠে কিন্তু রুপরোল,
জলশূন্য, পুড়ে যাবে ঠোঁট।

কেন যুদ্ধ, কার জয়, ভুলে গিয়ে তা-ও
আত্মধ্বংসী নিয়ত সংহার?....
সীমার বর্শায় বিঁধে মুণ্ড নিয়ে যাও—
সে উপঢৌকন দ্যাখো কার?

সীমার, বর্শায় দ্যাখো মুণ্ডটি তোমার।

তুমি তো আমাকে চেনো

সিদ্ধেশ্বর সেন

তুমি তো আমাকে চেনো,
যদি বা শিল্পেই পাও—

উন্মিলন ছিল বা মনে-মনে
তাই তো দিয়েছি তুলে—
উত্তীর্ণে গড়নে

এই কাজ—মনেরই নিজস্ব বাছাই—
এই ক'রে চলা, করা

প্রকৃতির দানে,
অথচ মনের বা মননের-ই
অন্তরে মিশিয়ে, সামাজিকে

যেন না হারিয়ে,
নতুন ক'রে সে চাওয়ায়, পাওয়ায়—

অনন্যের রসে, রূপে,
তন্ময়ের ধ্যানে, রূপকল্পের বন্ধনে ॥

পাথর গুঁড়ো হচ্ছে

পূর্ণেন্দু পত্রী

পাথর গুঁড়ো হচ্ছে।
পাথরের গুঁড়োয় ঘরে-দোরে-দেয়ালে-মহলে
আদিম সব আঁচড়।
পাথরের গুঁড়োয়
আর্শির গায়ে ফুটছে সব নকশা,

কে কাশছে খক্ খক্ ?

বাতাস ?
চোখের ছানি নিয়ে কি খুঁজছে
ঝুঁকে-পড়া ডালগুলো ? কাকে ?
শ্বাসকষ্ট নাকি ?
তাহলে অমন কেঁপে কেঁপে উঠছে কেন
ফণি মনসার ঝোপ ?

পাথর গুঁড়ো হচ্ছে ।
পাথরের পাঁজরার ফুটোয় ঢুকে পড়েছে
ভুল ।
আর গেলেমেলে সব হিসেব
আর এমন সব নাড়িভুঁড়ি
বা কেবল মরা শুয়োরকে মানায় ।

পাথর ভাঙছে যত
মুখোশ-পরা মুখগুলো এগিয়ে আসছে কাছে ।
যত ভাঙছে পাথর
দীর্ঘশ্বাসের শব্দে শুকিয়ে যাচ্ছে জল ।

তোর মনে পড়ে মুকুন্দ ?
তোর মনে পড়ে অনুরাধা ?
আমাদের সেই সদ্য যৌবনকালের
খোঁড়াখুঁড়ি ?
ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে আমরা জড়ো করছি
গাঁইতি শাবল কুড়োল কাটারি ।
কনকনে শীতের কামড় ঠেলে
আমরা পাতা-পাড়ানে আগুনে সেঁকে নিচ্ছি
উন্মোচনের বীজ ।

বুটের তলায় থেৎলানো পা,
বুলেটের আগুনে আধখানা পাঁজর ছাই,
শিকলে হাত দুটো বাঁধা—
খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ হয়নি তবু ।

পাড়াপড়শি বিরক্ত
তবু খুঁড়ে চলেছি।
ঘুরে বেড়াচ্ছে বাস্তু ঘুঘুদের চর
তবু খুঁড়ে চলেছি।
কালবেলা এসে হাঁকছে : ওয়ারেন্ট
খুঁড়ে চলেছি তবুও।

তারপরই আমাদের রক্ত দাগের উপর
সাদা জলের খিল্‌খিল হাসি।
ঐতো, ঐতো....
লাল পাথরের মুখ।

ওঃ, কী গর্বিত ছিল সেই আবিষ্কার
আর সেই বিজয় উৎসব।
হাড়-জিরজিরে বুকের উঠোন দালান কাঁপিয়ে
ছৌনাচের আসর যেন।
ও মাঠ
এবার সোনার গয়না পরবি তুই।
ও চালা
এবার তোর দেয়ালে দেয়ালে মধুবনীর আলপনা।
ও রাস্তা
এবার তোকে দৌড়তে হবে দশদিগন্তে।
ও তোতাপাখি।
এবার তোর জন্যে নতুন কবিতা।
ও চশমা
এবার তোকে দেখাব ভ্যানগগের সূর্যমুখী।
ও কলম
এবার লেখ নবজীবনের গান।
ও মঞ্চ
এবার দেখা রক্তকরবীর ভিতরের রক্তপাত।

তোর মনে পড়ছে ভাস্কর
তোর মনে পড়ছে পারমিতা
আমরা কি লম্বা হয়ে যাচ্ছিলাম রোজ

ঐ লাল পাথর ছুঁয়ে ?
আবহমানের গঙ্গা-যমুনা
কি রকম জোয়ার জোগাচ্ছিল আমাদের নাড়ীতে ?

সেই পাথর গুঁড়ো হচ্ছে এখন।
আর ক্রমশ খাটো হয়ে আসছে
আমাদের উড়ন্ত কেশর।
আর হাত-ফেরতা ছেঁড়া বইয়ের মতো
আমরা ভুলে যাচ্ছি
প্রতিজ্ঞার পাঁচ রঙে ছাপা তার প্রথম সংস্করণের
প্রচ্ছদ।
ও বই
পাথর গুঁড়ো হচ্ছে কেন ?
ও সন্ধ্যামণি
তুই তো দেখেছিলি পাথরের সেই রাজবেশ।
ও পতাকা
তোমার নীচেই তো ছিল আমাদের মুক্তবাদ মঞ্চ।
ও শহীদবেদী
তুমি তো শুনেছিলে উজাড় রক্তের যা কিছু সংলাপ।
ও পানাপুকুর
তোমার পাড় দিয়েই তো লাখো মিছিলের হাঁটা।
ও ছিটে বেড়া
কতবারই না ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে আর্তনাদের এপিঠে ওপিঠে।
ও হাতপাখা
বেহুঁস জ্বরের শিয়রে কত রাত তোমার জেগে থাকা।
ও সূর্যমুখ
পাথর গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে কেন ?

পাথর ভাঙছে।
তাই গায়ে গা লাগিয়েও আমরা আলাদা।
পাথর ভাঙছে।
তাই মন্ত্র এক
কিন্তু মানে হয়ে যাচ্ছে ভিন্ন।
পাথর ভাঙছে।

তাই সাড়া দিচ্ছি পরপারের ডাকে
কিন্তু জলচৌকি পেতে বসতে বলছে না কেউ।

তুই নিশ্চয় ভুলে যাসনি বিদিশা
তুই নিশ্চয় ভুলে যাসনি মনিরুল
বড় পায়ে হাঁটার সেই সব দিন
আর সেই সব কোরাস
যা অগ্নিকোণের দিগন্তকে টেনে আনতো কাছে।
দেখবি এখনো কি রকম মনে আছে সব ?
পুতুলনাচের ইতিকথা পড়তে পড়তে
ছুটে এসেছিল বিদিশা।
আর মনিরুল যখন দুই বেয়নেটের মাঝখানে
হাতে স্পার্টাকাস।

আমাদের মনে পড়া উচিত সরমাদিকেও,
চুড়ি বিক্রীর সেই টাকা।
আমাদের মনে পড়া উচিত আকবর আলীকে,
লুকিয়ে রাখার সেই পড়চালা।

পাথর ভাঙছে,
আর ভাঙা পাথর খুঁড়ে চলেছে গর্ত গহ্বর।
অর্থাৎ পচা জল জমার নালা
অর্থাৎ কোনো একদিন তলিয়ে যাওয়ার খাদ।

আমি এখুনি চিৎকার করে উঠতে পারি যন্ত্রের গলায়
ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো পড়পড়িয়ে ছিঁড়তে পারি
অবিবেচনার এই কুয়াশা।
গালিয়ে দিতে পারি
সমস্ত ইস্ক্রুপের প্যাঁচ।
কিন্তু এত ভাঙা পাথর জুড়বার আঠা কই
আমার রক্তে ?

ও শাঁখ
তুই কি ফিরিয়ে নিবি আমার সমুদ্র-স্বর ?

সালোমির জোকানান

তরুণ সান্যাল

থালায় ঐতো মুণ্ড জোকানানের, সালোমির নাচ শুরু হোক,
সর্ত তো পূরণ হয়েছে, সালোমির পায়ে থেকে ছুরিছোরা ঝিকমিক বিজলি
চোখ থেকে বুক থেকে নাভি থেকে জঙ্ঘা থেকে
এর তার হৃদপিণ্ড থ্যাতলাক
থালায় ঐতো মুণ্ড জোকানানের, নীল চোখে খাঁ খাঁ আকাশ
টায়ার সমুদ্র থেকে কালো ঢেউ চুলে খেলেছে
হেরোদের অন্ধ কূপ থেকে ওরই অভিশাপ গা ছম-ছম ছিল

বেচারা খোলা গা, কপনি উটের চামড়ায়, খাদ্য বুনো মৌ-পোকায়
ভাত কাপড় জোটান না ঈশ্বর, চুলো চালা থামে না
তবু বোল ঈশ্বর ঈশ্বর, তাই জোকানানের ঈশ্বরই অসুখ

সকলেই গম চায় যব চায় গম রম্ভা বর্তুল মাংসও চায় মদ চায় তাস পাশা চায়
আর সালোমি ওরই রঙে মজেছিল মজাতে পারেনি না,
নষ্ট ডুমুরের পোকা-কাটা বোঁটায়, মাটির মদের ভাঁড়ে মাছি ভনভনায়
শুঁড়িখানার আস্তাকুঁড়ে শুয়ে রয়েছে পাতিতের কানাভাঙা পুরুষ
জলপাই-গাছের গিঠ-ওঠা আঙুল শিকড়ে বেহুঁস মাথা
পাশে মুখে রুদ-বটল বসছে উঠছে উরুতক স্কার্ট ওঠানো মন্দিরের দাসী

জোকানানও মাতাল, তার গমরঙা চামড়ায় খড়ি, গ্যালিলির সমুদ্র দুচোখ
ও নাকি কেবলই দেখছে কর্ণাধনের দু-পা বালুরেখা ভূমি পেরিয়ে
চের ভাঙা ঢাল-বর্শা মানুষের-ঘোড়ার ধারালো কুচি হাড়ে পা বিঁধিয়ে,
আসছে-আসছে, বাঁয়ে ঝোপ, ডাইনে পিরামিড, আসছে-আসছে দু-পা

থালায় ঐ তো মুণ্ডু জোকানানের, সর্তও পুরেছে, এইতো সালোমির না
চেরা সময়

তালমুদ আদায় দেওয়া পণ্ডিত রাব্বিরা শুরু সেনাপতিরা
তোর হাতে-হাত নাচবে বলে সূর্যা-আতর হয়েছে
মক্তবের উপাচার্য, পঞ্চায়েতে সম্মানিত গুণী, ফারিসী প্রবীনদের সাধ্যর প্রবাদ

নষ্ট ডুমুরের পোকা-কাটা পাতায় কানাভাঙা ওল্টানো মদের হাঁড়ি
হয়ে ঘুমায় সালোমির পায়ের তোড়ার একটি-দুটি দানার তারা

সালোমির নাচ শুরু হোক

না হেরোদ, সে আমার জরায়ুতে ভ্রূণ পুঁতে রণস্নাত আকাঙ্ক্ষা করেনি
আমি তোমাদেরই মেয়ে, হেরোদের হাতে খুন আপন জ্যেষ্ঠের মেয়ে।
জ্যেষ্ঠের ঘরণী কিন্তু হেরোদের অধুনা রানির মেয়ে, রাজকন্যা।
মরুভূমির ক্ষুধায় একটি একটি কলা বাড়ানো হিংস্র চাঁদ
পশ্চিম-সমুদ্র থেকে নোনা হাওয়া যেমন আঙুরলতা রসে ভরিয়ে তোলে
এইতো নাচছি হেরোদ, দ্যাখো টায়রা ঝকমকায়, ঝাঁকে চুল ফণা হিসহিসায়
বর্তুল বুকের রূপা সোনা পান্না ঝলমল কাঁচুলি
দ্যাখো এই নাভির অমৃত কূপ, হেমজঙ্ঘা জায়ণ মন্দিরে থাম,
দ্যাখো এই পায়েলে কেমন ঘুরছে পড়ছে নদী নদ জনপদ শহর ও গ্রাম
জুড়ে মাথা আর মাথা

আর ঐ কোঁকড়া চুলে কালো হয়ে ওঠা রক্তে
মরুভূমির এই দেশে শুধু একটি মাথা
তামা না সোনার থালে জোকানানের কাটা মুণ্ডে
ঠাণ্ডা ঠোঁটে চুমো খাই, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা
অর্ফিয়ুস এমনি ঠাণ্ডা মৃত্যুর অনন্ত দেশে গিয়েছিলেন ?

কোথায় সোনার থালা ও তো হৃদপিণ্ড ও তো....
যেমন ভূ-প্রকৃতির আদিম বনের মাথা শিউরে উঠেছে পাগলা হাওয়ায়
লাল কালো পাঙাশ নীলাভ মাটি
ঘোলা জলে ডুব দিয়েছে তুষার পতনে দীর্ঘ ঘুমে গিয়েছে।
জল নেমে গেলে পলি, বরফ গললে সেচ,
মাটি ভেদ করে উঠেছে সিডার পাইন ওক
গ্রীষ্মকাল বনে শাল সেগুন
আর উদ্ভিদ ওষধি,
জোকানানের হৃদপিণ্ডে নেচে চলেছে স্বয়ংই সালোমি,
রাজা সেই হৃদপিণ্ডের গীর্জায় ঢং ঢং শুনতে শুনতে ঠিকই চলে আসবেন
ঐ তিনি এলেন, তিনি চড়ে বসলেন ক্রুশে সিংহাসনে

সালোমির নাচ শুরু হলো।

মজরা প্রধান

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

'য'-ফলা বসিয়ে লিখলে সব শব্দই ভারী, হয়ে যায়।
ব্যবহৃত মানুষীর মতো আমি তাকে বর্জন করতে চেয়েও
'ব'-এ 'য'-ফলা বসাই।
যারা এতদিন সম্ভোগশয়নে ছিল তাদের টান মেরে তুলে
টানাটানি বানিয়ে দিই সাদা পাতার দুদিকে প্রহরী,
আমার প্রহরী চাই—উভয়ত দুঃখ ও সুখের।

যতদিন নিকটে আসোনি, তুমি ছিলে শিখরিদশনা
ইন্দ্রসভার নও, নও কারো ইন্দ্রিয় ফেরৎ, তুমি এসে
ভালবাসি ভাসবাসি বলে নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে গেলে।
তারপর যা হয় আর কি, ঋতুতে ঋতুতে যেমন
কবিতার রদবদল হয়,
তোমারো তেমনি হলো, লজ্জার শয্যার পাশে
তুমি প্রথম রমনী হলে,
ঝরা-পড়া পাতারা যেমন নড়ে, তেমনি তুমি নড়ে নড়ে
হলে ভারী, হয়ে উঠলে শেষ সর্বনাশ।
আর আমি 'য'-ফলা বসিয়ে
তোমাকেই করে তুললাম অব্যবহার্য ভারী।

আধুলি

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

ডেরেক
উনিশ বছর আগে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ
পাহাড়ের দেশে।
তুমি কি পাহাড়ে উঠেছ ?
তুমি কি শিখর অবধি পৌঁছতে পারলে ?
তুমি পা ফসকে খাদে পড়ে যাও নি তো ?

আমরা জানি না, তবু
চিন্তা হয়।

এক-এক সময় তোমার কথা মনে হয় ডেরেক,
তুমি আমাদের প্রিয়জন হয়ে উঠেছিলে বলে নয়
তুমি পাহাড়ে চলে গেলে, তাই।
পাহাড় কেমন আমরা জানি না,
এখানে সমতলের আকাশ
মেঘে ভারি
মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে
বৃষ্টির জলে ধোয়ামোছা হয়ে যাচ্ছে গাছপালা,
তুমি একটা আধুলি পুঁতেছিলে আমাদের ছেলেমানুষ উঠোনে
তা থেকে আজও কোনো চারা বেরোয় নি।

আত্মহত্যা চিরকুট

শিবশম্ভু পাল

আমার মৃত্যুর জন্যে এমন চাঁদের আলো দায়ী
জানলা খুলে ভুল করেছিলাম
গরাদ টপকে এসে সে আমার সহশয্যাশায়ী
জানলা খুলে ভুল করেছিলাম।

অসহ্য আর্দ্রতা ছিল বাতাসের, ছিল বন্ধ পাখা
অন্তত এমনিতর কিছু
অবরোধ করেছিল অন্তরীণ সৌখিন এলাকা
প্রহরী আকাশমুখী ঋজু,

দেওয়ার বাহিনীর কথোপকথন ছায়াবাদী
চুপ করে গিয়েছিল, ফলে
ঘুম ছিন্নভিন্ন হল, আমি রূপকথা-পরাধীন
স্বখাত অধীর রসাতলে…

জানলা যেই খুলতে গেছি, হাত চেপে ধরল প্রতিহার
গায়ে তার আটপৌরে শাড়ি
হলুদ ও স্বেদের গন্ধ, কণ্ঠে তার গিল্টি করা হার
চিরকাল আদায় ব্যাপারি।

ছিনিয়ে নিয়েছি হাত, জানলা খুলি, সরাসরি চাঁদ
ঢুকে আগে শিকারের লোভে
পুরোপুরি লুটে নিল চরিত্রের তাবৎ বিষাদ -
ঘরে যাব সহর্ষ বিক্ষোভে।

বুলেট হল বুলেট

নবারুণ ভট্টাচার্য

জরায়ুর মধ্যে বুলেট খেয়েছিলাম বলে
আমি জন্মাতে পারিনি
তাই বলতে পারব না কোন দলের লোক
কোন জমানার পুলিশ গুলি করেছিল
বলতে পারবনা আমার মা
বিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী—কোন দলের
সমর্থক ছিলেন

বুলেট কোনো বাধার তোয়াক্কা করে না
সে কোনো চর্মাচ্ছাদন, সূক্ষ্ম ঝিল্লির স্নেহ
এবং জন্মজলকে খাতির করে না
বুলেটের কোনো বুদ্ধি নেই, নৈতিকতা নেই
চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কোনো যথার্থতা
বা অব্যক্ত অর্থও নেই
বুলেট হল বুলেট
তাকে অন্ধ ঘাতক বলে ভাবলে
দৃষ্টিহীন অপমানিত হবে
হত্যাকারীও মানবিকতা হারাবে

যাই হোক, জরায়ুর মধ্যে বুলেট খেয়েছিলাম বলে
আমি জন্মাতে পারিনি
আমি কে আমি জানি না
জানার সময় পাইনি
জানার সময় আমি আর কখনও পাবো না
আমি কালা, বোবা, অন্ধ ও অচেতন

এবার পুলিশ, নেতা, মাফিয়া, উর্দিপরা, উর্দি না পরা
সবাই আমাকে খুঁজতে বেরোতে পারো
নির্ভয়ে এসো, নির্মম হয়ে এস
সেবার আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম
এবার তোমাদের স্তম্ভিত হওয়ার পালা

তোমরা সন্ধান চালাও বুলেট নিয়ে
কিন্তু মনে রেখ
বুলেটের কোনো বুদ্ধি নেই, নৈতিকতা নেই
চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কোনো যথার্থতা
বা অব্যক্ত অর্থও নেই
বুলেট হল বুলেট
বুলেট এক গেলাস জল বা মদ
বা একটা সিগারেট নয়

না জন্মালেও অন্ধকারে এক একটা
প্রশ্নের ঢেউ ওঠাই
ঢেউ ফিরে যায়
আমার, না জন্মানো আমার
এত প্রশ্নের পাথর পাষাণ অন্ধকার
চূর্ণ করতে বিস্ফোরণে
হতভম্ব বুলেট কি জানে
বিদগ্ধ, সত্যনিষ্ঠ পাঠক
তুমিই কি জানো এত অসম্ভব জিজ্ঞাসার মানে

জীবন কি কবিতার সমার্থক প্রতিশব্দ

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কিছুই হলো না বলে মনে হয় জীবনের অপরাহ্নে এসে !

কিছু কি হওয়ার ছিলো ? কি ছিলো ? পৌঁছোতে সেখানে কি
আমার স্বতন্ত্র কোনো প্রস্তুতি দেখেছে কেউ ? আমি কি দেখেছি ?
মানুষ যেমন বাঁচে, বেঁচে থাকবার সাধ
স্বপ্ন ও সংগ্রাম নিয়ে বাঁচে ;
যেরকম বন্ধ্যা মাটি চাষ করে, ফসলের স্বপ্ন বোনে
একদিন পাকা ধান তোলে ;
বিবাহে, উৎসবে, জাতকর্মে ও মরণে বাঁচে
অজস্র কাজের কলরোলে
যেরকম সাধারণ সুখ ও অতৃপ্তি নিয়ে একদিন অনন্তে বিলীন
হয়ে যায়, সেরকমই আমিও ছিলাম, আছি অন্য কোনো প্রস্তুতিবিহীন।

শুধু কিছু দাবি, কিছু আনন্দ গচ্ছিত আছে তার কাছে—কবিতার কাছে।
তুমি বরমাল্য দেবে পরিয়ে এমন তীব্র ইচ্ছে নিয়ে
যৌবনে পুড়েছি ; ওরকম
বিনম্র আকুতি নিয়ে কাছে এসে অপরাহ্ন বেলা
বলেছি—আমাকে নাও যেরকম মৃত্যু নেয় ব্যর্থ প্রেমিকেরে।

সে-ডাকে মেলেনি সাড়া—বলে মনে হয়—
কিছু জীবন দিলো না এই হাতে।
জীবন কি কবিতার সমার্থক প্রতিশব্দ ?
না কি বয়ে যায় ভিন্নখাতে ?

প্রতিবেদন

কালীকৃষ্ণ গুহ

কতো দিক থেকে এলো
কতো যে নিমন্ত্রণ—
পূর্ণিমারাত্রিকে
ঘিরে সব নির্জন
হয়ে এলো তবু শেষে ;
নির্জন বাড়িঘর
আর সেই মহাকাশ
শরীরে আনলো জ্বর।

মৃত-প্রেমিকের ছবি
ভেসে ওঠে আজ চোখে
আর সব বন্ধুরা
অরচিত স্বর্লোকে
চিত্রার্পিত, বোবা ;
কী এক নিস্তব্ধতা
তোমাকে জাগালো শুধু—
একা বলে গেলে কথা।

এতো যে আবীর মাখা
হয়েছিল সারাদিন
কপালে, সিঁথির রেখায়
সবই হয়ে এলো ক্ষীণ
সন্ধ্যায় ; সব ডাক
'আমি ভালো নেই' বলে
ফিরিয়ে দিয়েছো, আর
মিশে গেছ কল্লোলে।

খুচরো-খাচরা অনেক লেখাতেই—এমনকি দুয়েকটা বিশেষ প্রবন্ধেও এর উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু, মৌলবাদ নিয়ে নতুন করে মাতামাতি শুরু হয় ১৯৭৮-এর ইরানে শাহকে গদিচ্যুত করে যে শিয়াপন্থী ঐস্লামিক বিপ্লব শুরু হয় তারপর থেকে। আমাদের সবারই জানা যে, ইরানের ঐ বিপ্লবকে 'মৌলবাদী বিপ্লব' আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রায় তার পর থেকেই ধর্ম ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নতুন করে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। আমি বলছি না—এর আগে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ধর্মের কোন প্রভাবই ছিল না। কিন্তু ১৯৮০ সালের পর থেকে যে ধরনের প্রভাব আমরা লক্ষ্য করছি তা চরিত্রগতভাবে আগের প্রভাবের চেয়ে আলাদা।

আমার এই প্রবন্ধের কয়েকটা সীমাবদ্ধতার কথা শুরুতেই বলে নেয়া যাক : প্রথমতঃ আমি এখানে 'ধর্ম' শব্দকে ইংরেজি 'রিলিজিয়নে'র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছি। আমরা সবাই জানি, ভারতীয় শব্দ 'ধর্ম' ইংরেজি 'রিলিজিয়নের' চাইতে অনেক ব্যাপক। কিন্তু, আলোচনার সুবিধের জন্যেই 'ধর্ম'-কে আমরা পাশ্চাত্য 'রিলিজিয়নে'র অর্থে সংক্ষিপ্ত রেখেছি। এখানে 'ধর্ম' অর্থে 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে' বোঝায়। সব ধর্মেরই একটা পিরামিডজাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকবে—এমন কোনো কথা নেই। ইসলাম বা শিখ ধর্মে এই ধরনের কাঠামো হয়তো লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, হিন্দু ধর্মে এই ধরনের কাঠামো নেই বা কাঠামো নিয়ে কড়াকড়িও নেই। আমি জীবনে কোনোদিন মন্দিরে না গেলেও নিষ্ঠাবান হিন্দু বলে প্রতিপন্ন হতে পারি। মন্দিরে যাওয়া বা পুরোহিতের ফরমান শোনার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আসলে 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম' বলতে আমি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে বোঝাতে চাইছি না। দুরখাইমকে অনুসরণ করে বলা যায়, যে কোন ধর্মের দুটো দিক আছে : এক, তার বিচার, মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের দিক, (আইডিয়াজ); দুই, তার আচারগত বা ব্যবহারিক দিক ('রিচুয়ালস')। আর এই দুয়ের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে এক সামাজিক গোষ্ঠী যার সদস্যেরা ধর্মের ঐ প্রস্তাবিত বিচার, মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের প্রতি অনুরক্ত থাকেন এবং তার আচার অনুশাসনগুলো মেনে চলেন। এর ফলে ঐ সামাজিক গোষ্ঠী একটা প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র লাভ করে। এই অর্থেই আমি 'ধর্ম' শব্দটাকে ব্যবহার করেছি। দ্বিতীয়তঃ, এখানে যা কিছু বক্তব্যের অবতারণা করা হয়েছে তার সবটাই ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে। এটা ঠিক যে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মৌলবাদের অভ্যুত্থানকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের মৌলবাদকে যেমন বোঝা যাবে না তেমনি বোঝা যাবে না মৌলবাদ বিরোধিতাকেও। তাই, আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গও এক-আধবার ঘুরেফিরে এসেছে। তৃতীয়তঃ, এই প্রবন্ধে সংকলিত উদাহরণগুলোকে একটু খাপছাড়া মনে হতে পারে। এমনও মনে হতে পারে, অন্য অনেক উদাহরণ বাদ দিয়ে ঠিক এই

উদাহরণগুলো এনে হাজির করার কোন যাথার্থ্য নেই। কিন্তু, প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সম্ভাব্য সব উদাহরণকে বর্ণনা করার কোন সুযোগ নেই। তাই একটা নির্বাচনের ব্যাপার এসেই যায়। অনেক ক্ষেত্রে, একাধিক উদাহরণ দেয়া সম্ভব হয়নি। এমনকি অনেক প্রাসঙ্গিক উদাহরণকেও বাদ দিতে হয়েছে। উদাহরণগুলো অবশ্য নিজেরাই গুরুত্বপূর্ণ নয়; তাদের অন্তর্নিহিত যুক্তি এবং বক্তব্যগুলো যদি বিতর্কের সূচনা করে তাহলে সেটাই আমার লাভ।

মৌলবাদ : পুরোন এবং নতুন

অনেকেই মনে করেন, মৌলবাদ যেন একটা জগদ্দল পাথর—তার কোন পরিবর্তন নেই। যেরকম দেখা যাচ্ছে তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, পুরোন বা সাবেকি মৌলবাদের দিন ফুরিয়েছে। ব্যাপ্তি এবং গভীরতা—এই দুই দিক দিয়েই পুরোন মৌলবাদের সঙ্গে নতুন মৌলবাদের তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। পুরোন মৌলবাদের ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয়, প্রত্যেক ধর্মেরই 'মূল' (নির্যাস, অক্ষর বা সারাৎসার) বলে একটা কিছু আছে। তা বিচার, বিশ্বাস বা মূল্যবোধের স্তরেও থাকতে পারে। আবার তা আচারগত বা ব্যবহারিক স্তরেও থাকতে পারে। কিংবা তা এই দুই স্তরেই একই সঙ্গে থাকতে পারে। উল্টোভাবে বলা যায়, ধর্মের সমস্ত বিচার, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সংস্কারই 'মূল' বলে গণ্য হবে না। এদের মধ্যে কিছু কিছু বিচার-বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি এবং সংস্কারকেই কেবল 'মূল' বলে মনোনীত করা হবে। এই 'মূল' মনোনয়নই হল পুরোন মৌলবাদের আসল কথা। যাকে 'মূল' বলে মনোনীত করা হল তা অবশ্য পালনীয়। অর্থাৎ, কোনো পরিস্থিতিতেই তার কিছুমাত্র লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। যেমন, মীমাংসকরা মনে করতেন বেদ যেহেতু 'অপৌরুষেয়' সেহেতু 'প্রামাণ্য' এবং একমাত্র 'প্রামাণ্য' গ্রন্থ। মনোনীত 'মূল'-এর বাইরে যা কিছু আছে তা অবশ্য পালনীয় নয়। তাকে অনায়াসে লঙ্ঘন করা যেতে পারে। বেদ যেহেতু একমাত্র 'প্রামাণ্য' গ্রন্থ বাকি সব গ্রন্থ এবং শাস্ত্র অবশ্য পালনীয় বা অলঙ্ঘনীয় নয়। একইভাবে, খ্রীষ্টীয় মৌলবাদ 'প্রোটেস্ট্যান্টিজম' থেকে পাঁচটি বিষয়ে আলাদা করা হল : 'খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের অভ্রান্তত্ব, যিশুর ঈশ্বরত্ব, মাতা মেরীর মধ্যে কুমারীত্ব ও মাতৃত্বের সুশৃঙ্খল সহাবস্থান, পাপের জন্য অনুতাপে প্রায়শ্চিত্ত এবং যিশুর যুগান্তে সশরীরে দ্বিতীয় আবির্ভাব।' সুতরাং এখানে এই পাঁচটিকে 'মূল' বলে স্বীকৃতি দেয়া হল। বলা বাহুল্য, এর বাইরে কিন্তু রয়ে গেল আরো অনেক খ্রীষ্টধর্মসম্মত বোধ-বিশ্বাস, রীতি-নীতি এবং আচার-সংস্কার। সেগুলো লঙ্ঘিত হলে মৌলবাদীদের কিছু

যাবে আসবে না। এথেকে মনে হয়, পুরোন মৌলবাদ একটা পূর্বমনোনীত সীমিত চৌহদ্দির মধ্যে সংকুচিত ছিল।

এই মনোনয়নের প্রসঙ্গে দুয়েকটা কথা এখানে বলে নেয়া যেতে পারে। মনোনীত 'মূল' আর পাঁচটা মনোনয়নের মতই বিতর্ক এবং সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। অন্ততঃ দুটো দিক দিয়ে বিতর্ক বা সমালোচনা উঠতে দেখা যায়ঃ এক, 'মূল'-এর মনোনয়ন যে সব সময়েই খুব শাস্ত্রসম্মত এবং ধর্মানুগ—এমন কথা বলা যাবে না। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। এই উদাহরণটা বিমলকৃষ্ণ মতিলালের এক প্রবন্ধ থেকে নেয়া। উদাহরণে যাবার আগে প্রসঙ্গটা একটু উল্লেখ করা দরকার। মেঘনাদ সাহাকে এক ঢাকাই উকিল বলেছিলেন, তাঁর 'থিওরি অফ থারমাল আয়োনাইজেশন' তো 'ব্যাদে আছে।' 'ব্যাদ' অর্থে বেদ। মীমাংসকরাও বেদকে একমাত্র 'প্রামাণ্য' শাস্ত্র বলে মনে করতেন। কিন্তু বিমলকৃষ্ণ মতিলাল বেদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ ···"সব ব্যাদে আছে" এ কথাটাই যে বেদে বা "ব্যাদে" নেই তাও আমাদের বুঝতে হবে।"[১] এরকম উদাহরণ আরো দেয়া যেতে পারে। কিন্তু, তার আর দরকার নেই। দুই, ধর্মের 'মূল' কি হবে—তাই নিয়ে একই ধর্মের অন্তর্গত সদস্যদের মধ্যে ঐকমত্যও খুব সহজ ছিল না। যেমন, মীমাংসকরা বেদ-কে 'প্রামাণ্য' বলে মনোনীত করলেও হিন্দু ধর্মেরই অন্যান্য গোষ্ঠী এর বিরোধিতা করেছে। 'প্রোটেস্ট্যান্টিজম'-এর সাথে মৌলবাদীদের বিরোধের কথা তো আগেই বলেছি। এর একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ না দিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ বলে মনে হতে পারে। খুব সম্প্রতি মুসলিমদের 'তিন তালাকের' বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চরমে উঠেছে।[২] এই বিতর্কের দুই মুখ্য প্রধান পক্ষ হল জামিয়াত আহলে হাদিস এবং জামিয়াত উলেমা-এ-হিন্দ। হাদিসের পক্ষ থেকে একটি 'ফতোয়া' জারি করে বলা হয়েছে, কোনো মুসলিম স্বামী যদি একই সঙ্গে একই আসরে 'তিন তালাক' উচ্চারণ করেন তবে তা অসিদ্ধ কারণ তা কোরাণ-সম্মত নয়। অন্যদিকে, হিন্দ-এর বক্তব্য অনুযায়ী কোনো স্বামী যদি একই আসরে, একই সঙ্গে 'তিন তালাক' উচ্চারণ করেন এবং তার পরেও সেই স্ত্রীর সঙ্গে 'সহবাস' করেন তা কেবল, বেআইনীই নয়, 'পাপের কাজ' বলে গণ্য হবে। হিন্দ-এর সভাপতি মৌলানা সৈয়দ আমাদ মাদানি নয়াদিল্লির এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়ে বলেন 'তিন তালাকে'র এই ভাষ্য 'সংশয়াতীতভাবে' পবিত্র কোরাণ এবং হাদিসের অনুসারী। হাদিসের ভাষ্যকে তিনি 'ভ্রান্ত প্রচার' ('মিসচিভাস প্রোপ্যাগাণ্ডা') বলে উড়িয়ে দেন। তাছাড়া, এই ভাষ্য 'কোরাণের অপব্যাখ্যা' বলেও তিনি মন্তব্য করেন। এখানে লক্ষ্যনীয় ব্যাপারটা হল, দুই পক্ষই 'তিন তালাক'-সংক্রান্ত তাঁদের ভাষ্যকে কোরাণের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলে মনে করছেন। শুধু তাই নয়, অপর পক্ষের ভাষ্যকে 'ভ্রান্ত প্রচার' এবং অসিদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করতে

চাইছেন। কার দাবি সত্যি, কারুই বা মিথ্যে—এ প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পরে বলার চেষ্টা করবো, এই ধরনের প্রমাণই অসম্ভব। কিন্তু, এখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত অনুশাসনকে কেন্দ্র করে 'মূল'-এর মনোনয়ন নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মতপার্থক্য খুব পরিষ্কার। এই সমস্ত কারণেই মনোনয়নকে মন-গড়া বলে ভাবাটা কিছু অসমীচিন নয়।

এখনকার মৌলবাদ কোনো সীমিত চৌহদ্দির মধ্যে সংকুচিত নেই। "বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, দর্শন, ইতিহাস' ইত্যাদি জ্ঞানচর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সরব অনুপ্রবেশ ঘটেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'মূলের অনুসন্ধান' চলছে। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে নতুন মৌলবাদের ব্যাপ্তি পুরোন মৌলবাদের চাইতে অনেক বেশি। এর একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। একটি প্রবন্ধে অরিন্দম চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন: "কোনো রাজনৈতিক হুজুগে বা গণ-আন্দোলনে নয়—ঘরে ঘরে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাদের মূল অনুসন্ধানে জাগ্রত হচ্ছে। আমেরিকা ইংল্যান্ডে পড়তে যাওয়া হিন্দু ছাত্রকুল হিন্দু শাস্ত্র বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, দর্শন, ইতিহাসে আবার উৎসাহ ফিরে পাচ্ছে।"[৩] প্রাচীন ভারতের 'বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, দর্শন, ইতিহাসের সঙ্গে' হিন্দু শাস্ত্রের সম্পর্কটা কি—তা কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না। আর এতে কেবল 'হিন্দু ছাত্রকুলের'ই আগ্রহ থাকবে, অন্য কারুর নয়—ব্যাপারটা এমনও নয়। আসলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'হিন্দু ধর্মের মূলের অনুসন্ধান' একদিকে যেমন হিন্দু মৌলবাদের পরিধি সম্প্রসারিত করেছে অন্যদিকে তেমনি প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানচর্চার ধারাকে নস্যাৎ করেছে। আসলে এরা একই মৌলবাদী আক্রমণের এপিঠ আর ওপিঠ। অরিন্দম চক্রবর্তীর এমন ধারা বক্তব্যের সমালোচনা করে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন: "প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদিতে উৎসাহ তো ভালো কথা। কিন্তু তার সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কী সম্পর্ক? হিন্দু ধর্ম কি এগুলোয় কোনোদিন কোনো উৎসাহ দিয়েছে? বরং বেদ প্রামাণ্যের চাপে আর্যভট্টর ভূভ্রমণবাদ এখানে স্বীকৃত হয়নি, সূর্যগ্রহণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বরাহমিহির ও লল্লকে দুমুখে দুকথা বলতে হয়েছে।"[৪] নতুন মৌলবাদের আক্রমণের চাপে এই ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানচর্চার ধারা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে, জ্ঞানচর্চা তার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র হারাচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে মৌলবাদের শিকার হয়ে পড়ছে।

কিন্তু, কেবল ব্যাপ্তি নয়—পরিবর্তন এসেছে মৌলবাদের গভীরতায়। পুরোন মৌলবাদের কাছে পূর্বমনোনীত 'মূল'-ও অনেক সময় পরিবর্তনশীল। কিন্তু, এই পরিবর্তনের গতি এত মন্থর এবং প্রকৃতি এত গোলমেলে যে পরিবর্তনকে আর পরিবর্তন বলে মনে হয় না। মৌলবাদীরা পরিবর্তন

হয়নি জেনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। সম্প্রদায়ের বাইরের লোকেরা 'মূল'-এর সূক্ষ্ম পরিবর্তনকে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারেন না। মনে হয়, একই 'মূল' যেন যুগযুগান্ত ধরে অব্যাহত আছে। এ এমন এক পরিবর্তন যা অপরিবর্তনীয়তার বিশ্বাসকে আঘাত করে না। আমরা জানি, পরিবর্তন হওয়া এবং তার সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মানো—এক জিনিস নয়।

'যুগোপযোগী' পরিবর্তনের তাগিদেই হিন্দুদের স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হয়েছে। সময় বুঝে কালোপযোগী ভাষ্য টীকাটিপ্পনী এবং শেষ পর্যন্ত নিবন্ধাবলী রচনা করতে হয়েছে। মতিলালের ভাষায়ঃ "বেদের প্রতি একটা 'ওষ্ঠাগত' প্রশংসা বা শ্রদ্ধা জাগিয়ে তাঁরা (স্মার্তরা) যুক্তিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আপন জীবনদর্শনকে রূপ দিয়েছেন। ...মীমাংসক বা স্মার্তকের মৌলবাদের মধ্যে কিন্তু সংগ্রামী বা 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব ছিল না।"[৫] এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। মুসলমানদের 'ফেকাহ' শাস্ত্রও এই রকম 'যুগোপযোগী' প্রয়োজন মেটাতেই রচনা করা হয়েছিল।

কিন্তু, আধুনিক মৌলবাদে উগ্রতা যা বিমলকৃষ্ণ মতিলালের ভাষায় 'সংগ্রামী বা যুদ্ধং দেহি মনোভাব' ভীষণভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, যাকে একেবারে 'মূল' বলে মনোনীত করা হয়েছে তার আর কোনোরকমের লঙ্ঘন বা পরিবর্তন সহ্য করা হয় না। এক কথায় আজকের মৌলবাদ এক অনতিক্রম্য পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। মৌলবাদের চোখে পূর্বমনোনীত 'মূল'-এর চেয়ে বড় আর কিছু নেই—এমনকি দেশের সংবিধানও নয়। নয়াদিল্লির এক প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আচার্য বামদেব ঘোষণা করেছেন তিনি ভারতীয় সংবিধানের প্রতি 'বিন্দুমাত্র' আস্থাশীল নন। সংসদে বিজেপির সদস্যরা পর্যন্ত বলেছেন, সংবিধানে যাই লেখা থাক দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয় যাই রায় দিন—অযোধ্যার 'বিতর্কিত' স্থানে 'রামমন্দির' তাঁরা গড়বেনই। এটা নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে দেয়া তাঁদের অন্যতম প্রতিশ্রুতি। সংবিধান-বিরোধী এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায় কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। তাঁদের দেয়া আর সব প্রতিশ্রুতি তাঁরা মেনে চলতে পারবেন কিনা—তাও ভেবে দেখা দরকার। সোজা কথাটা হল, সংবিধানকে দেশের চূড়ান্ত আইন বলে আর মনে করা হচ্ছে না। মুসলিম মৌলবাদীরাও তাঁদের ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকারকে প্রশ্ন করেছেন। শাহবানু মামলায় 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের' ব্যাখ্যাতা হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকাকে তাঁরা 'ইসলামবিরোধী' বলে মনে করছেন। একটা কথা এখানে বলে নেয়া দরকার। শাহবানু মামলায় বিতর্কিত রায়ের (১৯৮৬) পরে যে প্রশ্নটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তা কিন্তু এই নয় যে, বিবাহ-

বিচ্ছেদের পরে একজন মুসলিম স্বামী তাঁর স্ত্রীকে খোরাক-পোষাক দিতে বাধ্য থাকবেন কিনা। বরং যে প্রশ্নটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তা হল, 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের' ব্যাখ্যা দেবার নাম করে সুপ্রিম কোর্ট মুসলমান সম্প্রদায়ের একান্ত নিজস্ব ধর্মীয় ক্ষেত্রে নাক গলাতে পারে কিনা। এসব দেখে মনে হয়, একজন মৌলবাদীর চোখে এই পূর্বমনোনীত 'মূল'-এর ওপরে আর কিছুই স্থান পেতে পারে না—এমনকি দেশের সংবিধান বা সর্বোচ্চ আদালতও নয়। প্রতিষ্ঠিত আইনব্যবস্থার প্রতি তীব্র অনাস্থা এবং অসহিষ্ণুতা পুরোন মৌলবাদে কিন্তু লক্ষ্য করা যায়নি। একটু খোলসা করে বলতে গেলে বলা যায়, প্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা বা অসহিষ্ণুতা এতটা তীব্রতা লাভ করার আগেই রাষ্ট্রশক্তি তাকে নির্মূল করে ফেলেছে।

মনোনয়ন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা

ধর্মের যে সমস্ত বিচার, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার, ব্যবহার এবং সংস্কারকে 'মূল' বলে ধরে নেয়া হয় তা কিন্তু নিছকই ধরে নেয়া। ফলে, তার মধ্যে একটা মন-গড়া ব্যাপার থেকেই যায়। কিন্তু, যত মন-গড়াই হোক না কেন, যাকে একবার 'মূল' বলে ধরে নেয়া হল তা যে আদতে 'মূল'—ধর্মের নির্যাস, আকর বা সারাৎসার—তা নিয়ে মৌলবাদীদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না। এই সন্দেহাতীত বিশ্বাসটাই মৌলবাদের ভিত্তি। আমরা কজন আর ধর্মশাস্ত্র পড়ে ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হই? বা, একই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে (যেমন, বৈষ্ণব আর শাক্ত) বিতর্ক এবং মতপার্থক্য সম্পর্কে অবহিত থাকি যে বিচারের মধ্য দিয়ে নিজের পথ ঠিক করে উঠতে পারে? 'মূল' এর কোন বাস্তব অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ভিত্তি আছে কি নেই—সে প্রশ্ন গৌণ। 'মূল'-এর প্রতি সংশয়াতীত আস্থাই মৌলবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করে।

এই সংশয়াতীত আস্থাই কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। যদি সম্প্রদায়ের ব্যাপক সংখ্যক সদস্য (সব সদস্য নাও হতে পারেন) ধর্মের 'মূল' বলে যাকে ধরে নেয়া হয়েছে—তার প্রতি আস্থাশীল থাকেন এবং তার সম্বন্ধে কোনরকমের সন্দেহ প্রকাশ না করেন তা হলে এর দ্বারাই সেই সম্প্রদায় নিজেকে সংঘবদ্ধ করে। বিশেষ বিশেষ বিচার, মূল্যবোধ, আচার, ব্যবহার এবং সংস্কারের প্রতি বিশ্বাসের একরূপতাই কোন সম্প্রদায়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ।

সংঘ পরিবার যাকে হিন্দু ধর্মের 'মূল' বা 'হিন্দুত্ব' বলে ধরে নিয়েছেন তার প্রতি ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু আজো কেন আস্থাশীল নয়—তাই সংঘ

পরিবারের বিশেষ পরিতাপের বিষয়। বিশ্বহিন্দু পরিষদ-থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় সাংসদ বিজয় কুমার মালহোত্র খেদোক্তি প্রকাশ করেছেন, 'হিন্দুরা কেবল হিন্দুদের মতই ভাবেন না।' বলা বাহুল্য, এই 'হিন্দুদের মত ভাবনা'র বিষয়সূচী সংঘ পরিবার পূর্বনির্দিষ্ট করে রেখেছেন। হিন্দুরা যদি সেই ছাঁচে-ঢালা চিন্তার শরিক না হন তাহলে তা সংঘ পরিবারের মাথা-ব্যথার কারণ বইকি। ভারতবর্ষটা 'তাঁদের নিজেদের (হিন্দুদের) দেশ'। এর '৮৬ শতাংশ (?) মানুষ হিন্দু। এই রকম নিজভূমে পরবাসী থাকাটাকে হিন্দুরা আর কতদিন মাথা পেতে নেবেন। এ পোড়া দেশে হিন্দু হওয়াটাই পাপ। কিন্তু 'সবকিছুরই একটা সীমা আছে'। এমতা-বস্থায়, 'হিন্দুদের দাক্ষিণ্যে' পরিপুষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতা 'বেশিদিন বাঁচতে পারে না।' যে হিন্দু-জাগরণের ভয়াবহ ইঙ্গিত এই কথাগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে তা বর্ণে বর্ণে সত্যি হতে চলেছে। হিন্দুরা 'কেবল হিন্দুদের মত' ভাবতে শুরু করেছেন—এবং, সংঘ পরিবারের প্রদর্শিত পথেই হিন্দুদের ভাবনা-চিন্তা এসেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বিজেপির জনপ্রিয়তা। এটা কোনক্রমেই একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। আসলে স্বাধীনতার পরে নির্বাচনী পরিসংখ্যানগুলোর দিকে চোখ রাখলে যে কথাটা সবচেয়ে আগে মনে আসে তা হল—ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন দক্ষিণপন্থী দলগুলোর ক্রমবর্ধমান সাফল্য। এই সাফল্যে একবারের জন্যেও ভাঁটা পড়েনি। হিন্দুত্বের যে ছক সংঘ পরিবার তৈরি করে দিয়েছেন তার জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে যে হিন্দু মৌলবাদ ক্রমশঃ মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছে।

ধর্মের যে সমস্ত বোধ-বিশ্বাস, রীতি-নীতি, আচার-সংস্কারকে 'মূল' বলে ধরে নেয়। হয় তা যে মন-গড়া হতে পারে—সেকথা আগেই বলেছি। তার বাস্তব অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কোন ভিত্তি না থাকতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রীয় ভিত্তির অনুপস্থিতিই একটা সম্প্রদায়ের ঐক্যের বন্ধনকে দুর্বল বা ভঙ্গুর করে দেয় না। ভিত্তি মন-গড়া হলেও তার ওপরে সন্দেহহীন এবং অটুট আস্থা থাকতে পারে। এই আস্থার দৃঢ়তার ওপরেই নির্ভর করে সম্প্রদায়ের ঐক্যের বন্ধন। সংঘ পরিবার যাকে 'হিন্দুত্বে'র প্রাণ বলে মনে করছে তা আসলে 'হিন্দুত্ব' নয়—একথা আমরা অহরহ শুনতে পাই। এটা প্রচার করতে গিয়ে স্টেটসম্যান-এর মত গোঁড়া ইংরেজি দৈনিকও একটা রীতি-বিরুদ্ধ কাজ করে বসেছে। সম্পাদকের কাছে পাঠানো দুই তরুণীর এই সম্বন্ধীয় চিঠিকে একেবারে প্রথম পাতায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বাক্স করে ছেপেছে। এই চিঠি সম্পাদকের ভাষায়, 'ভারতবর্ষের বিবেকের কণ্ঠস্বর'। বলা বাহুল্য, 'ভারতবর্ষের বিবেক' মনে করে, সংঘ পরিবারের প্রচার করা 'হিন্দুত্ব' আসলে প্রকৃত হিন্দু ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। সম্পাদক

বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানিকে এই 'কণ্ঠস্বর' শুনতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু, হিন্দু ধর্মের এই 'প্রকৃত' রূপকে উন্মোষিত করেও কি সংঘ পরিবারের মৌলবাদকে ঠেকানো গেল? অর্থাৎ যাঁদের কাছে এই 'প্রকৃত' রূপের প্রচার চলছে তাঁরা তাতে আমল না দিয়ে 'ভ্রান্ত' রূপের আহ্বানেই সাড়া দিচ্ছেন। সেই 'ভ্রান্ত' রূপই তাঁদের অভিভূত করছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রশ্নটা সত্যি-মিথ্যের নয়। 'ভ্রান্ত' রূপও 'প্রকৃত' রূপের চেয়ে ঢের বেশি প্রকৃত বলে মনে হয়। 'মিথ্যে'ও 'সত্যির' চেয়ে বড় সত্যি হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলামের নাম করে যে মৌলবাদী প্রচার চলছে তা মুসলিমদের বিভ্রান্ত করছে। ইসলামে মৌলবাদের কোন স্থান নেই – সেকথাটা সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে। এর ফলে, মৌলবাদীদের মুখোশ খুলে ফেলা যাবে। ইসলাম 'সুস্পষ্ট প্রমাণের' ভিত্তিতেই 'সত্যের পথকে' বরণ করে নেবার শিক্ষা দেয়।[৮] ইসলামের সবচেয়ে বড় শিক্ষা সহনশীলতা—একথা স্যার সৈয়দ আহমেদ খানও বলেছিলেন। তাঁদের অভ্যাস, আচার-ব্যবহার, জীবনচর্যা এমন হওয়া উচিত যাতে তাঁরা 'অবিশ্বাসীদের' কাছেও অনুকরণীয় 'দৃষ্টান্ত' হিসেবে পরিগণিত হতে পারেন। ইসলাম মানেই যে মৌলবাদ নয়—সেকথা অনেকেরই জানা। কিন্তু এত প্রচার করেও কি ইসলামের ওপরে মৌলবাদী আগ্রাসন ঠেকানো গেল? মন-গড়া কিছু বোধ-বিশ্বাস, আচার-ব্যবহারকে শিখণ্ডির মত ইসলামের নামে দাঁড় করিয়ে মুসলিম মৌলবাদ ঠিকই মাথাচাড়া দিল। কাজেই, ধর্মশাস্ত্রের 'প্রকৃত' শিক্ষার ক্রমাগত প্রচারের ফলে মৌলবাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসকে পরাস্ত করা যাবে—সে আশা সুদূর পরাহত। পরে সে প্রসঙ্গে আসছি। কিন্তু এই বিশ্বাসই সাম্প্রদায়িক আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ।

একজন মৌলবাদী তাঁর ধর্মের 'মূল'-এর এমনই ব্যাখ্যা দেন, যার দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করতে পারেন যে এই 'মূল'-এর সঙ্গে অন্য ধর্মের 'মূল'-এর অনিবার্য পার্থক্য আছে। তেল আর জলে যেমন মেশেনা তেমনি এক ধর্মের ব্যাখ্যাত 'মূল'-এর সঙ্গে আর এক ধর্মের মনোনীত 'মূল'-এর কোনো সামঞ্জস্য থাকতে পারে না। হিন্দুরা যদি পৌত্তলিক হন, পৌত্তলিকতা যদি হিন্দু ধর্মের 'মূল' বা গোড়ার কথা হয় তবে, মুসলমানরা পৌত্তলিক নন। পৌত্তলিকতা ইসলামের 'মূল' নয়। গোমাংস ভক্ষণ যদি মুসলমানের চিহ্ন হয় তবে, হিন্দুদের কাছে তা অবশ্য বর্জনীয়। একটার সঙ্গে আর একটার কোন সামঞ্জস্যই থাকতে পারে না। অতএব, সংঘাত অনিবার্য। এমন কথা প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক লুই ডুমোঁও মনে করতেন। এই দৃষ্টিতে তাঁর কাছে, ভারতবিভাগ 'ইতিহাসের অমোঘ এক প্রতিফল'। কিন্তু, ডুমোঁর সঙ্গে আমার বক্তব্যের একটা বড় তফাৎ আছে। এক ধর্মের 'মূল'-এর সঙ্গে অন্য ধর্মের 'মূল'-এর অনিবার্য তফাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস হল এক ধরনের মৌলবাদী

বিশ্বাস। আদতে সেই তফাৎ আছে কিনা—তা নিয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এই অনিবার্য তফাতের কথাটা মানবেন না। তিনি ভাববেন, যাকিছু একের থেকে অপরকে স্বতন্ত্র করে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের জন্ম দেয় তা প্রকৃত ধর্ম নয়—তা 'বাইরের পরিচয়' বা 'সাম্প্রদায়িক ধর্ম'। কিন্তু ডুমোঁ মনে করতেন, এই অনিবার্য তফাৎ কেবল মৌলবাদীদের বিশ্বাসের মধ্যেই সীমিত নয়—এ আসলে দুই ধর্মের অন্তর্নিহিত দর্শন আর জীবনচর্যার তফাৎ। সেই বিতর্কের মীমাংসা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আর তফাৎ থাকলেই যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য—আমি এমন মনে করিনা।

ফলে, একজন মৌলবাদী কেবল নিজের ধর্মের যা 'মূল' তার ব্যাখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হন না। তিনি একই সঙ্গে অন্য ধর্মের 'মূল'-সম্বন্ধে একটা ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন। এই দুই ব্যাখ্যার মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যার চরিত্রটাও অন্য ধর্মের 'মূল'-সম্বন্ধে ব্যাখ্যার ওপরে গড়ে ওঠে। বা, একটু ঘুরিয়ে বলতে গেলে বলা যায়, অন্য ধর্মের 'মূল' যদি একরকম না হয়ে অন্যরকম হত তাহলে হয়তো তাঁর নিজের ধর্মের 'মূল'-এর ব্যাখ্যার ধরণও বদলে যেত। ব্যাখ্যার এই পরনির্ভরশীলতা সাম্প্রদায়িক আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় ধাপ। আমি এর দুটো উদাহরণ দেব। দুটোই অবশ্য হিন্দু মৌলবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ গঠন করার পেছনে যে প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল তাহল সংঘশক্তির। হিন্দুরা সংঘবদ্ধ 'জাতি' নয়। তাঁরা বর্ণে-বর্ণে, জাতিতে-জাতিতে, দলে-দলে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে শতধাবিভক্ত। আর কোনো সম্প্রদায়ের মানুষেরা তো এরকম নন। সংঘবদ্ধতা—ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম বা শিখধর্মের অপরিহার্য গুণ। হিন্দুদের এই গুণের অনুশীলন করতে হবে। এই প্রয়োজন থেকেই সংঘের জন্ম হয়।

বর্তমান সরসংঘচালক বালাসাহেব দেওরস যে দৃষ্টিতে ইসলামকে দেখেন তার দ্বারা মনে হতে পারে, মৌলবাদটা কেবল মুসলমানদের একচেটিয়া সম্পত্তি। হিন্দুরা মৌলবাদের ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত। অর্থাৎ, নিজের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য প্রমাণ করতে অন্য ধর্মের 'মূল'-এরও একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছে। আগের উদাহরণে সংঘশক্তির অভাব সংঘকে অন্য ধর্মের অনুকরণে প্রবৃত্ত করেছে। কিন্তু, এই উদাহরণে ইসলাম-সুলভ মৌলবাদকে বর্জন করার সচেতন চেষ্টার কথা বলা হয়েছে। পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতনতা গ্রহণ এবং বর্জন—দুইয়ের যে কোনটাই শেখাতে পারে। কিন্তু, আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণ বর্জনকে নিয়ে। দেওরস বলেছেন: "ইসলামী মৌলবাদ কোন নতুন কথা নয়। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে ইসলামের মৌলিক সিদ্ধান্তই এমন যে তাঁরা অন্য ধর্মের সঙ্গে সহাবস্থানে বিশ্বাস

করেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে বাকী সব ধর্মই মিথ্যা। কেবল তাই নয়, কোরানে এমনও লেখা আছে বলে জানা যায় যে অ-ইসলামীদের উপর দমন-পীড়ন চালানো কোন অন্যায় কাজ নয়। ও'দের ইতিহাসও একথার সাক্ষ্য বহন করে।"[৮] সামান্য কয়েকটা কথা কিন্তু বড় মারাত্মক তাৎপর্য বহন করছে। প্রথমতঃ, এখানে দেওরস শুধু কোরাণেরই ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেননি। 'ও'দের' অর্থাৎ মুসলমানদের ইতিহাসেরও একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। এই ছোট পরিসরে ইসলামের ধর্ম দর্শন এবং ইতিহাসের ব্যাখ্যা কত সহজেই না দেয়া হয়ে গেল। যেন যে কটা কথা তিনি বললেন, তা সর্বজনস্বীকৃত এবং এ নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই বা বলা ভালো, থাকতে নেই। দ্বিতীয়তঃ, 'ও'দের ইতিহাস' বলতে দেওরস কি বোঝালেন তা আমার কাছে বোধগম্য নয়। 'ও'দের' মানে মুসলমানদের। মুসলমানরা ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্যায়ে শাসক হলে ইতিহাসটা 'ওদের' হয়ে যায়। যেন শাসকরাই ইতিহাস নির্ধারণ করেন। হয়তো দেওরস ইতিহাসকে শাসকের ইতিহাস বলেই মানবেন। প্রজার ইতিহাস নয়। 'ও'দের ইতিহাস' বলে যা বলা হল তার ভারতবর্ষীয় অধ্যায়ের 'আমরা'ও (অ-মুসলমানরাও) অংশীদার ছিলাম না? ইতিহাসের এই রকম ব্যাখ্যা সত্যিই অভিনব। তৃতীয়তঃ, এই বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে দেওরস কোরাণ পড়েন নি। পরের মুখে ঝাল খেয়েছেন। কিন্তু, কোরাণের ব্যাখ্যা দিতে তাঁর কোথাও আটকায়নি। আসলে মৌলবাদীর জগৎটা বড় সহজ, সরল, একরৈখিক। হয় সাদা, না হয় কালো; হয় ভালো, না হয় মন্দ—এই রকম সাদাসিধে দ্বিমাত্রিক বিচারে তিনি অভ্যস্ত। এর বাইরে চিন্তার আবর্ত তাঁকে ধাঁধায় ফেলে দেয়।

এক মৌলবাদ অন্য মৌলবাদের পুষ্টিসাধন করে। যিনি মৌলবাদী তিনি মনে করেন, তাঁর ব্যাখ্যা যদি মৌলবাদী হয় তাহলে তাঁর প্রতিপক্ষের ব্যাখ্যাও মৌলবাদী এবং তাঁর মৌলবাদ প্রতিপক্ষের মৌলবাদের একটা জবাব মাত্র। এই জবাব না দিলে অপরপক্ষের মৌলবাদ কেবল বেড়েই চলবে। কোনো মৌলবাদীই বিশ্বাস করেন না, মৌলবাদের এই প্রতিযোগিতায় তিনিই প্রথম অবতীর্ণ হয়েছেন। যেহেতু অপরপক্ষের মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সেহেতু তার একটা যোগ্য জবাব দেয়া দরকার। এই যোগ্য জবাব দেবার প্রবণতা সাম্প্রদায়িক আত্মপ্রতিষ্ঠার তৃতীয় ধাপ। যেহেতু যোগ্য জবাব সেহেতু এখানে কোনো অপরাধবোধ নেই। পরে অবশ্য বলবো মৌলবাদী উচ্চমন্যতার কথা।

এই প্রত্যুত্তর দেবার প্রবণতা কখনো কখনো ভয়ংকর আকার ধারণ করে। সওয়াল-জবাবে মৌলবাদের তীব্রতা বেড়েই যায়। সামান্য ঘটনা—যাকে আগে হয়তো খুব সহজেই মিটিয়ে ফেলা যেত—তা এমন আকার ধারণ করে যে

তাকে মিটিয়ে ফেলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এটা দূরদর্শনের সম্প্রচার নিয়ে। ভারতীয় দূরদর্শনের যে প্রতীক তাতে লেখা হয়ঃ 'সত্যম, শিবম, সুন্দরম।' ধর্মনিরপেক্ষতা-রক্ষায় অতিমাত্রায় তৎপর দূরদর্শনের কর্তাদের এতকালের প্রচলিত 'শিবম' কথাটা মনঃপূত হলনা। শিব তো হিন্দুদের দেবতা। তাঁর নাম দূরদর্শনের মতো এক 'ধর্মনিরপেক্ষ' সরকারি মাধ্যমে কি করে স্থান পেতে পারে? দূরদর্শন-কর্তাদের এই 'ধর্ম-নিরপেক্ষতা' আশ্চর্যজনকভাবে মুসলিম মৌলবাদীদের প্ররোচিত করলো। শিব যদি স্থান পান তাহলে সব ধর্মের বিশ্বাসকেই স্থান দিতে হবে। অবাক হবার মতই কথা—তার পর থেকে 'শিবম'-এর জায়গায় 'প্রিয়ম' কথাটা ব্যবহৃত হতে থাকলো। এখানে দুটো বিষয় লক্ষ্য করার মতোঃ এক, শিবকে নির্দ্বিধভাবে হিন্দুদের দেবতা বলার মধ্যে ভারতের ইতিহাস-সম্বন্ধে একধরণের অজ্ঞতা লুকিয়ে আছে। শিব কিভাবে হিন্দুদের দেবতা হয়ে গেলেন তার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। সেও এক সমন্বয়ের ইতিহাস। দুই, 'শিবম' বলতে এখানে হিন্দুদের দেবতাকেই যে বোঝানো হবে—এমন কোনো মানে নেই। 'শিবম'-এর অন্য অর্থ (যেমন, মঙ্গল) সম্ভব। এতসব সমালোচনার মুখে কর্মকর্তাদের টনক নড়লো। তাঁরা আবার ফিরে গেলেন 'সত্যম, শিবম, সুন্দরমে'। কিন্তু, মুসলিম মৌলবাদীরা ক্ষুন্ন হলেন। মৌলবাদ তো একার্থক—একই শব্দের অর্থভিন্নতার সম্ভাবনাকে তা নস্যাৎ করে দেয়।

পূর্বমনোনীত মূলের প্রতি অবিচল আস্থা, অপরপক্ষের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতনতা এবং একই সঙ্গে অপরপক্ষের মৌলবাদের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার প্রবণতা—এই তিনটেই মৌলবাদী আত্মপ্রতিষ্ঠার অপরিহার্য অঙ্গ।

মৌলবাদী উচ্চমন্যতা

ধর্মের প্রস্তাবিত বিচার, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার এবং সংস্কারের যে অংশকে 'মূল' বা গোড়ার কথা বলে মনোনীত করা হল তার উপরে আর কোনো কথা চলেনা। একে লঙ্ঘন করার কোনো উপায় নেই। কোনোরকমের লঙ্ঘন করার চেষ্টা ধর্মদ্রোহিতার নামান্তর বলে গণ্য হয়ে থাকে। কি সেই অদৃশ্য শক্তি যা ধর্মের এই পূর্বমনোনীত 'মূল' অংশকে অলঙ্ঘনীয় করে তোলে? আমি এখানে সেই শক্তির কেবল দুটো উৎসের উল্লেখ করবো। এর বাইরেও অন্য কোনো উৎস থাকতে পারে। কিন্তু, আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা কেবল দুটো উৎসের মধ্যেই আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখব্যো ঃ এই দুর্দমনীয় শক্তির প্রথম উৎস হল একধরণের উচ্চমন্যতা। আমার ধর্মের বোধ-বিশ্বাস, রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার—যাকে আমি 'মৌলিক' বলে ধরে নিয়েছি—তা কেবল অন্য ধর্মের বোধ-বিশ্বাস, রীতি-

নীতি, আচার-সংস্কার থেকে আলাদাই নয়, অনেক অনেক ভালো। নিজের ধর্মের 'মৌলিক' ভিত্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অবিচল বিশ্বাসই মৌলবাদকে টিকিয়ে রাখে। পূর্বোল্লিখিত সাংবাদিক সম্মেলনে দেওরসের একটি মন্তব্য থেকে এই বিশ্বাস যে কত দৃঢ়—তা অনুমান করা যায়ঃ "পশ্চিমী সংস্কৃতির রমরমা অতি দ্রুতহারে বেড়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের কাজ হওয়া উচিত নিজেদের সুমহান সংস্কৃতিকে যাতে ধরে রাখা যায় এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা যায় তার চেষ্টা করা। কেবলমাত্র শক্তিশালী হিন্দু সংগঠনের মাধ্যমেই তা সম্ভব।" দেওরসের মতে, 'আমাদের' সংস্কৃতি 'সুমহান' হলেও অন্য সংস্কৃতির তুলনায় নিজেকে এখনো 'শ্রেষ্ঠ' প্রতিপন্ন করতে পারেনি। নিজেকে 'শ্রেষ্ঠ' প্রতিপন্ন করতে হলে যে 'শক্তিশালী হিন্দু সংগঠনের' দরকার, সেবিষয়ে তাঁর মনে কোনো সংশয় নেই। অর্থাৎ, 'আমাদের সংস্কৃতি' স্বনির্ভরভাবে 'শ্রেষ্ঠ' নয়—কেবল 'শক্তিশালী হিন্দু সংগঠনের' মাধ্যমেই তা শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হতে পারে।

জামাতে ইসলামী হিন্দ-এর সর্বভারতীয় আমীর (সভাপতি) মওলানা সিরাজুল হাসানের সাক্ষাৎকারেও ধরা পড়ে এই আকাশচুম্বী উচ্চমন্যতাঃ "(জামাতের) রুকন (সদস্য) হয়েছিলাম অন্তরে এই পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে যে, ইসলাম মুসলমানদের এবং সমস্ত মানুষের একমাত্র জীবনব্যবস্থা। এতেই তামাম মানব-জাতির কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আর ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সাফল্য এনে দিতে পারে একমাত্র ইসলামই।"[৯] ইসলাম কেবল মুসলমানদের 'জীবন-ব্যবস্থাই' নয়—সমগ্র মানবজাতির 'জীবন-ব্যবস্থা'। এটা যে 'তামাম মানবজাতির' এক আদর্শ 'জীবন-ব্যবস্থা' এ নিয়ে আমীরের মনে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর বিশ্বাস 'পূর্ণ' অর্থাৎ নিশ্ছিদ্র। এছাড়া, ইসলামকে 'একমাত্র' আদর্শ জীবন-ব্যবস্থা বলে ধরে নেয়া হয়েছেঃ 'ইহকালীন এবং পরকালীন জীবনের সাফল্য এনে দিতে পারে একমাত্র ইসলামই।' এই 'একমাত্র' শব্দটা দিয়ে অন্যান্য ধর্মের প্রস্তাবিত 'জীবনব্যবস্থার' উৎকর্ষের দাবি খারিজ হয়ে গেল। ইসলামের যে অপরিহার্য গুণ, সহনশীলতা—যার কথা স্যার সৈয়দ আহমেদ খান বারংবার উল্লেখ করেছেন, তার আর কোন স্থানই রইলো না আমীরের এই বক্তব্যে। গোটা বিশ্বের মঙ্গলসাধন 'একমাত্র' ইসলামেরই মাথাব্যথা—এই বক্তব্য থেকে সেকথাটাই বেরিয়ে এল।

কেবল শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আকাশচুম্বী বিশ্বাসই নয়, সেই শ্রেষ্ঠত্বে যাঁরা অবিশ্বাসী এবং সন্দিগ্ধ তাঁদের শাস্তিবিধানেরও যথাযোগ্য ব্যবস্থা আছে। যাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নন; কিংবা যাঁরা মনে করেন, তাঁর কাছে তাঁর ধর্ম শ্রেষ্ঠ হলেও অন্যের কাছে অন্য ধর্ম শ্রেষ্ঠ—তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত শাস্তির সামাজিক মূল্য ভারতবর্ষের মত দেশে অপরিসীম। অসহনীয় লাঞ্ছনা, সামাজিক বয়কট, একঘরে করে দেয়া—এই সমস্ত শাস্তির খবর আমরা সচরাচর কাগজে পড়ি না। কিন্তু, এর খবর

অনুসন্ধিৎসু গবেষক মাত্রেই রাখেন। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুদণ্ড দেবার কথাও আমরা শুনতে পাই। ফলে, শ্রেষ্ঠত্বের ওপরে সন্দেহ প্রকাশ করলে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হয়। এইভাবে মৌলবাদ-বিরোধী সবরকম শুভবুদ্ধিকে পরাস্ত করা হয়। খালি যে অপরাধীই শাস্তি পায় তা নয়। প্রতিটি শাস্তি-বিধান অন্যের কাছে উদাহরণের মত কাজ করে। ফলে, অপরাধের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা প্রায় থাকেনা বললেই হয়।

মৃত্যুদণ্ডবিধানের চূড়ান্ত উদাহরণ সালমন রুশদির ঘটনা। তাঁর দ্য স্যাটানিক ভার্সেস-কে ইসলাম-বিরোধী আখ্যা দিয়ে ইরানের প্রয়াত আয়াতোল্লা রুহোল্লা খোমেইনি রুশদিকে মৃত্যুদণ্ড দেন। ভারতবর্ষে জন্ম হলেও বর্তমানে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নিয়েছেন এই বিতর্কিত সাহিত্যিক। এক রাষ্ট্রের নাগরিকের ওপরে অপর কোনো রাষ্ট্র শাস্তিবিধান করলে সেই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার ওপরে হস্তক্ষেপ করা হয়। (এই কারণেই অ্যালভিন টফলার বলেছেন; মৌলবাদ আজ সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করেছে।) এছাড়া, বিবেকের কণ্ঠরোধ তো হলই। এই দুটি ব্রিটিশরাষ্ট্র রুশদির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। এই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল—ব্যয়ভার মেটাতে সংকটাপন্ন ব্রিটিশ অর্থনীতির নাভিশ্বাস অবস্থা। কিন্তু, এতৎসত্ত্বেও নীতিগত কারণে এলাহি নিরাপত্তার আয়োজন করা হয়েছে। আজ অব্দি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা অব্যাহত থাকলেও তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। দ্য স্যাটানিক ভার্সেস প্রকাশিত হবার প্রায় অব্যবহিত পরেই আয়াতোল্লা খোমেইনি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা জারি করেন। আর সেই সময়েই তিনি দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা প্রাচীরের আড়ালে চলে যেতে বাধ্য হন। লোকচক্ষুর অন্তরালে যাবার আগে যে সমস্ত সাক্ষাৎকার তিনি দেন তার প্রতিটিতেই তিনি ঘোষণা করেন, 'তাঁর কোন ধর্ম নেই।' স্বভাবতই এই বিবৃতির ফলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ে। এরপর থেকেই অবশ্য সালমন রুশদির সুর নরম হতে থাকে। ইসলামকে 'অবমাননার' জন্যে তিনি প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ধীরে ধীরে মুসলিম মৌলবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। নিরাপত্তা-বেষ্টনীর আড়ালে থাকতে থাকতে তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন ; তাঁর সামাজিক জীবন নষ্ট হতে চলেছে। এছাড়া তাঁর কিছু কিছু দুর্ভাগ্য-জনক ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিও ঘটতে থাকে। এই কারণে তাঁর স্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেন। কাজেই, আয়াতোল্লা খোমেইনি যে তাঁর সামাজিক জীবনের ইতি ঘটিয়ে দিতে পেরেছেন তা খুব সত্যি কথা। এদিক থেকে দেখলে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা সম্পূর্ণ সার্থক। প্রাণে না মরলেও তাঁর সামাজিক জীবনের এক রকম পরিসমাপ্তি ঘটেছে। স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকারটুকুও তাঁর নেই। চাপের মুখে রুশদি আবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। মিশরের 'সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর এনডাওমেন্ট' মহম্মদ আলি

মাহগোবের নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম পণ্ডিত-সমাজের কাছে এক লিখিত বিবৃতিতে তিনি বলেন: "আমার উপন্যাস দ্য স্যাটানিক ভার্সেস-এ যে সমস্ত চরিত্র প্রেরিত পুরুষ মহম্মদকে অপমান করেছে বা ইসলামের মর্যাদাহানি করেছে কিংবা পবিত্র কোরাণের গ্রহণযোগ্যতা বা আল্লাহর ঈশ্বরত্বকে নস্যাৎ করেছে তাদের কোন বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই।" বলা বাহুল্য, এই বক্তব্য পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে রুশদির বিদ্রোহী-সত্তার মৃত্যু ঘটেছে। ইংল্যান্ডের নরমপন্থী সংগঠন 'সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশন অফ রিলিজিয়াস টলারেন্স'-এর তরফ থেকে প্রকাশিত এক বক্তব্যে রুশদি প্রতিজ্ঞা করে বলেন: "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ঈশ্বর নেই এবং মহম্মদই হলেন তাঁর শেষ প্রেরিত পুরুষ।" (আমীর-এ-জামাত-এর বক্তব্যের সঙ্গে রুশদির এই বক্তব্যের কোন পার্থক্য নেই।) ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে তিনি দ্য স্যাটানিক ভার্সেস-এর সুলভ (পেপারব্যাক) সংস্করণ বা অনুবাদ যাতে আর না বেরোয় তার ব্যবস্থা করবেন বলে কথা দেন।[10] যে অবিস্মরণীয় তীব্রতায় তিনি একদিন নিজেকে গোটা বিশ্বের কাছে 'ধর্মহীন' বলে ঘোষণা করেছিলেন তার তলানিটুকুও এইসব বক্তব্যে নেই।

নিজের ধর্মের 'মৌলিক' বক্তব্যের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস একজন মৌলবাদীকে বাইরের জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। যে কোন মৌলবাদীই এক অদ্ভুত উচ্চমন্যতার শিকার হন। এই উচ্চমন্যতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে অন্যেকে দোষারোপের পালা। নিজের মন্দভাগ্যের কারণ নিজে নই, অন্য কেউ—এই বোধ যেমন আমাদের আত্মতুষ্টি যোগায় তেমনি অন্যের প্রতি বৈরিতার ভাব এনে দেয়। আবার এটাও ঠিক, এই আত্মতুষ্টি ছাড়া আমরা কেউই বাঁচতে পারি না। নিজেকে সমালোচনা করে নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত করা আমাদের ধাতে সয় না: 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে)'? এই আত্মতুষ্টিই কোনো সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর প্রবণতা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও যেমন সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রেও তেমনি। এক সম্প্রদায় অন্য আর এক সম্প্রদায়ের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে। হিন্দুদের মন্দভাগ্যের কারণ মুসলমানরা—এতো আকছারই ধরে নেয়া হয়। পাকিস্তান হয়ে যাবার পরেও মুসলমানরা কেন ভারতবর্ষে থাকবে? ওরা এসে 'আমাদের' সমৃদ্ধিতে ভাগ বসাবে কেন? 'তুমি মুসলমান অতএব পাকিস্তানে চলে যাও—ভারতবর্ষ তোমার দেশ নয়।' শ্রীসন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি—কলকাতায় (ডিসেম্বর, ১৯৯২) দাঙ্গার পরে 'অপরাধী' মুসলমানদের হাজতে রেখে পুলিশ পাকিস্তানে চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছে। এছাড়া অনেকের দাড়ি ছিঁড়ে দিয়েছে, 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করেছে। গত ৬ই ডিসেম্বর (১৯৯২) অযোধ্যায় সেই বিতর্কিত স্থানে

যে উন্মত্ত 'করসেবকরা' জড়ো হয়েছিল তারা যে স্লোগান তুলেছিল তাও বেশ চমকপ্রদ : "হারাম কো মিটানা হ্যায় / কুমার মেঁ লুঙ্গি, মুঁহ মেঁ পান / ভাগাও সালেকো পাকিস্তান / নরসিংহ রাও কাটুয়া হ্যায়।"[১১] আমার এক মুসলমান সহকর্মী ঠাট্টা করে আমায় বলেছিলেন : 'আচ্ছা, আপনারা আমাদের পাকিস্তানে পাঠাতে চান কেন ? কই, আরো তো অনেক মুসলিম দেশ আছে। সৌদি আরব আছে, কুয়েত আছে। সে সমস্ত দেশের অবস্থা তো পাকিস্তানের চেয়ে ভালো। আমরাও সেখানে যেতে পারলে বর্তে যাই।' এই একই ঘটনার একটা উল্টো দিকও আছে। ভারতবর্ষটা আর যারই হক, মুসলমানদের দেশ নয়—সেটা আমরা এখন নির্বিবাদে মেনে নিই। বিজয়কুমার মালহোত্রের ভাষায়, ভারতবর্ষটা 'তাঁদের (হিন্দুদের) নিজেদের দেশ' ('দেয়ার ওন কানট্রি')। অন্যদিকে মুসলিম মৌলবাদীরা দুটো গোষ্ঠীকে দোষারোপ করেন—বিধর্মীবাদের এবং ধর্মত্যাগী মুসলিম। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আবার দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে প্রথমটির তুলনায় অনেক বেশি বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়। কাজেই, এই দুই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 'জিহাদ' ঘোষণা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।[১২]

আমাদের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যাঁরা শরনার্থী হয়ে এসেছেন তাঁরাই পশ্চিমবঙ্গকে ডুবিয়েছেন—এমন কথা আমরা অর্থাৎ এদেশীয় ঘটিরা অনেকেই মনে করি। এর আগে আমাদের দেশ যেন স্বপ্নের দেশ ছিল। এরপরে যাকিছু বিপর্যয় ঘটলো তার সব কিছুর জন্যে প্রত্যাগত শরণার্থীরা দায়ী। বলা বাহুল্য, তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ / পূর্বপাকিস্তান থেকে যাঁরা শরণার্থী হয়ে এদেশে এসেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ।[১৩] ইদানীং অবশ্য অনেক মুসলমানও আসছেন। একদিকে আমরা মুসলমানদের ভারত-ছাড়া করতে চাই; অন্যদিকে প্রত্যাগত হিন্দুদের দায়ভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করি—এই সুবিধাবাদই আমাদের মৌলবাদী মনের যথাযথ প্রতিফলন। তবে, বিজেপি অবশ্য তাদের ইস্তাহারে হিন্দু শরণার্থী এবং প্রত্যাগত মুসলমানদের মধ্যে একটা পার্থক্য নির্দেশ করেছে। প্রত্যাগত মুসলমানরা 'শরনার্থী' নন-ভারতবর্ষে তাঁরা বিদেশি, অবাঞ্ছিত, 'অনুপ্রবেশকারী'। হিন্দুরা যেহেতু প্রকৃত 'শরণার্থী' সেহেতু তাঁদেরকে বরণ করে নিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। অথচ তাঁদের ব্যাপারে কোনোরকম কার্যকরব ব্যবস্থা রাষ্ট্রের তরফে নেয়া হচ্ছে না। এটাই বড় আফসোসের বিষয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইস্তাহারটি মন্তব্য করেছে : "আজকে পশ্চিমবঙ্গ—বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ চোরাপথে ভারতে ঢুকছে। এদের মধ্যে হিন্দু শরণার্থী আছেন—যাঁদের ধর্ম, প্রাণ, নারী এবং সম্পত্তি আজ ইসলামী বাংলায় বিপন্ন। আর

আছে প্রচুর মুসলমান অনুপ্রবেশকারী—যারা শুধু অর্থনৈতিক কারণে এবং রাজনৈতিক কুচক্রান্তে এই বেকার-সমস্যা সংকুল ভারতে ঢুকছে, ভারতীয় মানুষের চাকরির সুযোগ আরো কমিয়ে দিয়ে। হিন্দু শরণার্থীদের ব্যাপারে কংগ্রেস বা সি পি এম উৎসাহী নয়—কারণ এরা সব ভাগ হয়ে ভোট দেয়। এজন্য এদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে না। উল্টে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি এবং অন্য নানারকম কূটতর্ক তুলে এদের আবার বাংলাদেশী বাঘের মুখে ঠেলে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা কিন্তু কংগ্রেস ও সি পি এমের নয়নের মণি। কারণ এরা একজোট হয়ে ভোট দেয়।'[১৪] এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় বিজেপির সমবেদনা কাদের দিকে—মুসলমান 'অনুপ্রবেশকারীদের' দিকে না হিন্দু 'শরণার্থীদের' দিকে।

মৌলবাদী উচ্চমন্যতার একটা অবশ্যম্ভাবী ফল হল, নিজের আদলে পৃথিবীটাকে বদলে নেবার অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারের দুটো দিক আছে। এই দুটো দিকের মধ্যে কোনো রকমের দ্বন্দ্ব নেই। আমাদের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে এদের একটার সঙ্গে আর একটার ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস অন্যের সঙ্গে নিজেকে কখনোই সমন্বিত হতে শেখায় না। বরং একপ্রকার ব্যবধান রচনা করে। একজন মৌলবাদীর কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল, আপন শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান বজায় রাখতে পারা। সেই অভিমান বজায় থাকতে পারে যদি অন্যের থেকে নিজের ব্যবধান বহাল করা যায়। সুতরাং, অন্যের সঙ্গে মেলামেশা, আদান-প্রদান, গলাগলি—একজন মৌলবাদীর অভিপ্রেত হতে পারে না। তিনি সব সময়ে অন্যের সংসর্গ এড়িয়ে চলতে চাইবেন এবং সেই পরামর্শ দেবেন। হিন্দু এবং শিখদের মধ্যে কিছুদিন আগে অব্দিও তেমন কিছু ব্যবধান ছিল না যার দ্বারা সাম্প্রদায়িক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। ধর্মচর্চার ব্যাপারে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য যে কিছু চোখে পড়ে না তার কথা অনেক সমাজতাত্ত্বিকই উল্লেখ করেছেন। যা কিছু পার্থক্য—তা কেবল বাইরের চেহারায়। খুশবন্ত সিং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঠাট্টার ভঙ্গীতে বলেছিলেন, শিখরা আসলে 'দাড়িওয়ালা হিন্দু' ছাড়া আর কিছু নন। ঐ চুল ও দাড়ি রাখা ছাড়া আর কোন ব্যাপারে হিন্দু ও শিখদের মধ্যে কোন অমিল নেই। এর একটা ফল ছিল, হিন্দু এবং শিখদের মধ্যে বিয়ে। ইদানীং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। ব্যাপারটা যে কোনোরকমের কারণ ছাড়াই ঘটছে—তা মনে হয় না। আসলে, সাম্প্রতিক-কালে উপর্যুপরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখ সম্পর্কে কোথায় যেন চিড় খেয়েছে—যার ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের সীমারেখা হঠাৎ করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর তারই একটা প্রতিফলন ঘটেছে ক্রমহ্রাসমান আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক বিয়ের ক্ষেত্রে। যে বিবাহ-বন্ধন তাঁদের

মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদানের অবাধ সুযোগ করে দিয়েছিল তাতে সন্দেহের মেঘ এসে জমেছে। একে অপরের সংসর্গ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়ঃ বলে মনে করছেন।

আমার ধর্ম অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—একজন মৌলবাদী কেবল এটা প্রমাণ করেই ক্ষান্ত হন না। বরং আমার ধর্ম যেহেতু অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেহেতু অন্যেও আমার মতো হবার চেষ্টা করবে। আমি হব অন্যের অনুকরণের বস্তু। আমি বদলাবো না; অন্যেরা তাদের আমার আদলে বদলে নেবে। বলা বাহুল্য, অন্যের অনুকরণের বস্তু হতে গেলে যে সততা, অধ্যবসায় আর অনুশীলনের দরকার তার কোন ব্যাপারই নেই। স্রেফ ধরে নেয়া হল, আমি শ্রেষ্ঠ। এ যেন এক স্বতঃসিদ্ধ। আর যেহেতু আমি শ্রেষ্ঠ, সেহেতু অন্যেরাও আমার মত হবার চেষ্টা করবে। সার্থক অনুকরণের ফলে শ্রেষ্ঠত্বের ব্যবধান যায় ঘুচে—এরকম অবস্থায় মৌলবাদ তো টিকে থাকতে পারে না। যতটা অনুকরণ করলে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান খর্ব হয় না ঠিক ততটা অনুকরণকেই স্বীকৃতি দেয়া হয়। তার বেশি হলে আবার চলবে না। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। বহুকাল আগে অগ্রগণ্য সমাজ-নৃতাত্ত্বিক নির্মলকুমার বসু ভারতবর্ষের উপজাতিদের মধ্যে ক্রমশঃ হিন্দু হয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন। এই প্রবণতাকে তিনি 'হিন্দুভবন' ('হিন্দুআইজেশন') বলে অভিহিত করেন। উপজাতিরা দল বেঁধে হিন্দু হয়ে যাচ্ছেন (যেমন, কুর্মিরা) মানে তো আর এই নয় যে তাঁরা হিন্দুসমাজের ওপরতলার ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছেন। বরং, হিন্দুসমাজের নিচুতলায় প্রায় অচ্ছুৎ করেই তাঁদের এতকাল রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা চাই তাঁরা আমাদের মত হবার চেষ্টা করুন—কিন্তু, তাঁরা যেন ঠিক 'আমরা'ই (অর্থাৎ, সমাজের বর্ণহিন্দু অন্তর্গোষ্ঠী) না হয়ে ওঠেন। আমাদের মত, কিন্তু, 'আমরা' নয়—মৌলবাদের এই জটিল মনস্তত্ত্ব খুব সহজেই নজরে পড়বে।

একজন মৌলবাদী কিভাবে অন্যের অনুকরণের বস্তু হতে পারেন? কি করেই বা তিনি অন্যকে অনুকরণে বাধ্য করতে পারেন? প্রথমেই বলে নেয়া দরকার, অন্যকে অনুকরণে বাধ্য করতে একজন মৌলবাদী হিংসার আশ্রয় নিতে পারেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পেছনে মৌলবাদ-সুলভ শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান লুকিয়ে থাকতে পারে। তবে, সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই এই শ্রেষ্ঠত্ব-জনিত অভিমানের ফল—এমন কথা বলা যাবে না। এক ধরনের নিরাপত্তার অভাব এবং হীনমন্যতা থেকেও দাঙ্গা বাঁধতে পারে। থাক সে কথা। আমরা তো আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে আলোচনা করছি না। বরং মৌলবাদী শ্রেষ্ঠত্ববোধ কিভাবে দাঙ্গার স্ফুলিঙ্গে পরিণত হয় সেকথাই বলার চেষ্টা করবো। নোয়াখালির (১৯৪৬) সেই ভয়াবহ দাঙ্গার স্মৃতি আমাদের মন থেকে মুছে যাবার নয়। তৎকালীন রিপোর্টে দেখেছি, নোয়াখালিতে

মুসলমানরা হিন্দুদের লুঙ্গি পরতে বাধ্য করেছে। আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত দাবি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু, অমুসলমানদের লুঙ্গি পরাবার মধ্যে 'লুঙ্গিই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পোশাক'—এই অনুমান নিশ্চয়ই কাজ করেছিল। অনেক বাঙালি হিন্দু লুঙ্গি পরতে পছন্দ করেন, এতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। সুট-বুটের তুলনায় লুঙ্গিতে আরামও অনেক। কিন্তু, কেউ যদি সেই লুঙ্গিই পরতে বাধ্য করেন তবে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যায়। তখন বাঙালি হিন্দু এত আরাম সত্ত্বেও নিয়ম করেই লুঙ্গি বর্জন করেন। আর তা থেকেই অশান্তির সূত্রপাত।

যাঁরা অনুকরন করতে রাজী হবেন না তাঁদের শত্রু বলে চিহ্নিত করা হবে। তাঁদের সঙ্গে আর সহবাস নয়। তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হবে। অর্থাৎ, এখানে ভাবটা হল : 'অপরপক্ষের উমেদারি করে থাকতে পারলে থাকো—নচেৎ দেশ ছেড়ে চলে যাও।' সাম্প্রতিক এক নির্বাচনী বক্তৃতায় বাল থ্যাকারে যা বলেছেন, তার মর্মার্থ অনেকটা একইরকম : "হিন্দুস্তানে মুসলমানদের থাকতে হলে হিন্দুরা যেমনটি চায় তেমনিভাবে থাকতে হবে। না পোষালে তারা চলে যেতে পারে পাকিস্তানে। যদি যাবার সঙ্গতি না থাকে তো হিন্দুরা চাঁদা তুলে টাকা যোগাড় করে দিতে পারে।" মুসলমানদের ভারতবর্ষ ছাড়া করতে হিন্দুদের এই মহানুভবতা আসলে মৌলবাদের এক নির্লজ্জ রূপ। অপরপক্ষকে আর দেশান্তরী করতে হয় না। অনেক সময়ে স্রেফ দেশান্তরিত করার ভয় দেখিয়েই কাজ হয়। ভক্তিতে নয়—ভয়েই অন্যের সুরে সুর মিলিয়ে চলেন অপরপক্ষ, বিশেষতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

কার্ল মার্কস বলেছিলেন : পুঁজিবাদ নিজের আদলে একটা পৃথিবী তৈরি করে ('ক্যাপিটালিজম ক্রিয়েটস এ ওয়ার্লড আফটার ইটস ওন ইমেজ')। প্রাক-পুঁজিবাদী বা পুঁজিবাদ-বিরোধী কোনো কিছুই তা থাকতে দেয় না। পৃথিবীকে বৈচিত্র্যহীন এবং একঘেয়ে করে ফেলতে পুঁজিবাদের কোনো জুড়ি নেই। কিন্তু, এতো মৌলবাদেরও মনের কথা। নিজের শ্রেষ্ঠত্ববোধ একসময়ে দিশ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গোটা পৃথিবীকে নিজের আদলে বদলে ফেলার আত্মঘাতী লড়াইয়ে মেতে ওঠে। 'জিহাদ' এবং 'ক্রুসেড' সেই লড়াইয়ের দুটো নাম। অবশ্য এ ব্যাপারে পুঁজিবাদ আর মৌলবাদের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। পৃথিবীর ইতিহাসের এই সংকটময় মুহূর্তে পুঁজিবাদকে সাফল্যের সঙ্গে রোখার মত কোনো প্রতিবাদী শক্তি নেই। আজকের পুঁজিবাদ যেন ফাঁকামাঠে গোল দিয়ে বেড়াচ্ছে। অন্যদিকে, এক মৌলবাদের জবাব আর এক মৌলবাদ। ফলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটা সম্ভাবনা থাকে। কাজেই, পৃথিবীকে নিজের আদলে বদলে ফেলার অঙ্গীকার মৌলবাদের কাছে নিছক স্বপ্নই থেকে

যায়। তবে, স্বপ্ন হলেও এ এমন এক স্বপ্ন যার আকর্ষণ দুর্নিবার। এই অসম্ভব স্বপ্নের আকর্ষণে প্রাণ হারিয়ে শহীদের মৃত্যু বরণ করে নেয়ার মধ্যেও জয়ের গৌরব লুকিয়ে আছে।

সামাজিক পরিবর্তন এবং নির্মাণ

মৌলবাদ এবং সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে যে একটা ঝগড়া আছে—সে তো বলাই বাহুল্য। এককথায় বলতে গেলে, মৌলবাদ সামাজিক পরিবর্তনের বিরোধী। আমাদের চারপাশে অহরহ যে পরিবর্তন হচ্ছে—সমাজ, রুচি, মূল্যবোধ অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বদলে যাচ্ছে—তার প্রতি বৃহদাঙ্গুষ্ঠ দেখানোই মৌলবাদের কাজ। মৌলবাদ এবং সামাজিক পরিবর্তনের যে ঝগড়ার কথা বলছি তার একটা চূড়ান্ত উদাহরণ এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। গ্যালিলেও-র সূর্যকেন্দ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞান যেমন বিজ্ঞানের জগতে এক বিপ্লব ঘটিয়েছে তেমনি সামাজিক জগতেও এনেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। এর ফলে, অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের রাজ্য থেকে আমাদের চিন্তার বন্ধনমুক্তি ঘটেছে। এই পরিবর্তনের কাজটা অবশ্য সহজে হয়নি। আমরা এখানে তার সামাজিক ইতিহাস বর্ণনা করতে আগ্রহী নই। এই পরিবর্তনের সূচনা করে গ্যালিলেও-কে অনেক ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি বরণ করে নিতে হয়েছিল—তাও আমাদের সকলের জানা আছে। খ্রীষ্টানদের মক্কা বলে যাকে গণ্য করা হয়, সেই ভ্যাটিকান গির্জা কিন্তু এত পরিবর্তন সত্ত্বেও গ্যালিলেওর সূর্যকেন্দ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানকে এতকাল স্বীকৃতি দেয়নি। এই স্বীকৃতি মিললো এবছর—অর্থাৎ, ১৯৯৩ সালে। তা বলে কি আর পৃথিবী এতকাল সূর্যের চারদিকে ঘুরতো না? ভ্যাটিকান গির্জার চোখে কিন্তু পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরতে শুরু করলো এই স্বীকৃতি দেবার পর থেকেই। আমরা বলতে পারি, এই পরিবর্তনের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রাখাই মৌলবাদের অন্যতম বিশেষত্ব। যাকে ধর্মের 'মৌলিক' অংশ বলে মনোনীত করা হয়েছে তার কোন ব্যত্যয় অকল্পনীয়।

মৌলবাদের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের যে ঝগড়ার কথা বলেছি তার দুটো দিক আছে। নেতিবাচক দিকটা নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। খুব হালের এক লেখায় 'গুরু গোবিন্দ ফাউন্ডেশন'-এর সাধারণ সম্পাদক অগ্রণী বুদ্ধিজীবী জসবির সিং আলুওয়ালিয়া বলেছেন, "মৌলবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'বাস্তবের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নিতে পারার অক্ষমতা।'"[১৫] নানা ঐতিহাসিক কারণেই এই 'অক্ষমতা' দেখা দিতে পারে। আর এই 'অক্ষমতার' ইতিবাচক দিক হল, এর ফলে এক '(ধর্মীয়) সম্প্রদায় তার ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক অতীতে ফিরে যায়।" এই পশ্চাৎমুখীনতা

মৌলবাদের অপরিহার্য অঙ্গ। স্থান-কাল-পাত্রকে অগ্রাহ্য করে মৌলবাদ একটা সম্প্রদায়কে তার অতীত গর্বে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।

বাস্তবের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারাটাকে শ্রী আলুওয়ালিয়া 'অক্ষমতা' বলে অভিহিত করেছেন। আমি একে 'অক্ষমতা' না বলে 'ক্ষমতা' বলতে চাই। আমরা ঠিক কতজন এই বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের ঝড়-ঝাপটা থেকে নিজেদের আগলে রাখতে পারি? সেই রাখতে পারাটাও একটা 'ক্ষমতার' ব্যাপার। পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশের ফলে এক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আর এক জনগোষ্ঠীর, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সম্প্রদায়ের ব্যবধান হ্রাস পায়। সকলেই এক অখণ্ড জাতীয় বা বলা ভালো, আন্তর্জাতিক বাজারের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এর ফলে, মানুষের সাম্প্রদায়িক সত্তা ভেঙে যেতে থাকে বাজারের চোখে প্রত্যেকেই হয় ক্রেতা না হয় বিক্রেতা — এখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদের স্থান নেই। ফলে, মানুষের সাম্প্রদায়িক পরিচয় ক্রমশঃ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। মৌলবাদ কিভাবে এই যুগান্তকারী এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ঝড়-ঝাপটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে দিকে দিকে তার মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে—তা সত্যিই খুব বিস্ময়কর। এর একটা সাদামাটা উত্তর আমরা আগেই দিয়েছি।

মৌলবাদ কিভাবে বিশ্বব্যাপী সামাজিক পরিবর্তনের ঝড়-ঝাপটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়? এর দুটো সম্ভাব্য উত্তর আছে। অনেক সময়ে দুটো উত্তর একসঙ্গে মিলে যেতে পারে: প্রথমতঃ, মৌলবাদ কিছু ধর্মগ্রন্থকে বা ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশকে 'মূল' বলে ধরে নেয়। তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার ওপরে আর কোন প্রশ্ন চলে না। অতএব, তা শিরোধার্য। খ্রিষ্টানদের যেমন দ্য বাইবেল, মুসলমানদের আল কোরাণ, শিখদের তেমনি গুরু গ্রন্থসাহেব। মীমাংসকরা বেদ-প্রামাণ্যের কথা বললেও ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারটা গোলমেলে। এখানে নানা কারণেই কোনো একটা শিরোধার্য ধর্মগ্রন্থ নেই, অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ আছে। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেবল সামঞ্জস্যের—এমন ভাবা বাতুলতা। (এগুলো সব মিলিয়ে অবশ্য রোমিলা থাপারের ভাষায়, 'একটা আলোচনার সাধারণ কাঠামো' বা 'কমন ফ্রেমওয়ার্ক অফ ডিসকোর্স' গড়ে উঠেছে। কিন্তু, তার মানে এই নয় যে এদের মধ্যে হুবহু সামঞ্জস্য আছে।) এইরকম অবস্থায় মীমাংসকদের (বা, আর্যসমাজীদের) মতো বেদের প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টার মধ্যে একধরনের মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গী লুকিয়ে আছে। অন্য ধর্মগ্রন্থগুলোর দাবিকে নস্যাৎ করার মধ্যে মৌলবাদী অসহনশীলতার ছাপও স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। 'সেমিটিক' ধর্মের দস্তুর অনুযায়ী প্রতিযোগী ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রামাণিকতা অগ্রাহ্য করাকে অনেকে হিন্দুধর্মের 'সেমেটীয়করণ' ('সেমিটাই-জেশন অফ রিলিজিয়ন') বলে অভিহিত করেছেন। কোন এক ধর্মগ্রন্থকে

শিরোধার্য হিসেবে ধরে নেয়ার আর একটা দিক হল, সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি উদাসীন থাকা।

এই ঔদাসীন্যের আর একটা কারণ আছে বলে মনে করা হয়—যা একটু বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। মস্কোর প্রগতি প্রকাশন থেকে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত এক অভিধানে মৌলবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধর্মগ্রন্থের 'আক্ষরিকতার' ওপরে জোর দেয়া হয়েছে। ধর্মগ্রন্থে যা আছে, লোকাচারে যা আছে, যাকে 'মৌলিক' অংশ বলে মনোনীত করা হয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এর কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। আক্ষরিকতা বলতে এই ব্যতিক্রমহীনতাকে বোঝানো হয়েছে। এর পাশাপাশি বলা হয়েছে, ধর্মগ্রন্থ এবং লোকাচারে যা আছে তার যে অন্য কোন অর্থ থাকতে পারে (যেমন, নিহিতার্থ বা 'অ্যালিগরিক্যাল মিনিং') মৌলবাদ তার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে।[১৬] আমরা আগেই মৌলবাদের একার্থকতার কথা বলেছি। এই ব্যতিক্রমহীনতা, একার্থকতা এবং আক্ষরিকতার থেকে জন্ম নেয় একধরণের গোঁড়ামি যা মৌলবাদীদের চোখে ঠুলি পরিয়ে দেয়। এই ঠুলিই সামাজিক পরিবর্তনের বাস্তব চাহিদা থেকে তাঁদের দৃষ্টিকে সরিয়ে নেয়।

কথাটা অবশ্য সবসময়ে ঠিক নয়। মৌলবাদীরা 'মূল'-এর নিহিতার্থ অনুধাবনে অসমর্থ—একথা আমার মনে হয় না। আক্ষরিক অর্থ ধরে বসে থেকে পরিবর্তনের বিরোধিতাই কেবল মৌলবাদের বিশেষত্ব নয় ; নিহিতার্থ আবিষ্কার / নির্মাণ করে নিত্য-নতুন পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেয়াও মৌলবাদের ইতিহাসে বিরল নয়। এই নিহিতার্থ এমনভাবেই নির্মাণ করা হয় যাতে পরিবর্তনকে আর পরিবর্তন বলে মালুম হয় না। মৌলবাদীরাও স্বস্তিবোধ করেন ; আমাদের মত বুদ্ধিজীবীরাও বেকুব বনে যান। আমরা ভাবি, মৌলবাদে মনোনীত 'মূল'-ও যেমন অপরিবর্তনীয়, তেমনি সামাজিক পরিবর্তনেরও কোনো স্বীকৃতি নেই। আসলে আমরা ধোঁকা খাই। মৌলবাদের যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। মৌলবাদ পশ্চাৎমুখী, প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রগতিবিরোধী—চট করে এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই। আমরা একবারও কি অনুসন্ধান করি—কি সেই 'ক্ষমতা' যা দ্রুত এবং শক্তিশালী সামাজিক পরিবর্তনের হাত থেকে মৌলবাদকে বাঁচাতে পেরেছে বা আমাদের অগোচরে মৌলবাদের প্রকৃতিতে রূপান্তর ঘটিয়েছে? ধর্মগ্রন্থ এবং লোকাচারের নিহিতার্থ নির্মাণ করে পরিবর্তনের সঙ্গে মৌলবাদ এমনভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে যে, পরিবর্তনকে আর পরিবর্তন বলে মনে হয় না। মনে হয়, সময় যেন থেমে আছে।

এই নিহিতার্থের নির্মাণ পরিবর্তনের প্রতি নৈতিক বা আর একটু বৃহত্তর অর্থে বলতে গেলে, বৌদ্ধিক সমর্থন জানায়। এই সমর্থন পেয়ে মৌলবাদীরা আশ্বস্ত হন। নিজেদের ক্রমাগত আশ্বস্ত করার ফলে তাঁদের মনের জোর

বেড়ে যায়। দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁরা কাজে নামেন। ৬ই ডিসেম্বরের (১৯৯২) ঘটনা সমস্ত সচেতন ভারতবাসীর মুখে চুনকালি ঢেলে দিয়েছে। ঘটনা এতই আকস্মিক যে এর অব্যবহিত পরেই বিজেপিও যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। দলের বিভিন্ন মহল থেকে পরস্পরবিরোধী বিবৃতি প্রকাশিত হতে থাকে। সংঘ পরিবার কোনোক্রমেই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়—পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে একথা জানান বালাসাহেব দেওরস। বরং স্বয়ংসেবকরা উন্মত্ত জনতাকে নিরস্তই করতে চেয়েছিলেন। তাহলে, এইরকম একটা ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও তাঁদের কেউ নিন্দা করলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি-র সর্বভারতীয় নেতা শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী এক গল্প শুনিয়েছিলেন। গল্পটা ছিল এইরকম: অশোকবনে রাবণের হাতে সীতার কল্পনাতীত লাঞ্ছনার কথা যখন রামভক্ত হনুমান শুনেছিলেন, তখন তিনি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেন নি। লেজের আগুনে স্বর্ণলংকা ছারখার করে দিয়েছিলেন। নগরে অগ্নিসংযোগ আপাতদৃষ্টিতে সমর্থনীয় কাজ নয়। এই ঘটনা শোনার পর তাঁর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তো তাঁর নিন্দা করেন নি। নগরে অগ্নিসংযোগ করে প্রাণ এবং সম্পত্তিনাশ যে অনৈতিক তা নৈতিকতার মূর্ত প্রতীক শ্রীরামচন্দ্র কি জানতেন না? আসলে এই বর্বরোচিত কাজের জন্যে কিন্তু সেই পবিত্র ধর্মগ্রন্থেরই শরণাপন্ন হতে হল; এই গল্পের মাধ্যমে সেই ধর্মগ্রন্থ থেকেই নিহিতার্থ নির্মাণ করে সমর্থন আদায় করা হল। ফলে, মৌলবাদীর মনে পাপবোধের লেশমাত্র রইলো না। সাধারণ মানুষের বোঝার কথা নয়; আসল রামায়ণে কি আছে না আছে—আমরাই বা কজন তার খবর রাখি! আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও কিন্তু দুটো ঘটনা হুবহু এক নয়। এর একটাই উদাহরণ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। হনুমান যখন লেজের আগুনে স্বর্ণলংকা ছারখার করলেন তখন শ্রীরামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। অর্থাৎ, তিনি প্রত্যক্ষদর্শী নন। কিন্তু, ৬ই ডিসেম্বরের অযোধ্যায় সংঘ পরিবারের প্রায় সব কজন প্রথম সারির নেতার নাকের ডগাতে এই ঘটনা ঘটে যায়। শুধু তাই নয়। মসজিদ/সৌধ ভেঙে যাবার পরে মুরলী মনোহর যোশী এবং উমা ভারতীর আনন্দ প্রকাশের ছবি আগ্রার একটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে অবশ্য তা দ্য স্টেটসম্যানেও প্রকাশিত হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, সেই উন্মত্ত আনন্দ-প্রকাশ খুব শ্লীলতার পরিচায়ক ছিল না। যাই হোক, এই ছিল দুটো ঘটনার মধ্যে তফাৎ। এর নৈতিক দায়িত্ব সংঘ পরিবারের নেতারা কিভাবে এড়াবেন?

একজন মৌলবাদী দুই ভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া দুটো ঘটনার মধ্যে একদম তফাৎ করতে নারাজ। তিনি ঘটনার পৌনঃপুনিকতায় বিশ্বাস করেন। যাঁরা এরকম বিশ্বাস করেন তাঁদের চেতনা আর যাই হোক ঐতিহাসিক বলা চলে না। সমাজতত্ত্বের ভাষায় একে আমরা 'পূর্বস্বীকৃত ধারণা' ('ইডীফিক্সে') বলতে

পারি। যা কিছু বর্তমানে ঘটছে তা অতীত কোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি—এমন ধারণার দুটো মারাত্মক প্রতিফল আছে। প্রথম প্রতিফল হল, বর্তমান কেবল অতীতেরই হুবহু নকল—এমন অনুমান আসলে বর্তমানের নতুনত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে না। এর একটা উদাহরণ দেয়া দরকার। সুধীর কাকার ইদানীং শিখদের সমষ্টিগত মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছেন।[১৭] তিনি বলেছেন: ১৯৮৪-র 'অপারেশন ব্লুস্টারের' পরে স্বর্ণমন্দিরে আগত প্রায় প্রতিটি শিখ তীর্থযাত্রীই মনে করতেন, স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্র আর মোগলযুগের রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ আজকের রাষ্ট্রও সেই মোগলযুগের রাষ্ট্রের মত অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর থেকে একজন শিখ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা খুব উদ্বেগজনক। মোগলযুগের অত্যাচারী রাষ্ট্রের যোগ্য প্রত্যুত্তর ছিল 'খালসা যোদ্ধার' অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ। ঠিক তেমনি আজকের ভারতরাষ্ট্রের মোকাবিলা করতে গেলে সেই 'খালসা যোদ্ধার' উদ্বোধন ঘটানো দরকার। বিধ্বস্ত অকাল তখত দেখে শিখ মহিলারা তাঁদের ভাবাবেগ সংবরণ করতে পারতেন না। তাঁদের সঙ্গী পুরুষদের উদ্দেশে বলেছেন: 'তোমাদের দাড়ির জোর গেল কোথায়?' ('হোয়্যার ইজ দ্য স্টার্চ ইন ইওর মুসটাস?') এই প্রশ্ন কেবল প্রশ্ন নয়—'খালসা যোদ্ধার' উদ্বোধনমন্ত্র। যা কিছু বর্তমানে চোখের সামনে ঘটছে তাকে সহজলভ্য আদিরূপের ('আর্কিটাইপ') সাহায্যে ব্যাখ্যা করলে বর্তমান তার নতুনত্ব হারায়।

বর্তমানের ঘটনাগুলোকে অতীতের ছকে প্রক্ষেপ করলে অতীতের যত উদ্বেগ, ভীতি এবং আশংকা পুনরায় এসে উপস্থিত হয়। সেই উদ্বেগ, ভীতি এবং আশংকা বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহে নতুন করে সঞ্চারিত হয়। স্বাভাবিক-ভাবে যতটা থাকা উচিত, উদ্বেগ, ভীতি এবং আশংকার মাত্রা তার থেকে বহুগুণে বেড়ে যায়। এর ফলে, সম্প্রদায়ের মানুষ খুব সহজেই এক অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের শিকার হয়ে পড়েন।

হাদিস এবং হিন্দ-এর মধ্যে 'তিন তালাক' নিয়ে যে বিতর্কের সূচনা হয়েছে তা হয়তো পবিত্র গ্রন্থের আক্ষরিক অর্থ এবং নিহিতার্থের বিরোধ নিয়ে। এর কথা যেহেতু আগেই বলা হয়েছে, সেহেতু নতুন করে আর বলতে চাইছি না। কিন্তু কথাটা হল, মৌলবাদ আক্ষরিক অর্থের বাইরে ধর্মের অনুশাসনকে মানতে চায় না—একথা সবক্ষেত্রে ঠিক নয়। নিহিতার্থ নির্মাণ করে পরিবর্তনের সমর্থনে যুক্তি খাড়া করার মৌলবাদী প্রয়াস তো আমরা এতক্ষণ বিশ্লেষণ করে দেখলাম। এই নির্মাণের একটা সুবিধে এই যে, তাতে অদলবদলের সুযোগ থাকে। অর্থাৎ, আজকের নিহিতার্থ কাল নাও প্রযোজ্য হতে পারে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্য কোন নিহিতার্থের নির্মাণ চলতে পারে। আধুনিক ভারতবর্ষে গোহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে। গোহত্যা এবং গোমাংস-ভক্ষণ হিন্দুদের কাছে 'মহাপাপ'। এই দুটো আজ হিন্দুদের অবশ্য বর্জনীয়ের তালিকায় পড়ে। কিন্তু, এমন একদিন ছিল যখন হিন্দুদের গোমাংস-ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল না। এমনকি প্রাচীনকালে আর্যরাও গোমাংস-ভক্ষণ করতেন বলে জানা যায়। বিশেষ করে ষাঁড়ের মাংস পরম উপাদেয় আর সুস্বাদু বলে বিবেচিত হত। পরে, কৃষিভিত্তিক সমাজে গবাদি পশুর সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা থেকেই সম্ভবতঃ গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়। এছাড়া, অন্য আরো কারণ থাকতে পারে। গোহত্যা নিষিদ্ধ হলে গোমাংস-ভক্ষণ আপনা-আপনি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু, আজ হিন্দু হতে গেলে গোহত্যা চলবে না, গোমাংস ভক্ষণ তো নয়ই। একে হিন্দুধর্মের 'মূল' অনুশাসন বলে মনে করা হচ্ছে। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, মৌলবাদও ঐতিহাসিকভাবে পরিবর্তনশীল। একে পরিবর্তনশীল বলে না মনে করাটাই অনৈতিহাসিক।

মৌলবাদ, মৌলবাদ-বিরোধিতা এবং যুক্তি

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মৌলবাদের গোড়ায় আছে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস বিভিন্ন স্তরে ক্রিয়াশীল। ধর্মের যে অংশকে 'মৌলিক' বা অলঙ্ঘনীয় বলে মনোনীত করা হয়—তা এক ধরনের বিশ্বাস। তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা আর এক ধরনের বিশ্বাস। ঠিক তেমনি, অন্য ধর্মের 'মূল' বলে যাকে ধরে নেয়া হল—তা আবার আর এক ধরনের বিশ্বাস। এই তিন বিশ্বাসের সম্মিলনে মৌলবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। মৌলবাদের গোড়ায় যেহেতু বিশ্বাস সেহেতু যুক্তির সঙ্গে তার একটা বিরোধ আছে। যুক্তি তো আর বিশ্বাস নয়। আমাদের জ্ঞানের জগৎ বিশ্বাস এবং যুক্তির মধ্যে বৈপরীত্য সন্ধানেই অভ্যস্ত। কাজেই, যখনি মৌলবাদ দমনের কথা ওঠে তখনি আমরা যুক্তির শরণাপন্ন হই। যুক্তির আলোয় মৌলবাদের অন্ধকার দূর হয়ে যাক—এই প্রত্যাশা দায়িত্বশীল সমাজ-সংস্কারকের প্রত্যাশা।

কিন্তু, বিশ্বাস এবং যুক্তির মধ্যে সম্পর্কটা অনেক ক্ষেত্রেই গোলমেলে। অর্থাৎ, যে বৈপরীত্যের সম্পর্ক আমরা ধরে নিয়ে চলতে অভ্যস্ত তা সব সময়ে সত্যি নয়। এর দুটো দিক আছে। দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। তবে, প্রথমটা নিয়ে এযাবৎ অনেকটা আলোচনা হয়ে গেছে। তাই, দ্বিতীয় দিকটার ওপরেই খানিকটা আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। অনেক সময়ে বিশ্বাসের সমর্থনে যুক্তিকে এনে হাজির করা হয়। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের মতে, অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল ঠিক এই কাজটাই করেছেন: 'বিশ্বাসের সপক্ষে যুক্তি দেওয়া মানেই এক ধরণের হেত্বাভাস (ইনফর্মাল ফ্যালাসি)—এটা কি তিনি বোঝেন না?'[১৪] এই কথা থেকে কিন্তু এটা প্রমাণিত হয় না যে যুক্তি এবং বিশ্বাসের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বরং উল্টোটাই প্রমাণিত হয়।

বৈপরীত্যের সম্পর্ক বজায় রাখতে না পারার জন্যেই মৌলবাদকে সমালোচিত হতে হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে আবার এর ঠিক উল্টোটাই হতে পারে। অর্থাৎ, যুক্তির সমর্থনে থাকতে পারে বিশ্বাস। যুক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে বিশ্বাসের উপস্থিতির কথা বলেছিলেন পল ফেয়েরাবেন্ড তাঁর বিখ্যাত ফেয়ারওয়েল টু রিজন গ্রন্থে। এর ফলে বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে বিভেদ থাকে না। আর তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে আমাদের যুক্তির দম্ভে। মৌলবাদ বা যুক্তিবাদ—এই দুয়েরই কেন্দ্রবিন্দুতে যদি বিশ্বাস থাকে তবে আমাদের যুক্তিবাদী দম্ভ যেমন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় তেমনি মৌলবাদ-বিরোধিতার ভিত্তিও হয়ে পড়ে ভঙ্গুর। যুক্তিবাদ যদি এক ধরনের বিশ্বাসেই পর্যবসিত হয় তবে আমাদের মৌলবাদ-বিরোধিতা কি কখনো কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি আধুনিক যুক্তিবাদের এমন তিনটে উপাদানের কথা উল্লেখ করবো যার সঙ্গে মৌলবাদ-সুলভ বিশ্বাসের কোনো পার্থক্য নেই। তার আগে একটা কথা একটু বলে নেয়া আবশ্যক। আধুনিক যুক্তিবাদ বলতে আমি সেই বিশেষ ধরনের যুক্তিবাদের কথা বলছি যার স্বরূপ অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের 'আলোকপ্রাপ্ত যুগান্তরের' (এনলাইটেনমেন্ট) পর্ব থেকে উদ্ঘাটিত হতে দেখা যাচ্ছে।

প্রথমতঃ, এই সময়ে যাকে যুক্তি বলে উপস্থিত করা হল তা কিন্তু আর যাই হক, স্থান-কাল-পাত্রের ওপরে নির্ভরশীল নয়। কোনো বিশেষ পরিস্থিতি-ভেদে যুক্তির যে তারতম্য হতে পারে—একথা পরিস্কার অস্বীকার করা হল। যা যুক্তিসম্মত তার একটা সাধারণ আবেদন রয়েছে। আজ যাকে যুক্তিসম্মত বলে মনে করছি কালও তা যুক্তিসম্মত হতে বাধ্য। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে, যা যুক্তিসম্মত ভারতবর্ষেও তাই। এর উল্টোটা অবশ্য সত্যি নয়। দেশভেদে বা কালভেদে যুক্তির কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। বলা বাহুল্য, এখানে বিশেষ পরিস্থিতির কোনো গুরুত্ব নেই। যুক্তির এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মৌলবাদের একটা চমৎকার মিল রয়েছে। লেজের আগুনে স্বর্ণলংকা যদি আদৌ ছারখার হয়ে থাকে তবে তাও কত কাল আগের কথা। কিন্তু, সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো গত ৬ই ডিসেম্বর, অযোধ্যায়। স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্র এবং মোগল রাষ্ট্রের মধ্যে একজন বিক্ষুব্ধ শিখ কোন পার্থক্য করেন না। প্রতিটি ঘটনা চক্রাকারে ঘুরে-ফিরে আসে। কোনকিছুই হারিয়ে যায় না। লেজের আগুনে স্বর্ণলংকা ছারখার যদি অপরাধ না হয় তবে মসজিদ / সৌধ ভাঙাও কোন অপরাধ নয়। 'রক্তপাগল' মোগলের বিরোধিতা করা যদি ন্যায়সংগত কাজ বলে গণ্য হয় তবে শিখদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপও কিছু অন্যায় নয়। অকাল তখতে তো বান্দা বাহাদুরও অস্ত্রশস্ত্র মজুত করেছিলেন। তাই বলে বান্দা বাহাদুর কি

সন্ত্রাসবাদী? একই কারণে ভিন্দ্রানওয়ালেও সন্ত্রাসবাদী নন। একই ঘটনার ছকে ফেলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বর্তমানের ঘটনা-প্রবাহকে।

আমরা যাঁরা নিজেদের যুক্তিবাদী বলে জাহির করি তাঁরা যুক্তির আড়ালে জাতিরাষ্ট্রের জয়গান গাই। মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যুক্তির কোন সম্পর্ক নেই; সুতরাং তারা অযৌক্তিক। অন্যদিকে আমরা জাতিরাষ্ট্রের অযৌক্তিকতা নিয়ে তো কোন প্রশ্ন তুলি না? জাতিরাষ্ট্রের যৌক্তিকতা যে আমাদের দেশে স্থান-কাল-পাত্রের ওপরে নির্ভর করে না। যেন ভারতীয় জাতি যুগযুগ ধরে ছিল, আছে এবং থাকবে। নেহরু অন্ততঃ এই রকমই বিশ্বাস করতেন। তাঁর যুক্তিবাদী মনও একটা পর্যায়ে এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ছিল—এই বিশ্বাসের ঊর্ধে কখনো উঠতে পারেনি। অথচ আমরা জানি, জাতি এবং জাতিরাষ্ট্রের উত্থান ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্যায়েই ঘটে থাকে। ঠিক তেমনি ভারতীয় জাতি গোটা ভারত ইতিহাস জুড়েই উপস্থিত ছিল না। উপনিবেশিক শাসনের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদী আধুনিকীকরনের যে কিম্ভূতকিমাকার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার হাত ধরেই জন্ম নিয়েছিল, অত্যন্ত দুর্বল এক আধুনিক ভারতীয় জাতি। এর আগে জাতির অস্তিত্বের সন্ধান করা আসলে ইতিহাসের এক ধরনের রোমান্টিক বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতবর্ষের মার্কসবাদীরাও জাতিরাষ্ট্রের এই প্রদত্ত কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হননি—অন্যত্র তা আলোচনা করেছি। অন্যদিকে, মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা অযৌক্তিক, কারণ তা পশ্চাৎপদ, প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রগতিবিরোধী। এগুলো সাময়িক বলেই অযৌক্তিক—এদের কোন স্থায়ী বা সাধারণ আবেদন নেই। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে এই সমস্ত শক্তি অন্তর্হিত হতে বাধ্য।

দ্বিতীয়তঃ সমজাতীয় যুক্তির মধ্যে তুলনা করা সম্ভব। এবং এই তুলনার মধ্য দিয়েই আমরা যুক্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। যেহেতু যুক্তিগুলো তুলনীয় বলে মনে করা হয়, সেহেতু আমরা খুব সহজেই অন্য যুক্তির তুলনায় কোনো একটার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করতে পারি। যুক্তির এই বৈশিষ্ট্যের পেছনে একটা অনুমান আছে—যার উল্লেখ এখানে মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনুমানটা হল: যেহেতু সমজাতীয় যুক্তির মধ্যে তুলনা করা সম্ভব সেহেতু যুক্তিবাদী দর্শনে এমন কিছু সাধারণ নিয়মের নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে যার সাহায্যে আমরা এই তুলনা করতে সক্ষম হই। এগুলোকে সাধারণ নিয়ম বলছি এই কারণে যে এই নিয়মগুলো কোনো একটা বিশেষ যুক্তির সাপেক্ষে তৈরি হয়না। অর্থাৎ, নিয়মগুলো কোনো বিশেষ যুক্তির অভ্যন্তরীণ নয়। বরং সমস্ত পরস্পরবিরোধী যুক্তিকেই এই সাধারণ নিয়মের আওতায় ফেলে তাদের উৎকর্ষ / অপকর্ষ যাচাই করে দেখা যায়।

মৌলবাদই হোক বা মৌলবাদ বিরোধিতাই হক—দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু একই উপাদান উপস্থিত। প্রথমে মৌলবাদ দিয়েই আলোচনা করা যেতে পারে। মৌলবাদীরাও কিন্তু মনে করেন, কতকগুলো সাধারণ নিয়ম আছে যার নিরিখে আমরা এক ধর্মের তুলনায় আর এক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারি। আমরা যতখানি নিশ্চয়তায় বলতে পারি নির্বাচনী প্রচারে প্রভূত অর্থব্যয় না করে খরাপ্রবণ গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের প্রয়োজনে নলকূপ বসানো ভালো, ঠিক ততখানি নিশ্চয়তাতেই ভিনদ্রানওয়ালে বলতে পারেন, একজন শিখ 'সওয়া লাখ' হিন্দুর সমকক্ষ। অন্যের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের মৌলবাদী প্রবণতা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। দেশ এর পূর্বোক্ত সংখ্যায় শিবজীবন ভট্টাচার্যের বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বলেছেন: "কুযুক্তির স্বার্থে শিবজীবনবাবুকে হিন্দুর তথাকথিত ঔদার্য বিসর্জন দিতে হয়েছে। 'অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে।' 'বহু মত ধর্ম সত্য, মিথ্যা কিছু নয়' ইত্যাদি বাণী ····ভুলে গিয়ে তাঁকে খৃষ্টানদের ঈশ্বরকে বুঝতে হয়েছে। কেন না সে ঈশ্বর লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেন।"

আমাদের মৌলবাদ বিরোধিতার মধ্যেও আবার এই একই উপাদান লক্ষ্য করা যাবে। এর একটা খুব সাম্প্রতিক উদাহরণ দেবার চেষ্টা করবো। ইদানীং মৌলবাদকে আক্রমণ করে অসংখ্য 'বিজ্ঞানমনস্ক' এবং 'যুক্তিবাদী' সংগঠন ছোটখাটো বই বা হ্যান্ডবিল প্রকাশ করছে। এই সমস্ত প্রয়াস প্রশংসনীয় —সন্দেহ নেই। কিন্তু, কতদূর কার্যকরী—তা ঠিক এমনই হলফ করে বলা যাবে না। এরকম একটা পুস্তিকার কথা এখানে উল্লেখ করছি। এর লেখক শ্রী সুরজিৎ দাসগুপ্তের মূল বক্তব্য হল: রামায়ণের রাম 'মহাবলী' নন। তাঁর সমস্ত কাজকে আমরা সমর্থন করতে পারিনা। এরকম অন্তত চারটে উদাহরণ আমরা তাঁর লেখাতে পাচ্ছি যার কোনটাকেই আমরা নৈতিক বলে মনে করতে পারিনা: (ক) 'মায়ামৃগের প্রতারণা থেকেই রামের চরিত্র পরিবর্তনের সূচনা। কোমল-সরল রাম হলেন কঠোর-চতুর রাম। একজন সীতাকে উদ্ধারের জন্যে হল শত-সহস্র প্রাণবলি। (খ) 'একজন শ্রমজীবী যদি উচ্চস্থানে আগ্রহী হয়, তাহলে রামরাজ্যেও অভিশাপ নেমে আসে। তাই শম্বুকের মাথা কেটে ফেললেন রাম।' (গ) 'প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ ছিল পররাষ্ট্রগ্রাসের শ্রেষ্ঠ উপায়—একটা প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধি লাভের শাস্ত্র অনুমোদিত একটা প্রকরণ'; রাম সেই যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন।'

(ঘ) 'নারীর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই, নারীর একমাত্র কর্তব্য পুরুষের আজ্ঞা পালন ও পরিচর্যা ও স্ত্রী হল একটি সম্পত্তি, স্বামীর মধুর ইচ্ছাতে স্ত্রী গৃহে আশ্রয় পায় আবার স্বামীর মধুর ইচ্ছাতেই স্ত্রী নির্বাসিতা হয়।'[১৯] এত দোষ সত্ত্বেও রাম কিভাবে একজন আদর্শ চরিত্রের মর্যাদা পান—এটা সত্যিই

বিস্ময়কর। আসলে, তাঁর মতে, সংঘ পরিবারের প্রতিনিয়ত প্রচারেই রামের মত একজন কুৎসিৎ চরিত্রের মানুষও আদর্শ মানুষের (বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভাষায়, 'জাতীয় চরিত্রের') মর্যাদা পেয়েছেন। মিথ্যেকে বারবার প্রচারের মাধ্যমে সত্যি বলে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। কাজেই, সংঘ পরিবার আমাদের যা বোঝাচ্ছেন তা ভ্রান্ত। তাদের প্রচারের বিরুদ্ধে 'প্রশ্ন' তুলতে হবে—'প্রশ্নের' মাধ্যমে 'সত্যসন্ধানে' প্রবৃত্ত হতে হবে: "আজ্ঞা পালনে নয়, প্রশ্নসাধনে ও সত্যসন্ধানে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব—মানুষের মনুষ্যত্ব।" আমরা বলতে পারি, প্রশ্নসাধন করেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন যে, রাম 'মহাবলী' ছিলেন না। এই 'প্রশ্নের' পথ হল যুক্তির পথ। এখানে রামের প্রতি ভক্তি-গদগদ বিশ্বাসের কোন স্থান নেই।

আমার মনে হয়, এই ধরনের মৌলবাদ-বিরোধিতা খুব ফলপ্রসূ হতে পারে না। এর সমালোচনা হিসেবে আমাদের তিনটে বক্তব্য আমরা এখানে প্রায় সূত্রাকারেই পেশ করতে পারি: প্রথমতঃ, রামের 'মহাবলী' হয়ে উঠার পেছনে সংঘ পরিবারের অবদানকে আমরা নিশ্চয়ই খাটো করে দেখতে পারি না। কিন্তু, তাঁর এই বক্তব্য পড়ে মনে হয়, সংঘ পরিবার গড়ে ওঠার আগে রাম 'মহাবলী' ছিলেন না। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে রামের 'মহাবল' বা আদর্শস্থানীয়তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি—একথা বলবো না। কিন্তু, সে প্রশ্ন যে বিশেষ পাত্তা পায়নি তা তো বলাই বাহুল্য। কদিন ধরে আর সংঘ পরিবার গড়ে উঠেছে? গোটা ভারত ইতিহাসের তুলনায় সংঘ পরিবারের ইতিহাস অতি নগণ্য। দ্বিতীয়ত, তিনি রামচরিত্রের যে মূল্যায়ন করেছেন তা শুধু শাস্ত্রসম্মত বলে তিনি মনে করছেন। অন্যদিকে সংঘ পরিবারের মূল্যায়ণ মোটেই শাস্ত্রসম্মত নয়—কারণ ওপরের চারটে উদাহরণ তো শ্রীদাশ-গুপ্তের মস্তিস্ক-প্রসূত নয়। তিনি রামায়ণ থেকেই এই উদাহরণগুলো সংগ্রহ করেছেন। তিনি তো একবারও ভাবলেন না, রামচরিত্রের এহেন রামায়ণ বিরোধী মূল্যায়ন এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে কিভাবে? অন্তত তাঁর মূল্যায়নের চাইতে ঐ মূল্যায়ন তো অনেক বেশি জনপ্রিয়—একথা বোধ করি তিনিও মানবেন। আজকে শাস্ত্রসম্মত যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা সাধারণের মনে প্রত্যাশা অনুযায়ী রেখাপাত করছে না কেন? আমি এ থেকে আমার তৃতীয় বক্তব্যে আসতে চাই—যেখানে এই জনপ্রিয়তার একটা ব্যাখ্যা আমরা খুঁজতে পারি।

রামের এই প্রচলিত জনপ্রিয় মূল্যায়নের বিরুদ্ধে 'প্রশ্ন' তোলার প্রয়োজন অনুভব করেছেন শ্রীদাশগুপ্ত। কিন্তু, আমরা তখনি প্রশ্ন তুলতে পারি যখন আমাদের কাছে মূল্যায়নের কিছু সাধারণ মানদণ্ড (বা নিয়ম) আছে। এতদ্ব্যতীত 'প্রশ্ন' করা বৃথা। যে চারটে উদাহরণের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার পেছনে এরকম চারটে মানদণ্ড আছে যাকে তিনি নির্বিবাদে

মেনে নিয়েছেন : (ক) 'মায়ামৃগের প্রতারণায়' প্রতারিত হওয়া উচিত নয় কারণ মায়ামৃগ' আসলে জাগতিক প্রলোভনের একটা প্রতীক মাত্র। (খ) উচ্চ-জ্ঞানে আগ্রহী' শ্রমজীবী মানুষকে হত্যা করা উচিত নয় কারণ 'উচ্চজ্ঞান'—সকলের অবারিত অধিকার। (গ) অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করা উচিত নয় কারণ, এই যজ্ঞ 'ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধি লাভের' এবং 'পররাজ্যগ্রাসের' শাস্ত্র-অনুমোদিত একটা উপায়। (ঘ) 'পুরুষের আজ্ঞা পালন' নারীর একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত নয়, কারণ এতে নারীর 'স্বতন্ত্র সত্তা' বিসর্জিত হয়। আমাদের মধ্যে সবাই যে এই চারটে মানদণ্ডের প্রতি আস্থাশীল হবেন—এমন নয়। এই চারটে মানদণ্ডকে যদি আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করি তাহলে রাম দোষী অর্থাৎ, 'মহাবলী' নন। আর যদি আমরা ঐ স্বতঃসিদ্ধগুলোকে প্রশ্ন করি তাহলে রাম দোষী ছিলেন—একথা জোর গলায় বলা যাবে না। কাজেই, দেখা যাচ্ছে, যে 'প্রশ্নসাধনের' কথা শ্রীদাশগুপ্ত বারবার বলছেন তা কিন্তু এই মানদণ্ডগুলোকে প্রশ্ন করছে না—বরং এগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়েই রামকে দোষী এবং কুৎসিৎ চরিত্রের মানুষ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, 'প্রশ্নসাধনে' যুক্তির পথকে খুঁজে নেবার যে প্রতিজ্ঞা শ্রীদাশগুপ্তের লেখায় ছিল তাও শেষ পর্যন্ত এই চারটে স্বতঃসিদ্ধে বা বিশ্বাসে পরিণত হল। যুক্তির কেন্দ্রে এসে স্থান নিল বিশ্বাস। আমাদের মনে রাখা দরকার, এই চারটে মানদণ্ডের বলেই লেখকের নিজস্ব মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছে। এবং এই মানদণ্ডগুলোর নিরিখে লেখকের মূল্যায়নের সঙ্গে আমরা প্রচলিত জনপ্রিয় মূল্যায়নের কোনো তুলনাই করতে পারি না। অর্থাৎ, দুই মূল্যায়ন দুই ভিন্ন ধরনের মানদণ্ডের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে; একের সঙ্গে অপরের কোনো তুলনাই সম্ভব নয়। সুতরাং, এগুলোকে সর্বজনস্বীকৃত সাধারণ নিয়ম বলা যাবে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মৌলবাদ বা মৌলবাদ-বিরোধিতা—দুইয়ের ভিত্তিতেই আছে বিশ্বাস। পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস কোনো সাধারণ নিয়মের আওতায় পড়ে না।

যুক্তিবাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল : যুক্তি একবার অকাট্য বলে প্রমাণিত হলে আর কোন কথা নেই; চরম অসহিষ্ণুতায় ভ্রান্ত যুক্তির পথ পরিহার করাই হল যুক্তিবাদী মনের ধর্ম। এ থেকেই পল ফেয়েরাবেণ্ড সিদ্ধান্ত করেছেন, যুক্তির এক 'সর্বময় কর্তৃত্ব' ('ইউনিভার্সাল অথরিটি') আছে। মৌলবাদের যে অন্যতম লক্ষণ এই অসহিষ্ণুতা—তার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু, মৌলবাদ-বিরোধিতার পেছনে যে যুক্তি কাজ করে তার মধ্যেও এই 'সর্বময় কর্তৃত্ব' প্রয়োগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমি যদি যুক্তিবাদী হই তবে মৌলবাদীদের ওপরে আমার কর্তৃত্ব ফলাবার সংগত অধিকার আমি আমার যুক্তিবাদী জ্ঞান এবং মৌলবাদ-বিরোধিতার মাধ্যমে অর্জন করেছি। এখানে যুক্তিবাদী জ্ঞান এবং সর্বময় কর্তৃত্ব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। যুক্তিবাদী

জ্ঞান যেমন কর্তৃত্ব প্রয়োগের এক মোক্ষম অস্ত্র তেমনি কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেও সেই যুক্তিবাদী জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম রাখা যায়। জ্ঞান কর্তৃত্বের এই লুকোচুরি খেলা যেমন মৌলবাদীরা খেলেন, তেমনি খেলেন মৌলবাদ-বিরোধীরাও।

মৌলবাদী বা মৌলবাদ-বিরোধী—প্রত্যেকেই মনে করছেন, জগতের অনন্ত জ্ঞান-ভান্ডারের তিনি ইজারা নিয়েছেন। অন্যের জ্ঞানকে জ্ঞানের মর্যাদা পর্যন্ত দিতে তিনি রাজী নন। মৌলবাদ-বিরোধিতা কিভাবে এক শক্তিশালী কর্তৃত্ব-কাঠামোর জন্ম দেয়—তার কথা আমরা পরের পর্যায়ে আলোচনা করবো। এবং সেই কর্তৃত্ব-কাঠামোর বিরুদ্ধে একটা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হিসেবে চলতি মৌলবাদের গুরুত্ব আছে—যাকে আমরা কোনক্রমেই খাটো করে দেখতে পারিনা। কিন্তু, তার আগে একটা ছোট উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। যুক্তিকে পল ফেয়েরাবেন্ড শেষ প্রস্তাবে 'এক বিশেষ ধরণের বিশ্বাস' ('এ স্পেশাল কেস অফ বিলিফ') বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর ভাষায়: "এই বিশ্বাসই মুসলিমদের বিজয়াভিযানে উদ্বুদ্ধ করেছে, এই বিশ্বাসই যাঁরা ধর্মযুদ্ধ ('ক্রুসেড') করেছিল তাঁদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত করেছে, এই বিশ্বাসই নতুন মহাদেশ আবিষ্কারের প্রেরণা দিয়েছে, এই বিশ্বাসই গিলোটিনকে তৈনাত করেছে এবং এই বিশ্বাসই আজ যুক্তি এবং / অথবা বিজ্ঞান, স্বাধীনতা আর মর্যাদাবোধের মার্কসবাদী রক্ষকদের মনে অন্তহীন বিতর্কের ইন্ধন যোগাচ্ছে।"[২০]

যুক্তিবাদী প্রতিষ্ঠান

আমাদের যুক্তিবাদ মৌলবাদের যথার্থ বিরোধিতা করতে পারুক আর নাই পারুক, এর মধ্যেই একটা বড় মাপের লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আমি 'প্রতিষ্ঠান' কথাটাকে খুব সজ্ঞানেই ব্যবহার করেছি। এর দুটো অর্থ থাকা সম্ভব। এই দুটো অর্থের মধ্যে অবশ্য কোনো বিরোধ নেই। কারণ, এদের অন্তর্নিহিত অনুমান একই। সেই অনুমানকে নিয়েই আমাদের এপর্যায়ের আলোচনা শুরু করা যাক। আমরা সবাই জানি, ভারতবর্ষের মত দেশে যুক্তিবাদের আশানুরূপ প্রসার ঘটেনি। মৌলবাদ এখনো দাপটে রাজত্ব করছে। একটু আলাদা করে বলতে গেলে বলা যায়, যুক্তিবাদ আমাদের দেশে এখনো একটা জনপ্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। এখনো তা মুষ্টিমেয়ের কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে।

ফলে, সমাজের নিচুতলার মানুষদের মধ্যে থেকে যুক্তির প্রসার ঘটবে—এমন আশা করা বৃথা। যুক্তিবাদকে সমাজের ওপরতলা থেকে নিচুতলার মানুষদের মধ্যে চারিয়ে দিতে হবে। এর দ্বারা যুক্তির অধিকারী মুষ্টিমেয় মানুষ কিন্তু

সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহি করেন না—তাঁদের কার্যকলাপকে অনুধাবন করার মত শক্তি আমাদের সমাজে সাধারণ মানুষ এখনো অর্জন করতে সক্ষম হননি। আমরা একবিংশ শতাব্দীতে পা রাখলে কি হবে, আমাদের সমাজ এখনো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পড়ে আছে। আমরা আমাদের অতীত নিয়ে বেঁচে আছি। এই দোহাই দিয়েই যুক্তিবাদের প্রসার বা উন্নততর বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ব্যবহারকে গণতন্ত্রের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। গণতন্ত্র যুক্তিহীন, মূর্খ, মৌলবাদী ভাবধারায় আচ্ছন্ন মানুষের শাসন। এমতাবস্থায়, গণতন্ত্রের স্থান দখল করে যুক্তি আর বিজ্ঞান। এর একটা উপযুক্ত উদাহরণ হল ঃ স্বাধীনতার পরে বিজ্ঞান-খাতে বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দের ওপরে কোনো সংসদীয় অধিবেশনে কোনোরকমের আলোচনা হয়নি বা হতে দেয়া হয়নি। হয়তো এর পেছনে যে অনুমান ছিল তা হল—যেহেতু বিজ্ঞানের ব্যাপার সেহেতু সাধারণ মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাথায় ঢোকার কথা নয়। তাঁরা আবার এসব জটিল বিষয় নিয়ে কি আলোচনা করবেন? কাজেই, কোনোরকম পর্যালোচনা ছাড়াই বিজ্ঞানখাতে ব্যয়বরাদ্দ পাশ হয়ে যায়। অর্থাৎ, এই প্রথম অর্থে যুক্তিবাদ চলতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাছে তার জবাবদিহি করার কোনো ব্যাপারই থাকেনা।

প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় অর্থও একই অনুমানের ওপরে নির্ভরশীল। যুক্তি-বাদীরা যুক্তি বা বিজ্ঞানকে সকল রোগের অব্যর্থ দাওয়াই হিসেবে মানেন। এই বিশ্বাস শুধু যুক্তিবাদীদের কেন, আমাদের সবাইকেই প্রভাবিত করেছে। ফলে, আমাদের সমাজে যুক্তিবাদের একটা আলাদা মর্যাদা আছে। আমরা সবাই যুক্তিবাদী হতে চাই। কোনো মৌলবাদীই নিজেকে মৌলবাদী বলে মানতে চাননা। বরঞ্চ তাঁর মৌলবাদকে যুক্তিসম্মত এবং বৈজ্ঞানিক বলে চালাবার চেষ্টা করেন। যুক্তিবাদের চমক আমাদের যুক্তিবাদী বা বিজ্ঞানমনস্ক কোনোটাই করেনি বটে; কিন্তু যা কিছু যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক তার প্রতি অন্ধ আনুগত্য শিখিয়েছে। এটা যে নিজেই যুক্তিবাদ-সম্মত নয় তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। আমরা সকলেই যুক্তি এবং বিজ্ঞানের দাস—এই দাসত্বে আমাদের গ্লানি নেই—বরং মুক্তির ইঙ্গিত রয়েছে। আমাদের দেশে যুক্তিবাদীরা যুক্তির সপক্ষে এই অন্ধ বিশ্বাস উৎপাদন করেই নিজেদের রাজত্ব কায়েম করেছেন। যুক্তির শাসনকে এই অযৌক্তিক উপায়েই বৈধ বলে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। এই অর্থে সাধারণ মানুষ আবার যুক্তিবাদী প্রতিষ্ঠানের পরিপূরক। শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্তের পুস্তিকার কথা আগেই বলেছি। গোটা পুস্তিকায় শ্রী দাশগুপ্তের উচ্চমন্যতার নজির ভয়ংকরভাবে ছড়িয়ে আছে। তিনি যেভাবে রামায়ণ, বিবেকানন্দ বা রাধাকৃষ্ণণের রচনাবলীকে ব্যাখ্যা করতে চান তা যে একমাত্র অভ্রান্ত ব্যাখ্যা—এই নিয়ে তাঁর মনে কোন সংশয় নেই।

অথচ যুক্তিবাদীর প্রথম লক্ষণ সংশয়। দেকার্তস-এর সেই বিখ্যাত উক্তির কথা আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে যেখানে তিনি বলেছিলেন 'সবকিছুকে সন্দেহ করতে।' বরং মৌলবাদী ('হিন্দুরাষ্ট্রবাদী') ব্যাখ্যাকে নিয়ে এক-ধরণের লঘু পরিহাস করেছেন: "হিন্দু জীবনের মৌলবোধ সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্যে বা চেতনা লাভের জন্যে আর স্বামী বিবেকানন্দ বা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের লেখা কষ্ট করে পড়ার দরকার নেই। এখন থেকে এঁরাই মনু-বুদ্ধ-রামানুজ-চৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাছাই-করা বাণী, এঁদের বুদ্ধি আর রুচি অনুসারে সাজিয়ে-গুছিয়ে বিতরণ করবেন।" এইভাবে মৌলবাদীকে পরিহাস করেই একজন যুক্তিবাদী তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। এই পরিহাসই একজন যুক্তিবাদীর সঙ্গে মৌলবাদী ভাবধারায় আচ্ছন্ন বৃহত্তর সমাজের ব্যবধান রচনা করে। এই ব্যবধান রচনা করে একজন যুক্তিবাদী মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন।

একদিকে যুক্তি যেমন গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্যদিকে তা মুষ্টিমেয়, যুক্তিবাদী এলিট এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ 'মৌলবাদী' জনসাধারণের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। এইভাবে, যুক্তিবাদ মুষ্ঠিমেয় এলিটের শাসনকে বৈধ করেছে। এই বৈধতার কয়েকটা চূড়ান্ত উদাহরণ দিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করতে পারি। এই যুক্তি এবং বিজ্ঞানের নামেই আমরা উড়িষ্যার বালিয়াপালে রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র বানাতে পারি, নর্মদার বুকে সর্দার সরোবর বাঁধ লাগিয়ে মনিবেলির মত অজস্র গ্রাম বন্যার জলে ভাসিয়ে দিতে পারি। বিজ্ঞানের উন্নতির নামেই বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে আমরা স্বাগত জানাতে পারি, শত শত লোককে 'গ্যাস দুর্ঘটনায়' পীড়িত করতে পারি, মেরে ফেলতে পারি বা জন্মের মত পঙ্গু করে দিতে পারি। আবার এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির দোহাই দিয়ে অসংখ্য উপজাতীয় পরিবারকে তাঁদের পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি থেকে নামমাত্র ক্ষতি-পূরণে বা আদৌ কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উৎখাত করা যায়, মেরে ফেলা যায়, জন্মের মত বিকলাঙ্গ করে দেয়া যায়। সবই করা হয় প্রগতির স্বার্থে, যুক্তি আর বিজ্ঞানের নামে। এই নিয়ে প্রশ্ন তুললে আমরা 'মধ্যযুগীয়', 'অবৈজ্ঞানিক' এবং 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' বলে আখ্যাত হই—বাধা দেয়া তো দূরের কথা। আসলে আমাদের যুক্তিবাদ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতই এক বিপজ্জনক হিংসাযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। আমাদের গর্বের জাতিরাষ্ট্রই এই হিংসাযন্ত্রের চালকের স্থান অধিকার করেছে।

এদিক দিয়ে দেখতে গেলে মৌলবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মৌলবাদ অনেক সময়েই এই যুক্তিবাদী প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করেছে। বলা বাহুল্য, মৌলবাদ সবসময়েই যে এই বিকল্প এবং হিংসাত্মক প্রতিষ্ঠানের একটা সার্থক প্রতিবাদ হবে—এমন কোন কথা নেই। আমাদের দেশেই যেমন,

মৌলবাদের এই প্রতিবাদী চরিত্র এখনো উদ্ঘাটিত হতে দেখা যায়নি, বরং উল্টোটাই হয়েছে। মৌলবাদের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের এক আশ্চর্য গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে। একে আমি অন্যত্র 'প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ' বলে অভিহিত করেছিলাম। তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বরং মৌলবাদ কিভাবে সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হিসেবে গণ্য হতে পারে—তা আলোচনা করে দেখা যাক।

১৯৭৮ সালে ইরাণে যে মৌলবাদী বিপ্লব ঘটে যায় তা ফুকোর অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিল। যে সাক্ষাৎকারে তিনি মৌলবাদের প্রতিবাদী চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর উজ্জ্বল প্রশংসা ব্যক্ত করেছিলেন তাতে কোথাও এর অন্ধকারময় দিকের এতটুকু উল্লেখ নেই। এ থেকে মনে হয়, ফুকো মৌলবাদকে অবিমিশ্র প্রতিবাদ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। পরে তিনি এই বিপ্লব নিয়ে অন্যরকম ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন কিনা—তার খবর আমি জানি না। মূলতঃ দুটো কারণে তিনি এই শিয়াপন্থী মৌলবাদী বিপ্লবকে স্বাগত করেছিলেন : প্রথমতঃ, তিনি বলেছিলেন, প্রগতির যে ধারণা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে চালু আছে তার উৎসে আছে পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার ধারা। অর্থাৎ, অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই 'আলোকপ্রাপ্ত যুগান্তর'-এর ফলস্বরূপই যুক্তিবাদ নির্ধারণ করে দিয়েছিল বিশ্বজুড়ে প্রগতি-সম্বন্ধীয় যাবতীয় ভাবনা-চিন্তার গতিধারা। এই ভাবনা-চিন্তার দাপট বিগত দুই শতাব্দী ধরে প্রায় অবিসংবাদিতভাবেই চলে আসছিল। আমাদের বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারের যা কিছু তার 'মূল'-এ ছিল ঐ যুক্তিবাদ। ১৯৭৮-এর সেই বিপ্লব প্রগতি-সম্বন্ধীয় আমাদের বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে গর্জে উঠলো। এই বিপ্লব ফুকোর ভাষায়, সেই পাশ্চাত্য উত্তরাধিকারেরই 'প্রতিনিয়ত প্রদর্শিত প্রত্যাখ্যান' ('এন্ডলেসলি ডেমন্সট্রেটেড রিজেকশন') প্রগতির পাশ্চাত্য প্রতীকগুলোকে তীব্র অসহিষ্ণুতায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করাই ছিল এই বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রগতির নামে বিদেশিদের দাপট, জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন আর বরদাস্ত করা হল না। ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হল শাহর আমলের মার্কিন-ঘেঁষা বিদেশ নীতি। দেশের ব্যাপারে আমেরিকার নাক-গলানোর বিরুদ্ধে ইরানের প্রতিটি মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন। এই 'প্রত্যাখ্যানের' পাশাপাশি ফুকো আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন। কেবল নেতিবাচক চরিত্রই নয়—এই বিপ্লবের একটা সদর্থক অবদানও ছিল। বিংশ শতকের শেষ ভাগে এসে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের একটা বিকল্প দেবার প্রচেষ্টা এই বিপ্লবের মধ্যে নিহিত ছিল। এই বিকল্প কতদূর যথার্থ ছিল—সে অন্য কথা। এই বিকল্পের বৌদ্ধিক কাঠামো ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঐশ্লামিক চিন্তাধারার থেকেই তার উৎসের সন্ধান করেছিল—একথা ঠিক। এইরকম এক মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা আজকের পৃথিবীতে কতদূর প্রাসঙ্গিক তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু, এই প্রথম

একটা দেশের সমস্ত মানুষ পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কিছু একটা বিকল্প খাড়া করার সংসাহস দেখাতে পারলেন। ফুশো একে 'এক নিরঙ্কুশ সমষ্টিগত ইচ্ছার' ('এ্যাবসলিউটলি কালেকটিভ উইল') প্রতিধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই সাহসই তাঁদের শাহর ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের নলের সামনে বুক পেতে দেবার প্রেরণা যুগিয়েছে। বিশ্বাসের জোরে মৃত্যুবরণ করার সাহস তাঁদের সাফল্যের গোপন রহস্য।

মৌলবাদ যদি এই পর্যায়ে নিজেকে উত্তীর্ণ করতে পারে তাহলে মৌলবাদ-বিরোধিতার চাইতে মৌলবাদই শ্রেয়ঃ। মার্কসের ভাষা ধার করে ফুশো বলেছেন: মৌলবাদ আসলে 'এই প্রেরণাহীন পৃথিবীতে প্রেরণাস্বরূপ' ('স্পিরিট ইন এ ওয়ার্লড উইদাউট স্পিরিট'[২১])।

মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ

আমরা আগেই বলেছি, মৌলবাদ একার্থক। একটি শব্দের একটি অর্থের বাইরে আর কোন অর্থ সম্ভব—একথা একজন মৌলবাদী কিছুতেই স্বীকার করবেন না। আবার, এই একার্থতা আমাদের মৌলবাদ-বিরোধিতারও একটা বড় লক্ষণ। যে দৃঢ়তায় শ্রীদাশগুপ্ত তাঁর ব্যাখ্যাত অর্থকে আমাদের সামনে পেশ করেন এবং মৌলবাদীদের পরিহাস করেন সেই একই দৃঢ়তায় সরসংঘ-চালক দেওরস বলতে পারেন, মৌলবাদ ইসলামের একচেটিয়া সম্পত্তি, হিন্দুধর্মে মৌলবাদের কোন স্থান নেই।

একই শব্দকে যখন আমরা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি এবং নিজেদের অর্থকে ধরে বসে থেকে অন্যের অর্থকে পরিহাসভরে উড়িয়ে দিই তখন আমাদের মধ্যে কোন কথোপকথন, যথার্থ কথোপকথন (ডায়ালগ) চলতে পারে না—বিতর্ক তো দূরের কথা। শব্দার্থের ব্যাপারে কথোপকথনকারীদের মধ্যে ঐক্যমত্য আসলে যেকোন অর্থবহ কথোপকথনের প্রাকশর্ত। এর অভাবে কথোপকথনের ধরণ হ-য-ব-র-ল-র মত হয়ে যায়। লেখক এবং কাক প্রায় সব ক্ষেত্রেই একই শব্দ (যেমন, 'সময়') ব্যবহার করছে। অথচ, দুজনেই 'সময়' বা 'সময়ের দাম' বলতে দুই ভিন্ন অর্থকে বোঝাচ্ছে। ফলে, কথোপকথন দানা বাঁধছে না:

> আমি বললাম, 'এমন আনাড়ি কথা তো কখনো শুনিনি। সাত দুগুণে যদি চোদ্দ হয়, তা সে সব সময়েই চোদ্দ। একঘন্টা আগে হলেও যা, দশ দিন পরে হলেও তাই।'
>
> কাকটা ভারি অবাক হয়ে বলল, 'তোমাদের দেশে সময়ের দাম নেই বুঝি?'
>
> আমি বললাম, 'সময়ের দাম কি রকম?'

কাক বলল, 'এখানে কদিন থাকতে, তাহলে বুঝতে। আমাদের বাজারে সময় এখন ভয়ানক মাগ্যি, এতটুকু বাজে খরচ করবার যো নেই। এইতো কদিন খেটেখুটে চুরিচামারি করে খানিকটা সময় জমিয়েছিলাম, তাও তোমার সঙ্গে তর্ক করতে অর্ধেক খরচ হয়ে গেল।'

এখানে আমরা 'সময়ের' এমন দুটো ধারণা পাচ্ছি যার একটার সঙ্গে আর একটার কোন সামঞ্জস্য নেই। এদের মধ্যে তুলনা করাও যায় না। একজনের চোখে সময় পূর্ববর্ণিত যুক্তিবাদের মত—তার হিসেব পরিস্থিতির ওপরে নির্ভর করে না। কাকের চোখে, সময়ের হিসেব অন্যরকম। তা ইচ্ছে করলে 'জমিয়ে রাখা যায়', 'বাজে খরচ করবার যো নেই।' অর্থাৎ, যে সময় 'জমিয়ে' রাখা হল তা আবার পরে ইচ্ছেমত 'খরচ' করা যায়। কোনকিছুই হারিয়ে যায় না—সবকিছুই আবার ঘুরে-ফিরে আসে। আমরা আগেই দেখেছি, সময়ের এই চক্রাকার হিসেব মৌলবাদীদের কাছে দুর্লভ নয়। কাজেই, একজন যুক্তিবাদীর 'সময়'-সম্বন্ধীয় ধারণার সঙ্গে একজন মৌলবাদীর 'সময়'-সম্বন্ধীয় ধারণার কোন মিলই নেই। ফলে, কথোপকথন দানা বাঁধতে পারে না—আমাদের অফুরন্ত হাসির খোরাক যোগায়। এরা কেউই একজন আর একজনের ভাষা বুঝতে পারছে না। আমাদের মৌলবাদ-বিরোধিতাও এই ধরণের ভাষা-সংকটের মধ্যে পড়েছে। যে ঔদার্য আমাদের অন্যের ভাষা বুঝতে সাহায্য করে তা বিসর্জন দিয়ে আমরা অনবরত আমাদের অর্থে কথা বলে যাচ্ছি—অন্যের কানে ঢুকছে না। এই ঔদার্যের অভাব এবং উচ্চমন্যতা আমাদের মৌলবাদ-বিরোধিতাকে আর এক ধরণের মৌলবাদে পরিণত করেছে। এই নিয়েই আমাদের সাম্প্রতিক বিবাদ—মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ।

আমাদের মৌলবাদ-বিরোধিতার এই গোলমেলে হ-য-ব-র-ল-কে না বুঝতে পারলে আমাদের মধ্যেকার বিবাদকে সম্যক বোঝা যাবে না। এর মাত্র একটা উদাহরণ দিয়েই আমার আলোচনা শেষ করছি। ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের পরম গর্বের বস্তু। আমরা সবাই ধর্মনিরপেক্ষ হতে চাই। কিন্তু, এই শব্দকে আমরা যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করি তার খবর আমরা অনেকেই রাখি না। অর্থাৎ, আমরা সকলেই ঐ শব্দটা ব্যবহার করি এবং করে গর্ব অনুভব করি—ঐ বিশেষ শব্দের প্রতি ব্রিটিশ শাসনের উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া একটা দুর্বলতা আমাদের সকলেরই কমবেশি আছে। কিন্তু, ঐ শব্দকে আমরা সকলেই এক অর্থে প্রয়োগ করি না। এরকম দুটো অর্থের কথা আমি এখানে উল্লেখ করবো। প্রথম অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সংখ্যালঘু অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধের ব্যবস্থা করার কোন বিরোধ নেই। বরং এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষা-কবচ: 'স্বাধীনতার এতদিন পরেও সমাজে জাত-পাতের সংঘর্ষ থাকে,

জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে ব্যবধান থাকে। আজ একথা সকলেরই জানা যে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের হার আমাদের দেশে তফসিলী জাতি আদিবাসীদের মধ্যে সব থেকে বেশি। পিছনে-পড়া মানুষের প্রতি সামাজিক-অর্থনৈতিক দায়িত্ব যদি পালন করতে হয়—তা হলে সাধারণভাবে সমস্ত পশ্চাৎপদ মানুষের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণের সাথে সাথে তফসিলী জাতি আদিবাসীদের মঙ্গলের জন্য বিশেষ কর্মসূচী প্রণয়ন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। তাই আজ শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে—এই অংশের মানুষের কথা পৃথকভাবে চিন্তা করতে হয়—ভাবতে হয় এঁদের জন্য কিছু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা।' এই 'স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না করলে' ধর্ম-নিরপেক্ষতা অন্তসারশূন্য হয়ে যায়। এই ব্যাখ্যা আজকের মার্কসবাদী মহলে দুর্লভ নয়। যদিও তফসিলী জাতি-উপজাতি সমস্যা নিয়ে ওপরের কথাগুলি বলা হয়েছে, অনুরূপ কথা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মৌলবাদীদেরও খুশি করবে।

কিন্তু, ধর্মনিরপেক্ষতার যে দ্বিতীয় অর্থের কথা আমি বলতে চাইছি তার সঙ্গে প্রথম অর্থের সম্পর্কে আদায়-কাঁচকলায়। এই অর্থে আবার ধর্ম-নিরপেক্ষতার সঙ্গে হিন্দুমৌলবাদের কোন বিরোধ নেই। বরং মিল আছে। অন্ততঃ দুটো দিক দিয়ে এই মিল লক্ষ্য করা যায়ঃ এক, আইনের চোখে সমতা এই ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা। আইন দেশের সবার জন্যেই এক—আলাদা আলাদা সম্প্রদায়ের জন্যে আলাদা আলাদা আইন থাকতে পারে না। ঠিক এই জায়গা থেকেই সংঘ পরিবার 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড'-এর দাবি তুলেছে এবং সংবিধানে কাশ্মীরের জন্যে বিশেষ ৩৭৪ অনুচ্ছেদ বাতিলের দাবি করেছে। এগুলো, মুসলিম 'তোষনে'র ('এ্যাপিজমেন্ট')—মুসলিম 'তোষনে'র নামে যে ধর্মনিরপেক্ষতার চেহারা আমরা বর্তমানে দেখতে পাই তা আসলে 'ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা' ('সিউডো-সেকুলারিজম')। পাশাপাশি তাঁরা এও বলেন যে, হিন্দুদের জন্যে কোন বিশেষ অধিকার বা সুযোগ-সুবিধে তাঁরা চাইছেন না। আসলে তার আর দরকার হয় না। কারণ, সংঘ পরিবার বিশ্বাস করে, যে রাষ্ট্রব্যবস্থা 'হিন্দুত্বের' আদর্শের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে একমাত্র সেই রাষ্ট্রব্যবস্থাই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ বলে গণ্য হতে পারে। ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শ একমাত্র 'হিন্দুত্বের' মধ্যেই প্রোথিত আছে—আর কোন ধর্মে এর কোন স্বীকৃতি নেই। কাজেই, ধর্মনিরপেক্ষতা একমাত্র হিন্দুদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। 'হিন্দুত্ব' ব্যতীত ধর্মনিরপেক্ষতার কথা চিন্তাও করা যায় না। সুতরাং যাঁরা মৌলবাদী তাঁরাও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন। ধর্মনিরপেক্ষতা আজ কেবল যুক্তিবাদীরই মুখের ভাষা নয়, মৌলবাদীরও মুখের ভাষা। কিন্তু, দুয়ের অর্থ আলাদা।

একই ভাষা, অথচ অর্থ ভিন্ন। আমরা কেউ কারোর কথা বুঝতে পারছি

না। অদ্ভূত বধিরতায় আক্রান্ত আমাদের সমাজ। শ্রবণে সক্ষম দুই ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে যেরকম হ-য-ব-র-ল কথোপকথন করেন—অন্যের কথা কিছুই বুঝতে পারেন না অথচ নিজের কথা বোঝানোর জন্যে তার স্বরে চীৎকার করেন। মৌলবাদীর সঙ্গে যুক্তিবাদীর কথোপকথনটাও একেবারে সেই রকম। অকারণ হাসির উদ্রেক করে।

তথ্যনির্দেশ :

১। বিমলকৃষ্ণ মতিলাল : 'মৌলবাদ—কী ও কেন ?' দ্রষ্টব্য, সুজিত দে (সম্পাদিত)। সাম্প্রদায়িকতা : সমস্যা ও উত্তরণ (কলকাতা : পুস্তক বিপনি, ১৯৯১), পৃঃ ১০৮।

২। 'ট্রিপল তালাক ভ্যালিড, ডিক্লেয়ার্স মুসলিম থিওলজিয়ান বডি', দ্য স্টেটসম্যান, ২ জুলাই, ১৯৯৩।

৩। অরিন্দম চক্রবর্তী : 'আটপৌরে হিন্দুত্ব ও তার বিবিধ অসুবিধে', দেশ, ১৬ এপ্রিল, ১৯৮৮, পৃঃ ৪৫।

৪। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : 'কলিকাল-স্রোতে আবার ভাসলো হিঁদুয়ানি' অনুষ্টুপ, ১৩)১১), ১৯৮৮, পৃঃ ১০৭।

৫। বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১০২-৩।

৬। বিজয়কুমার মালহোত্র : ইজ ইট সিন টু বি হিন্দু ইন ইণ্ডিয়া ? (পুস্তিকা) (নয়াদিল্লি : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত), পৃঃ ৬৬।

৭। আবদুল জাব্বার : 'ইসলাম-প্রসার ও বিভ্রান্তি', বর্তিকা, ৩৩(১) জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৮, পৃঃ ৩২।

৮। 'আর. এস. এসের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে : দিল্লিতে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বালাসাহেব দেওরস', স্বস্তিকা, ৪৫(৩৩), ৩ মে, ১৯৯৩, জোর আমাদের।

৯। 'সাক্ষাৎকার : জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান', কলম, আগস্ট, ১৯৯২, পৃঃ ৩৮।

১০। 'রুশদি রিক্যান্টস, এমব্রেসেস ইসলাম', দ্য স্টেটসম্যান, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯০।

১১। অ্যান পান্ডে : 'এ লুম্পেনাইজড হিপোক্রিটিকাল ইন্ডিয়া কামস টু দ্য ফোর আফটার দ্য ভ্যান্ডালিজম অফ ডিসেম্বর সিক্স', দ্য ইকনমিক টাইমস (কলকাতা), ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯২।

১২। বার্নার্ড লুইস : 'ইসলাম অ্যান্ড লিবারেল ডেমক্রেসি', দ্য অ্যাটল্যান্টিক মান্থলি, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩, পৃঃ ৯১।

১৩। দ্রষ্টব্য ; অমলেন্দু দে ঃ 'বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনবিন্যাস—মানচিত্রে পরিবর্তন', পরিচয়, ৬১ (১০-১২), মে-জুলাই, ১৯৯২।

১৪। বি জে পি ঃ নির্বাচনী ঘোষণাপত্র ঃ ১৯৯১ (কলকাতা ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ শাখা, ১৯৯১), পৃঃ ৯।

১৫। জসবির সিং আলুওয়ালিয়া ঃ 'এক্সট্রিম ভিউজ ঃ দ্য নেচার অফ ফান্ডামেন্টালিজম', দ্য স্টেটসম্যান, ১৪ মে, ১৯৯৩।

১৬। এ ডিকশনারি অব বিলিভার্স এ্যাণ্ড নন-বিলিভার্স (মস্কো ঃ প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৫), পৃঃ ২১৪।

১৭। সুধীর কাকার ঃ 'লিজেন্ডস অ্যান্ড হিস্ট্রি ঃ কজ অফ শিখ মিসপারসেপশন', মেইনস্ট্রিম, ২৩(৩৭), ১২ মে, ১৯৮৫।

১৮। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১০৬।

১৯। সুরজিৎ দাশগুপ্ত ঃ হিন্দুরাষ্ট্রবাদীরা কি চান? আবার কি বর্গীর হাঙ্গামা শুরু হবে? (কলকাতা ঃ কমলেন্দু ধর ঃ প্রকাশকাল অনুল্লিখিত), পৃঃ ১৮-২২।

২০। পল কেরেরাবেন্ড ঃ ফেয়ারওয়েল টু রিজন (লন্ডন ঃ ভার্সো, ১৯৮৭), পৃঃ ১১।

২১। মিশেল ফুকো ঃ 'ইরান ঃ দ্য স্পিরিট অফ এ ওয়ার্ল্ড উইদাউট স্পিরিট', দ্রষ্টব্য, মিশেল ফুকো ঃ পলিটিক্স, ফিলজফি, কালচার ঃ ইন্টারভিউজ এ্যাণ্ড আদার রাইটিংস ১৯৭৭-১৯৮৪, (নিউ ইয়র্ক ঃ রুটলেজ, ১৯৮৮)।

মরীচিকাও যে নেই

হাসান আজিজুল হক

সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র চুপ করে গেছে। দশই কি এগারোই ডিসেম্বর শিরোমণির যুদ্ধ শেষ। ফুলতলার এদিকটা একেবারে শান্ত। ভারতীয় বাহিনীর পেছনের অংশটা ফুলতলা ছেড়ে আরো সামনের দিকে চলে গেছে। কামানগুলোও থেমেছে। মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের দেখি দীপ্তমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরনে সবুজ লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, কাঁধে রাইফেল। আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ বলতে এরাই মাঝে মাঝে রাইফেল চালাচ্ছে আকাশমুখো। তীব্র শিস দিয়ে বাতাস কেটে বুলেট ছুটে যাচ্ছে। কি করে ছুঁড়তে হয় গুলি দেখার জন্যে ওদের হাত থেকে রাইফেল নিয়ে আনাড়ি হাতে ট্রিগার টানছে কেউ। হি হি করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে মানুষ। রোদে তাতে বৃষ্টিতে পোড় মুক্তিযোদ্ধার তামাটে মুখে সরল হাসি। হাটে-বাজারে পথে-ঘাটে মানুষের ভিড়। খণ্ড খণ্ড বিজয়-মিছিল আপনা-আপনি তৈরি হয়ে উঠছে।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের তখনো বাকি। রাজাকার আলবদরদের চৌদ্দই ডিসেম্বরের দুষ্কর্ম কারো কল্পনায় নেই। মানুষজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জমছে গ্রামের মাঝখানে। স্কুলের মাঠে বা মসজিদ-মন্দিরের উঠোনে। সেখান থেকে চলে আসছে হাটেগঞ্জে। আশ্বস্ত উদগ্রীব চেহারা তাদের। নয় মাসের নরকবাসের চিহ্ন তাদের শরীরে। যার কোথাও আঘাত লাগেনি, তারও ভেতরে একটানা যে আগুন জ্বলছে তাতেই পুড়ে কালো হয়ে গেছে তার শরীর। পরস্পকে জড়িয়ে ধরছে তারা। জড়িয়ে ধরে পরখ করার চেষ্টা করছে অন্যেরা বেঁচে কিনা, নিজেরা বেঁচে আছে কিনা,

হাত বুলিয়ে দেখতে চাইছে রোদ সত্যি কিনা, গাছপালা মাটির অস্তিত্ব আছে কিনা, শরীরে পানির ছোঁয়া অনুভব করা যায় কিনা। মানুষের উত্তাপে বাজারের জিনিসপত্রগুলো পর্যন্ত ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। ভৈরব নদীর পাড়ে গিয়ে আমি কতোদিন পরে জোয়ার-ভাটা দেখতে পাই। নদী ভেতর থেকে ফুলে উঠেছে। তারপর ভাটার টানে শব্দ করে নেমে যাচ্ছে সাগরের দিকে। বাজারে ঢুকতেই দেখা যায় চৌমাথায় সুপারি গাছটা এখনো পোঁতা রয়েছে। ঐ গাছে দড়ি দিয়ে সাতদিন ঝোলানো ছিলো শহীদ রফির মাথা। রফির কথা আজ নয়। শুধু এইটুকুও বলি, ওকে দেখে মনে হতো যেন মহাকাব্য থেকে উঠে এসেছে নায়ক ,একিলিস। ছ'ফুটের বেশি লম্বা টকটকে ফর্সা যুবক। খুব পবিত্র আগুন ছিলো তার দু'চোখে। ট্রয়ের প্রাচীর ধরে হেকটরের পেছনে ছুটছে একিলিস। যে ঘটনা রফি ঘটিয়েছিলো তা আমি দেখিনি, আমার চোখে শুধু ভেসে ওঠে রফি পিছু নিয়েছে পাকিস্তানী বাহিনীর এক সহযোগীর। মাথাটা নিয়েছিলো তার। তারপর একদিন ধরা পড়লো সে। অকথ্য নির্যাতনের পর রাজাকারের একটি দল মৃতপ্রায় রফিকে নিয়ে এলো চরম দণ্ডের জন্যে। ভৈরবের পাড়ে হাঁটু গেড়ে বসলো রফি। সামনে নদী, বিরাট একটি গুদারা নৌকো ভৈরবের শান্ত স্রোত ধরে নিচে খুলনার দিকে নেমে যাচ্ছে। ধীরলয়ে দাঁড়ের শব্দ আসছে ছপছপ, পাখির ডাকে নির্জনতায় কি অসীম শান্তি। যারা রফির পিঠের দিকে রাইফেল উঁচিয়ে লক্ষ্য স্থির করছে, রফি তাদের বলছে, সাবধান, গুলি আমার পিঠ ফুঁড়ে মাঝিদের গায়ে লাগবে, নৌকাটাকে পেরিয়ে যেতে দাও। সূর্যের আলো তখন নিভে আসছে। ওর ছোট চুলে ভরা মাথাটা নিয়ে যেতে রাজাকারটি বার বার পা ভেঙে পড়ে যায়।

চৌমাথায় সুপারি গাছে দড়ি দিয়ে রফির মাথাটি ঝুলিয়ে ঢেড়া পিটিয়ে জনশূন্য বাজারের মোড়ে জানিয়ে দেয়া হয়, এই মাথা যে সরাবে তার মাথাও ঐভাবে টাঙিয়ে রাখা হবে। একটা দুর্জ্ঞেয় শ্লেষভরা হাসি নিয়ে রফি চেয়ে থাকে। তার চোখ দু'টি কেউ বন্ধ করে দেয়নি। আমি একদিন বাসে যেতে যেতে মুহূর্তের জন্যে দেখেছি—আমি জানতাম না একদিন আগে রফির মুণ্ড ঐভাবে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে—একটা দ্রুত ধাবমান সময়—ফিতেয় আটকানো দৃশ্যটি দেখতে পেলাম। এককোঁটা রক্ত নেই রফির মুখে। ধবধবে কাগজের মতো নিষ্কলঙ্ক নিদাগ মুখ তার, তাতে একটি দুর্জ্ঞেয় হাসির বাঁকা রেখা টানা। শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিলো মুণ্ডটির আমি জানি না কিন্তু সুপারি গাছটি বরাবর পোঁতা ছিলো। সেই গাছের নিচে রফির মা। এতদিন পরে তার পক্ষে চোখ ভেজানো কঠিন, মায়ের অশ্রু তো কাউকে দেখানোর জন্যে নয়। শূন্য চোখে চেয়েছিলেন তিনি, মানুষজন আশেপাশে হাঁটছিলো, জটলা করছিলো, হল্লা-হল্লোড়ে ফেটে পড়ছিলো। কেউ কেউ

দাঁড়াচ্ছিলো তার পাশে। কিন্তু তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। হয়তো শূন্যে, বহু টুকরো জোড়া দিয়ে, আবছা, বিভ্রান্তিকর, ছোটো রফি, বড়ো রফি, কোলের ঘুমন্ত রফি এইসব নানা রফির উজ্জ্বল, জ্বলন্ত, বিবর্ণ, ছাই ছাই ছবির টুকরো জোড়া দিয়ে তিনি রফির মুখটা তৈরি করে নিতে চাইছিলেন। না, রফির মা কখনো মঞ্চে ওঠেননি, একটিও ফুলের মালা তাঁর গলায় পরানো হয়নি, এক ইঞ্চি বাড়েনি তাঁর ভিটের সীমানা। রফি ছিলো, রফি নেই—মাত্র এইটুকু তফাৎ তার কাছে। একদিকে জীবন, আর একদিকে মৃত্যু। বেঁচে থাকতে থাকতেই তিনি মৃত্যুর অতলে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

শিরোমণি যুদ্ধের এলাকায় আমি একবার যেতে চাইছিলাম। যুদ্ধ থেমে গেছে। সৈন্যরা চলে গেছে ওখান থেকে। সৈন্যদের ভিড় এখন দৌলতপুর থেকে খুলনায়। পাকিস্তানী সৈন্যদের নিরস্ত্র করা হচ্ছে, নিরাপত্তার জন্যে বিহারীদেরও আলাদা করে ফেলা হচ্ছে। এখানে সেখানে একটি দুটি প্রাণ নিচ্ছে সিসের বুলেট। আক্রোশেই প্রাণ যাচ্ছে কারো। বিচারের রাস্তা লম্বা। প্রাণ যখন নিতেই হবে, অনেক প্রাণ নেওয়ার অপরাধে যে অপরাধী তাকে যখন সামনে পাওয়া গেছে, তখন কাজটা খুব সংক্ষেপে মুহূর্তের মধ্যে করাটাই ঠিক। নৃশংসতম নরঘাতকেরও চোখের দিকে চাইলে, বাঁচার কামনা তার দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হতে দিলে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, তার নিজস্ব গল্পটি একবার শুনতে শুরু করলে প্রাণ নেওয়া খুব কঠিন। এই কঠিন রাস্তায় না গিয়ে হাউয়ের মতো উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল কিছু প্রাণ। মানুষের জমাটবাঁধা কান্না বিজয় উৎসবে আছড়ে পড়ছে। কি ভয়ানক তিক্ত অশ্রু মানুষের চোখে।

শিরোমণির দিকে কোনো যানবাহন যাচ্ছিল না। খুলনা থেকে যশোর হয়ে নানা রাস্তায় যেসব বাস যাতায়াত করতো সে সব বন্ধ আছে অনেকদিন। গত এক সপ্তাহ রাস্তা রয়েছে সেনাবাহিনীর দখলে। আমি যেতে চাইলেও খুলনার দিকে যাবার উপায় নেই। বোধ হয় বারো তারিখের বিকেল তিনটের দিকে একটা পুরনো, ভাঙা, বেতো, ফুলতলা-খুলনার লোকাল বাস অনেক সাহস করে খুলনার দিকে যেতে রাজি হলো। ড্রাইভার ছেলেটিকে আমি চিনি, অসম্ভব বেপরোয়া। বাস সে রাস্তার বাইরে চালাতেই বেশি পছন্দ করে। কিন্তু আমি জানি লক্কড়ে বাসটিকে নিয়ে সে তেমন কিছু করতে পারবে না।

শিরোমণির কাছে এসে আমি ছেলেটিকে আস্তে বাস চালাতে বলি। সামনের কালভার্টটি উড়ে গেছে, রাস্তায় একটা বিরাট গর্ত। বাঁ দিকে একটি ঘন বাঁশ-বাগান। জায়গাটা দিনের আলোতেও অন্ধকার থাকতো। দেখি অতবড় বাঁশবন তছনছ হয়ে গেছে। পাকা বাঁশের মাথাগুলো থ্যাতা হয়ে পাকানো দড়ির মতো ঝুলছে। মাঝখানে ভেঙে দুভাগ হয়ে গেছে।

গোড়াসুদ্ধ উপড়ে শূন্যে দুলছে মোটা মোটা বাঁশের গুঁড়ি। বাজারটা বাদ দিলে চারদিকে ফাঁকা মাঠ। একেবারে ফুটিফাটা হয়ে আছে। সমস্ত মাঠ জুড়ে অসংখ্য ট্রেঞ্চ, কাঁচা মাটি উঁচু হয়ে রয়েছে। বাজারে ঢুকতেই দেখা গেল রাস্তার উপরে বাসের সামনে পড়ে রয়েছে এক দাঁড়িওলা বাউলের লাশ। হাতের দোতরাটি ছিটকে পড়েছে হাত দশেক দূরে, লুঙ্গি-পরা ছেঁড়া জামা গায়ে লোকটি হাঁটু ভাঁজ করে নিশ্চিন্তে পড়ে আছে, রাস্তার উপরে। ওকে পাশ কাটিয়ে বাস এগোতেই চোখে পড়ে, বাজারের একটি বাড়িও আস্ত নেই। দেওয়াল ভেঙে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে বেশ বড়ো একটি দোতলা বাড়ি। দেয়ালের ওপর দেয়াল—সব ভেঙে এক জায়গায় স্তূপাকার হয়ে আছে। আঘাতের প্রচণ্ডতায় ইঁট গুঁড়িয়ে মিহি লাল ধুলো সমস্ত ধ্বংসস্তূপটিকে ঢেকে দিয়েছে। মেলে-দেওয়া শাড়ির মতো বড়ো একটি বারান্দা ঝুলে আছে, হাড়-পাঁজরের মতো বেরিয়ে এসেছে লোহার রডগুলো। বাউন্ডারী পাঁচিল-গুলোয় বড়ো বড়ো ফুটো। কোথাও একটি জনপ্রাণী নেই। শীতের বিকেলের আলোয় এই বিরাট লণ্ডভণ্ড এলাকাটিকে আমাদের চেনা পৃথিবীর অংশ বলেই মনে হচ্ছিল না। বাজারটা যখন প্রায় পেরিয়ে এসেছি তখন দেখতে পেলাম রাস্তার কিনারায় দুটি পাকিস্তানী সৈন্যের লাশ। তাদের শরীরে জওয়ানের পোশাক। স্বাস্থ্যে মাংসে পরিপুষ্ট দুটি বিশাল শরীর, ছোটো করে চুল ছাঁটা, খুব অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। একটু দূরেই মোটাসোটা একটি কালো দেশি কুকুর। এর মধ্যেই হাওয়াভরা থলের মতো ফুলে উঠেছে তার দেহ। তখন আশেপাশে চোখ ফেলে দেখতে পাই, রাস্তার কিনারায়, ঢালু জায়গাগুলোতে, রাস্তার নিচের চকমকে ঠাণ্ডা কালো পানির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষ, গরু-ছাগল কুকুরের লাশ। আরো দূরের মাঠের দিকে চেয়ে আমার গা শির শির করে ওঠে। সমস্ত মাঠে ইতস্তত অসংখ্য মানুষ গরু-ছাগল মরে পড়ে রয়েছে। ট্রেঞ্চগুলোর গায়ে দু'চারজন পাকিস্তানী সৈন্য বসে আছে। হয়তো উঠে এসেছিলো ট্রেঞ্চ থেকে, পালাবে বলে কিংবা উঠে এসে আত্মরক্ষার জন্যে লড়বে বলে—এখানেই মারা পড়েছে—তারপর শক্ত হয়ে গিয়েছে শরীর। আমি দেখতে পাচ্ছি না, নিশ্চয়ই ট্রেঞ্চ-গুলো ওদের মৃতদেহে ভরা। প্লেগের ইঁদুরের মতো মরে গাদা হয়ে আছে। বিরাট একটি মাঠে এইভাবে ছিটানো মৃতদেহ দেখা কি এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা কঠিন। মৃত্যুর বীভৎসা এখন আর নেই। প্রতিটি মৃত্যুর সঙ্গে অশেষ যন্ত্রণা থাকে। শারীরিক যন্ত্রণা তো থাকেই—চেতনাহীনতার মধ্যে মৃত্যু এলে বা বিদ্যুতের মতো তীব্র গতিতে মৃত্যু তার কাজটুকু করে গেলে অবশ্য কথা নেই—কিন্তু বুদ্ধি আর চেতনা সক্রিয় থাকলে মৃত্যুর মুহূর্তে শারীরিক যন্ত্রণার পাশাপাশি আত্মিক সংকটেও মানুষ ছিন্নভিন্ন হয়। নিজের:

রক্তে নিজে ভেসে যেতে যেতে, শরীর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া নিজের হাত বা পা দেখতে দেখতে অমোঘ মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কেমন বোধ করে মানুষ? শিরোমণির মাঠ যুদ্ধের রাতে-দিনে আক্রোশ, শোচনা, কষ্ট, হতাশা, ক্ষতির আর্তনাদে পরিপূর্ণ ছিলো। এখন এই মাঠ এমন ভয়ানক নিস্তব্ধ যে মনে হত মৃত্যুও একে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। খোলা প্রান্তরে তাকালে দেখা যায় কোথাও মাটি উঁচু হয়ে আছে, শুকনো মরা কোনো গাছের গুঁড়ি উবু হয়ে পড়ে রয়েছে, কোথাও আটকে আছে পানি, কোথাও দেখা যাচ্ছে উঁই ঢিবি বা ঘন ঝোপ-জঙ্গল বা শ্যাওলার শুকনো গাদা। এদেরই সঙ্গে মিশে গেছে পাকিস্তানী সৈন্যদের লাশ। মৃতদেহের সজীবতা হারিয়েছে তারা। মৃতের সামনে দাঁড়ালে তা অশ্রু টেনে আনে, স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, নীরব হাহাকারে বাতাস ভারি করে দেয়। কিন্তু পাকিস্তানীদের এইসব লাশ প্রকৃতির বর্জ্য পদার্থের মতোই এই মস্ত প্রকৃতির মধ্যে পড়ে আছে যেন উঁই ঢিবি, যেন শুকনো শ্যাওলার গাদা, যেন পিছন উল্টোনো মরা গাছের গুঁড়ি। কেউ তাদের শেষ বিদায় জানায়নি। যেমন কুকুরটি মরে এখন তাড়াতাড়ি ফুলে উঠছে, শোক নেই, অশ্রুর অভিষেক নেই, ঠিক তাই ঘটেছে পাকিস্তানী সৈন্যদের ভাগ্যে।

বাস ততক্ষণ আমারই অনুরোধে থেমেছিলো। সদ্য পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্র দেখা আমাদের কারো অভিজ্ঞতায় নেই। ড্রাইভার ছেলেটি শুধু আমার কথাতেই গাড়ি থামিয়েছিলো সেটা ঠিক নয়। তার নিজের আগ্রহ কম ছিলো না। সামান্য যে কয়েকজন যাত্রী ছিলো বাসে তারাও নেমে গিয়েছিলো। বাস আবার চলতে শুরু করলে ড্রাইভার আর যাত্রীরা খুব নিষ্ঠুর আশালীন রূঢ় ভাষায় নিজেদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে লাগলো।

বাসের লোকজনের কথা আর আমার কানে ঢোকে না। জনহীন ঘরবাড়ি গাছপালা মাঠ প্রান্তরের ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে বাস চলতে থাকে। শীতের সন্ধ্যার অন্ধকার তাড়াতাড়ি নেমে আসে। আমার মনে হতে থাকে জীবন মৃত্যু দুই-ই এই অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু সন্ধের মুখে দৌলতপুরে ঢুকতেই দেখা যায় রাস্তায় লোক ভরা। পথের মোড়গুলোতে লোকজন গিসগিস করছে। ভারতীয় সৈন্যদের দেখা যাচ্ছে এদিক-ওদিক। বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ছে মাঝে মাঝে। প্রচণ্ড হুল্লোড় আর বিস্ফোরণের আওয়াজে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। এর মধ্যেই কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে আমাদের ছোট্ট বাসাটির সামনে এসে দাঁড়াই। সঙ্গে চাবি ছিলো। যাবার সময় বাড়িতে তালা দিয়ে চাবি নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। এখন দেখছি বিনা কারণে চাবি এনেছি। দরজা হাট করে খোলা। ঘরের মধ্যে ঢুকে সুইচ টিপতেই আলো জ্বলে উঠলো। যাক বিদ্যুতের লাইন নষ্ট হয়নি। সবগুলো ঘরের আলো

জ্বালিয়ে দেখি কোনো জিনিসই খোয়া যায়নি। বিছানার নিচে ছিলো আমার একটি পুরনো দোনালা ইংলিশ বন্দুক। সেটা যেমন রেখে গিয়েছিলাম তেমনিই আছে। শুধু মেঝে আর বিছানার উপর দেখতে পাই মোম জাতীয় কোনো পদার্থ মাখানো গাদা গাদা সরু সাদা পাটকাঠির মতো জিনিস। মেঝে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে এগুলো দিয়ে। বুঝতে পারলাম না কি হতে পারে। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখি, বস্তাখানেক চাল ছিলো রান্নাঘরে সেটা নেই আর নেই কোনো খাবার জিনিস। উঠোনোর এক কোণে কলাগাছে ঝাড়ে একটি গাছ ছিলো এক কাঁদি কাঁচকলা। কলাগুলো আধখানা করে কেটে নেওয়া হয়েছে। ঘুরে ঘুরে আর কোনো ক্ষতির চিহ্ন আমি দেখতে পেলাম না। কি খেয়াল হলো হাতে করে কয়েকটি ঐ পাটকাটি জাতীয় জিনিস নিয়ে আমি উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। পকেটে দিয়াশলাই ছিলো, একটা কাঠি জ্বালিয়ে ওতে ঠেকাতেই হুস করে একটা সাদা আলো গোখরোর ছোবলের মতো আমার হাতে এসে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম এই অতিশয় দাহ্য পদার্থগুলো কি জন্যে ঘরের মেঝেয় গাদা করা আছে। বাড়িটিতে পলাতক পাকিস্তানীরাই ছিলো। ভয়ে আধমরা এই সৈন্যদের লুটপাটের দিকে মন দেয়ার উপায় ছিলো না। ক্ষুধার্ত পশুর মতো চাল-ডাল আর কাঁচকলা খেয়েছে। সামান্য অজুহাতে বাড়িটাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবার জন্যেই সঙ্গে এনেছিলো ভয়ানক দাহ্য কাঠিগুলো। এই কাজটি করার আগেই বাড়ি ছাড়তে হয়েছে তাদের। কলেজে অধ্যক্ষ ফিরে এসেছেন। কিছু কিছু অধ্যাপক ও কর্মচারীও নিজেদের বাসায় এসেছেন। শোনা গেল, একজন ভারতীয় মেজর কলেজের নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন।

কোনো কিছু না খেয়ে, আলো না জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করে আমি নোংরা খাটে শুয়ে পড়ি। সমস্ত বাড়িতে আমি একা জানালা দিয়ে রাতের আকাশ দেখা যাচ্ছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধতা বাড়ছে, তার গায়ে আছড়ে পড়ছে অনেক দূর থেকে আসা মানুষের উল্লাসের গর্জন। তীব্র কড়াৎ শব্দে ফেটে পড়ছে রাইফেলের আওয়াজ। সান্ত্বনাহীন বিশ্রামহীন ঘুমে আমার দু'চোখের পাতা জড়িয়ে আসে, আবার জেগে উঠি, অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকি, ফেলে আসা নয়টি মাসের ছবি শরীরী বাস্তবতা নিয়ে ফিরে আসে— তাতে ধারালো পাথরে খাঁজগুলো স্পষ্ট অনুভব করতে পারি কি সাংঘাতিক ছায়া আর পানির অভাব তাতে আবার ঘুম আসে খাঁজগুলো বৃক্ষহীন পাথুরে পাহাড়ের গা বেয়ে হিম অতলের দিকে নেমে যেতে থাকি ঘুম ভেঙে যায়, তপ্ত অশ্রুর স্রোত চোখের কোণ বেয়ে তেলচিটে নোংরা বালিশটা ভিজিয়ে দেয়, হঠাৎ ক্রোধে মাথার তালু জ্বলে ওঠে, দু'হাতে মাথা চেপে উঠে বসি। কেউ কোনো উত্তর দেয় না।

ভবাম্মি দাসম

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

মানুষ মোহমুগ্ধ জীব, প্রকৃত জীবনের জন্য তাকে তাই ভাবের ওপর নির্ভর করতে হয়। নিজেকে সক্রিয় রাখে যে অনুভব, অভিজ্ঞতা বা কাজ করার ইচ্ছে, তার ভেতর দিয়েই নিজের কল্পনাকে রচনা করে তোলার যে প্রবণতা তা থেকেই জীবনের প্রতি আসক্তিটা স্পষ্ট বোঝা যায়। নিজেকে তার ভালোবাসার যে সহজ নৈপুণ্য, রক্ত শীতল হয়ে এলে মনে হয় সেখানেও ফাঁকি ছিল। নিরলস সেবার সূত্রে যে সংসার জীবন, ইহকাল বা পরকালের দাবি, প্রেম অথবা প্রার্থনা যে কোন কিছুই যেন নির্দিষ্ট অন্ধকারে অনিবার্য-তায় অপসৃয়মান হতে হতে লীন হয়ে যায়। কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আছে, তার মধ্যে একটি হল জিজ্ঞাসাবোধ অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় অনেক সময় বীতস্পৃহাও জাগে, তখন সরল সুখ থেকে সরে এসে মানুষ স্বেচ্ছানির্বাসন বেছে নেয়। যে কোন সম্পর্কের দিকেই তখন সন্দেহের চোখে তাকিয়ে দেখা, বিচারের বৃথা চেষ্টা। যাপিত জীবন এভাবেই একসময় ভ্রান্ত প্রমানিত হয়। হাজার অনিচ্ছাতেও মিথ্যের সঙ্গে রফা করে আরো কিছুকাল থাকতে হয় মানুষকে। নিজের ওপর নয় যেন অন্য কারো ওপর নির্ভর করে। কেননা বাঁচার আকর্ষণ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। কোনকিছু নেই এটা জেনে গেলে মানুষ নামের জৈব সামাজিক প্রানীটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং পূজো, ঘৃণা আর লাভের প্রত্যাশা শীর্ণ হয়ে এলেও একটা আশা থেকেই যায় তা হল স্বর্গের লোভ। শান্তির

ঈপ্সা। আর তখনই চেতনায় বৃষ্টির ধারা নামতে থাকে। মনে হয় এতকাল কেন ঘটেনি,—এটাই তো শরীর ও মনের জন্য সবচেয়ে জরুরী। চৈতন্যর শুশ্রূষা করার চেয়ে বড় স্বাস্থ্যচর্চা আর কি হতে পারে। আর এই সময়গুলিতে মানুষের যে তথাগত চিন্তা তারই প্রলোভনে পড়ে যে কেউ। এখন চেষ্টা করলেই দেখা যাবে পার্থিব আর অপার্থিবের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ঐক্য স্থাপিত হয়েছে কিভাবে। সুগভীর বন্ধন। বিচিত্র ও দুর্জ্ঞেয়। শুধুমাত্র ভাবরূপের মধ্যে তার হদিস মেলে না। মুসকিল বাধে। আজগুবী কল্পনা থেকে অভ্যাসে ফিরে আসতে গিয়ে বার বার হোঁচট খায় মানুষ। ফলে নগরসভ্যতা, যন্ত্রশিল্প, ইন্দ্রিয়সম্ভোগ কিংবা বিজ্ঞানচর্চা সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসে। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে, স্নায়ুগুলি শিথিল হয়ে আসে,—লজ্জাবতী লতার মত তখন মানব দেহ, কেউ এসে ছুঁয়ে দেওয়ার আগেই সে চোখ বন্ধ করে ফেলে।

এভাবেই ঘুম এসে গিয়েছিল বুলার চোখে। একটি জীবন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বহুভাবে বাঁচল সে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তেতো মনের আকাশে হালকা বাসন্তী রঙ জেগে ওঠে যখন তেতো ভাবটা কেটে যায়। ফলের কথা না ভেবে কাজ করে যাও এই উপদেশ শুনে শুনেই এতকাল কাটল। কিন্তু তার কি কম জানতে ইচ্ছে করেছে যে কিসের আশায় সংসার নামের এই মরুভূমিতে পড়ে থাকা। কেন এত ঋণ। ছোট ছোট পাপ, ভাব বা ভাবনা কেন? কার প্রত্যাশায় এই শিরাউপশিরা এমন স্নায়ুচাপা কান্নায় কাঁদে। শরীরে কত দাগ—কত নখের আঘাত পেয়েও নীরবে সবকিছু সহ্য করে যাওয়া কিসের প্রতীক্ষায়। এত কৌতুক কাহিনীকে জীবন নাম দিয়ে কেন এই আবেগে লালন করে যাওয়া? খণ্ড খণ্ড ভাগ্যের হিসেব নিকেশে বসতে ইচ্ছে করে আজ। উদ্বেগে জীয়ানো আশা, কিংবা আশাভঙ্গের মনস্তাপ সমস্ত কিছুকে উত্তরের হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। আর উড়িয়ে দিলেই পাঁজরের ওঠানামা, শরীরে টান, বাঁকা ভুরুর নিচে ভাঙা রেখা মুছে যায়,—দু চোখে ঘুম নেমে আসে।

স্বামী, সন্তান, আত্মীয় বা ঈশ্বর সবকিছুই বুলার কাছে এখন কাল্পনিক মনে হয়। যেন সবাই চলে গেছে অস্তাচলে, পড়ে আছে শুধু সে একা। আগ্রহী চোখ তার নিস্পলক চেয়ে ঘুমের নীলিমায়। চিরকালের যে অভ্যস্ত আহ্লাদগুলি, এখন তার মনে হচ্ছে তা আসলে ছিল আনাড়ী মনের পাগলামি। এই সেদিনকার কোথাও হেঁটে যাওয়াটিও আজ রহস্যময় মনে হচ্ছে। জাগছে আত্মজিজ্ঞাসা।

বুলা দেখল তার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা রোদের মধ্যে কে যেন হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছে। দু পায়ে বালি মাখানো অন্ধকার নিয়ে সে হাঁটছে,

কেননা এতকাল হেঁটেছে ভুল পথে। সংসারের সেই যাবতীয় হাসিগুলিকে এখন সত্যিই অবান্তর মনে হয়। চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য একটা চাপা বাতাস, আর তারই ওপর ঝরে ঝরে পড়ছে সকালের আকাশ থেকে ভোঁতা হয়ে থাকা তারাগুলি। সংসারের ঘোরালো ধোঁয়ায় হাঁপাতে হাঁপাতে বুলা যেন এই প্রথম একটু মুক্তির নিশ্বাস ফেলল। আজ কাউকে নতুন করে আবার প্রতিশ্রুতি দিতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু ঘুমের এই জগতে থেকেও যেন পরিপূর্ণ নিস্কৃতি নেই। অন্য একটি জগত থেকে ছুটে ছুটে আসছে বাসনকোসনের ঝনঝন শব্দ, পোষা ময়না পাখির ডাক, কিংবা রান্নাঘর থেকে সিলিন্ডারের শোঁ শোঁ শব্দ। এসব আসছে কলকাতা থেকে। এ সকালে বুলার প্রিয় শহর ছিল, এখন মনে হয় খালি মাংসের প্রাচীরে ঘেরা একটি স্থূল কারাগার।

নিজেকে শক্ত করল বুলা, ফিরিয়ে নিল। সংসারের শেকলে আছে যে সংঘাতের বীজ আজ আর তার ভালো লাগল না। তার থেকে ঘুম ভালো, তার কোলে মুখ গুঁজে ফোঁপানো ভাল। তাই কলকাতার যাবতীয় স্মৃতি বা নিজের নাম ও ঠিকানা আস্তে আস্তে গলে গলে ঘুম হয়ে যাচ্ছে আজ।

ঘুমের ভেতর আবার দুলে উঠল সেই গাছটা।

মারাত্মক সবুজ আর ঝাপালো গাছ। লাল নীল হলুদ অনেক রকম ফলে ভরে আছে ডালপালা। বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে পাতাগুলি, ছায়ার একটা চিকরিকাটা নক্সা এঁকেছে—সেই গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকার দরুণ ওই নক্সা এখন বুলার গায়ে মাথায়। শাড়িতে। মাথার চুলে পড়ে নাচছে। পাতার আড়ালে দুলে দুলে সরে যাচ্ছে ফলগুলি। হাত বাড়ায় বুলা, কিন্তু হাসিতে খলখলিয়ে পাতার আড়ালে সরে যায় ফল, কিছু পরে আবার মুখ বাড়ায়। উঁকি মারে। লুকোচুরির খেলা চলতে থাকে।

কোন ক্লান্তি নেই, বেশ কিছুকাল ধরেই স্বপ্নে এই ফলে ভরে থাকা গাছটিকে দেখছি তো। আর হাত বাড়িয়ে পেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে একটি ফল। ফল নয়, যেন পরীক্ষার পর দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থাকা ছেলেবেলার সেই মার্কসীট। বুলার খুলে দেখতে ইচ্ছে করছে কোন বিষয়ে সে কত নম্বর পেয়েছে। কিন্তু সে কি এত সহজ, ফল যে কিছুতেই নাগালে আসতে চায় না।

তীব্র স্নেহের মাতামাতি যেমন তেমনি বাতাসের দোলায় ফলে ফলে ঠোকাঠুকি হয়। খুশির দমকে, ভেতরে উজিয়ে আসা রসের দমকে যুবতী মেয়ের মত ফলগুলি লাস্যময় সরে যায়। গভীর ইচ্ছার সরোবরে দাঁড়িয়ে পথিক যেমন আকুল তৃষ্ণায় ঘুরে বেড়ায় তেমনি ফলের ওই উন্মত্ত বাজনার সঙ্গে বাজতে লাগল বুলা। স্কিপিং করার মত যথা নিয়মে লাফাতে লাগল বুলা একটি ফল ধরার আশায়। ফলের সেই বোবা আড়ষ্ট ইঙ্গিত তাকে প্রলুব্ধ করল।

লাফাতে লাগাতে হঠাৎ সে অবিশ্বাস্য ভাবে ধরে ফেলল একটি ফলকে। হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিল ডাল থেকে। গাছ থেকে যেন টুং টাং মিঠে নাচে ফলটি নেমে এল তার পাগল দশটি আঙুলের ডগায়। যেন ফল নয়, একটি কড়সড় অগ্নিবিন্দু। আগুনের ফুলকি তার আলো আছে কিন্তু তাপ নেই।

স্পর্শে টসটসে রসে ভরা সেই ফলটিকে বিজয়ের উন্মত্ত আবেগে দুই হাতের তালুতে অনুভব করল বুলা। শুধু থমকে দাঁড়াল একবার, জিজ্ঞাসায় কেঁপে উঠল বুক, তাই তো ভেতরে কি আছে, কেমন স্বাদ। ঠোঁটের বাঁকে আগ্রহ উপচে এল তার। পায়ের তলার মাটি যেন ভূমিকম্পে নড়ে নড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু কাঁধ ও কোমর শক্ত রাখল সে। ভার বহনের চাপে নিজে নুয়ে পড়ল না। নিজের রঙ-চটা হাতের ওপর রঙিন ফলটা সত্যি অদ্ভুত লাগছে। ভীষণ তেষ্টা পেল তার, সে ফলের মধ্যে কামড় বসাল তীব্র ভঙ্গিতে।

ঘুম ভেঙে গেল তার।

কিন্তু বিছানায় উঠে বসেও আশ্চর্যভাবে বুলা দেখল তার হাতের স্বপ্নের সেই ফলটি, সদ্য কামড় দেওয়া, আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে অপরূপ এক আলোর বিভা।

দুই হাতের চাপে ফলটিকে দুভাগ করল বুলা। দেখল তীক্ষ্ণ তীরের মত তার থেকে আলোর রশ্মি বেরিয়ে আসছে, নীল সাদা বিদ্যুৎ রেখার মত অসংখ্য রশ্মি ফলের ডগমগে রসে ঠাসা আছে। যেমন একটি তাঁতের শাড়ি অসংখ্য সুতোর বোনা তেমনি যেন এই ফলটি বোনা হয়েছে রসালো ওই আলোর বিন্যাসে।

বর্ণ সাংঘাতিক এই আলো তীব্র স্ফটিকের মত, যেমন প্রথম আষাঢ়ের বৃষ্টি নামে তেমনি ফল থেকে তার হাতেই ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা রস। ছাদের ওপর চঞ্চল কাঠবেড়ালীর মত চঞ্চল সেই আলোর রেখা একটি একটি করে ফল বেরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে চকিতে, মিশে যাচ্ছে হাওয়ায়। অমনি গাঢ় সেই রঙের কাদায় রসের ভিয়ানে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল বুলা। হাসিতে বিদ্যুতে ভরে উঠল তার মুখ। মুখ আর ফুসফুস। এক একটি আলোর দানা যেন কে নিজের ভেতরে মুক্তোর মত ভরে নিতে লাগল। কিংবা বলা ভালো তীরের মত বিঁধে যেতে লাগল তার শরীরে।

নীল আর সাদায় মেলামেলি স্ফটিক আলোয় ভরে উঠল তার রক্ত, মজ্জা, হাড় ও মাস। শিরা উপশিরার বইতে লাগল নীল। স্নায়ুগুলো প্রার্থনার ভঙ্গিতে নুয়ে পড়তে লাগল শরীরেই। কাতর হয়ে এল হৃৎপিণ্ড। কিন্তু অমিত নৈপুণ্যে তার ঠোঁট, দাঁত বা জিভ চেটেপুটে খেতে লাগল ফলটিকে। দপ দপ করে আগুনের মত শরীরে ঢুকতে লাগল স্বাদ। অদ্ভুত মিষ্টি আর

অন্তরঙ্গ। সুখ আর সুন্দরে ঠাসা। শান্তির রসে টলমলে এই স্বাদ বুলার কাছে এই প্রথম। ঝড়ের মত ঢুকে যেতে লাগল ভেতরে, অন্তস্থলে।

নীলের মধ্যে অসাড় হয়ে যেতে যেতে বুলার মনে পড়ল সংসারের কথা। ভীড়ের মধ্যে যারা আছে তারা তো তার খুবই অন্তরঙ্গ। আকাঙ্ক্ষার এই সংসারে ছিল যে মায়া তার একটা হ্যাঁচকা টান শরীরে অনুভব করল সে। কিন্তু চেনা মুখগুলি আস্তে আস্তে নিভে যাচ্ছে। রক্তের যারা দোসর তারাও লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ধীরে। কিন্তু শরীরের ভেতর এখন ক্রমাগত আলোর ঢেউ। ঝিমিয়ে পড়ছে বুলা সেই ঢেউয়ের মুখে পড়ে। তারপর অনুভব করল ক্রমে আলোর মধ্যে উধাও হয়ে যাচ্ছে সে। এক নিষ্ঠুর সুন্দর ও দুরন্ত স্রোতে ভাসছে বুলা। নীল রঙ নয় যেন নীল রোদের ওপর গড়ে উঠছে নতুন নগর, তার আর সময় নেই এখানে অপেক্ষা করার, সংসার সাজাতে হবে—জ্বালাতে হবে প্রদীপ। প্রবিষ্ট আলোগুলি এখন তার শরীরের ভেতর যেন অসংখ্য প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠছে। হাড়ের জোড়ন হেসে উঠছে প্রাণ খুলে। বুলা দেখল হাসতে হাসতে খুলে গেল একটা বিরাট দরজা। তার ভেতর ঢুকতে ঢুকতে সে শরীরে টের পেল রামধনুর ছোঁয়া। এই কোমলতার ভেতরে নিজের শেকড় ডুবিয়ে দিল সে। এবার ভেতরের আগুনটা নিভে গিয়ে ঠান্ডার জমে পাথর হয়ে যেতে লাগল শরীর। ডুবে যেতে লাগল নীরবতায়। বরং শরীর থেকে রোমকূপ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল সেই নীল আলোর রোশনাই। আলোতে ভরে গেল ঘর। বিছানা। চারদিকে এই ছড়িয়ে থাকা নীল আলোর আলোড়নের ভেতর পড়ে থেকে প্রথমে নিঃশব্দ হয়ে এল তার শরীর। কোথাও অঝোরে বৃষ্টিপাত হচ্ছে—সে শুনতে শুনতে অনুভব করল অদৃশ্য একটা হিমের করাত যেন তাকে কাটছে। কিন্তু তা বড় মধুর। খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল সে এভাবেই। তারপর ওই সুন্দর নীল আলো চারপাশ থেকে তাকে গুছিয়ে নিয়ে সত্যি সত্যি উধাও হয়ে গেল।

খালি বিছানাটা শুধু পড়ে থাকল সংসারে।

'চাতলের কৃষক আন্দোলন—সূচনাপর্ব' থেকে তেভাগা

রঞ্জন ধর

কমরেড ভবানী সেন লিখেছিলেন,…'দুটি অতিকায় ঘটনা গ্রাম-বাঙলাকে কাঁপিয়ে তোলে; একটি ছিল ১৯৪৩-এর মন্বন্তর আর অপরটি ১৯৪৬-এর তেভাগা আন্দোলন। উভয় ঘটনা পরস্পরাতে পুষ্টিহীনতায় জীর্ণদেহ কৃষক সমাজই নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু ভূমিকা দুটির মধ্যে ছিল তীব্র বৈপরীত্য।'

কমরেড মণি সিংহ লিখেছেন, 'সারা পৃথিবীতে যতগুলি বিরাট বিরাট কৃষক আন্দোলন আজ পর্যন্ত হইয়াছে বাংলার তেভাগা আন্দোলন তাহার অন্যতম। ইহা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

অথচ মন্বন্তরের ইতিবৃত্ত যতটা গুরুত্বের সঙ্গে ইতিহাস ও সাহিত্যে স্থান পেয়েছে, তেভাগা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। মনে হয়, মন্বন্তরের করাল গ্রাস যেমন ব্যাপক ভাবে গ্রাম ও শহরের জীবনকে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত করেছিল, তেভাগা আন্দোলন অবশ্যই সেই হিসাবে তার সঙ্গে তুলনীয় ছিল না; তাছাড়া এটি ছিল কয়েকটি জেলার সীমাবদ্ধ এলাকায় জোতদারের বিরুদ্ধে কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রাম, তাই হয়ত এই আন্দোলন তেমন ভাবে প্রচার-মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়নি, অথবা এ-ও হতে পারে, বুদ্ধিজীবী মানুষেরা শ্রেণী-স্বার্থের দৃষ্টিকোন থেকে এই আন্দোলনের প্রতি তাঁদের স্বাভাবিক অনীহা বসত নির্লিপ্ত থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। তা না হলে তাঁরা দেখতে পেতেন ১৯৪৩-এ যে-কৃষক সমাজ

মানুষের তীব্র মন্বন্তরে অসহায় ভাবে ভাগ্যের হাতে নিজেদের সমর্পন করে কীট-পতঙ্গের মত লাখে লাখে অনাহার ও মৃত্যুর শিকার হয়েছিল, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে গ্রামের নিরক্ষর অসহায় কৃষক-চরিত্রে কী বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে, তারা নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভাগ্যের হাতে মার খাওয়ার বদলে ভাগ্যকে জয় করার মন্ত্র আয়ত্ব করে ফেলেছে। কৃষকের চেতনার এই ক্রম-রূপান্তরের পিছনে আছে কমিউনিষ্ট কর্মীদের প্রত্যক্ষ অবদান, নিরলস কঠোর শ্রম, আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠ আদর্শানুরাগ। কাজটা সহজ ছিল না। কৃষকরা স্বভাবত রক্ষনশীল, জোর করে তাদের বিশ্বাস, ধ্যানধারনা ও সংস্কারের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়, তারা শেখে তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

অবিভক্ত বঙ্গের যে-কটি জেলায় কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী ছিল, ময়মনসিংহ জেলা তার অন্যতম। এই জেলার অধিকাংশ স্থানেই ছিল কৃষক সমিতির শাখা, কিন্তু তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল মূলত যে তিনটি কেন্দ্রে, কিশোরগঞ্জ মহকুমার চাতল তার একটি। আজকের লেখা শুধুমাত্র এই কেন্দ্রটিকে নিয়ে, যেহেতু এর সঙ্গে কৃষক আন্দোলন গড়ার সূচনাপর্ব থেকে আমি যুক্ত ছিলাম। তবু ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দিন-তারিখ মিলিয়ে ঘটনাবলীর বর্ণনা কেমন করে সম্ভব, আর স্মৃতিপটে বা ধরে রাখতে পেরেছি কতটুকু! তবু পিছনে তাকালে দেখতে পাই, সময় এখনও পারেনি সব মুছে দিতে। কিছু ঘটনা, কাহিনী ও মুখ আজও স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত, তারই কিছু টুকরো-টুকরো ছবি তুলে ধরার ইচ্ছা নিয়েই এই প্রচেষ্টা, সবগুলো টুকরো একত্র জুড়ে নিলে হয়ত পাঠক অতীতের হারিয়ে যাওয়া সময়ের ছবির একটি পূর্ণাঙ্গ ক্যানভাসের আভাস পেলেও পেতে পারেন। হয়ত তা ইতিহাসের ছাত্রদেরও কিছু মাল-মশলা জোগাতে পারে।

। ২ ।

কিশোরগঞ্জের ভৈরবগামী ট্রেনের পথে পড়ে মানিকখালি স্টেশন। স্টেশনের এ-পাড়ে চাতল গ্রাম, ও-পাড়ে চাঁদপুর। স্টেশন সংলগ্ন একটি বাজারের পাশ দিয়ে চাতল গ্রামের মাঝ বরাবর চলে গেছে সোজা একটি চওড়া সড়ক, এর দু'পাশে আরও কত গ্রাম, ধানের মাঠ, মন্দির, মসজিদ, হাট-বাজার—মূল সড়ক থেকে ডাইনে বাঁয়ে বেরিয়ে গেছে আরও অসংখ্য ছোট-বড় পথ। এ সব কটিয়াদি থানার মধ্যে। সারা জেলায় এটি একটি বড় থানা, শুধু আকারে নয়, খ্যাতিতেও। এর লোকসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ মুসলমান হলেও এখানে হিন্দু জোতদার ও জমিদার শ্রেণীর আধিপত্য, সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়ি এখানে। একদা এই থানার অন্তর্গত

চাতল, বাশীগ্রাম, আচমিতা, মশুয়া ইত্যাদি গ্রাম ছিল স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ঘাটিকাকেন্দ্র। এই সব গ্রাম থেকে বহু যুবক ত্রিশের দশকের গোড়ায় নিরাপত্তা-বন্দী হিসাবে জেলে ছিলেন এবং দেশব্যাপী রাজ-বন্দীদের মুক্তি-আন্দোলনের ফলে '৩৮—'৩৯ সালে মুক্ত হয়ে বাইরে এসেছেন। আমাদের গ্রাম চাতল থেকেও রাজবন্দী ছিলেন, পাঁচ জন, তাঁদের দু'জন আমার দাদা। খুব ঝাপসা ভাবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে শৈশবের কিছু দৃশ্য। প্রায়ই গ্রামে ভোরের দিকে পুলিশ ঢুকত, তল্লাশী চলত বাছাই করা কিছু বাড়িতে। আমার দুই দাদা জেলে যাবার পরও আমাদের বাড়িতে পুলিশ এসেছে। আমার দুই মামাতো দাদা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন, হঠাৎ পুলিশ এসে তাদের ধরে নিয়ে গেল। কয়েক মাস আটক রাখার পর বোধহয় পুলিশ বুঝতে পেরেছিল তাদের সঙ্গে বিপ্লবী দলের সম্পর্ক নেই, তখন তারা ছাড়া পেল। এরপর বহু বৎসর আত্মীয়-স্বজনরা আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল। একবার পুলিশ গ্রাম থেকে ২০/২৫ জনকে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েক দিন হাজতে রেখে ছেড়ে দেয়। এর পর ভয়ও আতঙ্কে যুব-সমাজ বোধহয় রাজনীতি সম্পর্কে একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে যায়। তারা তখন যাত্রা-থিয়েটার নিয়ে মেতে ওঠে। গ্রামে অভয় দত্ত একজন জমিদার, তাঁর বাড়িতে স্টেজ করে থিয়েটার হতো বছরের বিভিন্ন সময়। পুজো হতো খুব জাঁকজমকের সঙ্গে।

ত্রিশের দশকের একেবারে শেষ দিকে বিভিন্ন গ্রামের এবং আমাদের গ্রামের যাঁরা জেলে ছিলেন, তাঁরা মুক্ত হয়ে ফিরে আসার পর আবার শুরু হল রাজনৈতিক কার্যকলাপ। এতদিন আমরা শুনেছি শুধু কংগ্রেস, যুগান্তর আর অনুশীলন দলের কথা। আমার বড়দা যুগান্তর আর মেজদা অনুশীলন দল করতেন জেলে যাবার আগে। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর বড়দা জেলা কংগ্রেসের একজন সংগঠক, থাকেন ময়মনসিংহ শহরে। মেজদা বাড়িতে রইলেন। তাঁর কাছেই প্রথম শুনলাম কমিউনিজমের কথা। তাঁর কাছে আসা যাওয়া করেন তাঁর জেল-জীবনের সদ্যমুক্ত বন্ধুরা। তাঁরা সবাই কমিউনিস্ট, তাঁদের মধ্যে আছেন নগেন সরকার, খোকা রায়, ক্ষিতিশ চক্রবর্তী, প্রবীর গোস্বামী, পবিত্রশঙ্কর রায়, জগদীশ ভট্টাচার্য প্রমুখ আরও অনেক লোক। তাঁরা তখন কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে ব্রতী। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ, এবং তাঁদের আলাপ আলোচনা ও কার্যধারার মধ্যে ছিল গোপনীয়তার আড়াল, যার মধ্যে আমি সেই অতি তরুণ বয়সে পেতাম এক রকম অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ এবং এটাই বোধ হয় তাঁদের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণের কারণ। তাঁরা প্রত্যেকেই আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁদের কাছে বসে আমি শুনেছি তাঁদের জেল-জীবনের কাহিনী। তাঁরা আমাকে

খুব সহজ করে বোঝাতেন কমিউনিজমের আদর্শ। এ ভাবেই আমাদের গ্রামের নব-প্রজন্মের মধ্যে প্রথম এই আদর্শের প্রতি আমার দীক্ষা। ক্রমশ আমি তাঁদের কাজে জড়িয়ে গেলাম, কুরিয়ার হিসাবে তাঁদের নির্দেশ বা চিঠি-পত্র বহন করে বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন কর্মীর সঙ্গে দেখা করেছি। আসল রোমাঞ্চ ছিল গোপনীয়তার মধ্যে। তাঁরা অনেকেই আমাদের বাড়িতে আসতেন রাত্রির দিকে, অনেক দিন খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর। আমার মা ও কাকীমা আবার খাবার তৈরি করতেন তাঁদের জন্য। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এ কাজ তাঁরা করে গেছেন বিনা অভিযোগে। পরে আমি যখন পার্টির পুরোপুরি কর্মী, পার্টির নেতা ও কর্মী যাঁরা বাইরে থেকে আসতেন, তাদেরও থাকা-খাওয়ার স্থান ছিল আমাদের বাড়ি।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে বিপ্লবীরা চাইলেন জনগণের সঙ্গে, বিশেষ করে কৃষকদের সঙ্গে মিশবেন, তাদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলবেন। কিন্তু অল্প-দিনেই বুঝতে পারলেন, কাজটা খুব সহজ নয়। অনেক বছর তাঁরা সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন কৃষকদের জীবনের সঙ্গে কোন সময় তাঁদের পরিচয় ছিল না, তাদের সমস্যা তাঁরা বোঝেন না। অন্যদিকে, কৃষক ও সাধারণ গরীব ও নিম্নবর্ণের মানুষের চোখে তাঁরা স্বদেশী ডাকাত বাবু, এককালে তাঁদের হাতে বন্দুক-রিভলবার থাকত, যার জন্য তাঁদের জেলে যেতে হয়েছিল। হঠাৎ সেই বাবুদের তাদের মত গরীবদের সঙ্গে মেলামেশার পিছনে কী মতলব রয়েছে, এই নিয়ে তাদের মনে সন্দেহ। এ-সব বিষয়ে কৃষকরা খুব হুঁশিয়ার। তা বলে বাবুদের মুখের ওপর সেই সন্দেহের কথা সোজাসুজি বলার সাহস তাদের নেই। চক্ষুলজ্জারও বাধে। তাছাড়া সন্দেহটা আরও দৃঢ় হয়, যখন বাবু-দের মুখ থেকে তারা শোনে, জমিদারী জোতদারী প্রথার উচ্ছেদের জন্য সমিতি গড়ে আন্দোলন করতে হবে। জমিদারী-জোতদারী প্রথার উচ্ছেদ! এ-ও কখনও সম্ভব? আর এ-সব কথা যাঁরা বলছেন, তাঁরা নিজেরাই তো জমিদার জোতদারের ঘরের ছেলে! সব মিলিয়ে এটা একটা বড় ধন্দ কৃষকদের সামনে। তারা সামনা-সামনি কিছু বলে না, অথবা বড় জোর 'এ-সব তো খুব ভাল কথা বাবু, হলে তো আমরা বেঁচে যাই'—এই বলে কেটে পড়ে। এর বেশি তারা এগোয় না, বাবুদের দেখলে এড়িয়ে চলে। এই ছিল সূচনা-পর্বের অবস্থা।

চল্লিশ দশকের আগে পর্যন্ত সামাজিক জীবন ছিল সহজ ও সরল। অন্তত আমাদের এলাকায়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের পরস্পরের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে ছিল খুবই সহনশীল এবং নিজেদের সামাজিক প্রথাগত বৈষম্যগুলিকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েই তাদের মধ্যে ভাবগত আদান-প্রদান ও হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। জনবসতি

বেশী হওয়ার দরুণ বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে গঠিত পাড়াগুলি ছিল পাশাপাশি। আর সেই সব পাড়ার লোকজনদের মধ্যে ছিল সহজ যাতায়াত। আমাদের বাড়ির বর্গাদারদের অধিকাংশ মুসলমান, তাদের বাড়িতে আমি সব সময় যেতাম, তাদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ছিল চাচী-ভাবী সম্পর্ক। তারাও সব সময় আসত, খাল-বিল থেকে মাছ ধরলে আমাদের না দিয়ে খেত না। তখন পর্যন্ত গ্রামের মানুষ উঁচু-নিচু সম্পর্ক, ছোঁয়া-ছুয়ির বাদবিচার, আচার বিচারের বিধিনিষেধ ইত্যাদির জন্য কেউ কাউকে দোষী ভাবতে অভ্যস্ত ছিল না। তাদের চোখে এ-সব তো যার-যার শাস্ত্র ও সমাজের বিধান, পূর্ব পুরুষরা মেনে গেছে, তারাই বা মানবে না কেন? শহরের মত গ্রামে আব্রুর বাড়াবাড়ি নেই। সাধারণ মুসলমান বাড়ির মেয়েরা বোরখা পরে না। হয়ত আর্থিক কারণেই। অধিকাংশদের সংসার একখানা কি দুখানা কুঁড়ে ঘর নিয়ে, খোলা উঠানে মেয়েদের সারাদিন কাজ করতে হয়—আব্রুর কথা ভাবলে কি তাদের চলে? তবে কিছু লোকের মধ্যে আব্রু আছে বৈকি। হাজী সাহেব, ইউনিয়াস বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট লাল মিঞা, অনেক জোত জমির মালিক সুন্দর আলী—এদের মত পয়সাআলা লোকদের বাড়ির মেয়েদের মুখ বাইরের লোকরা দেখতে পায় না।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় কারণে কোন বিরোধ বা সংঘাতের সঙ্গে এই এলাকার মানুষের পরিচয় নেই। গ্রামে একমাত্র দুর্গা পুজো হয় অভয় দত্তের বাড়িতে, সেই উপলক্ষে কদিন ধরে গান-বাজনা-যাত্রা-থিয়েটার হয়। এ-সব যারা দেখতে আসে তাদের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেশি, এটি গ্রামের সব সম্প্রদায়ের কাছে প্রধান উৎসব। গ্রামের প্রান্তে রয়েছে পীরের দরগা, প্রতি বছর মেলা তিন দিন, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুরাও দলে-দলে গিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে পীরের দয়া প্রার্থনা করে। আচমিতার গোপীনাথ জীউর রথের মেলায় অসংখ্য মুসলমান যায় রথের টান দেখতে। তেরগাতি গ্রামে বড় বটগাছের তলায় আছে একটা কালো পাথর—আশ-পাশের গ্রামের হিন্দু-মুসলমান চাষী ও সাধারণ মানুষ তাদের বাড়ির গাছের প্রথম ফল কিম্বা গরুর প্রথম দুধ ওই পাথরটির সামনে উৎসর্গ করে। তখন যাত্রাপালা বলতে বোঝাত কৃষ্ণযাত্রা বা নিমাই সন্ন্যাস ইত্যাদি আধা ধর্মীয় পালা। এ-সব যাত্রার দর্শকদের বেশির ভাগ মুসলমান। এমনি আরও কত দৃষ্টান্ত রয়েছে। নিজের নিজের ধর্মানুগত্য সত্ত্বেও মৌলিক জীবনে স্বাভাবিক উদারতার অভাব ছিল না। কিন্তু এই উদার সামাজিক পরিমণ্ডল ও সহনশীলতা ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খেতে শুরু করল চল্লিশের দশকের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দুষ্ট খেলোয়াড়দের হাতে।

॥ ৩ ॥

'৩৯-'৪০ সাল পর্যন্ত আমাদের এলাকায় কোন কৃষক সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তবে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে কিছু কর্মী ও সমর্থক পাওয়া গেছে। তাদের প্রচেষ্টার ফলে কৃষক সমিতি গড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কৃষকদের মধ্যে কিছু পরিমাণে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় বিশেষ কিছু কৃষকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে এক ধরণের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, দেখা হলে অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়, তারাও অনেক কথা খোলাখুলি বলে।

তখন পর্যন্ত আমাদের কর্মীই বা কজন। আমার মেজদা হেমন্তা ধর জেল থেকে আট বছর বাদে বেরিয়ে এসেছেন ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে, তাঁর পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয় না। বড়দের মধ্যে আর আছেন ক্ষিরোদ রায়। তিনি ৭/৮ বছর জেল খেটেছেন, বেরিয়ে এসেও সংগঠন গড়ার কাজ করেছেন। আর আমরা বাকি সবাই বয়সে তরুণ, সংখ্যায় ১০/১২ জনের বেশি নয়। বেণী দত্ত, শান্তি রায়, বিনোদ রায়, অমর বাগচী, টুলু দাস, শচীন দাস, সিরাজ, রেজ্জাক, হাসান আর আমি—এইতো কজন। এর মধ্যে পাঁচজন ছাত্র, বাকিরা কৃষক বা ক্ষেতমজুরের ছেলে। ধীরে ধীরে কৃষক পাড়ার সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছে এবং একদিন তারা আমাদের কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারবে, এই আশা নিয়ে আমরা তাদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করছি। এই আশা আরও দৃঢ় হয় সিরাজকে আমাদের সঙ্গে পেয়ে।

সিরাজ ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং ধর্মান্ধ। তার স্বপ্ন ছিল সে একজন মৌলবী হবে। এরজন্য সে খুব মন দিয়ে আরবী শিখছে এবং কোরাণ পড়ছে। নিয়মিত মসজিদে গিয়ে পাঁচওক্ত নামাজ পড়ে। সব সময় তার মাথায় থাকে ফেজটুপী। আমি সাধারণত স্কুল ছুটির দিনে দুপুরে আমাদের পুকুর পাড়ের আমবাগানে মাদুর পেতে বসে বসে পড়াশুনো করতাম। পাঠ্য বই নয়, পত্রিকা অথবা রাজনীতির বই। সিরাজ মাঝে মাঝে এসে আমার পাশে বসে গল্প করত। একটু-আধটু রাজনীতি নিয়েও কথা হত। একদিন আনন্দবাজারে প্রকাশিত আবদুল্লা রসুলের কোন সভায় প্রদত্ত কৃষক সমস্যা সম্পর্কিত একটা বক্তৃতা পড়ছিলাম। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হেডিং দিয়েই বক্তৃতাটা ছাপা হয়েছিল। সিরাজ এলে আমি তাকে ওটা পড়তে বললাম। সে মন দিয়ে পড়ল। তার প্রতিক্রিয়াটা তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু এরপর সে মাঝে মাঝে আমার কাছ থেকে চেয়ে বই নিতে লাগল। একদিন দেখা গেল, সিরাজ সম্ভবত তার নিজের অজ্ঞাতেই রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সে এখন আমাদের একজন ভাল কর্মী, প্রকৃতপক্ষে তার সাহায্যেই একটি বড় মুসলিম পাড়ায় আমরা কৃষক সমিতি গড়ে তুলতে পেরেছি। তার

দাদা মন্তরদ্দি এসে একদিন আমার কাছে অভিযোগ জানাল, সিরাজ আজকাল সংসারের কাজকর্ম কম করছে, নামাজ পড়ে না, কোরাণ তাকের ওপর তুলে রেখেছে। আরবী শেখবার মৌলানা সাহেব তার ওপর খুব খেপে গেছেন। আমি তখনকার মত যতটা সম্ভব বুঝিয়ে তাকে বিদায় করলাম। পরে সিরাজকে বলে দেওয়া হল সে যেন তার দাদার সঙ্গে কথা বলে। একজন কৃষক হিসাবে মন্তরদ্দি যদি তাকে ভুল বোঝে তবে অন্য কৃষকরাই বা তাকে বুঝবে কেমন করে? সিরাজ দিনের পর দিন তার দাদাকে বুঝিয়েছে, যার ফলে তাদের বাড়িটাই পরে হয়ে উঠেছিল কৃষক সমিতির মিটিং-বৈঠকের জায়গা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সিরাজকে আমরা চার-পাঁচ বছরের বেশি আমাদের সঙ্গে পেলাম না। ১৯৪৫-এর এপ্রিল মাসে নেত্রকোনার 'সারা ভারত কিষাণ কনফারেন্সের' এলাকাভিত্তিক প্রস্তুতির কাজে যখন সে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ একদিনের রহস্যজনক অসুখে তার মৃত্যু হল। এ আমাদের কাছে এক নিদারুণ আঘাত। একদিন আমাদের একান্ত একাকীত্বের মধ্যে তাকে কর্মীরূপে পেয়েছিলাম, কয়েক বছরে এই এলাকায় যে এতবড় সংগঠন গড়ে উঠেছিল, তার পিছনে সিরাজের অবদান ছিল অনেকখানি। হয়ত সবার চেয়ে বেশি। সেই সূচনাপর্বে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি সম্পর্কে কৃষকদের সংশয় ও সন্দেহ দূর করার কঠিন দায়িত্ব সে পালন করেছে।

সিরাজের মতই আকস্মিকভাবে একদিন আমাদের সঙ্গে যোগ দিল জম্বর। সে আমার ক্লাশ-মেট এবং বিশেষ বন্ধু। একদিন সে স্কুল ছেড়ে শহরের আজিমুদ্দি হাইস্কুলে পড়তে চলে গেল। হস্টেলে থেকে পড়বে। তার বাবার পয়সার অভাব নেই, জম্বর তাঁর একমাত্র সন্তান। কিন্তু শহরে যাওয়ার পর থেকে তার চালচলন বদলে গেল, খুব বিলাসী হয়ে উঠল, তাছাড়া শোনা যায় সে মুসলিম লীগ করছে খুব। গ্রামে ছুটিতে এলে আমাদের সঙ্গে তেমন মেশে না, চলে যায় মুসলিম লীগের ঘাটি চাঁদপুর গ্রামে।

১৯৩৯ সালে কিশোরগঞ্জ শহরে 'জেলা কৃষক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে জেলার ছোট-বড় নেতা ছাড়াও এসেছিলেন অবিভক্ত বাংলার অনেক বিখ্যাত নেতা—বঙ্কিম মুখার্জী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, গোপাল হালদার, রেবতী বর্মণ, শেরওয়ানী সাহেব প্রমুখ আরো অনেকে যাঁদের সবার নাম এখন আর মনে নেই। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়া প্রবাসী ডাঃ অক্ষয় সাহা ও তাঁর রাশিয়ান পত্নী তাতিয়ানা। মিছিল করে গারো, হাজং কৃষক এসেছিল কয়েকশ, সেই গারো পাহাড় থেকে। কিন্তু কিশোরগঞ্জে তখনও কৃষক সমিতির নিতান্ত শৈশব অবস্থা, তাই সংগঠিতভাবে কৃষকদের সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয়নি, তবে শহরের মধ্যবিত্ত মানুষ বিপুল পরিমাণে এসেছে বিশেষভাবে বঙ্কিম মুখার্জীর বক্তৃতা শোনার আকর্ষণে। আমরা আচমিতা

হাই স্কুল থেকে ৩০/৩৫ জন এসেছিলাম ভলান্টিয়ার হয়ে। আরও নানা জায়গার ভলান্টিয়ার নিয়ে এক বিরাট বাহিনী। তার কারণও ছিল। চারদিকে গুজব, মুসলিম লীগ এই সম্মেলন পণ্ড করবে। আমরা সর্বক্ষণ পাহারাদার হয়ে সম্মেলনের প্যান্ডেল ঘিরে রেখেছি। আমার ডিউটি ছিল বড় রাস্তার দিকে, হঠাৎ শুনতে পেলাম 'আল্লা-হো-আকবর' ধ্বনি, মুসলিম লীগের একটা মিছিল এদিকে এগিয়ে আসছে। উত্তেজনায় আমরা কাঁপতে লাগলাম। কিছুতেই এই মিছিলকে প্যান্ডেলের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আমরা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে হাত ধরাধরি করে ব্যারিকেড বানিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সংখ্যায় আমরা কম নই। আমাদের সংখ্যা দেখে হোক বা যে কোন কারণে হোক, ওদের মিছিল প্যান্ডেলের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল কয়েক মুহূর্তের জন্য, গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিল, তারপর সোজা পথ ধরে চলে গেল। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, সেই মিছিলের পুরোভাগে সবুজ ঝান্ডা হাতে রয়েছে জব্বর। সে-ই সবচেয়ে বেশি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। এরপর জব্বরের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বলে কিছু রইল না, বন্ধুত্ব তো দূরের কথা। কিন্তু এই ঘটনার বছর দেড়েক বাদে কিশোরগঞ্জ থেকে ফিরে জব্বর আমার সঙ্গে দেখা করে আমার হাতে একটা চিঠি দিল। লিখেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা নগেন সরকার। চিঠি পড়ে আমি তো অবাক। পরদিন আমি চলে গেলাম নগেনদার সঙ্গে দেখা করতে, তখন শুনলাম সব ঘটনা। জব্বরের সঙ্গে নগেনদার এক জায়গায় দেখা হলে প্রসঙ্গক্রমে দু'জনের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে কিছু আলোচনা হয়। সেই আলোচনার জের ধরেই উভয়ের ইচ্ছাক্রমে আর একদিন তারা আলোচনায় বসে কমরেড ওয়ালী নেওয়াজ খানের বাসায়। আলোচনা নাকি চলেছিল সারারাত এবং পরের দিনও অনেক বেলা অবধি। সেই আলোচনার ফলশ্রুতি জব্বরের রাজনৈতিক রূপান্তর। জব্বর পড়াশুনা ত্যাগ করে গ্রামে চলে এল পার্টির কাজ করতে। সে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় অল্পদিনের মধ্যে আমাদের কাজের ধারা পাল্টে গিয়ে নতুন বেগ পেল, নতুন-নতুন পাড়ায় সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল, কর্মীর সংখ্যা বেড়ে গেল। প্রোগ্রাম করে বিভিন্ন পাড়ায় কৃষকদের ছোট-ছোট বৈঠক ডেকে শিক্ষামূলক আলোচনার ব্যবস্থা করা হল। সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের জন্যও নিয়মিত ক্লাশের কর্মসূচী গ্রহণ করা হল। এ-সব ক্লাস নিতেন বেশিরভাগ সময় জেলা সংগঠক কমরেড অপূর্ব গোস্বামী। এ ছাড়া মাঝে-মাঝে কমরেড নগেন সরকার, ক্ষিতিশ চক্রবর্তী প্রমুখ নেতারাও আসতেন।

। ৪ ।

তখন যুদ্ধ চলছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে অস্বাভাবিক ভাবে। অভাব-অনটনের চাপে এলাকার মুসলমান ও নমশূদ্র সম্প্রদায়ের গরীব চাষি ও ক্ষেতমজুর শ্রেণীর অনেক লোক গ্রামের ধীরেন্দ্রনাথ রায় নামে একজন কনট্রাক্টারের অধীনে মিলিটারীর জন্য রাস্তা-ঘাট তৈরি করতে আসামে চলে যায় এবং ছ'সাত মাস বাদে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে হঠাৎ তারা ফিরে আসে। তাদের অভিযোগ, রায়বাবু তাদের প্রাপ্য টাকা-পয়সা কিছুই দিচ্ছেন না। কিছুদিন বাদে ধীরেন্দ্রবাবু ফিরে এলে তারা তাঁর বাড়িতে গিয়ে বারবার তাগাদা দিয়েও তাঁর কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারছে না। অন্যদিকে ধীরেন্দ্রবাবু উভয় সম্প্রদায়ের কয়েকজন মাতব্বরকে হাত করে ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছেন। এই অবস্থায় আমরা এগিয়ে গেলাম। মজুরদের মিটিং ডেকে তাদের বলা হল দলবদ্ধ ভাবে চাপ সৃষ্টি করতে। একদিন আমরা তাদের নিয়ে রায়বাবুর বাড়ির সামনে জমায়েত হলাম। প্রথমে তিনি মাতব্বরদের দোহাই দিয়ে এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করলেন। আমরা বললাম, মাতব্বর নয়, যারা কাজ করেছে তাদের সঙ্গে হিসাবপত্র করেই ব্যাপারটা মেটাতে হবে। কিন্তু তিনি সম্মত না হওয়ায় সিদ্ধান্ত হল, যতক্ষণ ফয়সালা না হবে, কেউ তাঁর বাড়ি ছেড়ে যাবে না। তাঁর বাড়ির কাউকে বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া হবে না। বাড়ির দু'জন কাজের লোককে বলা হল কাজ ছেড়ে দিতে। প্রচণ্ড ক্ষোভ ও উত্তেজনায় অসহায় মানুষগুলো সঙ্ঘশক্তির জোরে হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে উঠল। সারা দিন চলে গেল, রাতও গভীর হতে চলেছে, না খেয়ে তারা বসে আছে তবু ধর্ণা ছেড়ে যায়নি। পরদিন ভোরে ধীরেন্দ্রবাবু নত হলেন। তিনি সবার সামনে এসে সাত দিনের সময় চাইলেন টাকা সংগ্রহ করার জন্য। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সে সময় তাঁকে দেওয়া হল। শেষ পর্যন্ত কিছু ছাড় দিয়ে মজুররা তাদের প্রাপ্য আদায় করতে পারল। এই ঘটনার পর এলাকার সাধারণ গরীব মানুষের ওপর আমাদের প্রভাব নিঃসন্দেহে অনেক পরিমানে বেড়ে গেল।

কিন্তু যত প্রভাব বাড়ছে, তত বেশি পরিমানে আমরা অন্য দিক থেকে বাধার সম্মুখীন হচ্ছি। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই এলাকায় মুসলিম লীগের কোন সক্রিয় সংগঠন ছিল না। অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে কিছু কিছু লোক ছিল ব্যক্তিগতভাবে লীগের সমর্থক। এখন মুসলমান চাষিদের ওপর আমাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে তারা আতঙ্কিত হয়ে নানা ভাবে বাধা দিতে শুরু করল। যেমন মনিকখালি স্টেশন সংলগ্ন বাজারে নিয়মিতভাবে আমাদের স্কোয়াড যায় প্রচার করতে। আগেই বলা

হয়েছে, রেল লাইনের ওপারে চাঁদপুর গ্রামে লীগের বড় ঘাঁটি, তারা এসে একদিন বাধা দিল। প্রচার করতে দেবে না। চাঁদপুরের সবচেয়ে শক্তিমান ব্যক্তি হাজী মোক্তার মিঞা, টিপিক্যাল ফিউডাল লর্ড, চার বিয়ে, প্রত্যেক বউ-এর সঙ্গে এসেছে কয়েক জন ক'রে বাঁদী। তাঁর ঔরসে বিবিদের ও বাঁদীদের গর্ভজাত সন্তান সংখ্যা কুড়ি-পঁচিশ জনের কম নয়, তাদের দাপটে চাঁদপুর গ্রামের মানুষ ভয়ে কাঁপে, তারাই লীগেরও পান্ডা। তাদের কয়েক-জনের নেতৃত্বেই এই বাধাদান। আমাদের কর্মীরা সেদিন সংঘাত এড়িয়ে চলে আসে। রাত্রে কর্মীদের সভায় ঠিক হল পরের বাজারের দিনে আবার যাওয়া হবে। তাই হল। প্রায় একশ জনের স্কোয়াড নিয়ে আমরা সবাই গেলাম দস্তুর মত প্রস্তুতি নিয়ে। অম্বর সরাসরি ওদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বক্তব্য রাখল। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, তেল-লবনের চোরা-কারবার বন্ধ করা, চাষিকে পাটের ন্যায্য দাম দেওয়া ইত্যাদি দাবির কোন্‌টা অন্যায়, তা এসে সবার সামনে বলার জন্য লীগের পান্ডাদের আহ্বান জানানো হল। কিন্তু কেউ এল না। অম্বর ঘোষণা করল, 'ভয় দেখিয়ে বা গুন্ডামী করে আমাদের নিরস্ত করা যাবে না। আমরা গরীবের স্বার্থ নিয়ে লড়ব।' বহুলোক কেনা-বেচা বন্ধ রেখে আমাদের কথা শুনছে। পরে অবশ্য লীগের একজন বিশিষ্ট নেতা ডাঃ করু মিঞা আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, ও-রকম আর হবে না। সেদিন ছেলেরা না ভেবে চিন্তে কাজটা করে ফেলেছে।

১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলারের ফ্যাসিস্ট ফৌজ কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হবার পরের মাসগুলি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। লাল ফৌজ পিছু হটছে—এর চেয়ে বড় দুঃসংবাদ আর কী হতে পারে? এদিকে জন-যুদ্ধের তত্ত্ব হজম করা, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে বৈরী-ভাব ত্যাগ করা, সুভাষ বোসকে দেশদ্রোহী বলে মেনে নেওয়া ইত্যাদি নিয়ে নানা প্রশ্ন ও বিতর্কের ঝড়। শেষ পর্যন্ত পার্টির প্রতি আনুগত্যই সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। কিন্তু আমরা মেনে নিলেও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ মেনে নেয়নি। এর পর ১৯৪২-এর আগস্ট বিপ্লব। আমার মত মধ্যবিত্ত কর্মী, যারা ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি, তাদের কাছে সময়টা খুব কষ্টকর। মনে আছে, আমি সেদিন কিশোরগঞ্জ শহরে। শহরজুড়ে তোলপাড় চলছে, ছাত্ররা স্কুল ছেড়ে রাস্তায় নেমেছে, দলে-দলে লোক গ্রেপ্তার বরণ করছে, তাদের মধ্যে আমার কয়েকজন বন্ধুও রয়েছে। সেদিন বাড়ি ফিরে রাত্রে ঘুমোতে পারিনি। এরপর থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের চোখে আমরা দেশদ্রোহী, ইংরেজ চর ইত্যাদি। সে-সময় আমাদের ধৈর্য ও সহনশীলতার একটা পরীক্ষা দিতে হয়েছে। তিক্ত বিদ্রুপের মুখেও আমরা আমাদের বক্তব্য বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছি।

তবে বাঁচোয়া, কৃষক সমাজের মধ্যে এ-সবের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি। তাই আমরা আমাদের 'কৃষক ফ্রন্ট' আঁকড়ে রইলাম। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য মজুতদারী বিরোধী অভিযান চালিয়ে কিছু মজুত মাল উদ্ধার করে ন্যায্য দরে বিক্রি করতে বাধ্য করা হল। কেরোসিন তেলের চোরা কারবার যাতে না হয় দোকানের ওপর কড়া নজর রাখা হল। পতিত জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা হল ফসল-বৃদ্ধির জন্য। অন্যদিকে জাপানী আক্রমনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। আমাদের গানের স্কোয়াড পাড়ায়-পাড়ায় হাটে-বাজারে গণসঙ্গীত গেয়ে এবং বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচার করা হল—ইংরেজ ও জাপান উভয়েই দেশের শত্রু, কিন্তু আমরা এমন কাজ করব না যাতে এক শত্রুর বদলে অন্য শত্রু ঘরে ঢোকে। আমাদের দেশপ্রেম সম্পর্কে মধ্যবিত্ত সমাজ যাই ভাবুক, আমাদের নিজেদের মনে কোন সংশয় নেই।

১৯৪২-এর নতুন ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে-গ্রামে ছেয়ে গেল একশ্রেণীর পাইকার বা ফড়িয়া, যারা কিছুটা চড়া দামের লোভ দেখিয়ে ব্যাপকভাবে খাদ্যশস্য কিনতে লেগে গেল। সাধারণত ফসলের মুখে সব বছর দাম খুব কম থাকে, প্রয়োজনের তাগিদে চাষি সেই দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এবার কিছু বেশি দাম পেয়ে শুধু বাড়তি অংশ নয়, খোরাকির অংশও তুলে দিল পাইকারদের হাতে। মধ্যবিত্ত জোতদার, বড় চাষি সবাই একই ফাঁদে পা দিল। শত শত গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে গ্রামের ফসল কোথায় গিয়ে গুদামজাত হল, কেউ জানে না। এরই ফলে মন্বন্তরের পদধ্বনি শোনা গেল কয়েক মাসের মধ্যে। বাজারে চালের আমদানী প্রায় বন্ধ হবার পথে। যা আসে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি ক্রেতাদের। এক সময় আমদানী একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী চোরা কারবার শুরু করে দিল। দাম একেবারে লাগাম ছাড়া, গরীব চাষী-মজুরের আয়ত্বের বাইরে। বাঁচার তাগিদে তারা ঘরের জিনিসপত্র, জমি কিম্বা যার যা আছে বিক্রি করতে বা মহাজনের কাছে বন্ধক দিতে শুরু করল। তাতেও কুলোয় না। দেখা দেয় ঘরে-ঘরে উপোস আর হাহাকার। অসহায় মানুষ অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে শুরু করে। পুকুর-খাল-বিলের শালুক, বন-বাদারের গাছ-গাছরা, জঙ্গলের কচু সব সাফ হয়ে যায়।

এই সময়টা আমাদের সামনে এক অগ্নি পরীক্ষা। মানুষের এমনি চরম দুঃসময়ে নির্লিপ্ত থাকা যায় না। একটা কিছু করা দরকার। আমরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং কিছু পরিমাণে সচ্ছল মানুষদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে চাল-ডাল-তেল-নুন সংগ্রহ করা হল এবং পরদিন থেকে চালু করা হল লঙ্গরখানা। খবর পেয়ে চারদিক থেকে দলে-দলে বুভুক্ষু

মানুষেরা এসে হাজির হল খিচুড়ি খেতে। পরদিন সংখ্যা বেড়ে গেল। তার পরদিন আরও। আমরা বুঝতে পারলাম, এভাবে দানের ওপর নির্ভর করে আর দু'চার দিনের বেশি চালানো সম্ভব নয়। আমি ও অম্বর কিশোরগঞ্জে গেলাম পরিস্থিতি নিয়ে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলতে। নগেনদা পরামর্শ দিলেন বুভুক্ষু মানুষের মিছিল নিয়ে শহরে এসে এস. ডি. ও. রিজভী সাহেবের কাছে রিলিফের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দিতে।

তিন দিনের মধ্যে ডেপুটেশনের প্রস্তুতি শেষ করা হল। প্রায় হাজার খানেক মানুষের মিছিল দশ-এগারো মাইল পথ পায়ে হেঁটে শহরের দিকে চলেছে। যাত্রাপথের দু'পাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আরও বহু বুভুক্ষু মানুষ মিছিলে সামিল হল। শহরের আদালত প্রাঙ্গণে রিজভী সাহেবের অফিসের সামনে যখন আমরা পৌঁছেছি তখন মানুষের সংখ্যা বোধহয় আড়াই হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আদালতে মামলা করতে আসা লোক আর মিছিলের লোক মিলে প্রাঙ্গণ জনারণ্যে পরিণত হল। 'মরতে চাই না, খাদ্য চাই' স্লোগানে আদালত প্রাঙ্গণ কাঁপছে। নগেনদা ও ওয়ালীনেওয়াজ খান রিজভী সাহেবকে মিছিলের সামনে এসে আমাদের বক্তব্য শোনার অনুরোধ জানাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। রিজভী সাহেব পাঞ্জাবী, ভাল বাংলা বলেন, তবে খুব একগুঁয়ে লোক বলে শুনেছি। নগেনদা এসে জানালেন, তিনি দেখা করতে রাজী নন। এখন কী করা? আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, সবাই তাঁর অফিসের সামনে বসে থাকবো যতক্ষণ তিনি না আসেন। ওয়ালীনেওয়াজ উত্তেজিতভাবে জনতার সামনে বক্তৃতা দিচ্ছেন। নগেনদা আবার গিয়ে অনুরোধ করেও রিজভী সাহেবকে রাজী করাতে পারলেন না। বেলা তিনটা নাগাদ রিজভী সাহেবের অফিসের বারান্দায় তাঁকে দেখা গেল। বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর জিপ-গাড়ি. সেদিকেই তাঁর নজর। তিনি বারান্দা থেকে নেমে সরাসরি তাঁর গাড়ির ভিতর ঢুকে স্টার্ট দিলেন। কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার, হঠাৎ গাড়ি চলতে শুরু করেছে দেখে সামনের লোকজন চমকে গিয়ে দু'পাশে সরে দাঁড়াল। গাড়িটা বোধহয় ১৫/২০ ফুটের বেশি এগোয়নি, ঠিক তক্ষুনি অম্বরের আচমকা চিৎকার সবার কানে গেল— 'আটকাও গাড়ি। আমাদের কথা না শুনলে যেতে দেব না।' তার কথা শেষ হবার আগেই জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ির সামনে, যেন এর জন্য তারা প্রস্তুত হয়েই ছিল। দেখা গেল, গাড়ি চলছে, তবে সামনের দিকে নয়, পিছনের দিকে। জনতা ঠেলতে-ঠেলতে তাকে আগের জায়গায় নিয়ে এসেছে। রিজভী সাহেব এবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন একবার, তারপর নগেনদাকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে তাঁকে কী যেন বললেন। নগেনদা কিরোদ রায়, অম্বর ও আমাকে ইশারায় তাঁর কাছে ডেকে রিজভী

সাহেবকে বললেন আমাদের বক্তব্য শুনতে। ওয়ালীনেওয়াজ খান লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে জনতাকে চুপ করতে বললেন। আমরা এলাকার মানুষের দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে আমরা যে ভিক্ষা করে কয়েক দিন যাবৎ লঙ্গরখানা খুলে খিচুড়ি খাওয়াচ্ছি একথা তাঁকে জানালাম এবং এও জানালাম ভিক্ষা দেবার মত ক্ষমতা মানুষের নেই, একমাত্র সরকারী রিলিফ পেলেই লঙ্গরখানা চলানো সম্ভব। মনে হল, খুব মন দিয়ে তিনি আমাদের কথা শুনলেন, তারপর একটু কী চিন্তা করে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা লঙ্গরখানা বন্ধ করো না, কয়েক দিনের মধ্যে রিলিফ পৌঁছে যাবে।' চতুর্থ দিনের মাথায় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট লাল মিঞা আমাদের জানালেন, রিলিফ পৌঁছে গেছে। আমরা প্রতি সপ্তাহে চৌদ্দ মন চাল ও চৌদ্দ মন করে ডাল পাব লঙ্গরখানার জন্য। এই ব্যাপারে সারা মহকুমায় আমরা পথ প্রদর্শক, এর পর বহু কেন্দ্রে লঙ্গরখানা খোলার জন্য রিলিফ বরাদ্দ করা হয়েছে।

তবু প্রয়োজনের তুলনায় সাহায্য ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। একবেলা জলের মত পাতলা খিচুড়ি রোজ আধপেটা করে খেলে মানুষের জীবনশক্তি কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? চারদিকে তাকালে নজরে পড়ে শুধু জীবন্ত কঙ্কাল। রোজ প্রত্যেক পাড়া থেকে দু'তিন জনের মৃত্যুর খবর আসে। লঙ্গরখানায় প্রথম দিকে যে মুখগুলিকে দেখেছি, কিছু দিনের মধ্যে তাদের অনেক মুখই হারিয়ে গেছে।

॥ ৩ ॥

১৯৪৩-এর ফসলের ওপর মানুষের উন্মুখ দৃষ্টি। হাওয়ায় দোলে মাঠ জুড়ে সবুজ ধানগাছের ডগায় কচি ধানের শিষে। কতদিন মানুষ পেটপুরে ভাত খেতে ভুলে গেছে। একদিন তাদের অপেক্ষার অবসান ঘটে। পাকা ধানের মাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বুভুক্ষু মানুষ।

কিন্তু কমাসের অনাহার ও অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়ার ফলে তাদের পাকযন্ত্রটি বিকল হয়ে গেছে। নতুন চালের ভাত হজম করার শক্তি তাদের নেই। কিছুদিনের মধ্যে দেখা দিল ঘরে-ঘরে নানা রকম আন্ত্রিক রোগ আর কলেরা। শেষ পর্যন্ত তা মহামারীতে পরিণত হল। গ্রামের দিকে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে কলেরা-বসন্ত সম্পর্কে কুসংস্কারজনিত ভয় অত্যন্ত বেশি। তারা তখন মুস্কিল-আসান ও মারফু'কিস্আলাদের স্মরণাপন্ন হয়, এসব ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। কিন্তু তাতে ফল হল বিপরীত। রোগ নানা পাড়ায় ছড়াতে লাগল। মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিন এত বাড়তে লাগল যে পোড়ানো বা কবর দেবার লোকের অভাব। চারদিকে ভয়ও আতঙ্ক মানুষকে গ্রাস করে রেখেছে। লোক দলে-দলে পাড়া ছেড়ে

মুরের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে চলে যাচ্ছে। সন্ধ্যার পর আর লোকের দেখা মেলে না।

এই অবস্থায় আবার আমরা অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন। কর্মীদের একাংশ ভয় ও সংস্কারমুক্ত নয়, তাদের বাদ দিয়ে সাহসী কর্মীদের নিয়ে কয়েকটা গ্রুপ করা হল। বিভিন্ন গ্রুপের বিভিন্ন রকম দায়িত্ব—কোন গ্রুপ শুধু মৃতদের সৎকার করবে, কোন গ্রুপের দায়িত্ব চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, কোন গ্রুপ বাড়ি-বাড়ি ঘুরে পরিচ্ছন্নতা, জল সিদ্ধ করে খাওয়া ইত্যাদি রোগ-প্রতিরোধক প্রচার চালাবে। আমরা কাজে লেগে গেলাম। প্রয়োজনের তুলনায় কর্মী কম। তাছাড়া ডাক্তারের অভাব। সারা এলাকায় মাত্র পাশ করা ও হাতুড়ে মিলিয়ে চারজন অ্যালোপ্যাথ ও একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। তাঁরা ঘুরে-ঘুরে হয়রাণ হয়ে পড়েছেন। ওষুধেরও অভাব। এক-এক বাড়িতে দুজন-তিনজন রোগী। সেবা-শুশ্রূষার সমস্যা। একটা ঘটনা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। আজিজ মিঞা একজন স্বচ্ছল কৃষক (তিনি লীগের সমর্থক)। তাঁরা তিন ভাই প্রায় একসঙ্গে কলেরায় আক্রান্ত হয়েছেন। খবর পেয়ে আমি ও বেণী দত্ত গেলাম তাঁদের খোঁজ নিতে। তিন ঘরে তিন ভাই রয়েছে, কিন্তু কোন ঘরে বাড়ির লোক নেই। ছোট ভাইকে দেখে মনে হল শেষ অবস্থা। মেজভাই-এর বিছানা নষ্ট হয়ে আছে, আর্তনাদ করছে। বড় ভাই, অর্থাৎ আজিজ মিঞার কোন সাড়াশব্দ নেই, গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম শক্ত হয়ে গেছে, কখন মরেছে কে জানে? আর এক ঘরে গিয়ে দেখলাম, মহিলারা ছেলে-মেয়ে নিয়ে জড়সড় হয়ে আছে এক কোণে। সুস্থ পুরুষ বলতে আজিজ মিঞার বড় ছেলে, সে কোথায় ছিল জানি না, আমাদের সাড়া পেয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। আমি বেণী দত্তকে রেখে ডাক্তারের খোঁজে বেরুলাম। ডাক্তারবাবুকে পেলাম না। অন্য রোগী দেখতে গেছেন। সেখানে গিয়েও তাঁকে পাওয়া গেল না। এমনি করে তিন-চার জায়গায় ঢু মেরে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধরা গেল, রাত তখন দশটারও বেশি। তিনি এসে দেখে আজিজ মিঞার ছোট ভাইকেও মৃত বলে জানালেন, অর্থাৎ এখন এক বাড়িতে দুটি মৃতদেহ পড়ে থাকবে যতক্ষণ তাদের কবরের ব্যবস্থা না হচ্ছে। কবর-খোঁড়ার লোকের অভাব, পাড়া-প্রতিবেশীরা ভয়ে আসতে চায় না। আমি চলে গেলাম জব্বারের খোঁজে। সে তখন বিলের ধারে আরও তিনজনকে কবর দেবার ব্যবস্থা করেছে আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে। এখনকার ভাষায় বলা চলে 'গণ কবর।' তখন এ ছাড়া উপায় ছিল না। লোকজনেরও আর এ নিয়ে আপত্তি নেই।

এ-সব বিবরণ আমরা 'জনযুদ্ধ' কাগজে পাঠিয়েছি। জানানো হয়েছে নেতাদের। ইতিমধ্যে কাগজে দেখলাম ডাঃ বিধান রায়ের নেতৃত্বে 'মেডিক্যাল

কো-অর্ডিনেশন কমিটি' গঠিত হয়েছে, তারা মহামারী-আক্রান্ত এলাকায় মেডিক্যাল ইউনিট পাঠাচ্ছেন। নগেন সরকার খবর পাঠালেন, আমাদের এলাকায় একজন ডাক্তার আসছেন ওষুধপত্র সহ। কয়েক দিনের মধ্যে এসে হাজির হলেন ডাঃ মৌলিক কলকাতা থেকে। গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি সূর্যকান্ত রায়ের বাড়িতে তাঁর থাকার ও ডিসপেনসারি খোলার ব্যবস্থা করা হল।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মৃত্যুর সঠিক হিসাব আজ আর মনে নেই। তবে দু'একটি পাড়ার কথা মনে আছে। মুমুরদিয়া গ্রামের জেলে-পাড়ায় লোকসংখ্যা ছিল দেড় হাজার, মারা গিয়েছিল সাড়ে-চারশ। চারিগাতি বাগহাটা, তেরগাতি ইত্যাদি পাড়ায়ও মৃত্যুর হার কম-বেশি একরকম। যারা মরেছে তারা প্রায় তিন-চতুর্থাংশই গরীব চাষী, দিন-মজুর, জেলে, তাঁতি, খুচরো খেটে-খাওয়া-মানুষ, ছোট কারিগর, ছোট দোকানদার এবং ক্ষুদ্র আয়ের নানা শ্রেণীর পুরুষ-নারী-শিশু। গ্রামগুলির চেহারা একেবারে ছন্নছাড়া ও বিষণ্ণ দেখায়। দুঃস্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন।

॥ ৭ ॥

আমাদের কমরেড অশ্বিনী ঠাকুরের গানে মানুষের প্রাণ উথাল-পাথাল করে, সে দোতরা বাজিয়ে গান গায় উদাত্ত সুরে—"আমরা বাঁচব রে বাঁচব, ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়ে নতুন বাংলা গড়ব" ইত্যাদি নব জাগরণের গান। আমাদের নিজস্ব গানের স্কোয়াডও এমনি গান গেয়ে দুস্বপ্নের ঘোর থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পাড়ায়-পাড়ায় হাটে-বাজারে গিয়ে গান গায়। আমরা সভা বৈঠক করি। কাজের বিরাম নেই। বিশ্রাম নেই। আর যেন '৪৩-এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। মজুতদার, মহাজন, চোরাকারবারী আর তাদের ক্রিয়া সম্পর্কে সাবধান।

গ্রামের মহাজনী প্রথা সম্পর্কে সবাই জানে। নতুন করে লেখা নিস্প্রয়োজন। ঋণ ও তার চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ, যে-ফাঁদে পা দিলে চাষী বা গরীব কোনদিন বেরিয়ে আসতে পারে না এবং তার জমিজমা ভিটে-বাড়ি মহাজনের হাতে তুলে দিয়ে নিস্ব হতে হয়, সেই ঋণের বোঝা থেকে চাষীকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ফজলুল হক সাহেব পাশ করেছিলেন 'ঋণ সালিসী আইন'। প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় একটি করে 'সালিসী বোর্ড' গঠিত হয়েছে সরকার কর্তৃক। আমরা পরিসংখ্যান নিয়ে দেখেছি নব্বুই শতাংশ চাষী ঋণের ফাঁদে আবদ্ধ। একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই পাঠক বুঝতে পারবেন। হামিদ মিঞার বাবা সরাফত মিঞা ললিত বাগচীর কাছ থেকে সাদা কাগজে টিপছাপ দিয়ে চারশত টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। কয়েক বছর ফসলের মুখে সুদ সহ বাড়তি কিছু টাকা দিতেন সরাফত মিঞা।

তিনি হঠাৎ মারা গেলে ঋণের দায় বর্তায় হামিদ মিঞার ওপর। তাকে জানানো হল, তখনও সুদ সহ ঋণের পরিমাণ থেকে গেছে আড়াই হাজার টাকা। হামিদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তার পক্ষে এত ঋণ শোধ করা কেমন করে সম্ভব? অতএব হামিদের আটখানি জমি ললিত বাগচীর দখলে গেল। এতেও ঋণ শেষ হয়নি। হামিদ বর্মায় চলে গেল, সেখান থেকে সে দফায়-দফায় আরও তিন হাজার টাকা পাঠিয়েছে। একদিন বর্মা থেকে ফিরে এসে সে জানাল তখনও ঋণের পরিমাণ দেড় হাজার টাকার ওপর রয়ে গেছে। এই হল মহাজনী ঋণ। এর শেষ নেই।

নিরক্ষর চাষিদের নিয়ে আমরা 'সালিসী বোর্ড'-এর সামনে গেছি। তাদের হয়ে ওকালতী করেছি। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত সুদ বাদ দিয়ে মূল ঋণ আট-দশ বছরে শোধ করার রায় আদায় করা গেছে। আমাদের যুক্তি ছিল, সুদের হার বে-আইনী এবং সুদের হিসাবের মধ্যে মারাত্মক কারচুপি করে মহাজন। প্রায় সব ঋণ-গ্রহিতা নিরক্ষর, সাদা কাগজে টিপ-ছাপ নিয়ে যে-পরিমান ঋণ দেওয়া হয়েছে, লিখে রাখা হয়েছে তার বহুগুণ বেশি। সাক্ষীরা সব মহাজনের নিজের লোক। অতএব কাগজে দেখানো ঋণের পরিমান বিশ্বাসযোগ্য নয়। ললিত বাগচীর অবস্থা এক কালে ছিল অতি সাধারণ, শুধু মহাজনী ব্যবসা করে তিনি এখন এলাকার সবচেয়ে বড় জোতদার, অথচ তাঁর সব জোত জমির মালিক ছিল এক কালে হামিদ মিঞার মত সাধারণ চাষি বা গরীব মানুষ।

১৯৪৫ সাল নাগাদ পার্টি ও কৃষক সমিতির সঙ্গে কৃষকদের জীবনের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমাদের সংগঠিত এলাকার বাইরের গ্রামগুলির কৃষকরাও আমাদের সম্পর্কে আগ্রহশীল। আমরা মাঝে মাঝে জেলা ও মহকুমা স্তরের নেতৃবৃন্দকে এনে বড় সভা করি, তাতে ওইসব এলাকার কৃষকরাও যোগ দিয়ে আমাদের বক্তব্য শোনে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষক সভার সম্মেলনে এই এলাকার বহু কৃষক যোগদান করেছে। এ তাদের জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই সম্মেলনের মাত্র কয়েক দিন আগে আমরা আমাদের একান্ত প্রিয় কমরেড সিরাজকে হারিয়েছি।

নেত্রকোনা সম্মেলন থেকে ফিরে কিছুদিনের মধ্যে আমরা একটি খাদ্য সম্মেলন করি। '৪৩-এর মন্বন্তরের পর থেকেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যশস্য যাতে মজুতদারের গুদামে না যায়, তার জন্য জনসাধারণকে সচেতন থাকতে বলছি। এবারকার খাদ্য সম্মেলনে আমরা কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য দলের জেলাস্তরের নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। লীগ ছাড়া আর সব দলের নেতৃবৃন্দ যোগ দিয়েছেন। এত বড় সভা এর আগে আমরা আর করিনি।

সভার আগে আমাদের একটি মিছিল এলাকা পরিভ্রমণ করেছে। মনে আছে, সেই মিছিল দেখে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মতিলাল পুরকায়স্থ বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'আজকাল মুসলিম লীগের এত দাপট, এর মধ্যে মুসলিম mass-এর ওপর এই কমান্ড্ কেমন করে সম্ভব হল?

দীর্ঘকাল ধরে গ্রামে জল-সেচের একটি সমস্যা ছিল। মানিক খালের জল সেচের কাজে লাগাবার জন্য প্রায় এক মাইল লম্বা আর একটি মরা খাল সংস্কার করে বড় সড়কের ওপারের মাঠের সঙ্গে সংযোগ ঘটালে প্রায় হাজার দেড়েক একর জমি জল পেতে পারে শুকনোর দিনে। এ সম্পর্কে বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেও ফল হয়নি। এবার কৃষক সমিতির উদ্যোগে স্বেচ্ছাশ্রমের ডাক দেওয়া হল। কয়েকশ কৃষক কোদাল হাতে নেমে পড়ল মাটি কাটতে। গানের স্কোয়াড গান গেয়ে তাদের উৎসাহিত করল।

নেত্রকোনার সম্মেলন থেকে ডাক দেওয়া হয়েছে তেভাগার। চাতলের কৃষক সমিতি সেই ডাকে সাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এই প্রথম শ্রেণী সংগ্রামের দিকে পদক্ষেপ।

॥ ৮ ॥

'৪৫—'৪৬ সাল দেশের রাজনীতিতে যে ঝড়ের তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে, তার ঢেউ এসে গ্রামাঞ্চলেও আছড়ে পড়ল। একদিকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকদের মুক্তি-আন্দোলন, যুদ্ধ পরবর্তী পার্টি-নীতি অনুযায়ী আবার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদি, অন্যদিকে পাকিস্তান এর দাবি নিয়ে মুসলিম লীগের তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচার। রাতারাতি লীগ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। গ্রামে গ্রামে আওয়াজ উঠছে—'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।' এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সর্বত্র মুসলমানদের মধ্যে একটা উম্মাদনা দেখা দিয়েছে। আমরা অথবা যেখানেই কমিউনিস্টদের বিশেষ-বিশেষ এলাকায় কম-বেশি প্রভাব রয়েছে, তারা যেন এক-একটা দ্বীপের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। চারদিক থেকে সাম্প্রদায়িকতার ঢেউ আঘাত হানছে সেই দ্বীপগুলির ওপর। আর আমরা আপ্রাণ লড়াই করে যাচ্ছি সেই দ্বীপগুলির ভিতরকার সুস্থ অসাম্প্রদায়িক পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য। এ লড়াই রাজনৈতিক লড়াই। আমাদের প্রধান ভরসা, গত কয়েক বছর ধরে কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হয়ত তাদের শ্রেণী-চেতনা থেকেই তারা ভাল-মন্দ বুঝে নেবে।

আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। পুরোদমে চলছে তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব। প্রতিদিন বৈঠক, মিটিং মিছিল। কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ এল এক ভয়ংকর বাধা—মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ডাকে কলকাতার ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, '৪৬-এর ১৬ আগস্ট। দাঙ্গার বিবরণ অতিরঞ্জিত

ও বিকৃত হয়ে দাবানলের মত ছড়াতে লাগল। পাড়ায় পাড়ায় উত্তেজনা। হিন্দু পাড়া ভীত-সন্ত্রস্ত। যে-সব পাড়ায় আমাদের সংগঠন নেই, সেখানকার মানুষই বেশি পরিমানে গুজবের শিকার। আমরা খবর পেলাম, চাঁদপুর গ্রামের বড় মসজিদের সামনে জমায়েত ডেকেছে মুসলিম লীগ। জমায়েতের পরই তারা কলকাতার বদলা নিতে আক্রমণ করবে হিন্দুপাড়া। চাতল গ্রামই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। আমরা কিমূঢ়, খবর শুনে। সেদিন অম্বর এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত দিল, যার মধ্যে ঝুঁকি ছিল অনেকখানি। তবু তার ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা দশজন নেতৃস্থানীয় কর্মী, যাদের এলাকায় ভাল পরিচিতি আছে, সেই রাত্রে গিয়ে হাজির হয়েছি জমায়েতের সামনে। লীগের পান্ডাদের সঙ্গে মুখোমুখি বাকবিতণ্ডার পর দাঙ্গার প্ল্যানটাকে ভেস্তে দেওয়া সম্ভব হল। সেই রাত্রের রোমাঞ্চকর কাহিনী 'পরিচয়' মে-জুন, ৯১ সংখ্যায় বিবৃত করা হয়েছে বলে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের শুভ-বুদ্ধির প্রতি আমাদের আস্থা অনেক বেড়ে গিয়েছে সেদিনের ঘটনার পর। আমরা এলাকায় 'শান্তি কমিটি' গঠন করে প্রচারে নেমে গেলাম। কয়েক-দিনের মধ্যে পরিবেশ শান্ত হয়ে এল।

৯

সাধারণভাবে এই এলাকায় জোতদারের সঙ্গে বর্গাদারের দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্কের মধ্যে কোন তিক্ততা নেই। নিতান্তই দু'চারজনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। বড় জোতদারদের চাষীরা ভয় পায়, তাদের দাপট বেশি, ইচ্ছা হলেই একজনের বর্গা আর একজনকে দিয়ে দেয়। বেশির ভাগ চাষীর নিজস্ব জমি খুব সামান্য কিংবা নেই, বর্গাচাষের ওপর নির্ভর করে তাকে বাঁচতে হয়, অতএব নিজের স্বার্থে তারা সব জোতদারের সঙ্গেই সাধারণভাবে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে। আর এটাই অধিকাংশ বর্গা-চাষীর বড় দুর্বলতা। এই দুর্বলতা ও ভয় তেভাগা আন্দোলনের পক্ষে প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া অন্য বাধা চাষীর বিবেক, ধর্মবোধ ও চক্ষুলজ্জা। তারা পুরুষানুক্রমে দেখে এসেছে ফসলের আধাআধি ভাগ। তাদের কাছে এটাই নিয়ম ও রীতি। এই নিয়ম ও রীতি ভাঙতে তাদের বিবেক ও সংস্কারে বাধে। এই সংস্কার কাটিয়ে ওঠার জন্য যে পরিমাণ শ্রেণীচেতনা দরকার, সবার মধ্যে তা সঞ্চারিত হয়নি।

অথচ বেঁচে থাকার জন্য এই মুহূর্তে 'তেভাগা' ছাড়া তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। চাষের খরচ বেড়েছে, এই খরচ বহন করে চাষী একা। খরচ ধরে অর্ধেক ফসলে তার লাভ তো দূরের কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকসান। প্রকৃতপক্ষে বর্গার নামে তার খাটুনির মজুরী—

টুকু নিয়ে তাকে খুশি থাকতে হয়। কয়েকমাসের খোরাকি জোটে না দুই তৃতীয়াংশ চাষীর। বাধ্য হয়ে তাদের ঋণ করে কিংবা ক্ষেত-মজুরী করে বাকি মাসগুলির অন্ন সংস্থান করতে হয়। ধানের চাষে যদি বা সামান্য লাভ থাকে, পাটের চাষে অবধারিত লোকসান। পাটের ব্যবসায় মনোপলি দু'জন মারোয়ারী ব্যবসায়ীর। তারা জানে, চাষীর পাট ধরে রাখার ক্ষমতা নেই, যা বড় জোতদার বা মধ্যম শ্রেণীর জোতদার পারে। তাই পাট ওঠার মুখে ইচ্ছা করে তারা দাম এত কমিয়ে রাখে সে লোকসান মেনে নিয়েই চাষী ঘরের পাট ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, ঋণ শোধ ও সংসারের প্রয়োজনীয় খরচ পত্রের জন্য। তাই তেভাগার দাবি। ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে চাষী তার নিজের পরিশ্রম, হাল-গরু-বলদ, বীজ বোনা ক্ষেত, মজুর নিয়োগ ইত্যাদি বাবদ, জোতদার পাবে একভাগ তার খরচবিহীন জমির মালিকানা স্বত্বের জন্য। এর সঙ্গে আরও কিছু দাবি যুক্ত হবে। যেমন এখনকার প্রথা অনুযায়ী, চাষীর বাড়ির সংলগ্ন জমি হলেও জোতদারের খামারে ফসল তুলতে হয়, তা সে খামার যত দূরেই হোক না কেন। সেখানে ফসল মাড়াই হবার পর চাষীকে তার ভাগ, ধান ও খড় আবার বাড়িতে বয়ে আনতে হয়। এই দু'বার আনা-নেওয়া বাবদ অকারণ তার বাড়তি মজুরী-খরচ। অতএব এখন থেকে চাষী তার সুবিধা অনুযায়ী এবং খরচের কথা বিবেচনা করে যেখানে সুবিধা সেখানে ফসল তুলবে। তার নিজের বাড়িতে তোলাই সুবিধাজনক, কেননা তাহলে বাড়ির মেয়েদের সাহায্য পাওয়া যায় মাড়াইর কাজে, মজুর নিয়োগের খরচ বাঁচে। তৃতীয় দাবি, চাষীর বর্গাস্বত্ব রদবদল করা যাবে না। একজন চাষী অনেক পরিশ্রম দ্বারা জমিকে আগাছা-মুক্ত করে ও সার মিশিয়ে মাটির উর্বরাশক্তি বাড়াল, এমন সময় মালিক বর্গাদার বদল করে আর একজনকে বর্গা দিল। জমির চাহিদা বেশি বলে এই ব্যাপারে চাষীদের মধ্যেও অসুস্থ প্রতিযোগিতা ও রেষারেষি আছে বৈকি, জোতদার তার সুযোগ নেয়।

তেভাগার প্রস্তুতিপর্বে শ্রেণীচেতনার আলোকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই আমাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। কৃষকরা আইনকে ভয় পায়, কিন্তু সংগ্রাম করে আইন মানুষের স্বার্থে পরিবর্তন করা যায়, তা তারা জানে না। চাষীই জমির প্রকৃত মালিক হবে একদিন, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবি নিয়ে দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির ক্ষেত্র তৈরি করার প্রথম পদক্ষেপ তেভাগা আন্দোলন। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে চাষীর পাশে এসে দাঁড়াল ক্ষেত-মজুর শ্রেণী, যারা একদিন ছিল চাষী এবং মহাজনের ফাঁদে পড়ে আজ সর্বহারা, যাঁদের বুক থেকে জমির তৃষ্ণা এখনও যায়নি।

চারদিকে একটা আলোড়ন পড়ে গেল। এলাকার বাইরের কৃষকরা তাকিয়ে অনেক আশা নিয়ে আমাদের দিকে। আমাদের প্রকাশ্য হয় সভায় তারাও দলে-দলে আসে আমাদের বক্তব্য শুনতে। কারণ একই সমস্যা সর্বত্র। একই যন্ত্রণা তাদেরও বুকে। জমিদার-মহাজনের শোষণে তারাও ধুঁকছে অসহায়ভাবে। কোনদিন এ সবের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ হয়নি। ব্যক্তিগভাবে কৃষক অত্যন্ত অসহায় ও ভীতু প্রকৃতির। সংঘশক্তির প্রেরণায় তাদের মধ্যে সাহস সঞ্চারিত হতে চলেছে।

আমাদের এলাকা থেকে কয়েক মাইল দূরে বাণীগ্রামে সমরেন্দ্র অপূর্ব গোস্বামী ও প্রবীর গোস্বামীর নেতৃত্বে ছোট্ট একটি পাড়ায়ও তেভাগার প্রস্তুতি চলছে। সব জায়গায় সমিতি থাকলেও তেভাগার জন্য কৃষকদের শ্রেণীচেতনা ও সংগঠন আন্দোলনের উপযোগী স্তরে উত্তীর্ণ হয়নি বলে, এবারকার আন্দোলন কার্যত সিম্বলিক। এবারের অভিজ্ঞতার ফলে ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক এলাকা জুড়ে আন্দোলন প্রসারিত হবে হয়ত।

১০

একদিকে চাষীদের মধ্যে যেমন দেখা দিয়েছে উৎসাহ, অন্যদিকে বড় জোতদার ও ছোট জোতদারদের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া ও আতঙ্ক। বিশেষ করে ছোট জোতদারদের মধ্যে, যারা অল্প জোত জমির মালিক এবং অন্য আয়ের পথ খোলা নেই, তারাও এলাকার প্রধান জোতদার ললিত বাগচীর নেতৃত্বে সভা করে আন্দোলন প্রতিরোধের পথ খুঁজতে লেগে গেছে। আরও একটা লক্ষ্যণীয় বিষয়, আশ-পাশের গ্রামের মুসলিম লীগের পান্ডারাও ললিত বাগচীর বাড়িতে আনাগোনা শুরু করে দিয়েছে, এমন কি চাঁদপুর গ্রামের মক্তার মিঞা অব্দি তার সঙ্গে যুক্ত। অঞ্চলের মধ্যবিত্ত হিন্দুরা প্রায় সবাই কংগ্রেসভাবাপন্ন, ললিত বাগচীকে তারা এতকাল বৃটিশের খয়ের খাঁ বলে ভাবলেও স্বার্থের তাগিদে তারা যেমন এখন তাঁর স্মরণাপন্ন হয়েছে, তেমনি একই স্বার্থের তাগিদ মুসলিম লীগের নেতারাও নিজেদের তাদের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এ ঘটনা স্থানীয় কৃষকদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমরা যা এতদিন বলে এসেছি, সেটা তাদের উপলব্ধির মধ্যে এসেছে। অর্থনৈতিক স্বার্থই রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি যে গরীবের প্রকৃত বন্ধু, আরও কিছু ঘটনা তাদের সামনে সেটা প্রমাণ করে দিল।

এবার মাঠে ধানের ফলন ভাল। মাঠ জুড়ে সবুজের ঢেউ। ধানের শিষগুলো এখনও সবুজ, আর কদিনের মধ্যেই রং পাল্টে সোনালী হয়ে উঠবে। এখন আমাদের প্রস্তুতির শেষ পর্ব। সাংগঠনিক কর্মসূচী নির্ধারণ।

আন্দোলনের নেতৃত্বে আমরা যারা রয়েছি, তাদের অধিকাংশ ছোট-বড়

হিন্দু জোতদারের ঘরের সন্তান। মনের দিক থেকে আমরা দ্বিধাহীন, আমরা জানি, বাড়ির সঙ্গে আমাদের সংঘাত অনিবার্য। মুসলিম কর্মীদের সমস্যা ঠিক আমাদের মত নয়। তাদের মধ্যে দু'চার জনের বাড়ির জমির পরিমাণ বেশি হলেও তারা নিজেরা সেই জমি চাষ করে নিজেদের হাল-গরু দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান জোতদার বর্গায় চাষ করায় এমন সংখ্যা নগন্য। জোতদার প্রায় সবাই হিন্দু।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার কিশোরগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক পৃথ্বিশ দত্তের কথা। এক কালে তাঁরা সমৃদ্ধ ছিলেন, পরে মধ্যম শ্রেণীর জোতদারের পর্যায়ে নেমে এসেছে তাঁদের অবস্থা। বড় বাড়ি। তিনি পার্টির একজন সমর্থক। আমরা সব সময় তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ ও সমর্থন পেয়েছি। আমাদের গোপন মিটিংগুলো হতো তাঁর বাড়ির একটি বিচ্ছিন্ন ঘরে। সময় পেলেই কর্মীরা তাঁর বাড়িতে এসেছে—সারাদিনের কাজকর্মের পর্যালোচনা করেছে, কাজকর্মের ব্যাপারে পরামর্শ করেছে। আর একটা বড় আকর্ষণ ছিল ঢালাও চা-এর ব্যবস্থা। গাঁয়ে চা-এর দোকান নেই, সব বাড়িতে চা-এর রেওয়াজ চালু হয়নি। ঘোরাঘুরির পর পৃথ্বিশ বাবুর বাড়ির চা-এর আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য।

আমার যতদূর মনে পড়ে, আমাদের সাংগঠনিক মিটিংয়ে পৃথ্বিশবাবুই প্রথম প্রস্তাব রাখেন যে, তেভাগার ধানকাটা প্রথম শুরু হোক আমাদের কমরেডদের বাড়ির জমি থেকে, এবং যে সব কমরেড সরাসরি জমির মালিক, তাঁরা নিজেরা স্বেচ্ছায় তেভাগা মেনে নেওয়ার কথা ঘোষণা করুক। এই প্রস্তাব নিয়ে সামান্যতম বিতর্ক হয়নি। মেনে নেওয়া হল।

কিন্তু বিতর্ক হল আন্দোলনের বাস্তব কিছু সমস্যা ও মানবিকতার প্রশ্নে। সেটা ছোট জোতদার, যারা দু'তিন বিঘা বা কম-বেশি এই পরিমাণ জোত-জমির মালিক, তাদের নিয়ে। তারা নামেই জোতদার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খুবই গরীব শ্রেণীভুক্ত। তাদের সংখ্যা অনেক। প্রস্তাব উঠল, তাদের তেভাগার আওতা থেকে বাদ দিলে লাভ হবে আমাদেরই, প্রধান টারগেট ললিত বাগচীর নেতৃত্বে সংগঠিত ছোট-বড় সব জোতদারের ঐক্যে ভাঙন ধরান যাবে। তাছাড়া মানবিক দিক থেকে দেখতে গেলে, একজন গরীব চাষীর কিছু উপকার করতে গিয়ে আর একজন গরীবের গরীবত্ব বাড়িয়ে দিয়ে কি লাভ? তার চেয়ে যদি তারা চাষের খরচের কিছু অংশ বহন করতে রাজী হয়, তবে তাদের তেভাগার আওতা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। আলোচনান্তে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া হল, তবে এই রকম ক্ষেত্রে প্রত্যেক জোতদার ও চাষীর মধ্যে লিখিত চুক্তি থাকবে। আর গরীব জোতদারের ক্ষেত্রে ফসল উঠবে যার বাড়ি জমি থেকে কাছে, তার বাড়িতে।

আরও সিদ্ধান্ত হল, এককভাবে কোন চাষী তার জমির ধান কাটবে না। কোন্ দিন কতগুলি জমির এবং কার কার জমির ধান কাটা হবে তার তালিকা তৈরি করবে সমিতি। প্রতিদিন ভোর রাত্রে এলাকার সমস্ত কৃষক নিঃশব্দে জমায়েত হবে বাঘহাটার স্কুলের মাঠে, সেখান থেকে নির্দিষ্ট জমিগুলিতে যাবে দলে দলে, যাতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বহু বিঘা জমির ধান কেটে চাষীদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

আমরা জানতাম, গণ্ডগোল হতে পারে, পুলিশও আসতে পারে। যে-কোন বাধা আসুক, তা প্রতিহত করার জন্য বিরাট স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী তৈরি হল জঙ্গী কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের নিয়ে। গোপন যোগাযোগের জন্য বিশ্বস্ত কর্মীদের নিয়ে আলাদা গ্রুপ করা হল, ধরপাকড় এড়াবার পরিকল্পনাও করা হল, ঠিক করে রাখা হল আণ্ডারগ্রাউণ্ড অবস্থায় নেতা ও কর্মীদের থাকার জায়গা।

সময় আসন্ন। ধানে পাক ধরেছে, আরও কদিন অপেক্ষা করলেও চলত, কিন্তু আমরা তা করলাম না। জোরদার হয়ত তার আগেই পুলিশের উপস্থিতিতে অন্য এলাকা থেকে মজুরবাহিনী এনে আমাদের ক্ষেতের ধান কাটিয়ে নিজের খোলানে নিয়ে তুলবে। পরস্পরের সম্পর্ক ইতিমধ্যেই দারুণ তিক্ত হয়ে উঠেছে। ললিত বাগচী চাষীদের অনেককে গোপনে ডেকে অনেক জমি বর্গা দেবার লোভ দেখিয়েছে। বিনা সুদে দাদন দেবে বলেছে। ভয়ও দেখিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে কৃষক একটু দুর্বল চরিত্রের, বাবুদের মুখের ওপর কোন ব্যাপারে সরাসরি 'না' বলার মত মনোবলের অভাব। তাই সমিতি থেকে ললিত বাগচীকে 'বয়কট' করা হয়েছে। কেউ তাঁর বাড়িতে যাবে না। এমন কি যারা দুধ বিক্রি করতে যেত, তারাও না। তাঁর সঙ্গে আদর্শ প্রদানের সম্পর্ক বন্ধ হল। তিক্ততা ও ক্রোধ থেকে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, ললিত বাগচীর বাড়ির সামনের সড়ক দিয়ে যে-সব মাছআলা ও সব্জিআলা যায়, তাদেরও নিষেধ করে দিল চাষীরা। একদিন নাকি ললিত-বাগচীর গোমস্তা একটি মাছআলাকে দাঁড় করিয়ে মাছ কিনেছিল, কয়েকজন চাষী সেটা দেখতে পেয়ে ছুটে এসে তার হাতের মাছ কেড়ে নিয়ে পুকুরের জলে ছুঁড়ে দেয়। উত্তেজনা চরমে। চাষীদের মধ্যে একটা সংগ্রামী মনোভাব এসে গেছে।

এদিকে ছোট জোতদারদের মধ্যে আমাদের প্রস্তাব প্রচারিত হওয়ার পর, প্রথমে দু'একজন, পরে বহু সংখ্যায় এসে তারা চাষের আংশিক খরচ বহনের স্বীকৃতি জানিয়ে সমিতির অফিসে লিখিত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করতে থাকে। এর ফলে বড় জোতদারগণ কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

প্রথম ধান-কাটার আগের দিন রাত্রে বাঘহাটার স্কুল ময়দানে সভা ডাকা হয়। এর জন্য প্রকাশ্যে কোন প্রচার হয়নি, যা হয়েছে মুখে-মুখে। সেই

সভায় এত লোক হয় যে মাঠে জায়গা ধরেনি। যেহেতু মাইকের ব্যবস্থা নেই, বক্তাদের বক্তব্য যাতে সবাই শুনতে পায় এর জন্য সভাস্থলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে বক্তব্য রাখতে হল। অধ্যাপক পৃথ্বিশ দত্ত সাধারণত প্রকাশ্য কাজ-কর্মের মধ্যে থাকেন না, কিন্তু সেদিন তিনি নিজে বক্তব্য রাখেন, গ্রাম-বাংলার দুর্দশা কোনদিন ঘুচবে না যদি জমির মধ্যস্বত্তভোগী প্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়ে চাষীকে জমির প্রকৃত মালিক না করা হয়; এর জন্য সরকারকে দিয়ে আইন করাতে হলে অনেক দিন ধরে চাষীকে লড়তে হবে। তিনি এ-ও ঘোষণা করেন তাঁর জমিতে তিনি তেভাগা মেনে নিলেন। কমরেড ক্ষিরোদ রায়ও একই ঘোষণা করেন। আরও কয়েকজনের এমনি ঘোষণার পর কমরেড জব্বর ঘোষণা করল, ভোর হবার আগেই যেন প্রত্যেকে কাস্তে, ধানের আঁটি বাঁধার শক্ত দড়ি আর ভার নিয়ে এই ময়দানে হাজির হয়। তাড়াতাড়ি সবাইকে বাড়ি গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে বলা হল। কিন্তু আমি জানি, সে-রাত্রে তেভাগা-এলাকার কোন কৃষক পরিবারে 'ঘুম' ছিল না। আর ঘুম ছিল না আমাদের চোখেও। সে রাত্রিটা আমরা পৃথ্বিশবাবুর সেই ঘরে নানা আলোচনা ও গল্প করেই কাটিয়ে দিলাম। ময়মনসিংহ জেলায় প্রথম চাতল এলাকার চাষীরা তেভাগায় আন্দোলনে নেমেছে। আমাদের অঞ্চলের ধান আগে পাকে, কার্ত্তিকের শেষ বা অগ্রহায়ণের শুরুতে। যতদূর মনে পড়ে, আমন ধান নিয়ে আমাদের আন্দোলন বাংলায় প্রথম। এর আগে আউষ ধান নিয়ে যশোরে আন্দোলন হয়েছিল।

১১

রাত্রি শেষের অবস্থা অন্ধকারের মধ্যেই দলে-দলে চাষীরা এসে হাজির। হাতে হাতে দড়ি কাস্তে ভার। স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে লাঠি। জমায়েতকে তিন ভাগে ভাগ করা হল। একভাগে আছে মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ, তারা গেল ললিত বাগচীর জমিতে। বাকি দুই ভাগের এক ভাগ গেল মধ্যম শ্রেণীর জোতদারের জমিতে, অন্য ভাগ ছোট জোতদারের জমিতে। সবাইকে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া আছে, আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া কোন অবস্থায় শক্তি প্রয়োগ নয়। এই প্রথম সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে মুসলমান ও নমশূদ্র চাষী একসঙ্গে লড়তে নেমেছে তাদের শ্রেণী-স্বার্থে। এই এলাকায় নমশূদ্র চাষীর সংখ্যা কম নয়। তাদের দু'একজন ছাড়া কারো নিজস্ব জমি নেই। ভাগচাষ আর দিন মজুরী তাদের জীবিকার মাধ্যম। এক কালে তাদের সবারই অল্পসল্প জমি ছিল, কিন্তু ঋণের দায়ে সব আজ ললিত বাগচীর দখলে। যেমন আমাদের কর্মী টুসু দাস। তার বাবার দশ কানি জমি ললিতবাবু নিয়েছেন। টুসু দাস এখন ষোল আনা দিন মজুর। একদিন

কাজ না পেলে উপোস। তার বুকের জ্বালা তাকে কমিউনিস্ট বানিয়েছে। এমনি আরও অনেক টুসু দাস আছে নমশূদ্র পাড়ায়।

ঝড়ের গতিতে ধানকাটা চলছে মাঠে মাঠে লালঝাণ্ডা পুঁতে। কারো মুখে শব্দ নেই, শুধু শত শত কাস্তের খচখচ শব্দ ছাড়া। ভার বোঝাই ধান চলছে চাষীদের বাড়িতে; যা এর আগে কোনদিন হয়নি। আমাদের আশঙ্কা ছিল, ললিত বাগচীর তরফ থেকে হয়ত কোনরকম বাধা আসতে পারে, কিন্তু তা আসেনি। কোন জোতদার বা তাঁর লোক জমিতে আসেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়ালেন আমার বাবা। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে আমার পক্ষে অস্বস্তিকর, আরো বেশি অস্বস্তিকর কৃষকদের পক্ষে, সেটা তিনি আমার বাবা বলেই। তিনি জমির পাশে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিলেন ধান যেন তাঁর বাড়িতে যায়। আমাদের বর্গাদার আজিমুদ্দি ভাই ও নিজামুদ্দি ভাই চিরকাল বাবার খুব বাধ্য, তারা প্রায় আমাদের ঘরের লোকের মত। খবর পেয়ে আমি ছুটে জমিতে গেলাম। আজিমুদ্দি ভাই ও নিজামুদ্দি ভাই নত মুখে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে। কোন কথা বলছে না। বাবা জমির কর্মীদের শাসিয়ে বলছেন, তোমরা কি ভেবেছ দেশে আইন নেই? কতকগুলো পাগলের কথায় যা খুশি তা করে যাবে? আমি বাবাকে থামিয়ে বাড়ি যেতে বললাম এবং চাষীদের বললাম ধান ওঠাতে। আমার নির্দেশ পেয়ে চাষীরা মুহূর্তের মধ্যে ভার কাঁধে তুলে নিল। এরপর বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, এরপর থেকে যেন এরাই তোমার খাওয়া-পরার দায়িত্ব নেয়। তিনি আর কিছু না বলে স্থান ত্যাগ করলেন। আমি বাবার নির্দেশ মেনে নিয়েছিলাম। রাত্রে বাড়ি গিয়ে আমার কাপড়-জামা ও প্রয়োজনীয় দু'একটা জিনিস নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। একজন মুসলমান কৃষকের ঘরেই আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল। শুধু আমার ক্ষেত্রেই এমন হল, তা নয়। একই বিষয় নিয়ে কমরেড বেণী দত্তকেও তার দাদাদের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়িতে খাওয়া ছাড়তে হয়েছে, তবে তার নিজস্ব ঘরে থাকার অধিকার সে ছাড়েনি। বাড়িতে থাকত, খেত চাষীর ঘরে। কমরেড শান্তি রায়ের বাড়িতেও অশান্তি হয়েছে, তবে তার খাওয়া-থাকা বন্ধ হয়নি। আমাদের এ-সব ঘটনার কথা বিদ্যুৎগতিতে চাষীদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল এবং বহু কৃষক সন্ধ্যার পর কৃষক সমিতির অফিসে এসে তাদের বাড়িতে আমাকে থাকা-খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তাদের কাছে এ যেন আমাদের একটা বড় ত্যাগ, আর সেটা আমরা করেছি তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে, এ ভেবেই তারা আরও বেশি কষ্ট বোধ করছিল। অম্বর ঘটনাটাকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে ছাড়ল না। প্রত্যেক মিটিংয়ে সে এ-সবের উল্লেখ করে বলত, 'এখানেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মুসলিম লীগ বা অন্য দলের তফাৎ। আমাদের কর্মীরা সাধারণ

মানুষের স্বার্থে যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ বিসর্জন না দিলে কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। ইত্যাদি।

তিন দিন ধান কাটা হল একই পদ্ধতিতে। কৃষকদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ। কিন্তু এখনও মাঠে অর্ধেকের বেশি ধান কাটা বাকি। এদিকে খবর, জোতদারের পক্ষ থেকে খুব ছোটাছুটি চলছে। তারা নানা জায়গায় যোগাযোগ করছে। ললিত বাগচীর বাড়িতে রোজ মিটিং হচ্ছে, সেইসব মিটিংয়ে স্থানীয় কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুসভা ইত্যাদি সব দলের নেতাদের যোগ দিতে দেখা যায়।

চতুর্থ দিন ভোরে হঠাৎ গ্রাম ভরে যায় পুলিশে। তারা একটা মাঠের দিকে অগ্রসর হচ্ছে দেখে কৃষকরা মাঠ ছেড়ে চলে আসতে থাকে। সরাসরি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের কথা আমারও ভাবিনি। তবু সবার পক্ষে পুলিশের নজর এড়ানো সম্ভব হয়নি। পুলিশ গুলি করবে ভয় দেখানোর ফলে যারা পালাবার চেষ্টা করছিল, তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। মাঠ থেকে চল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করে ললিত বাগচীর বাড়িতে এনে আটকে রাখা হয় সারাদিন। শুধু তাই নয়, তাদের দড়ি দিয়ে হাতে-হাতে বেঁধে একটা গাছে তলায় দাঁড় করিয়ে রাখে। খেতে দেওয়া হয়নি। শোনা গেল, সন্ধ্যার ট্রেনে তাদের কিশোরগঞ্জ শহরে চালান দেওয়া হবে।

যারা ধরা পড়েছে, তারা জীবনে জেলে যাওয়া তো দূরের কথা, পুলিশের কাছাকাছি যায়নি কখনও। তার ওপর দড়ি দিয়ে বেঁধে না খাইয়ে খোলা জায়গায় সবার চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখার অপমান। তাদের মনে এসবের কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে; এটাই এখন আমাদের প্রধান ভাবনা। তাদের মনে সাহস জোগাবার জন্য প্রধান কর্মীদের অন্তত একজনের তাদের সঙ্গে থাকা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কমরেড অমর বাগচী তৈরি হয়ে ললিত বাগচীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল ধরা দিতে।

ললিত বাগচীর বাড়িতে পুলিশের ক্যাম্প বসল। সংখ্যাটা ঠিক জানা যাচ্ছে না। কেউ বলে ত্রিশ, আবার প্রত্যক্ষদর্শীর মতানুযায়ী চল্লিশের নিচে নয়। তাদের থাকার জন্য ললিত বাগচীর বিরাট আটচালা ও চার-পাঁচ কোঠার একটি দালান ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও আটচালার লাগোয়া একটি তাঁবু টাঙানো হয়েছে। ললিত বাবুর পক্ষ থেকেই চালাও খাওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু সমস্যা, দুধ নেই, চা-এর ব্যবস্থা কেমন করে হবে? চাষীরা তাঁর কাছে দুধ বেচে না। পুলিশের কাছে কাঁদুনি গেয়ে তিনি দুধের কথা জানালেন হয়ত। অমনি শীতলকে (বশম্বদ চাকর) সঙ্গে নিয়ে পাঁচজন সশস্ত্র পুলিশ এসে হাজির হল কাছাকাছি এক চাষীর বাড়িতে। তাকে দিয়ে জোর করে দুধ দুইয়ে চা-এর জন্য দুধ সংগ্রহ করা হল এবং তাকে নির্দেশ দেওয়া হল, সে যেন রোজ দুধ দিয়ে আসে।

আমরা বুঝতে পারলাম, পুলিশ কিছুদিন থাকবে। অতএব নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের স্ট্র্যাটেজীর কিছু পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠল। চাষীদের মধ্যেও হঠাৎ এতগুলি লোককে ধরে নিয়ে যাওয়ায় কিছুটা সন্ত্রাস দেখা দিয়েছে বৈকি। কর্মীদের মাধ্যমে রাত্রে পাশের গ্রামে মিটিং হবে, এই খবর পৌঁছে দেওয়া হল। পুলিশের গতিবিধির ওপর নজর রাখার দায়িত্ব দেওয়া হল ক্ষুদে স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর, তাদের শিখিয়ে দেওয়া হল পুলিশকে পাড়ায় ঢুকতে দেখলে তারা কিভাবে অগ্রিম সংকেত দেবে।

আমাদের সামনে এখন প্রধান সমস্যা মাঠের বাকি ধান কেমন করে কাটা হবে। দিনের বেলায় সে করা যাবে না, এটা নিশ্চিত। রাত্রির মিটিংয়ে ঠিক হল, ধান কাটা হবে রাত্রে, অন্ধকারের মধ্যে। আরও কিছু জরুরী নির্দেশ দিয়ে মিটিং অল্প সময়ের মধ্যে ভেঙে দেওয়া হল। চাষীরা বাড়ি গিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসবে আবার। এ-ও ঠিক হল, আগে ললিত বাগচীর জমির ধান কাটা শেষ হলে পরে অন্য জমি।

চতুর্থ দিনে গভীর রাত্রে বহু বিঘা জমির ধান কাটা সারা হল। তবু একটি মাঠেই এখনও তাঁর আরও অনেক জমি বাকি পড়ে আছে। অন্য মাঠে আরও কত জমি! কয়েকদিন লেগে যাবে শুধু ললিতবাবুর জমি শেষ করতে। আমরা চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলাম, কারণ পুলিশের কী প্ল্যান, বোঝা যাচ্ছে না।

আমরা বুঝতে পারলাম, পুলিশ নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সুযোগ পেলেই গ্রেপ্তার করবে। আমাদের কাছে খবর আসছে, তারা সেই চেষ্টায় রয়েছে। যদি অতর্কিতে আমাদের ধরা যায়। হয়ত তারা ভাবছে, আমরা সামনে না থাকলেই আন্দোলনটা চৌপাট হয়ে যাবে।

অতএব আমাদের থাকতে হবে সাবধানে। সিদ্ধান্ত হল, ক্ষিরোদ রায়, জব্বর, বেণী দত্ত ও আমি—আমাদের এই চারজনকে যেন পুলিশ কোন অবস্থায় ধরতে না পারে। আমরা প্রতিদিন লোক মারফৎ মহকুমা নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি। তাঁদেরও একই নির্দেশ।

পঞ্চম দিনও গভীর রাত্রে ধান কাটা হল। কিন্তু ভোরের দিকে পুলিশ হানা দিল নমশূদ্র পাড়ায়, বেছে বেছে ললিতবাবুর বর্গাদারদের বাড়িতে গেল। আমাদের ক্ষুদে স্বেচ্ছাসেবকরা যথাসময়ে সঙ্কেত দেওয়া সত্ত্বেও কয়েকজন ধরা পড়ল। সেই দিন থেকে পুলিশের হানার ধরণ পাল্টে গেল। তারা প্রত্যেক পাড়ায় অতর্কিতে হানা দিতে লাগল, দিনে তিন-চারবার করে। দল বেঁধে সশস্ত্র পুলিশ পাড়ার ভিতর টহল দিতে শুরু করেছে। দিনেরবেলা শুধু আমাদের নয়, সাধারণ চাষিদেরও বাড়িতে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। কিছু সংখ্যক চাষি ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকছে সারাদিন, সন্ধ্যা হলে

বেরিয়ে আসছে। নেতৃস্থানীয় কর্মীরা এলাকার বাইরের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ছে ভোরের অন্ধকারে, আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে এলাকায় ফিরে আসছে। আশ্রয় ও খাদ্যের অভাব নেই। দূরের গ্রামগুলিতেও আন্দোলন ও পুলিশী নির্যাতনের খবর পৌঁছে গেছে, সেখানকার কৃষকরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তারা আশা করে রয়েছে আমরা সফল হলে তারাও একদিন এই পথ বেছে নেবে। সমস্যা তো সব এলাকায় একই। তাই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য তারা আন্তরিক ভাবে আমাদের আশ্রয় দিচ্ছে। নানা ভাবে সাহায্য করছে।

আমাদের কাছে এখন রাতটাই দিন হয়ে গেছে। সব কাজ চালাতে হচ্ছে রাত্রে। ধান কাটা, অল্প-অল্প ধান মাড়াই, মিটিং, পরস্পরের যোগাযোগ—সব চলছে রাত্রির অন্ধকারে। এ-ও কদিন চলবে বলা যায় না। শোনা যায় পুলিশের একজন বড় অফিসার জিপ গাড়িতে করে এসে সব দেখে-শুনে গেছে। একটা বড় রকম কিছু করার তোড়জোড় চলছে। এখন পর্যন্ত পুলিশ রাত্রে বেরয় না। হয়ত ভয়ে। আমাদের শক্তি সম্পর্কে তাদের নিশ্চয়ই কিছুটা ভয়ের ভাব আছে, নইলে রাত্রে মাঠে ধান কাটা হয়, রাত্রে নেতা ও কর্মীরা পাড়ায় আসে জেনেও তারা দিনের মত হামলা করতে বেরয় না কেন? অথবা হয়ত তাদের অন্য কোন প্ল্যান আছে, যা এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

এই অজ্ঞাত রহস্য উন্মোচিত হল সাত দিনের মাথায়। পুরুষরা অন্য দিনের মতই দিনের বেলা পলাতক। বাড়িতে আছে শুধু মহিলা ও শিশুরা। সকালের দিকে ললিত বাগচীর বাড়িতে কয়েকটি গরুর গাড়ি ও কিছু সংখ্যক মজুর আনা হয়েছে চাঁদপুর গ্রাম থেকে। আগেই বলা হয়েছে, চাঁদপুর একমাত্র গ্রাম যেখানে আমাদের সংগঠন নেই, অপর দিকে মুসলিম লীগের প্রচণ্ড প্রতাপ। বোঝা গেল, আমাদের শক্তি ও আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য তারা এই সুযোগ ব্যবহার করবে। এই উদ্দেশ্যেই শ্রেণিস্বার্থের তাগিদে আপতত সাম্প্রদায়িকতা চাপায় দিয়ে তারা ললিত বাগচীকে গরুর গাড়ি ও মজুর সরবরাহ করছে। পুলিশবাহিনী নমশূদ্র পাড়ায় হানা দিয়ে মজুরদের সাহায্যে গাড়ি বোঝাই করে বর্গাদারদের বাড়ি থেকে ধান ললিত বাগচীর খামারে নিয়ে তুলছে। মেয়েরা বাধা দিয়েছে, চিৎকার চেঁচামেচি করেছে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। শুরু হল আন্দোলনের সংকটজনক পর্যায়। এতদিন পর্যন্ত খুব বড় বাধা আসেনি, এলেও অতিক্রম করা গেছে। কিন্তু এখন? এখন আমরা কী করব?

১২

পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবেই মতভেদ দেখা দিল। তার পশ্চাৎপট ছিল পার্টির 'শর্ট অ্যান্ড পারশিয়াল' রণনীতির প্রয়োগকৌশল। জম্বর প্রস্তাব রাখল, 'চাষিদের বাড়ি থেকে পুলিশ ধান সীজ করতে এলে দলবদ্ধভাবে বাধা দেওয়া ও প্রয়োজন হলে সশস্ত্র সংঘাত। কিন্তু এর পরিণতি? সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে চাষিরা কতক্ষণ লড়তে পারবে, মাঝে থেকে কিছু নিরীহ চাষির প্রাণ যাবে, এ প্রায় সুনিশ্চিত। অথচ ধান রক্ষা করা যাবে না। একদিকে সরকার ও তার পুলিশ, অধিকাংশ জোতদার, কংগ্রেস, হিন্দু-সভা ও মুসলিম লীগ, তাদের অর্থবল—এদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে একটা ছোট এলাকার দরিদ্র চাষিরা কেমন করে এঁটে উঠতে পারে? আমরা কি জেনে শুনে চাষিদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেব? সারারাত আলোচনা করেও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাচ্ছে না। ঠিক হল, কর্মীদের ও নেতৃস্থানীয় কৃষকদের মিটিং ডেকে তাদের মতামত জানা দরকার। আরও দু'একদিন দেখা যাক অবস্থা কোন দিকে যায়। কিন্তু এ-ও সত্যি, আজকের ঘটনার পর কিছু কৃষকের মধ্যে যেমন ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠছে, তেমনি আর একটি অংশের মধ্যে হতাশাও দেখা দিচ্ছে। তাছাড়া কৃষকরা সাধারণভাবে যে অবস্থায়ই থাকুক, তারা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় এবং নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনে অভ্যস্ত। এই কদিনের টেনশানে তারা মানসিক ভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত। গরু-বাছুরের ঠিকমত যত্ন হচ্ছে না, টাল-টাল ধান মাড়াই হওয়া বাকি, এখানে-ওখানে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ানো—এসব তাদের মনের ওপর কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে বৈকি! এর ওপর নতুন উপদ্রব বাড়ি থেকে ধান সীজ করে নেওয়া। সব ধান যদি এভাবে সীজ করে নিয়ে যায় আর চাষি তার ভাগ না পায়, তা হলে তো না খেয়ে মৃত্যু একেবারে অবধারিত। এ সব প্রশ্ন ও সমস্যা আমাদের সামনে।

এর মধ্যে এল নতুন আর এক সমস্যা। জম্বরের স্ত্রী ছিল সন্তানসম্ভবা, খবর পাওয়া গেল, একটি মৃত সন্তান প্রসব করে সে এখন মৃত্যুর মুখোমুখি। শেষবারের মত সে একবার জম্বরকে দেখতে ইচ্ছুক। মুমূর্ষু স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে গেলে জম্বর নির্ঘাৎ ধরা পড়বে, কারণ তার স্ত্রীর গুরুতর অসুস্থতার খবর নিশ্চয়ই পুলিশের কাছে পৌঁছে গেছে এবং তাকে ধরার জন্য ফাঁদ পেতে রাখা খুবই স্বাভাবিক তাদের পক্ষে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছি না, যদিও জানি আন্দোলনের এই সংকট-জনক পরিস্থিতির মধ্যে ধরা পড়ার সামান্যতম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। সেটা আন্দোলনের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। তবু ব্যাপারটা তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া হল। জম্বর গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবে জবাব দিল,

'না, দেখা করার দরকার নেই।' পরদিনই তার স্ত্রীর মৃত্যুর খবর আমরা পেলাম গোপন সেণ্টারে বসে।

আর একদিন পুলিশ কয়েকজন মজুর ও গরুর গাড়ি সঙ্গে নিয়ে একজন চাষির বাড়িতে হানা দিল ধান সীজ করতে। আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কয়েক জন চাষি শান্তিপূর্ণ ভাবে ধান তুলতে বাধা দিল। তাদের বাধা দানে মজুররা সরে দাঁড়াল। তখন পুলিশ নিজেরাই ধানের আটি গাড়িতে তুলতে শুরু করল। অবশ্য অর্ধেক ধানও তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফেরার সময় তারা তিনজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল ধানের সঙ্গে।

ইতিমধ্যে আগে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল, তারা বেইলে ছাড়া পেয়ে ফিরে এল। আমাদের আশঙ্কা, তাদের মনোবল ঠিক আছে কিনা। মহকুমা জেলে খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট। কিন্তু মন্বন্তর পার হয়ে-আসা চাষিদের কাছে ও-সব কোন ব্যাপার নয়। তাদের মনোবলে কোন ভাঙচুর হয়নি দেখে অন্যান্য চাষিদের জেল-ভীতি অনেকখানি দূর হল। বন্দীদের বেইলের ব্যাপারে আমাদের কিছু করতে হয়নি। এ সব দায়িত্ব মহকুমা পার্টির পক্ষে নগেন সরকারের। তাঁর চিঠি থেকে জানা গেল, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ধান চুরির অভিযোগ। এই অভিযোগে গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট ঝুলছে এই এলাকার সাড়ে-চারশ জনের বিরুদ্ধে। আমরাও বাদ যাইনি। সবাইকেই একদিন কোর্টে হাজিরা দিয়ে বেইল নিতে হয়েছিল, পরে।

পুলিসের ধান সীজের খেলা তিন-চারদিনের বেশি চলেনি। ব্যাপারটা তাদের কাছেই হয়ত বিসদৃশ ঠেকেছিল। ললিত বাগচীর অর্ধেকের বেশি জমির ধান কাটা হয়ে গেছে। এত ধান চাষিদের বাড়ি থেকে সীজ করে আনার মত মজুর সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। চার পাশের গ্রামগুলির চাষিরা আন্দোলনে না নামলেও তাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে আন্দোলনের প্রতি। যে-সব গ্রামে ললিত বাগচীর কর্মচারিরা পুলিশ সঙ্গে নিয়ে মজুর সংগ্রহ করতে গেছে, সেখানেই তারা ব্যর্থ হয়েছে। অবস্থা দেখে পুলিশ আবার তাদের কৌশল পরিবর্তন করল। রাত্রে তারা দলে-দলে মাঠে ঘুরতে লাগল, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগল ভয় দেখানোর জন্য। দিন বা রাতের যে-কোন সময় চাষিদের বাড়িতে ঢুকে দেখতে লাগল কোন পুরুষ বাড়িতে আছে কিনা। যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরে ললিত বাগচীর বাড়িতে এনে বেদম মারপিট করছে! একজন চাষির পা এমন ভাবে খোঁড়া করেছে যে, তাকে আর হাজতে পাঠাবার মত অবস্থা নয় দেখে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। সারা এলাকার চাষিপাড়ায় পুরুষ নেই। আগে রাত্রে ঢোকা যেত, এখন তা-ও বন্ধ। এলাকার চৌহদ্দি জুড়ে পুলিশ ওত পেতে থাকে চাষি বা কর্মীদের ধরার জন্য। ধরার পর অমানুষিক অত্যাচার।

এই অবস্থার ফলে মাঠের ধান পেকে ঝরে পড়ছে মাঠে। মাত্র তো ললিত বাগচী আর কয়েকজন বড় জোতদারের জমির ধান আংশিক কাটা হয়েছে। এখনও মাঠজুড়ে রাশি-রাশি পাকা ধান। তা ছাড়া যে ধান কেটে আনা হয়েছে, তার মাড়াই বাকি। এ সময় চাষির কত কাজ, দিন-রাতে একটু অবসর মেলে না। সব কাজ ফেলে তারা এখন গ্রামের বাইরে বন-বাদাড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি চাষিরা অস্থির হয়ে উঠেছে। কিছুটা বিভ্রান্তও। চারদিকে ছড়িয়ে আছে তারা। সবার মনের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এর মধ্যে কিছু ঘটনা ঘটল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যোগাযোগের ফলে, আমার দাদা, আইন সভার সদস্য মনোরঞ্জন ধর গ্রামে এসেছেন। তিনি ললিত বাগচীর বাড়িতে বসে জোতদার-পক্ষের বক্তব্য শুনছেন। খবর পাওয়া গেল, তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। যোগাযোগ মাধ্যমে রাত্রিবেলা গোপনে তাঁর সঙ্গে আমরা চারজন দেখা করলাম। তিনি তেভাগার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন মন্তব্য না করে প্রথমেই আমাদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আনলেন আমাদের আন্দোলনের পদ্ধতিগত নৈতিকতা সম্পর্কে। ললিত বাগচীর বাড়িতে দুধ, মাছ ইত্যাদি বিক্রি বন্ধ করা, যার ফলে বাড়ির শিশুরা দুধ পায়নি, এসব আমাদের পক্ষে খুব অন্যায় ও অমানুষিক কাজ হয়েছে এবং এমনি আরও কিছু অভিযোগ। এই প্রথম প্রতিপক্ষ হিসাবে আমি আমার দাদার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। আমি কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে কি ঘটেছে, সব তাঁকে জানালাম। কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের দিক থেকেই কি কম বাড়াবাড়ি হয়েছে? অনেকক্ষণ আমাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হল, কিন্তু আমাদের সব বক্তব্য তিনি মেনে নিলেন না। তবুও এ আন্দোলনের ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার জন্য তাঁকে মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ জানানো হল। তাঁর কাছ থেকেই আমরা জানলাম, মুসলিম লীগের প্রাদেশিক নেতা গিয়াসউদ্দীন পাঠান আসছেন এখানে।

পাঠান সাহেব এলেন এর দু'দিন বাদে। মিটিং হল মানিকখালি বাজার-প্রাঙ্গনে। চারদিক থেকে কাতারে-কাতারে মুসলমান জনতা এসে ভেঙে পড়ল মিটিং শুনতে। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' আর 'আল্লা-হো-আকবর' ধ্বনিতে কেঁপে উঠল এলাকা। পাঠান সাহেব প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন, এর মধ্যে বোধহয় চল্লিশ মিনিট ব্যয় করলেন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসা করে। তাঁর আসার উদ্দেশ্য স্পষ্ট—মুসলমান জনতাকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া। তিনি জানালেন, 'কমিউনিস্টদের তেভাগা দেবার ক্ষমতা নেই। একটু অপেক্ষা করুন, পাকিস্তান হতে যাচ্ছে আর কিছু দিনের মধ্যে। আমাদের মুসলমানের জমানা একবার শুরু হলে, তেভাগা

কেন তার চেয়ে অনেক বেশি আপনারা পাবেন। তখন তেভাগাই হবে আপনাদের।' কমিউনিস্টদের খপ্পরে পড়ে আইন ভাঙার দরুণ কৃষকদের জেলে যেতে হচ্ছে এবং আরও নানাভাবে তাদের হয়রান হতে হচ্ছে বলে খুব দুঃখ প্রকাশ করে শেষ উপদেশ দিলেন, তারা যেন অগোনে আইন মোতাবেক জোতদারদের সঙ্গে ফয়সালা করে ফেলে।

তলে তলে কী হয়েছে জানা যায়নি, পরদিন থেকে ললিত বাগচীর বাড়ি থেকে পুলিশ ক্যাম্প উঠে গেল। পুলিশ চলে গেল গ্রাম ছেড়ে। কিন্তু গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কারো ওপর থেকে প্রত্যাহার করা হল না। কৃষকরা বাড়ি ফিরে এল। আমরাও কৃষক সমিতির অফিসে এসে বসেছি সন্ধ্যার দিকে। পাঠান সাহেবের বক্তৃতার প্রভাব যে কৃষকদের ওপর ভীষণভাবে পড়েছে এবং তার ফলে তাদের সংগ্রামী জেহাদ বেশ কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে, সারা দিন ঘুরে ঘুরে আমরা তা বুঝতে পেরেছি। কৃষকরা এই কদিনের হয়রানি ও ফসলের ক্ষতি হবার আশঙ্কায় সংগ্রামকে আরও টেনে নেবার মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তারাও চাইছে একটা ফয়সালা হয়ে যাক। বিনা খবরে দলে-দলে কৃষক এসে সমিতির অফিসে হাজির হল। কিন্তু আমরা অবাক হলাম, কৃষকদের মধ্যে যারা বেশি জমির বর্গাদার তারা যতটা আপসের জন্য আগ্রহী, ছোট বর্গাদার ও ক্ষেতমজুর শ্রেণীর গরীব মানুষ-গুলো সেই পরিমানে আপস-বিরোধী। এরা গিয়াসুদ্দিন পাঠান সাহেবের বক্তৃতাকে আমল দিচ্ছে না। তারা বলছে, "গিয়াসুদ্দিন পাঠান আর মনোরঞ্জন ধর কেন ছুটে এসেছেন, তা কি আমরা বুঝি না? পাকিস্তান হলে তেভাগাই যদি দেবেন, এখন তো লীগের সুরাবর্দি সাহেবই প্রধানমন্ত্রী, তেভাগার আইন কেন করেন নি? আসলে সব ধোকাবাজি। তাদের কাছে জমিদার-জোতদারের স্বার্থই বড়। চাষির জন্য তারা কোনদিন আইন করবে না।" কৃষকরা নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সব বোঝে, তা সত্ত্বেও চারদিকে হঠাৎ মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের সমর্থনে প্রচণ্ড জোয়ার দেখে আন্দোলনের টেম্পো নষ্ট হয়ে যায়। সর্বভারতীয় রাজনীতির হাল-চাল দেখে আমরাও স্পষ্ট বুঝে গেছি, দেশ-বিভাগ অনিবার্য ও আসন্ন। যুদ্ধে যেমন 'সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ' বলে রণকৌশল ইংরেজরা প্রথম দিকে অনুসরণ করেছিল, আমরাও সেই ধরণের কৌশলের কথা ভাবলাম, যাতে আমাদের সংগঠন ও প্রভাব অটুট থাকে, অথচ কৃষকরা মনে করতে পারে আন্দোলনে পুরোপুরি তেভাগা না হলেও তাদের কিছু লাভ হয়েছে। আমরা গিয়াসুদ্দিন পাঠানের বক্তব্যকেই কাজে লাগালাম। তাঁর মত একজন বড় নেতার উপদেশ লঙ্ঘন করা ঠিক হবে না, বিশেষ করে হাজার-হাজার মানুষের সামনে তিনি যখন তেভাগার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অতএব চাষিরা নিজের নিজের জোতদারের

সঙ্গে দেখা করে জানতে চেষ্টা করুক কে কতটা সুবিধা বর্গাদারকে দিতে প্রস্তুত। চাষের খরচের একটা অংশ, আর যার বাড়ির কাছে জমি তার বাড়িতে ফসল উঠবে—এই দু'টো ন্যূনতম দাবি নিয়ে চাষিরা জোতদারদের সঙ্গে কথা বলুক। আগেই বলা হয়েছে, দু'চারজন ছাড়া অধিকাংশ জোতদারের সঙ্গে চাষিদের সম্পর্ক ভাল। তারা দু'টো দাবিই মেনে নিল। আর ললিত বাগচী, ফটিক বাগচী এবং আরও কয়েকজন দ্বিতীয় দাবিটা মানতে রাজী হল না, তবে খরচপত্রের ব্যাপারে আশ্বাস দিল। তাদের দ্বিতীয় দাবি না মানার কারণ, কৃষকের প্রতি তাদের সন্দেহ। তারা ভাবে, কৃষকের ঘরে সম্পূর্ণ ফসল উঠলে তারা অর্ধেক কেন, দুই ভাগেরও বেশি রেখে দেবে। তার চেয়ে খরচ বাবদ কিছু ধরে দেওয়া ভাল। অবস্থার চাপে চাষিরা এভাবেই আপস করতে বাধ্য হল। আর এত ঝক্কির পর জমির মালিকরাও একটু নরম হল। আপাতত শান্তি ফিরে এল।

সংগ্রামে জয়, পরাজয় বা আপস তো আছেই। তবে এ আমাদের একটা বড় সান্ত্বনা যে, কৃষকরা সংগ্রামে কিছু পরিমানে পশ্চাদপসরণ করার আসল কারণটা বুঝতে পেরেছে, তারা তাদের নেতৃত্বকে ভুল বোঝেনি বা বিশ্বাস হারায়নি তাদের প্রতি। চারপাশে যখন পাকিস্তান লড়কে লেঙ্গে-র রণহুঙ্কার ও সবুজ ঝাণ্ডার তাণ্ডব, তখনও কয়েকটি গ্রামের একটি ছোট দ্বীপে উড়ছে লাল ঝাণ্ডা, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাতাবরণের মধ্যে। এমন কি পাকিস্তান হওয়ার পরেও এই বাতাবরণ নষ্ট করতে পারেনি লীগ ও আনসার বাহিনীর গুণ্ডারা। বারবার দাঙ্গার চক্রান্তকে ব্যর্থ করেছে কৃষকরা, অথচ তখন তারা নেতৃত্বহীন। নেতাদের অনেকে তখন জেলে অথবা গ্রেপ্তার এড়াতে পলাতক, কয়েকজন দেশ ছেড়ে ভারতে। সক্রিয় কর্মীরা প্রকাশ্যে কাজ করতে পারছে না।

তেভাগা আন্দোলনের একবারে শেষ পর্যায়ে আমি একদিন কিশোরগঞ্জ শহরে গিয়ে দেখলাম, কলকাতায় ছাত্রদের ওপর গুলি চালনার প্রতিবাদে শহর জুড়ে কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলি মিছিল করছে, রেল রুখছে রেল লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে, সরকারী অফিসগুলিতে আগুন লাগানো হচ্ছে। আমিও কমরেডদের সঙ্গে সামিল না হয়ে পারিনি। কিন্তু আরো অনেকের সঙ্গে ধরা পড়ে গেলাম এবং পাকিস্তান হবার মাত্র কয়েকদিন আগে বেইলে ময়মনসিংহ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গ্রামে ফিরে এসে দেখি, তখন পর্যন্ত তেভাগা আন্দোলন উপলক্ষে সাড়ে-চারশ কৃষক ও কর্মীদের বিরুদ্ধে ধান-চুরির মামলা উঠিয়ে নেওয়া হয়নি। তবে তাদের কোর্টে যেতে হয় না, মাসে একবার করে থানার সামনে বিশেষ আদালত বসে, সেখানে সবাইকে হাজিরা দিতে হয়, আবার একমাস বাদে তারিখ পড়ে। এভাবে চলেছিল পাকিস্তান হবার পরেও

অন্তত এক বছর। তারপর আর তারিখ পড়ত না, কিন্তু মামলা উঠিয়ে নেওয়া হয়নি সরকারী ভাবে।

১৩

এই লেখা শেষ করতে গিয়ে আজ মনের পর্দায় ভেসে উঠছে অনেক নেতা, কর্মী ও কৃষকের মুখ, যাদের নিয়ে আমরা ছিলাম একটা পরিবারের মত। ত্যাগ ও নিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এক-একজন। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃসাহসিক কাহিনী ও ঘটনা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের ইতিহাস চাপা পড়ে রইল। সেদিন একটা কথা কর্মীরা মনে প্রাণে মেনে চলত—কমিউনিস্টদের ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শ মানুষ হতে হবে। খাঁটি ও সৎ জীবন যাপন করতে হবে। এ ভাবেই তারা মানুষের ভালবাসা ও বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের রাজনৈতিক শত্রুরাও স্বীকার করত—'ওদের রাজনীতি ভুল, কিন্তু ছেলেগুলি বড় ভাল।' আর সাধারণ গরীব মানুষ, কৃষক, ক্ষেত-মজুর এরা তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না, অন্তত তখনকার দিনে ঘামাত না। তারা মানুষগুলি ভাল কি মন্দ, সেটা যাচাই করেই তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করত। আমাদের ওপর তাদের বিশ্বাস কখনও টাল খায়নি।

পাকিস্তান হবার অল্পদিনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি কার্যত নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আমাদের ওপর আক্রমণ শুধু সরকারের দিক থেকে নয়, লীগ ও তার আনসার বাহিনীর দিক থেকেও এল। বাছাই করে আমাদের কর্মীদের ধরে নির্দয়ভাবে প্রহার করে জেলে পাঠানো হচ্ছে। আমরা সব আন্ডার গ্রাউন্ড গেলাম। যশোহর জেলা কৃষক সম্মেলন হবার কথা ছিল ৪৯ সালে, পুলিশ ও আনসার বাহিনী তা পন্ড করে দিল। তারা বাড়ি বাড়ি ঢুকে সার্চ করতে লাগল কোন কমিউনিস্টকে সেল্টার দেওয়া হয়েছে কিনা। সন্দেহ হলে সেই বাড়ির লোকজনকে মারপিট করা হত। পুলিশের চেয়েও বেশি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াল আনসার বাহিনীর গুন্ডাগুলো, যারা পুরোপুরি ফ্যাসিস্ট কায়দায় মানুষের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করছে। আমার ও অম্বরের ওপর টাকা ঘোষনা করা হল। ধরে দিতে পারলে পাঁচশো করে টাকা দেবে পুলিশ। এমন অবস্থা দাঁড়াল, সেল্টারের খোঁজে রাত্রে বেরনো মুস্কিল, পথে পথে আনসারের ছেলেরা পাহারা দিচ্ছে। মনে আছে, রাত একটার সময় একজন বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, আমাকে দেখে বন্ধুর মা বন্ধুটিকে বারান্দায় ডেকে বলল, 'ওকে চলে যেতে বল।' বেশ জোরেই তিনি বললেন যাতে আমার শুনতে অসুবিধা না হয়। বন্ধুটি খুব অপ্রস্তুত। আমি নিজেই বেরিয়ে এলাম। আর একদিন আমার নিজের মাসীর বাড়িতে গেলাম। আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দু'চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল, তিনি বললেন, 'তোকে টাকা দিচ্ছি, তবু তোকে থাকতে দিতে পারব না। তুই চলে যা।' চাষিদের

ঘরে বহুদিন রয়েছি, কিন্তু তাদের ঘর-দোরের অভাব, তাদের পক্ষে আমাদের লুকিয়ে রাখা কঠিন; তাছাড়া প্রত্যেক মুসলিমপাড়ায় অন্তত দু'চারজন আনসার রয়েছে, তাদের নজর এড়ানো সম্ভব নয়। আপাতত এলাকা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। আমি চলে এলাম বগুড়ায় পূর্ণেন্দু দত্তের কাছে, তিনি তখন বগুড়া কলেজের অধ্যাপক। সেখান থেকে খবর পেলাম কমরেড বীরু রায় আরো দু'তিন জনের সঙ্গে ধরা পড়েছে এবং থানায় পুলিশ ও আনসারের নির্মম অত্যাচারে তারা আধমরা হয়ে গেছে। পূর্ণেন্দু বাবুর ওখানেও বেশিদিন থাকা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই দু'এক জনের মনে সন্দেহের আভাস দেখা দিয়েছে। নানা রকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এবার মন স্থির করে ফেলা হল। সোজা চলে এলাম কলকাতায়। আমার আসার কিছু দিন বাদে অম্বরও চলে আসতে বাধ্য হল। জানাশোনা লোকের মাধ্যমে কুকা গ্লাস ফ্যাক্টরিতে তার একটা কাজ জুটে গেল, অবিশ্যি ৫২-র ভাষা আন্দোলন শুরু হবার মুখে সে আবার ফিরে গেল। কিন্তু ফিরোদ রায়, বেনী দত্ত ও আমি বরাবরের মত এখানেই রয়ে গেলাম। জীবনের একটা অধ্যায়ের এ ভাবেই সমাপ্তি ঘটল। এরপর অন্য অধ্যায়—পড়াশুনা, চাকরি আর এই সঙ্গে পার্টিও।

এলিজি-সপ্তক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পূর্ণ পাথর

দূরবাস থেকে ডাকো। প্রাণপণে ডাকো।
ডাকতে ডাকতে
কণ্ঠনালী ছিঁড়ে যায়। ফিনিকে ফিনিকে রক্ত ওঠে।
চোখ ফেটে রক্ত, কপালের শিরা ফেটে রক্ত,
দুই করতলে রক্ত,
এইটুকু শরীরের সমস্ত শোণিত আজ
দশদিক কেঁপে যাকে ডাকে—
সে এত বধির, এত অন্ধ
কিছু দেখে না, শোনে না।
বসে থাকে। প্রশ্নের ভিতরে প্রশ্ন হয়ে বসে থাকে।

এরকম স্মৃতিহীন, ভালোবাসাহীন লোক দেখে
সকলেই দুয়ো দেয়,
সমবেত-ঘৃণার বিদ্যুৎ কাঁপে ঈশানে ঈশানে।
কেবল জানে না তারা
সে-দূরবাসিনী নারী যাওয়ার বেলায়
ঐ মূর্খ লোকটিকে সম্পূর্ণ পাথর করে রেখে চলে গেছে।

[illegible]

শেষের সে-দিন
সারা শরীরের রক্ত মুখে এসে জড়ো হয়েছিল।
যেন ফেটে পড়ছিল টসটসে ঠোঁট, দুটি চোখ।

এত বড় শাস্তি ছিল ? আর নয়, ওর শান্তি হোক—
বাণ বুকে নিয়ে
এই প্রার্থনায়, মূক হাহাকারে নেমে গেল
সে-নারীর নিজস্ব পুরুষ ।

মাঝরাতে চুল্লির হাঁ-মুখ খুলে গেলে
বুঝতে বুঝতে তার বড় বেশি দেরি হল
রমণীটি কোনোদিনই তার নয়, কখনো ছিল না—
তার নাম স্বাহা, সে তো একমাত্র অগ্নিরই প্রেমিকা ।

ছোট বাড়ি

ভালোবাসা ঢেলে গড়া তার একটা ছোট বাড়ি ছিল ।
আহামরি আসবাবে মোটেই সাজানো নয়,
দুধশাদা-ফুলের ফুলে
তবু রোজ ম ম করত তার বাড়ি । তার ছোট বাড়ি ।

চারপাশে মানুষের সমস্ত অসুখ
সে এমন বুক পেতে নিয়েছিল,
যে-অসুখ একদিন বয় হয়ে নিয়ে গেল তাকে
দোরহীন জানালাবিহীন এক বিশাল বাড়িতে
সেখানে যেতে না পেরে
বহুদূরে একা একা কেঁদে মরে
তার বাড়ি, তার ছোট বাড়ি ।

এত বেশি অহংকার

'তোকে ছেড়ে এক তিল যাবো না কোথাও'—
এত বেশি অহংকার
কখনো বাঁচার যোগ্য নয় ।
আমারও তো ক্ষোভ আছে,
আছে শংকা, মনস্তাপ, ভয়,
এত বেশি পেয়ে তবু এত বেশি ভেঙেছি নিজেকে,
হুট্ করে যাওয়া কোনো ব্যাপারই ছিল না ।

০

'যাই' 'যাই' বলে চেপে বসে থাকি।
তুমি শুধু হুঠকারে চারদিক আলো করে উড়িয়ে রুমাল
না-ফেরার দেশে আজ পর্যটনময়,
'তোকে ছেড়ে এক তিল যাবো না কোথাও'—
এত বেশি অহংকার
কখনো বাঁচার যোগ্য নয়।

অলীক বন্দুক

বড় ভালোবাসা ছিল। তাই বড় বেশি শংকা ছিল।
সেই বিষে নীল হয়ে
আপ্রাণ বাঁচার ইচ্ছে নিয়ে যে কখন
বোঁটা-ছেঁড়া ফলের মতন
টুপ্ করে খসে গেছ জলে,
তোমাকে চিনত যারা, গোল হয়ে বসে
তারা সে দুঃখের গল্প বলে।

পাথর, গিয়েছো সরে। এত সুখ, আজ এত সুখ!
তাই আমি আশাতীত এমন সুযোগে
নিজের বুকের দিকে তুলে ধরি আত্মঘাতী অলীক বন্দুক।

বাতাসে বাতাস

তুমি এই ঘরে আছো। বাতাসে বাতাস হয়ে আছো।
যখন ঘুমিয়ে পড়ি, কাছে আসো।
প্রাণপণে চেয়ে দেখ—এ নিদ্রিত মুখে
স্মৃতির চাবুক কিছু কাটাছেঁড়া রেখে গেছে কিনা।

পাঁজরের রিডে রিডে আঙুল বুলিয়ে বলো—
আর কত রোগা হবে তুমি?
জ্বরের কপালে রাখো শুশ্রূষার করতল,
বলো—এইবার শান্ত হও,
নিশি-পাওয়া দুই পায়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
বলি—তুমি যেয়ো না রজনী,
দুই বাহু সেতু করে যেই মেলে দিই,

বাতাসে বাতাস হয়ে মিশে যাও
ও আমার নিহিত রমণী।

পাহাড় ও টিলা

বৃষ্টিতে বিষণ্ণ দিন। সব ধুয়ে মুছে একাকার।
বারুণীর জলে কাঁপে কমলা রঙের ছায়া—
ঢেউয়ে ঢেউয়ে চলেছো কোথায়?
নিজেকে কতটা ছুঁড়ে দিতে পারি, সে তো তুমি জানো,
আমার সমস্ত নদী না-পারার কংক্রিটে বাঁধানো।

আমি তো হুডিনি নই, উড়িয়ে রুমাল
হয়ে যাবো এক ঝাঁক পাখি,
ডাকি, শুধু দূর থেকে ডাকি,
ছিঁড়ে যায় হৃৎপিণ্ডের ছিলা,
না কি ঐ প্রাণপণ ভালোবাসা এমনই পাহাড়,
যার কাছে আমাদের সমবেত ভালোবাসা
ছোট এক টিলা।

কাঁচল্যাম্প আর নুড়িপাথরের কথা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাবি কাঁচল্যাম্প আর নুড়িপাথরের কথা। ভুষোর শেওলায়
দীপ পিপিলিকা খুইয়ে কী বলে নিজেকে? তাপ করে?
ধাপ ভেঙে খসে যায় অগাধ তলায়? বার বার
সয়ে, শয্যা তুলে উঠে বসি আমি। ঘাম কালি মুছে, ধুলো ধুয়ে
ঝোলা কাঁধে ফেলে ছুটছি—দশটা-এগারোটা—বেজে গেল—সবজী পাঁক
বাইক আর বিজ্ঞাপনের ঠেলা খেতে খেতে, মারুতি মালিক আর পকেটমারদের
চোখ এড়িয়ে চাপ জলোচ্ছ্বাসে ঢুকে যেতে থাকি নিজের অগাধ
নুড়িপাথরের পেটে দীপ ঘোর কাঁচের নাভিতে।

বিকেল-রাতের ভার মনস্তাপ ঘোলা হয়ে আছে।
চোরবাজার মদনাহাটের পারাপার লোক দফায় দফায়

নুড়ি কাদা ভেঙে ওঠা-নাবা করে—দু ভুরুর জোড়ে
ভুখো ফেলে ফেলে জ্বলছে কাঁচল্যাম্প, অজানি তেজটুকু
চড় চড় করে উঠছে গুমোট চাঁদ-খাওয়া ভাদ্ররাতে।
শাদা হলদে কালোর ফোঁটা ফোঁটা টাল খেয়ে উঠছে বাইক আর বিজ্ঞাপনের
ধারে ধারে, বোলা সয়ে ওঠে পিঠে ঘাম আর খোঁচায়।
খোলা লণ্ঠে দশ আঁচড় দিয়ে পড়ছে আঁশ-বাতাসের রোঁয়রেণু....

মণি

শুভ বসু

সেও তো এক সাপের মাথার মণি!
এই দেশের রূপকথার মায়ায় ভরা রাত
এক লহমায় তার বিভার জাদুতে হত ভোর।

কে পায় সে মণি, কে পায় এমন দুর্গম পথে পথে
পা ফেলে পা ফেলে মৃত্যুর সাথে কোলাকুলি করে চলতে চলতে চলতে?

যে পায়, তার বুকে তখন শ্যামসমান শিখা
গুনগুন করে গুঞ্জন, আর তামাম জগৎ-সংসার
জয় করে নেয় মায়ালোক থেকে কনে-দেখা ঘোর আলো!
সে মণি তাহলে কোথা থেকে পায় আলোর অমন ঝর্ণাধারার উৎস?

দুচোখ যখন অমোঘ লগ্নে খুঁজে পায় অম্বিষ্ট
অন্য দুচোখ, এক জোড়া তারা—তখনই আকাশগঙ্গার মোহানায়
অবগাহণের পুণ্যে জীবন ফিরে পায় নবজন্ম।
তখন বাতাস পাতায় পাতায় অধীর বৈতানিক, সরীসৃপসমাজ
অনন্তগামী জিজ্ঞাসু কোনো-নিষেধ-না-মানা।

সেই অনন্ত মুহূর্তেই তো তখন বুকের শুক্তির
ভেতর জমে আলোয় আলোকময়তাময় মণি!

যে পায় তার সারা জীবন প্রতি পথের বাঁকে
বাতাস এসে নির্ভুল দিক চিনিয়ে বায় গোপন একান্ততায়,
আকাশ তাকে বরণ করে দিগন্তিকার সখ্যে,
মৃত্যু গভীর দোসরতায় বলে, 'এ মুখ ভয় না পাওয়ার, ভীরু' ।

লক্ষ লক্ষ লোক চলেছে দিব্যি সুখে আলোকমণির হদিশ-না-জানা,
তাদের চামড়ায় বসায়নি দাগ হাজার প্রশ্নের তীক্ষ্ণ কঠিন ফলা,
দৈনন্দিনে মগ্ন, তাদের শরীরভরা সুখে
সুবচনীর অভয় থাকে, ষষ্ঠীমাতার কৃপা এবং নির্বিকারতার
হাত থেকে পাওয়া রক্ষাকবচ, কুণ্ডল ।

যার জীবনে হদিশ ছিল, স্বপ্ন ছিল, প্রয়াসও ছিল মণির
আলোয় আলোকময় সামর্থ্যে দৃঢ় দুপায়ে যাবেই দিগন্তে
অচরিতার্থ তার বেদনা আকাশজোড়া মেঘের মুখে মুখে
প্রাজ্ঞসজল বিদ্রূপে কৌতুকে
গাঢ় হরিৎ শাখায় শাখায় দোলা জাগায়, কান্না জাগায় না ?

নিজেকে বহন করে

ব্রত চক্রবর্তী

আলোড়ন পর্যন্ত থাকব
তারপর দুয়ো ।

কুশলপ্রশ্নের পরে চা পান ।
ঈশ্বরেরও কাছ থেকে
উঠে চলে এসেছি তারপর ।
এঁটো কাপ ধুলোয় গড়াগড়ি ।

নিজেকে বহন করে নিয়ে যাই,
তুমি জান ।
একদায় অনায়াস যাতায়াত নেই,
তুমি জান ।

খুব বেশী ক্লান্ত করে উদাসীন ফেরালে
একদিন কিছুতে যাবো না।

তামাক ফুরিয়ে গেলে বলেছি ঈশ্বর
গড়গড়া সাজা হলে আবার ডাকবেন।

ও তরুণ রাঠোর

নন্দিতা চৌধুরী

হে ঈশ্বর, জেব্রা সভ্যতায় তুলে ধরো পেট্রল পণ্যের বশ্যতা, তুলে ধরো চণ্ডালের শিমুল পাতার মদ ও কাঁচপোকা। ঘাসের বাহারপীঠে তরুণ রাঠোর, বহুদিন পরে একখানা বৃষ্টি-ভেজা পত্র দিও রাজকন্যার সাজানো অভিমানে সাম্প্রতিক জাহাজের পতাকা উড়িয়ে। আমি কিন্তু জানি, যা তোমাকে স্পর্শ করেছে আমলকির ফুলের ঘ্রাণে দ্যু-সন্ধির মাঝখানে বর্শা ফলক উঁচিয়ে। হেমন্তের মত ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মেঘের ঘোলাটে জোৎস্নার প্রত্ন-বিশপের গরল-মাখানো ওভারকোটে। তবু ভুল হয়; তোমার মৃত্যুর আগে উপত্যকার কোলাজিয় প্রেক্ষাপটে স্ফীত দুটি পা, জনবৃন্তে সূর্যমুখীর আলো—পুরনো মিশর-দুর্গের নীচে দেবদূতেরা তামাক পাতা ভেজানো জলে বোধহয় স্নান করেছিল।

হে ঈশ্বর, পিতৃত্বের চরমতম প্রতিশোধে ছিঁড়ে খুঁড়ে যায় জুয়ারির সিঁড়ি-গহ্বর। প্রেতের প্রণয় চুম্বনে নিটোল উর্বশীর ছবি এবার ফেরার সময় হলো, অথচ মখমল জুড়ে মাতাল মৌমাছির কুসুম-শূন্যতায় গাণিতিক ভুল। এই ভুলের রীতি যদি কখনো ক্ষমা করো, তবে হোটেল মালিকের ছেলে তোমাকে ঠিকঠাক বুঝবে উত্তমাশা অন্তরীপের সেই বাদামি ঘোড়ার সওয়ারের মত।

এখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো শিশুর শবাধারে মানুষ ও পিঁপড়ের সঙ্গে, তবু উম্মাদের যৌনাচারে গর্ভিনী কিরাত নারী বটের নাভিমূল আঁকড়ে ধরে। অথচ তোমাকে জাগতে হবে কুকুর-শৃগালের জ্বরের তৃষ্ণায়, কোনো এক বোতল বন্দী জিনের ইশ্তেহারে। কেন ব্যক্তিগত কিছু খুচরো পাপ চাষের জমিতে ছড়িয়ে দিলে রুমাল ওড়ানোর রাজকীয় ভঙ্গিমায়? কেন তোমার মৃত্যুরূপী জানালার ধারে কয়েক মুঠো আতপ চাল সংগ্রহ করেছিলে স্থায়ী বন্দোবস্তে ও টাকাকড়ির অছিলায়?

অতএব ঈশ্বর, আজ শুধু তুমি হেঁটে চলে বেড়াও গভীর অরণ্যের মায়াবী চুলে সবুজ ছদ্মবেশ খুলে ফেলে। পৃথিবী যেখানে যেমন ছিল, ঠিক সেখানে তেমনি আছে। আজও প্রাচীন মন্দিরে মসজিদে, গির্জার দেয়ালে খুনীদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তোমার সচিত্র পোস্টার সেঁটে রেখেছি। শুধু একবার দুচোখ ভরে দ্যাখো, আফ্রিকার জিন-পরীরা টোটেম গড়ন ভেঙে উড়ে যাচ্ছে রাজহাঁসের ডেরায়। মায়াসভ্যতার ভৌগোলিক ম্যাপ ছিঁড়ে যাচ্ছে প্রেমিকের ওষ্ঠে গভীর চুম্বন করে।

তবুও তোমার শিকড়-ওপড়ানো কাশির শব্দে কুসুম কুমারীর ঘুম ভাঙে —রোজ রাতে অনন্ত নাগের সঙ্গিনী হবে বলে। তবু কেন জানি না, তুমি তঞ্চকতা ছেড়ে এক স্বেচ্ছাচারীকে ভালোবাসো এবং আমাদের লাগাতার টেলি-গ্রাম করো। তাই কোনো এক গভীর রাতে আমরা শুধু তোমাকেই স্বপ্নে দেখেছিলাম এবং তোমার কথাই শুনেছিলাম।

দূরত্ব

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

যে কথা ব্যক্তিগত তাকে টেনে আনো কার্ফ্যুর দুপুরগুলিতে। তাকে টেনে আনো বুদ্ধিজীবীদের পাশে, রাস্তায়, ইঁটবৃষ্টিতে। গঙ্গাজলের কলে আলো ধরে দাও তার, লজ্জা দাও, যতটা সম্ভব। দাও শিল্প-সুষমা। ভাঙো পি টি এস-এ, চারফর্মার স্মার্ট কবিতাবইয়ের মধ্যে, তৃতীয় পৃষ্ঠায় রাখ তাকে। বন্ধুরা বাহবা দিক। পার্টি হোক মেঘলা নিশীথে

যে কথা ব্যক্তিগত, ভুলেও বোলো না মেয়েটিকে

দৃষ্টি

রূপা দাশগুপ্ত

তুমি কি রূপকথা পড়ো ? তুমি কি মেঘের পিঠে চাপো ?
তবে কেন দাবা খেল সভায় সভায় ?
যেভাবে তাকায় লোক, তারও ঢের তাকানো যে যায়

তুমি কি তেমন কোন কাজলের ছোঁয়া
পাওনি কখনো ?

মুখর ভাষার চেয়ে মুখের ভাষাকে
আজ যদি মূর্খ মনে হয়
তবে কেন চেয়েছিলে জীবনের ভাষা শিখে নিতে ?

যে বাতি ফেরায় রাত্রি নদীটির গান
ভোর এলে চুপিসারে নেভে
তার জ্বলনের সীমা মানুষের শিহর-পরানো ।

অথচ রাতের কথা মানুষের মুখে মুখে হাঁটে
সকাল তাকেই দেয় উলোঝুলো ডানা
কে কাকে পালানো বলে, কাকে মলে অভিমানী হাওয়া
তার কিছু জানোনি এখনো

ছোট বড় দাঁত নখ, পাথরের খাঁজ শব্দ পাত
নদীকে পারে না রুখতে, স্রোতে স্রোতে রক্ত মিশে যায়
জল জানে রূপকথা, জল জানে কোনদিকে গেলে
হাজার গ্রহের ভিড়ে কোনজন সূর্য হতে পারে

মুঠিতে ধরেছো তুলি, তুমি কি নিজের ভাষা ভাবো ?
মাঠে একা কৃষ্ণচূড়া কিভাবে শীতের কাছে কজু
তুমি কি তেমন করে পাতা ঝর কেঁপেছো কখনো ?

তুমি কি রূপকথা পড়ো ? তুমি কি মেঘের পিঠে চাপো ?

আরোগ্য

সুব্রত রুদ্র

চৈত্রমাস, কত শুঁয়োপোকা এসেছে আমার ঘরে ।
ওদের থাকতে দিতে হবে
আজ তেমন কিছু করবো না । শুধু লক্ষ রাখবো ।

ঘরের কুয়াশা কেটে কেটে হালকা হয়ে যাচ্ছে ওদের গান-গাওয়া।

এসময় আমি কি বিছানায় শুয়ে থাকবো? ঠিক
সেরে উঠবো। হেঁটে যাব ধানখেতের মাঝখান দিয়ে।

দায়

স্বপন চক্রবর্তী

বলা উচিত। ভুল হলে প্রত্যেকের বলা উচিত।
আমি তো এমন নই যে নিয়ম-বশীভূত হব।
মনে হয় দিনের সময়সীমাও কমে এসেছে।
ঘুমোবার রাতও
স্বপ্নে শশব্যস্ত।

কেবলি চারপাশে তাড়া। এ ডাকছে, 'আয়।'
ও ডাকছে, 'আয়।'
আমি কার কাছে যাবো?

আমার নিজস্ব রীতি-ভিত নেই। পাড়ার সব বাড়িতে
আমার পাত পড়েছে। এতদিনে সে পাতা
শুকিয়ে মাটি।
কাউকেই অস্বীকার করতে পারছি না আর।
এ বলছে, 'আয়'। ও বলছে, 'বোসো।'

বিজ্ঞান যখন বলে দেবতা নেই, আমি বলি, 'হাঁ।
ঠিক বলেছো।'
হৃদয় যখন বলে আছে, আমি বলি
'টের পাচ্ছি।'

শুধু কোন কথাটা আমার আমি বুঝতে পারি না।
আমায় বোঝাও। না পারলে দোষ দেব না।
অবুঝ মানুষকেই বহন করতে হয় তার নষ্টের দায়।

ধর্মযুদ্ধে ভেসে গেল

নীরদ রায়

সুখের-যা কিছু আঞ্চলিকতা, ভাসমান, ছেড়েই তো দিয়েছি জলস্রোতে,
তবু কেন বারবার কেঁপে ওঠে তোমার মুখের দাক্ষিণ, সীমান্তের ঝাউ,
চাহনির দুপাশে এতো যে শুভেচ্ছা, মানপত্রের উল্লসিত আমি
অস্তিত্বের যা কিছু অপচয়, গ্রীষ্মকাল, রেখেছো সাজিয়ে আমার জন্য,
চেয়েছি তো দিগন্তের সামান্য কটাক্ষ, খালি হাত, ধুধুর সামান্য,
রোগাভীতু স্পর্শকাতর একটুখানি ইচ্ছের সম্মতি
তাতেই, ধর্মযুদ্ধে ভেসে গেল পূর্ব-পশ্চিম ?

তর্কসাপেক্ষ

অনীক রুদ্র

তর্কসাপেক্ষ আমি প্রসব করেছি সততা ও বিনয়
বৃহৎ জলধারা অনাধুনিক, বা তর্কসাপেক্ষ
চরাচর ঢেউখেলানো—এখন কথা হল
কেউ ঢেলে দেবে কিনা রোচনা, পীতাভ বা
তর্কসাপেক্ষ ধর্মগ্রন্থ ও সাংবিধানিক ফুলবাগিচার পাতায়

ভোঁদড় ও টিকটিকি দেখি তোমাদের কেরামতি
খাও তো দুটো প্রজাপতি আর উদ্গার তোল
তর্কসাপেক্ষ, হাঁচো—
আমি দেখতে চাই মলাক্ষল কিংবা হলাহল, আমি
তর্কসাপেক্ষ, খুনে বা হিংসুক নই

বমন করি প্রমাণ সাইজ মন্ত্রিসভা
একটা গোটা কালোবাজার, খাঁজকাটা কনডোম
হিমঘর, বাতিল কাপাস নিকোশা
আর্যরক্তের গরিমা, এমন কি নবীকৃত তৃতীয় রাইখ
কিছুটা হড়হড়ে কাথ ও পুরনো সর্দি

তর্কসাপেক্ষ, পাঠকের কাছে

সত্তা

সব্যসাচী সরকার

যা ছিল উদ্বৃত্ত, দিয়েছি সব, এক আকাশ
আর দুটি দুপুর।

যতোই বলো, জটিলতা নেই, তবু গিয়েছিলে কেন অন্ধকারে
আলো বুঝি বিঁধেছিল খুব।

সচ্ছলতা, কীর্তি ও বিপন্নতা সবই দিয়েছি
তবু কেন ডাক দিয়েছিলে অস্থি-মজ্জাতে
সংসার, নাকি সন্তান লেগেছিল কোনখানে ?

সময়ের সব নৌকো খুলে দিয়ে এবার
চলো ঝাঁপ দিই....অমোঘ পাতালে।

মকরসংক্রান্তি

অহনা বিশ্বাস

আবার রাস্তায় দাঁড়াবো

আবার ক্যান্টিনে খাদ্যে মুখ লুকিয়ে
তার পায়ের নিঃশব্দ নাড়াচাড়া দেখব

আবারও শান্ত হব। শরীরের সামনে
ঝুলিয়ে দেব আরো দীর্ঘ দীর্ঘ পর্দা
কিংবদন্তীর মত অন্যের চোখের আলো
খুব অচেনা সবুজ নকসায় ঢেকে গেলে

গান বেজে ওঠে
দীর্ঘদিন কাকস্নানের পর আজ মকরসংক্রান্তি।

ব্রজগীতি

বিকাশ গায়েন

রাধিকার আছে কানা খোঁড়া এক কেষ্ট
লাঠি ঠুকে যায় ভিক্ষায়।
মরা কদম্ববৃক্ষ রাঙালে গোধূলি
কালো হাঁড়ি থেকে ক্ষীর খায়।
গোপিনীরা সব আলাভোলা, কারও কুষ্ঠ—
সাজিমাটি দিয়ে মাজে গা,
ক্ষারে কাচা শাড়ী ঢেকে নেয় সারা অঙ্গে
বাকিটা ঢেকেছে লজ্জা।

আজ পূর্ণিমা, বাতাসে আকুল গন্ধ
ফুলের তো নয়—ইচ্ছার।
টিটকিরি দেয়, চলে পড়ে যায় হর্ষে
দেখেছিল কবে পিকচার।
তারই কোন কথা—নায়ক বলছে আজে
নায়িকার কানে—বরষা
করেছে অঝোর ধারায়, বাড়ীটি ভগ্ন
আড়াল দিয়েছে ভরসা।

মুরলিমোহন বাঁশরি হয়েছে যষ্টি
পাথরে ঠুকেই গোড়া সুর
বাজালে অধীর রাধিকা এসেছে আজো
ইশারা দারুণ চোরাক্ষুর।
কাটে অবিরত, জ্বালায় পোড়ায় অন্ধ
করেছে ব্যাকুল শোণিতে।
রাধিকামোহন বেগে পার হয় দর্পে
লাঠি ঠুকে সুর বাতাসে ধ্বনিতে ধ্বনিতে।

শস্যকাহিনী

শ্যামল জানা

সম্পূর্ণ রাত্রির নীচে নামহীন দু'একটা লেপকাঁথা
অথচ শীত নেই, আলো-সংক্রান্ত কোনো নোটিশ নেই

আর আমার পিতা খুব নিচু হয়ে একটার পর একটা
ঘৃণার বীজ পুঁতে যাচ্ছে এক মাটি থেকে আর এক মাটিতে

আমি, এই মাটিকে শোনাই একজন রাত্রির গল্প।

চাঁদের শরীর থেকে শেষবারের মতো
ঝরে পড়ার আগে যে জ্যোৎস্না—সে আমার কেউ না
তবু সেও এই গল্প শোনে...

নীরবতা লেখার কথা ভুলে যায় আমার মাতৃকাহিনী
নরম, বৃত্তান্তমূলক সেই কথকতা বড় অশ্রুর কাছাকাছি

আর ক্রমশঃ সবুজ হয়ে যায় যে ম্যাজিক—
তাকে বলি থামো....
আমি শেষতম বৃক্ষের কাছে গিয়ে শুনবো শস্য-কাহিনী

যদি নীরবতা থেকে উৎসের দিকে চলে যায় সেই নিষ্ঠুর বৃত্তান্ত
আমি রাত্রির নীচে অচেনা শৈশবের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকবো
কথা দিচ্ছি...

উৎসর্গ

সুমন গুণ

মন্দ্রী দিয়েছিল, তাই অনুদ্দিষ্ট আলোর স্তবক
সাজিয়ে রেখেছি কুটিরে!

পাশের সড়ক দিয়ে একে একে বন্ধুরা সফল
সমারোহে যায়, হাতে নিপুণ পতাকা

অথচ তোমার
আরো আলোকিত মদ্রা ছিল, আরো
গভীর আমন

লবণের ভাষা

জলধি হালদার

তোমার সঙ্গে কথা বলি লবণের ভাষায়।
তোমার সঙ্গে কথা বলি
বিষুবরেখার রোদ্দুরে আমার তামাটে
শরীর ও জিভ পুড়িয়ে।

বুকের গভীর থেকে সম্পর্কের গন্ধ উঠে আসে
কেননা একমাত্র তুমিই জানো আমার অক্ষমতা
এবং গ্রহণ করতে পারো
আমার বর্জ্য তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি।

এবং শ্রেষ্ঠ সাহসের ভরে তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে
রোম রোম জমে যাওয়ার মতো কম্প
এই মধু অঙ্গে জড়াই।

একমাত্র তুমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো স্থলাংশ
আমাকে আকর্ষণ করে না।

বোঝাপড়া

তাপস রায়

আপনারা জানেন, হ্যাঁ এভাবেই বলছি আজ,
সভ্যতার কাছে ঋণ আমার ধূর্ত ইতিহাস কতোবার
কাটাছেঁড়া করেছে শিল্প অভ্যাসে।

স্পষ্ট মন্ত্রায় আগুন উপকরণ কতোবার নীল-হাড়ি ঘুরিয়ে
ভুলিয়ে দিয়েছে বৃষ্টিপাতের শব্দ। আর ফুটোফাটা আকাশ
গোপন রেখে দেখানো হয়েছে স্থাপত্য—সাম্রাজ্যের বস্ত্র-ইমারত।
আমার হা-অন্ন ক্রোধ ইনস্যাটের ধাক্কায় স্নিগ্ধ হ'লে
আরো আরো পাজরের নেশায় আমি ডুবে গেছি
আর প্রতিবার বুক ফাটিয়ে ইশারায় উজ্জ্বল হ'য়ে
আপনাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে আমাকে বলতে হয়
কী নিপুণ শিল্পকলায়—ভালো আছি, ভালো আছি।

জানালার কথা

বজ্রেশ চক্রবর্তী

মধ্য-অগাস্টের দুপুর। অথচ সামনের রাস্তায় তখন চড়া রোদ, আর রাস্তাটা আকাশের মতো ধু ধু ফাঁকা। ফাঁকা মানে আকাশের এখানে-ওখানে হালকা দু-এক পুঞ্জ মেঘ অবশ্যই ছিল, আর ফাঁকা মানে রাস্তায় কখনো কখনো একটা-দুটো গাড়ি হুশহাশ বেরিয়ে যাচ্ছিল এদিক থেকে ওদিক আর ওদিক থেকে এদিক। এইভাবে বৃষ্টি নিয়ে এগোতে এগোতে অকস্মাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। বস্তুত, জানালার গ্রিল জুড়ে, গ্রিলের নকশা জুড়ে যা উন্মোচিত, এই থমকে দাঁড়ানোটুকু তার।

আসলে জানালা ঠিক এরকমই—আড়ালের প্রহেলিকা থেকে কীভাবে রক্তক্ষরণের দিকে নিয়ে যায়। আর সেই গোপন রক্তক্ষরণ থেকে অথবা রক্তক্ষরণের সেই গোপনীয়তা থেকে বেরিয়ে আসা যেটুকু বিস্ময়, ভাষার আর ধ্বনির যেটুকু দাবি, সেখানে সেই সাফল্য আনে না কোনো পরিত্রাণ, বরং ছিঁড়েখুঁড়ে, চাবুকে চাবুকে শেষ পর্যন্ত বন্দী করে ফেলে।

আসলে জানালা ঠিক এরকমই—চিহ্নকে ধূসর থেকে ধূসরতর করে, ইঙ্গিতকে অব্যক্ত থেকে অব্যক্ততর, ইশারাকে আরো ব্রীড়াময়। আর দূরের সমুদ্র থেকে আসা প্রবল বাতাসে গাছে গাছে চতুর্দিক কাঁপিয়ে জ্বর আসে।

তবে কি প্রহেলিকামালা থেকে শুরু যার যাতায়াত তাকেই অধিক ডাকে ইশকুলের ঘেরাটোপ। দেখো, অন্ধকার আর বিদ্যুৎবাহী তারে তারে আশ্চর্য চাঞ্চল্য। প্রতিক্রিয়া তবে শুধু জানালা-নির্ভর নয়। ইশকুল—

পালানো কোনো বালিকার রিবনের ভাঁজে ভাঁজে হাওয়া লেগে বয়সের অহঙ্কার ফুলে ফুলে ওঠা তবে কিছু নয় জানালার অনুষঙ্গ ছাড়া!

এই বিরোধিতা থেকে এই যে বাধ্যত আপোসমুখী হাহাকার, এরও সমস্ত দায় তবে কি শুধুই তার—প্রহেলিকামালা থেকে যার যাতায়াত শুরু, যার অরণ্যচারিতার শেষ ফলাফল কালি ও কাগজের এক বিক্রিয়ার মুখোমুখি জানালাবিহীন স্তব্ধ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনন্তের জন্মদৃশ্য দেখা!

এইসব প্রশ্ন আর প্রহেলিকা নিয়ে, এইসব বৃষ্টি ও বাতাস নিয়ে এগোতে এগোতে অকস্মাৎ এভাবেই থমকে দাঁড়িয়েছিলাম, আর সামনের রাস্তাটা ছিল আকাশের মতো ধু ধু ফাঁকা।

ছয় পরী

সুবর্ণ ঘোষ

১. প্রহরশেষের রাঙা আলোও নয়, চৈত্রমাসও নয়
তবু কেন বসন্তপুরের হরিণজঙ্গলে স্বপ্নে দেখলাম সর্বনাশ?

২. আসানসোলের মেয়ে, মোমোহানি কলোনিতে থাকে
লাম্বিনী পার্কে বসে আমাকে দেখাল শুশুনিয়া

৩. প্রমোদতরণী ফাঁকা, সারে সারে সাজানো সিরাজি
কণ্টিকীতে ঘন রাত, সেবাদাসী বসে আছে পানপাত্র নিয়ে

৪. সবুজাভ মৃদু আলো ঘিরে থাকে সময়, পরিধি
টেবিলে রজনফুল, কিন্তু রজনীগন্ধার মত সাদা, যেন মৃতের চাদর

৫. নীলাঞ্জনছায়া কই? এ তো শুধু আইল্যাস, মূর্খ প্রতারণা
কুরুশকাঁটায় চলে তৎপর, সুবিন্যস্ত অঙ্গুলিচালনা
প্রণয়যোগ্যতা নেই, আছে রূঢ় অধররঞ্জনা

৬. শ্রাবণ-ট্যাক্সিতে বসে, সতর্ক থাকতে হল ছাতা ও রুমালে
চৈতালী ফুলের মত হেসে উঠল নীলটিপ, সর্দারের তোয়ালে
শ্যামবাজারের মোড়ে, দুচোখে শূন্যতা নিয়ে, আবার তাকালে।।

প্রসঙ্গ ঃ পুতুল নাচের ইতিকথা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

[দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'পরিচয়'-এর জন্যে এই নিবন্ধটি লিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে লেখাটি অসমাপ্ত থাকে। তার কিছুকাল পরেই এই প্রখ্যাত দার্শনিক-লেখককে ছিনিয়ে নেয় মৃত্যুর কালো হাত। যেহেতু নিবন্ধটিতে সামান্য হলেও আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কে অসাধারণ এক উদ্ঘাটন, সেইহেতু অসমাপ্ত হলেও আমরা নিবন্ধটি প্রকাশ করছি। নিবন্ধটি পেয়েছি আমরা প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সৌজন্যে।—সম্পাদকমণ্ডলী]

আমরা তখন 'রং-মশাল' বলে ছোটদের একটা কাগজ চালাতাম। আমার দাদা কামাক্ষীপ্রসাদ আর আমি। প্রধানতই কাগজটাকে কেন্দ্র করে একটা মাঝারি রকমের ছাপাখানাও তৈরি হয়েছিল। দাদার ছিল তাসের নেশা, আর তাই নিয়ে বেশ একটা দলবলও। বিকেল সন্ধ্যে হতে না-হতেই তাসের বন্ধুরা জড়ো হতেন আর টেবিল থেকে ছাপাখানার খাতাপত্র হটিয়ে দাদা ওঁর তাসের দল নিয়ে বসে পড়তেন।

তাসের দলের মধ্যে খুব বড় রকমের উৎসাহী বলতে রাধামোহন ভট্টাচার্য, 'উদয়ের পথে' বলে ছবিতে নায়কের ভূমিকা করে রাধামোহনের তখন রীতিমতো নামডাক। একদিনের কথা না বলে পারি না। ওদের তাসের আড্ডা দারুণ জমেছে। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আসলে আমাদের 'রং-মশাল' কাগজে তখন উনি একটা ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছিলেন। সে মাসে লেখা বাবদ প্রাপ্য কিছুটা যোগাড় করতে এসেছিলেন।

মাণিকবাবুকে দেখে রাধামোহন হঠাৎ প্রবল উৎসাহে বলে উঠল, "আরে প্রবোধ, এতো প্রায় একযুগ পরে দেখা। এখন কি করিস, কি করে দিনকাল কাটাস ?"

আমরা সকলে বেশ কিছুটা হকচকিয়ে গেলাম। প্রবোধ আবার কে ? মাণিকবাবু বললেন, "তাহলে পুরনো পিতৃদত্ত নামটা ভুলিস্‌নি দেখছি !"

ভাবলুম, রাধামোহন ব্যক্তিটিকে ভুল করছে না তো ? তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিলুম। নামকরা লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলাই বাহুল্য, মাণিকবাবুর লেখার সঙ্গে রাধামোহনের বিলক্ষণ পরিচয়। কিন্তু ছাত্রজীবনে দুজনের ঘনিষ্ঠতা ছিল নিবিড় এবং তখন রাধামোহন তাঁকে পুরনো নামেই জানতেন। শুধু জানতেন না, তার ঐ পুরনো বন্ধু প্রবোধই বাংলা সাহিত্যে এমন নামজাদা সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে একটা ছদ্মনামেরই সামিল। প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় নামটার বদলে এই ছদ্মনাম কি করে চালু হল, তার কাহিনী অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু যাদের জানা নেই তাদের কাছে কিছুটা মজাদার লাগতে পারে। তখনও যতদূর জানি তাঁর ছাত্রাবস্থা। সেই সময়ে প্রখ্যাত কোন মাসিকপত্রে ভাল গল্প লেখার জন্য একটা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা গল্প পাঠান। যতদূর মনে পড়ে গল্পটার নাম 'অতসী মামী'। কিন্তু স্বনামে না পাঠিয়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে কেন পাঠিয়েছিলেন, তা জানি না। আসলে আমার পক্ষে বিষয়টা নিয়ে তাকে কিছু প্রশ্ন করতে যাওয়া একটু কঠিন ব্যাপার ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর আলাপই বলুন বা বন্ধুত্বই বলুন, সত্যিকারের জমে উঠেছে যখন তিনি ঘোরতর কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট হিসেবেই তিনি আগেকার কালের লেখা ভাবালু রোমান্টিক রচনার ঘোরতর সমালোচক। নিজেরই লেখার বিরুদ্ধে এমন কঠিন সমালোচনার ভাব আর কারুর মধ্যে দেখেছি কিনা, সত্যিই মনে পড়ে না।

দাদাদের যে সান্ধ্য তাসের আসরে প্রথম জানলুম লোকটির পিতৃদত্ত নাম আসলে প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেদিনকারই আর একটা কথা ভুলতে পারি না। আসলে আমার দাদা রাজনীতি-টাজনীতি নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাতেন না। চলতি কথায় যাদের বলি রোমান্টিক, দাদা ছিলেন তাদেরই দলে। ফলে সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় দাদা বেশ কিছুটা গদগদ ভাবে মাণিকবাবুকে বললেন, "আজও এই সারা দুপুর ধরে আপনার 'পুতুল নাচের ইতিকথা' আর একবার পড়ছিলুম। পড়তে পড়তে একেবারে বিহ্বল হয়ে যাবার মতো !"

নিজের কোন লেখার এ-হেন তারিফ শুনলে সাধারণ যে কারুর পক্ষে হয়তো অল্প-বিস্তর খুশি হবারই কথা। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, মাণিকবাবু রীতিমতো রেগে উঠলেন। প্রায় যাচ্ছেতাই-ভাষায় দাদার ওপর বেজায় ঝাল ঝাড়লেন। তার ভাষা হুবহু মনে রাখা এতবছর পরে আমার পক্ষে অবশ্যই সম্ভব নয়। কিন্তু মূল বক্তব্যটা মন থেকে আজও মুছে যায়নি।

> অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মেছেন! সাহিত্যে রুচি-অরুচির দৌড় আর কতদূর হবে! ঐ রোমান্টিক মন দেওয়া-নেওয়ার হেঁয়ালি নিয়ে তন্ময় থাকুন। পথে-ঘাটে বেরিয়ে শ্রমিক-সাধারণের সঙ্গে যদি কিছুটা মনের সম্পর্ক পাতাতে পারতেন, তাহলে বুঝতেন ঐসব বিলাসিতা নিয়ে আর যাই হোক সত্যিকারের সাহিত্য হতে পারে না। আমার নিজের পক্ষে সংসার চালানোর সমস্যা অনেক। তাই বিরক্তিকর মনে হলেও বইটা প্রকাশকদের কাছ থেকে সরিয়ে আনা কঠিন। পালে-পার্বণে হাজার হোক কিছু টাকা রয়ালটি হিসেবে আসে। নইলে সত্যি হয়তো ওরকম ন্যাতপ্যাতে সেন্টিমেন্টাল বইয়ের প্রচার বন্ধ করবার কথা ভাবতুম ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমঝদারি করতে গিয়ে এ-হেন রূঢ় কথা শোনবার জন্য দাদা নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিলেন না। ঘরের বাকি সকলেও অল্প-বিস্তর থ মেরে গেল। অথচ আমার নিজের বিশ্বাস—এবং বিস্তর কমিউনিস্ট লেখালেখির সঙ্গে পরিচয় সত্ত্বেও একেবারে স্থির বিশ্বাস—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যতদিন থাকবে, ততদিন আমরা কেউই 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-কে এতটুকুও ভুলতে পারব না। কমিউনিস্ট হিসেবে তো নিশ্চয়ই নয়। মনে পড়ে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে একদিন এই ঘটনাটার কথা বলেছিলাম। স্বাভাবসিদ্ধ পরিহাস করে ধূর্জটিবাবু প্রশ্ন করেন: "কিন্তু মাণিক কি সত্যিই কমিউনিস্ট লেখক? নাকি তার চেয়ে ঢের বড় কিছু? অন্তত কমিউনিস্ট লেখক বলতে ওর যেটুকু ধারণা, মাণিক তার চেয়ে ঢের উঁচুদরের সাহিত্যিক। আর তার একটা মস্ত বড়ো প্রমাণ ওর ঐ 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-ই।"

এই কিছুদিন আগে দিন কতক দিল্লিতে কাটাবার সময় হাতের কাছে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' আবার পেয়েছিলাম। আবার পড়লাম। সত্যি বলতে কি, ইতিমধ্যে বিস্তর কমিউনিস্ট লেখালেখির সঙ্গে সম্পর্ক ঘটলেও আমার নিজের আবার এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' রচনার সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে একটা চিরকালের, চিরযুগের অসামান্য সাহিত্যকীর্তি। এ জাতীয় সাহিত্যকীর্তি থেকে বঞ্চিত হলে মানুষের সভ্যতা হয়তো অনেকটাই

করা হতো। এবং কমিউনিজম আমাদের যে-পথের নির্দেশ দেয়, তার দিকেও আমাদের অগ্রগতি অসমাপ্ত থাকত।

কথাগুলো বিশেষত এই কারণে তুলছি যে, পশ্চিমবাংলায় এবং তার বাইরেও বারবার আমাকে একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যিই কোন দরের কমিউনিস্ট ছিলেন? প্রশ্নটা সাধারণত এসেছে একটা উল্টো দিক থেকে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই লেখা ডায়েরির নির্বাচিত অংশ প্রকাশিত হবার পর। অনেক পাঠকেরই মনে সংশয় জেগেছে যে, মুখে ও অন্যান্য লেখায় কমিউনিস্ট হিসেবে তাঁর যে আত্ম-অভিব্যক্তি, তার পিছনে এমন একটা ভাবাবেগ আর বিশ্বাসের টান ছিল যা কমিউনিস্ট-সম্মত বস্তুবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে সহজে খাপ খায় না।

মুখের ছবি

ভগীরথ মিশ্র

সদাব্রত সান্যাল একটুক্ষণ ভাবলেন।

এতগুলি শুভানুধ্যায়ীর সমবেত প্রশ্ন, বাড়ি বয়ে খোঁজ নিতে এসেছে সবাই, জবাবটা ভেবে-চিন্তে দিতে হবে বৈকি। কাজেই, সদাব্রত সান্যাল দেওয়ালের ছবিগুলোকে দেখলেন। সিলিং এবং সিলিং ফ্যান। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্যাবলী। ভুরু কুঁচকে বেশ গভীরভাবে চিন্তা করলেন। এমন নীরোগ শরীরের অধিকারী তিনি, এককালে নিয়মিত ব্যায়াম করেছেন, এক নাগাড়ে তিনশো ডন-বৈঠক দিতেন, আচমকা তিন দিন শয্যাশায়ী, সহকর্মী-দের ভাবনা তো হবেই।

আসলে অফিস থেকে গেল পরশু যখন বেরোলাম, ভালই ছিলাম। কেবল ঘাড়ে এক ধরণের যন্ত্রণা। প্রেসার বাড়লে হয়। ভাবলাম, আমার কি প্রেসার বাড়ল! তোমাদের বউদি বলে শোবার দোষে। এই নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি। অনেক সূক্ষ্ম কারণে তোমার বউদির সঙ্গে আমার নিরন্তর মতান্তর। হাঁটুতে ব্যথা হলে রেস্ট নেব, নাকি বেশি করে হাঁটব, এ্যাসিড কমাতে অবিরাম হজমুলা নাকি নিত্য সকালে লেবুর জল, ইণ্ডিয়ার ফিল্ডিংটা বাজে বলেই বোলিং ফেল করছে নাকি ছন্নছাড়া বোলিং বলেই ফিল্ডাররা ল্যাজে-গোবরে হচ্ছে,—এই সব নিয়ে দু'জনের দু'তত্ত্ব। যা হোক, অফিস থেকে তো বেরোলাম, এখন শেয়ালদা আসি কেমন করে? ঐ সময়টাতে ট্রাম-বাসগুলোর যা অবস্থা, যেন বিয়েবাড়ির ভোজ খেয়ে ফিরছে। পরের পেয়ে

গাণ্ডে পিণ্ডে গিলেটিলে হাঁস ফাঁস করতে করতে চলেছে জগদীশচন্দ্র বসু রোড ধরে, সন্ধেবেলায় যাকে ডেকোরেটর-নির্মিত সঙ্কীর্ণ আলোকিত প্যাসেজ বলা যায়। তাও প্রতি পাতে (অর্থাৎ স্টপেজে) পড়ে রইল ভুক্তাবশিষ্ট প্রচুর। এই জন্যেই বুঝি আজকাল নেমন্তন্ন বাড়িতে ক্যাটারিং দিয়ে কাজ করালেও গৃহকর্তা সায়াহ্নেই জানিয়ে দেন, সব কিছুই রাঁধুনি বাড়িতে দিয়ে বানিয়েছি দাদা, এরা এসেছে স্রেফ পরিবেশন করতে। গৃহস্বামীর ক্ষতির কথা ভেবে যদি একটু মায়াদয়া করে নষ্ট না করে। বড় মেয়ে রুবির বিয়েতে ক্যাটারিং কলাতে গিয়ে চোট খেয়েছিলুম। মেজ মেয়ে চুমকির বিয়েতে ভুলটা শুধরে নিয়ে বেঁচেছি। সব কিছুই বাড়িতে বানানো দাদা।

যাকগে, বাসে ওঠার আশা ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতেই এলুম শিয়ালদা অবধি। স্টেশনে পৌঁছে দেখি গিজ গিজ করছে মানুষ। ইলেকট্রনিক টাইম টেবিলে রক্তের অক্ষরে যে ইস্তাহার জলছে, তাতে ঘণ্টা দুয়েক আগের খান তিনেক ট্রেনের নাম। অর্থাৎ সেগুলোই তখন অবধি ছাড়েনি। আমার গলা শুকিয়ে আসছিল তেষ্টায়। এক থেকে চার অবধি সমস্ত প্লাটফর্ম তখন প্লাবিত। বাড়তি জনস্রোত উপচে এসেছে স্টেশনের বাইরে অবধি। এ সময়ে যদি সহসা মনীশের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত! কারণ, অনেকক্ষণ ধরে আমার মগজের মধ্যে একটা আশঙ্কা ঘুরঘুর করছিল, ঘাড়ের যন্ত্রণা আর স্টেশনের ভীড় যে হারে বাড়ছে, শেষ অবধি বাড়ি পৌঁছুতে পারব তো? এমন সঙ্কটকালে মনীশ নামক যুবকটি এক জীবন্ত বিশল্যকরণী। মনীশকে চেন তো? আমরা দুজনেই বারাকপুরের বাসিন্দা। আমি থাকি রবীন্দ্রপল্লীতে ও আর্দালি বাজারে। বড় আজব ছেলে মনীশ। মাধ্যমিকে চারটে বিষয়ে লেটার পেয়েছিল। কিন্তু যে শুধোয় তাকেই বলে, পেয়েছি তো, চার-চারটে লেটার। একটাতে লিখেছে, মনীশ, তুমি কি ভাল ছেলে! আর একটিতে, মনীশ, তুমি ছাত্রকুলের গৌরব। তৃতীয়টিতে, তুমি জাতির সম্পদ। চার নম্বর লেটারে লিখেছে, তাই বলে আবার চাকরি-টাকরি চেয়ে বসো না যেন। চাকরির বাজার বড্ডই খারাপ। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে পড়ছিল মণীশ। থার্ড-ইয়ারে উঠে আচমকা একটা চাকরি পেয়ে পড়াশুনো ছেড়ে দিল। ডালহাউসি পাড়ার কোথায় যেন চাকরি। সকালে বেরোতো, রাতে ফিরতো। আমাকে বলেছিল একদিন, কি করবো সান্যালদা, বিধবা মা আর পিঠোপিঠি তিন-তিনটে বোন, জাতির সম্পদ হয়ে ওঠা আর হল না। বছর চার-পাঁচ আর্দালিবাজারে 'সবুজ সংঘ' নামে একটা ক্লাব গড়েছিল। সে ক্লাব পুজো-আচ্চা করত না। মাইক বাজিয়ে পাড়া কাঁপাতো না, ট্রাক আটকে চাঁদা তুলতো না, ফুটবল-ক্রিকেট তাস-ক্যারামের টুর্নামেন্ট চালাতো না, কনট্র্যাক্ট বেসিস-এ ভোটে খাটত না। কেবল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোই ওদের

কাজ ছিল। শবদাহ, দুর্নীতি-দমন, দাতব্য-চিকিৎসা, দাতব্য-শিক্ষা....। ঝামেলাতেও পড়ে যেত মাঝে মাঝে। এনক্রোচ করে বসত পুলিশ, অফিসার, নেতাদের মৌরসী-পাট্টাভুক্ত এলাকাগুলোতে। হৈ-চৈ পড়ে যেত সর্বত্র। এই সব কারণেই, যদিও মুখে সবাই 'এমন সমাজসেবী যুবক বিরল' বলে প্রকাশ্যে পিঠ চাপড়াত, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ভেতরে ভেতরে ওরা টাইট দেবার চেষ্টা করত মণীশকে। স্টেশনে মানুষের সংখ্যা যতই বাড়ছিল, ঘাড়ের যন্ত্রণাটা বেড়ে যাচ্ছিল ততই। ভীড় দেখলেই আজকাল ভয় করে। বুকের মধ্যে গুরু গুরু আওয়াজ ওঠে। ভীড় বড় ভয়ংকর বস্তু। কোনও তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে কিংবা নিছক অকারণে যদি সহসা ফুঁসে উত্তাল হয়ে ওঠে এই জনসমুদ্রটি, বাঁচা দায় হবে, বিশেষ করে আমার মত মানুষের পক্ষে, যার বাহান্ন বছরে শরীরে দিনভর পরিশ্রমের ক্লান্তি আর ঘাড়ে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকা টনটনানি যন্ত্রণা। একবার মনে হল, বেরিয়ে পড়ি এই জনসমুদ্র থেকে। বাইরে গিয়ে নিরাপদ দূরত্বে অপেক্ষা করি, খোলা হাওয়ায় দম নিই। যদি সব কিছু স্বাভাবিক হয় তো ভালই, নচেৎ চলে যাব বাসে চড়ে। কিন্তু তখন খুব দেরী হয়ে গেছে। জ্যামের মধ্যে ফেঁসে গেছে গাড়ি। ব্যাক করবার কোন উপায় নেই। আমার পেছনে, সেও এক জনসমুদ্র, একেবারে বাইরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড অবধি বিস্তৃত, থই থই, উত্তাল....।

গেল হপ্তায়ও ঠিক এমনি হয়েছিল, কিন্তু সেদিন মনীশ ছিল আমার সঙ্গে। এক সঙ্গে বাড়ি ফিরেছিলাম দু'জনে। সেদিনও জনসমুদ্র এমনি থই থই উত্তাল ছিল। মণীশকে বলি, 'মণীশ, কেমন বুঝছো?' মণীশ বড় কষ্টে হেসেছিল।

বলি, এমনি সময়ে যদি কোনও কারণে প্যানিকি হয়ে ওঠে এই জনসমুদ্রের একটা ক্ষুদ্রতম অংশও, যদি হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে। ধর, এমন ভিড়ে পকেটমাররা তো অধিক মাত্রায় সক্রিয়, কেউ একজন ন্যালাক্ষ্যাপা পাবলিকও যদি 'পকেটমার', 'পকেটমার' বলে চেঁচিয়ে ওঠে, যদি কাউকে ধরে আলটপকা পেটাতে শুরু করে, তাই দেখে যদি আরও মানুষ ধেয়ে আসতে চায় পকেটমারের দিকে, কিছু মানুষ যদি ভয় পেয়ে দৌড়াদৌড়ি জুড়ে দেয়, ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে আন্দাজ করতে পার? শুধু পায়ের চাপেই মরে যাবে বহু লোক। বলা যায় না, হয়ত আমিই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাব, আর উঠতে পারব না। আমার বয়েস হয়েছে, শরীর ক্লান্ত, ঘাড়ে স্থায়ী যন্ত্রণা...., বলতে বলতে তেষ্টাটা বেড়ে গেল সহসা। মণীশ আবারও কষ্ট করে হাসে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনে এক জোড়া পাইনেপ্‌ল্‌ লজেন্স। একটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, খান, চুষতে থাকুন, তেষ্টা কমবে। এক সময় মনীশ বলে, চলুন বেরোবার চেষ্টা করি। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব।

—কি করে বেরোবে তুমি ? দেখছ না—?

—এর মধ্যেই ঠেলেঠুলে বেরোনো যাক। বাইরে গেলে খোলা হাওয়ায় অনেক বুদ্ধি বেরোবে। আমি পথ করে করে এগোচ্ছি, আপনি আমার পিছু ছাড়বেন না।

তারপর, দীর্ঘ আধ ঘন্টার কৌশল মেশানো পরিশ্রমে, মূলত পুরো কৃতিত্বটাই মনীশের, আমরা স্টেশনের বাইরে এলাম। খোলা হাওয়ায় প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিলাম। মিষ্টির দোকানে ঢুকে জল খেলাম। তারপর এস—১১ বাসে চড়ে আমরা ঘরে ফিরেছিলাম, কিন্তু রাত এগারোটা বেজে গিয়েছিল। বাড়ির প্রায় সবাই এসে দাঁড়িয়েছিল রাস্তায়। সাদা খইয়ের মতো ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল তাদের চোখ।

গত পরশু মনীশকে না পেয়ে আমাকে ভীড়ের মধ্যেই আটকে থাকতে হল। ট্রেন চলাচল শুরু হল রাত সাড়ে-দশটার পর। ব্যারাকপুর স্টেশনে পৌঁছে নীলগঞ্জ ডিপোগামী শেষ বাসটা যদিও বা পেলুম, সেও মসজিদ মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে রইল এক বাসযাত্রী দলের মুখোমুখি। বাড়িতে পা দিলুম মধ্যরাতে।

বসবার ঘরে ঢুকেই আমার চোখ আটকে গেল ছবিখানার ওপর। ঐ ওপরের দেওয়ালে টাঙানো ছবিখানা, তোমরা তো দেখেছ আগে। ভেরিশ্চাগিনের আঁকা, ১৮৭২ সালে যুদ্ধের ছবি। আদিগন্ত বিস্তীর্ণ এক বৃক্ষশূন্য প্রান্তর জুড়ে এক বিশাল খুলির পাহাড়, মানুষের খুলি। চূড়োয় বসে রয়েছে একটা নিঃসঙ্গ কাক, মনে হয় ওই যেন পাহাড়টার মালিক, সারা প্রান্তর একেবারে খাঁ খাঁ, কাকটার দু'চোখে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। ছবিখানার নামকরণও মনে কর; যুদ্ধের মহিমান্বয়ন। তার ক্যাপসনটাও দারুণ; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত মহাযুদ্ধ-বিজয়ীদের প্রতি উৎসর্গিত। ছবিটা বহুদিন ধরে ঝুলছে আমাদের বসবার ঘরের দেওয়ালে। ইচ্ছে করেই রেখেছি ঐ বিবর্ণ ছবিখানা, ওখানে। প্রতি মুহূর্তে আমি, আমরা সবাই, যাতে করে দেখতে পাই যুদ্ধের বীভৎসতম পরিণতির জলন্ত চিত্রখানি। যেন ভুলে না যাই, ভুলে যেতে না পারি, এক মুহূর্তের জন্য। কারণ, মানুষ তো বড় ভুলে যায়। আজকের দুঃখ কাল মনে থাকে না, তীব্র কশাঘাতের ক্ষতও দু'দিনেই মিলিয়ে যায় তার শরীর থেকে, মানুষ এমনই স্মৃতিহীন। ছবিখানা আমি সময় পেলেই দেখি, বাড়ির সবাই দেখে। আমরা মাঝে মাঝে ছবিটাকে নতুন নতুন চোখে বিশ্লেষণ করি। ছবিটাকে নিয়ে কোন কোনও সন্ধ্যায় ওয়ার্কশপ বসিয়ে দিই আমাদের বসবার ঘরে। সেই ওয়ার্কশপে পরিবারের সবাই থাকি, বহিরাগত দু' একজনও থাকে যারা যুদ্ধকে ভয় পায়। গভীর রাতে খুলিগুলোর ভেতর দিয়ে হু-হু হাওয়া বয়ে যায়, আশ্চর্য রিঁ-রিঁ আওয়াজ

ওঠে, যেন করুণ বেহালার সুর। আমি স্পষ্ট শুনতে পাই, আত্মজদের ডেকে ডেকে শোনাই। তো, ঘরে ঢুকেই দেখলাম, ছবিটা একটুখানি বেঁকে গেছে ডাইনে। কি করে বাঁকলো? কেউ ছবি ধরে ঠেলা দিয়েছে নাকি! কিন্তু ছবিখানা তো অনেক ওপরে, সাধারণের নাগালের বাইরে। তবে কি কেউ দেওয়াল সাফ করতে গিয়ে অমন বিচ্ছিরিভাবে হেলিয়ে দিয়েছে ছবিটাকে! সবাইকে একে একে শুধোই, তোমরা কে হেলিয়ে দিয়েছ ছবিখানাকে, ডানদিকে? সবাই ঘাড় নাড়ে, সবাই খুব অবাক হয়ে যায়। আর একটাই সম্ভাবনা রইল, টিকটিকি। ছবিখানার পেছনে বাসা বেঁধেছে ওরা বেশ ক'টিতে, মাঝে মাঝে ওদের ঘরকন্নার আভাষ পাই। পোকার টানে হঠাৎ হঠাৎ কেউ কেউ তীর বেগে বেরিয়ে আসে ছবির পেছনের অন্ধকার থেকে। কিংবা ওখানেই, অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যেই হুটোপুটি জুড়ে দেয়। সব ক'টিতে মিলে দক্ষযজ্ঞ বাধায়। পারিবারিক অশান্তি, নাকি কোনও সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক বিপর্যয় ওদের, ঠাহর পাইনে। হতে পারে, আজ দুপুর থেকে যে কোনও একটা সময়ে ওরা দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে ছবিটাকে হেলিয়ে দিয়েছে। পরিবারের অন্যরা ছবিখানাকে দেখে নিজেদের মধ্যে যৎসামান্য জল্পনা-কল্পনা চালাতে চালাতে চলে গেল যে-যার কাজে। আমার কিন্তু ঘাড়ের ঐ টনটনে যন্ত্রণাটা আবার শুরু হল, এবং ক্রমশ তা বাড়তে লাগল তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে। কোনও গতিকে চোখে-মুখে জল দিয়েই আমি শুয়ে পড়লুম বিছানায়। রাতে আমার কম্প দিয়ে জ্বর এল। সারারাত বেঁহুশ রইলুম, ভুল বকলুম, উদ্ভট সব স্বপ্ন দেখলুম, সে সব আর মনে নেই। সকালে হুঁশ ফিরতেই অনুভব করলুম, আমার কোমর থেকে নিম্নাঙ্গ অসাড়।

॥ দুই ॥

অফিসেই শরীরটা কেমন খারাপ লাগছিল। কেমন আইঢাই করছিল। সারা শরীর গুলোচ্ছিল, অথচ বমি হচ্ছিল না।

—তার ওপর আপনার ঘাড়ের ঐ ব্যথাটা—।

—ব্যথা? ঘাড়ে? সে তো আমাদের আজীবন কালের সঙ্গী। ঘর ব্যাপী অর্ধচন্দ্রাকারে ছড়িয়ে থাকা ব্যথা। এয়োতির সিঁদুরের মতো আমরা তাকে ধারণ করি, বহন করি আজীবন কাল। যাকগে, সকাল থেকে কি কি খেয়েছি, যাতে বদহজম হয়ে অ্যাসিড হতে পারে? বাউল্‌স্‌ ক্লিয়ার না হলেও গা গুলোয়, বমি পায়। আজ সকালে পায়খানা পরিস্কার হয়নি আমার। কন্‌স্টিপেশন আর গ্যাস, আমাকে একেবারে শেষ করে ফেলল রে ভাই। একেবারে ফিনিশ হয়ে গেলাম। সামান্য ঠাণ্ডা জল খেয়ে লাইব্রেরি

রুমের লম্বা টেবিলে চড়ে শুয়ে রইলাম খানিকক্ষণ, যদি একটুখানি ঘুম আসে। আমার কেমন জানি মনে হচ্ছিল, একটুখানি ঘুমোতে পারলেই ঝরঝরে হয়ে উঠবে শরীর। কিন্তু অনেকক্ষণ চোখের পাতা বুজে শুয়ে রইলাম, ঘুম এলো না কিছুতেই, ঘুম আমার আসে না।

একটু আগে ভাগে বেরিয়ে পড়লাম অফিস থেকে। শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে দেখি, সেখানে ভয়াবহ অবস্থা। বহুক্ষণ ট্রেন বন্ধ, প্ল্যাটফর্ম জুড়ে গিজগিজ করছে মানুষ। খানিক আগে স্টেশন জুড়ে দক্ষযজ্ঞ ঘটে গেছে। একটা পকেটমারকে বেধড়ক পিটিয়েছে পাবলিক। খানিক বাদে পুলিশ স্মাগলার আর পকেটমারের সম্মিলিত বাহিনী পাবলিকের ওপর চড়াও হয়ে তার শোধ নিয়েছে। সেই রোষে পাবলিক আবার কিছু কামরা ভাঙচুর করেছে।

সারা প্লাটফর্ম জুড়ে গিজগিজ করছে মানুষ। ট্রেন কখন চালু হবে ঠিক নেই। আমি জনতার মাঝে মনীশকে খুঁজতে লাগলাম আঁতিপাতি। কিন্তু এই জনারণ্যে যত দূর দৃষ্টি চলে মনীশ নেই। মনীশকে না দেখতে পেয়ে আমার আশঙ্কা আরও গাঢ় হল। ঘাড়ের যন্ত্রণা তীব্র হল ক্রমশ। আমি স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঘন্টা খানেক পরে ট্রেন ছাড়ল, এবং ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে আমি যখন বাড়ি পৌঁছালাম রাত তখন এগারোটা প্রায়। মসজিদ-মোড় এলাকাটা অন্ধকার, লোড শেডিং চলছে। এমার্জেন্সি আলো জ্বলছে কিছু ঘরে। রেলিং টপকে সেই আলোর ছিটেফোঁটা গরাদের ছায়া সহ রাস্তায় পড়েছে। আমি অন্ধকারে খানা-খন্দ সামলে হাঁটতে লাগলাম। খাটিয়ার চড়ে একটা মড়া চলে গেল পাশ দিয়ে। রজনীগন্ধা, ধূপ, নতুন কাপড়, অগুরুর পাঁচমেশালি গন্ধ ঝাপটা মারে নাকে। কে মরল এই গভীর রাতে? আমাদের পাড়ার কেউ, নাকি অন্য পাড়ার? এত মানুষজন কেন পেছনে? কোনও ভি-আই-পি ব্যক্তি নাকি। আজকাল তো পকেটমার মরলেও লাশ নিয়ে মিছিল হয়, পথসভা হয়, যে-দলের পকেটমার, সেই দলই আয়োজন করে। বাড়ি-ফেরামাত্তর স্ত্রী বললেন, মনীশ হাসপাতালে। কোথায় নাকি ওকে খুব পিটিয়েছে। বাঁচে কি না বাঁচে। শুনে আমি বিস্ময়ে থ হয়ে গেলাম। এমন প্রাণবন্ত পরোপকারী ছেলেটিকে কে পেটাল। ওর ওপর অনেকের খার আছে জানি। ওদের মধ্যেই কোন গ্রুপ—। বসবার ঘরে ঢুকে দেখি যুদ্ধের ছবিখানা ওল্টানো। পাহাড়ের চূড়োটা মেঝের দিকে। বউ-ছেলেকে বলায় ওরা যেন কাঁচা ঘুম থেকে জাগল, জানি নে তো, দেখিনি তো। আশ্চর্য, একটা জলজ্যান্ত ছবি পুরোপুরি উল্টে গেল, কেউ জানে না, দেখে নি! সারারাত তেমন ঘুম এলো না আমার।

—চূড়োয় বসে থাকা কাকটা, তার মানে, বুঝলে।

—কাক? আরে না, না, কাক কোত্থেকে আসবে? কাক তো ছিলই না। যে দাঁড়িয়েছিল ঐ খুলি-পাহাড়ে চূড়ায় তাকে এক ঝলক দেখা মাত্তরই আমার নিম্নাঙ্গ জুড়ে তীব্র ঝাঁকুনি। আর সেই ঝাঁকুনিতেই....পুরোটা খুলেই বলি।

রাতভর ছটফট করতে করতে শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখনই দেখলাম এক হাড় হিম করা স্বপ্ন। ঐ খুলির পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। নামবার পথ পাচ্ছিনে কোনও দিকেই। এমন নিটোল করে খুলিগুলো সাজানো, আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, একটু এলোমেলো হাঁটলেই খুলিগুলো হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়বে এবং আমি নির্ঘাত চাপা পড়ে যাব ঐ খুলির স্তূপের মধ্যে। দু'পায়ে ব্যালান্স করতে করতে অতি সাবধানে আমি অবতরণের প্রয়াস চালাই। ঘেমে-নেয়ে উঠি। এই ভাবে অনেকক্ষণের, অনেক অনুসময়ের প্রচেষ্টায় আমি যখন ঐ পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেছি, তখনই সামান্য টাল খেলাম ডাইনে। তাতেই পাহাড় শুদ্ধ পুরো প্রান্তর, এমন কি দিগন্তরেখা অবধি হেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখলাম, সকাল হয়েছে। শেষ রাতের স্বপ্নটা খচখচ করছে মনের মধ্যে। কেমন, কেমন করে কি কৌশলে উঠেছিলাম ঐ পাহাড়ের চূড়োয়, সেটাই মনে করতে পারছি নে কিছুতেই। জানলা দিয়ে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। শুয়ে শুয়ে গাছ-গাছাল, দূরের খেলার মাঠ, পার্ক, সব কিছু দেখছিলাম। আমার বাম গালে রোদ্দুর পড়েছে। আমার জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। ঘাড়ের যন্ত্রণাটা কিন্তু প্রবল হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি বিছানা ছাড়তে গেলাম, আর তখনই আবিষ্কার করলাম, আমার নিম্নাঙ্গে কোনও সাড়া নেই। আমি চিৎকার করে উঠলাম। আমার পক্ষাঘাত হয়েছে। ওগো, আমার নিম্নাঙ্গ অসাড়। ডাঃ সেন, আমার সুদূর প্রতিবেশী, প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে এলেন, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। বললেন, আকস্মিক কোনও শক, নার্ভের ওপর, তাতেই—। তারপর, একে একে এলেন ডাঃ রুদ্র, ডাঃ মল্লিক, আমার ন্যাওটা ভাগনে শিবতোষ, এম-ডি হয়েছে, এল, পরীক্ষা করল, ওষুধ দিল....। অবশেষে তোমরা এলে, আজ।

। তিন ।

সকাল থেকে মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল। পায়ের পাতায় চিনচিনে অনুভূতি। লো-প্রেসার হল নাকি। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে হয়। হজমের গোলমালেও হয়। মনে দুর্ভাবনা থাকলে রাত্তিরে ঘুম হবে না, খাবার হজম হবে না, লো-প্রেসার অবশ্যম্ভাবী। অফিসে গিয়ে কাজে মন বসছিল না। খিটখিটে মেজাজ। কিছু ভাল লাগছিল না। খালি ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে

করছিল। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছিল। আমি চোখ থেকে ঘুম তাড়াতে সিগারেট ধরালাম।

—গা গুলোচ্ছিল কি? বমি-টমি?

—ওটা আমার নতুন নয়। আজীবনকালের পোষা। সর্বদাই বমি-বমি পায়। ক্রনিক আমাশা।

—হজমের গোলমাল আছে নাকি আপনার? বাউল্‌স্‌ ক্লিয়ার হয়?

—হজমের ভাই কস্মিনকালেও কোনও গোলমাল নেই। যা খাই হজম হয়। কালিয়া, পোলাও, বিরিয়ানি, পুঁইশাক, ফুচকা, রাবড়ি ভেলপুরী, হুইস্কি, কাবাব, কোপ্তা, কোৎকা, চড়-চাপড়, লাথি-ঘুষি, সব, সব। খাই, হজম করি, বের করে দিই। কিছু রাখি না পেটে, মনে। কাজেই, বাউল্‌স্‌ আমার একদম ক্লিয়ার, কনসেইন্সও, সেই কারণেই।

শেয়ালদা স্টেশনে ঢুকেই শুনতে পাই সোরগোল। তিন নম্বর প্লাটফর্মে জমাট ভিড়।

—কি হয়েছে দাদা? —পেটাচ্ছে। —কাকে? —একজনকে।

—কেন? —অত প্রশ্নের জবাব পারব না মশাই। পারলে তো একটা চাকরি-বাকরি জুটে যেত এ্যাদ্দিনে। যত কড়া ইণ্টারভিউ বোর্ডই হোক বেরিয়ে যেতাম, মামা-কাকা ছাড়াই।

—পকেটমার। হাতে-নাতে ধরেছে।

—না, না, ছাত্র। ইংলিশে অনার্স পড়ে প্রেসিডেন্সীতে। ছাত্র-ইউনিয়ন নিয়ে ঝগড়া। আজ ভোট ছিল তো কলেজে।

—আরে না, না। ছেলেটা নকশাল।

আমি তিন-নম্বর থেকে দু'নম্বরে চলে আসি। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে মারামারিটা ছড়িয়ে পড়ে সারা স্টেশন চত্বরে। পুলিশ আসে, লাঠি-চার্জ হয়, ট্রেন-চলাচল বন্ধ থাকে অনেকক্ষণ, সেই ক্ষোভে পাবলিক কিছু ভাঙচুর করে, ট্রেন চলাচল শুরু হয় রাত নটার পর। আমার বাড়ি ফিরতে এগারোটা।

মসজিদ-মোড়ে পান কিনছি. পাশ দিয়ে মড়া চলে গেল। সামনে-পেছনে অনেক ছোকরা। বল হরি, হরি বোল—

আমি তাকাতে গিয়েও মুখ ফিরিয়ে নিলুম। শবদেহ দেখতে আমার ভাল লাগে না। যদি এমন কোনও মানুষের লাশ হয়, যাকে আমি আজ সকাল বেলাতেই দেখেছি। সুখ-দুঃখের কথা বলেছি। সইতে পারব না। আসলে, মৃতদেহ আমি সহ্য করতে পারি নে। বিশেষ করে, মৃতদেহের শরীর থেকে নতুন কাপড়, ফুল, ধূপ-ধুনো অগুরুর যে পাঁচ মিশেলী গন্ধ বেরোয়, তা আমার নিতান্তই অসহ্য ঠেকে। ঘাড় ঘুরিয়ে নিশ্বাস চেপে আমি কোনও গতিকে পেরিয়ে এলুম জমায়েতটা।

ঘরে ঢুকতেই স্ত্রী বললেন. জান, মনীশ আজ হাসপাতালে মারা গেল। একটু আগে লাশ নিয়ে গেল দেখলে না ?

—ওটা মনীশের লাশ নাকি ? কি আশ্চর্য ! মনীশেরই ! স্ত্রী বললেন, আজ সন্ধ্যে নাগাদ শেয়ালদা স্টেশনে স্মাগলার, পকেটমার আর পুলিশ মিলে পকেটমার সাজিয়ে ওকে পিটিয়ে মেরেছে। হাসপাতালে যখন নিয়ে যায়, তার আগেই শেষ।

শুনতে শুনতে আমি তাজ্জব হয়ে যাই। শেয়ালদা স্টেশনে যাকে পেটাচ্ছিল, সে মনীশ ছিল নাকি ? ওরই ওপর তবে বার বার উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছিল লোকগুলো ! হায় ভগবান ! সহসা সারা শরীর জুড়ে বমি এল।

॥ চার ॥

পরশু যখন অফিসে বেরোই, তখন কিছু হয়নি আমার। পুরোপুরি ফিট। অফিসে গেলাম, কাজ করলাম চুটিয়ে। অফিস ছুটি হতে হাঁটতে হাঁটতে শেয়ালদা এলাম। স্টেশনে ঢুকেই দেখি, এইমাত্র একটা ক্যানী লোক্যাল ছেড়ে গেল। এক থেকে চার অবধি কোনও প্লাটফর্মেই ট্রেন নেই। খুব একটা ভিড়ও নেই। চারটে প্লাটফর্ম জুড়ে বড় জোর শ' চারেক মানুষ। এই সময়ে একটা ট্রেন এসে পড়লে বাঁচি। বসবার জন্যে এক চিলতে জায়গা তা হলে পেলেও পেতে পারি। এরপর যত সময় যাবে, ভিড় বাড়বে, ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি···। এই সব সাত-সতের যখন ভাবছি. ঠিক সেই সময়ে আমার থেকে হাত দশেক তফাতে সহসা হল্লা বাধাল এক ছোকরা 'পকেটমার 'পকেটমার', ধর শালাকে। নিমেষের মধ্যে নড়ে চড়ে উঠল চার পাশের জটলাগুলো। মার্ মার্···। তৎক্ষণে জনা পাঁচ-সাত ছোকরা পেটাতে শুরু করেছে ছেলেটাকে। ওদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে পালাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ছেলেটা। ওদের ঠেলে ঠুলে হাত পাঁচেক এলো ও। আর সেই সুযোগে আমি দেখলাম ওর মুখ। সঙ্গে সঙ্গে আমার পা গুলোতে লাগল। মনীশ— ! অস্ফুট স্বরে নামখানা উচ্চারণ করবার আগেই ও ঢাকা পড়ে গেল চার পাশ থেকে ছুটে আসা মানুষের বেষ্টনীতে। শুধু উন্মত্ত মানুষগুলোর মারণ-মুদ্রা প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম আমি। দু'একবার যেন শুনতেও পেলাম মনীশের অন্তিম আর্তনাদ। আমার শরীরটা কেমন দুর্বল লাগছিল। পা দুটোয় যেন শক্তি নেই। যেন মাস দুয়েক টাইফয়েডে ভুগে সবে উঠেছি আমি। আচ্ছা মনীশ কি আমায় দেখতে পেয়েছিল ? কেন জানি আমার সন্দেহ হচ্ছে, এক পলক, স্রেফ এক বলকের জন্য মনীশের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছিল আমার। পর মুহূর্তে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল জনতার

ব্যূহের মধ্যে। আমি বুঝতে পারছিলাম, কারা ওকে মারছে, কেন মারছে, কাদের ভালোর জন্য ও মরছে। কাদের ভালো করতে গিয়ে। অথচ গণ-পিটুনির শরিক যে সব সাধারণ মানুষ, তারা জানলই না, কাকে মারছে, কেন মারছে, নিজেকেই মারছে ওরা, বুঝল না। আমার ভয় হল, যদি কেউ আমার চোখে-মুখে উদ্বেগ আর বিষাদ দেখে মনীশের সাগরেদ গোছের ভেবে নেয়। যদি ওদের কেউ আচমকা চিনে ফেলে আমাকে। এই স্টেশনে কিংবা অন্যত্র একসঙ্গে অনেকদিনই তো ঘোরাঘুরি করেছি দু'জনে। যদি মনীশই কোনও গতিকে ব্যূহমুক্ত হয়ে ছুটে আসে আমার দিকে। সান্যালদা, আপনি এদের বলুন, আমি পকেটমার নই, বলুন, সান্যালদা। আমি একটু একটু করে পিছু হটতে থাকি। এরপর হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটবে পুরো স্টেশন চত্বর জুড়ে। মনীশের বন্ধুরা, ক্লাবের ছেলেরা খবর পেলে আসবেই। তারা মৃতদেহের দখল নেবে, ফিরে দাঁড়াবে। তাদের হটিয়ে মৃতদেহ ছিনিয়ে নিতে, আসবে পুলিশ। শুরু হবে আর একপ্রস্থ দক্ষযজ্ঞ। ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। আর আউট গেট বন্ধ হয়ে গেলে স্টেশনের যা অবস্থা হয়, সারা প্লাটফর্ম, স্টেশন চত্বর, মায় ট্যাক্সি স্ট্যান্ড অবধি উপচে পড়বে মানুষ, থই থই করবে মধ্যরাত অবধি। চাই কি উত্তেজিত জনতা স্টেশন ভাঙচুর করতে পারে। সেই সুবাদে আর একপ্রস্থ লাঠি চার্জ হতে পারে, গুলিও চলতে পারে, কে বলতে পারে। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠি। আর দেরি করলে আমি সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে আটকা পড়ে যাব মানুষের ব্যূহের মধ্যে। অভিমন্যুর মত আমিও ব্যূহ থেকে বেরোবার কৌশল জানি নে। সে জানত মনীশ। আগের দিন মনীশ ছিল, এই এই মানুষের সমুদ্র থেকে টেনে টেনে ডাঙায় তুলেছিল আমায়। আজ মনীশ নেই। কে বাঁচাবে আমাকে। ভাবতে ভাবতে আমার মধ্যে এক ধরণের আতঙ্ক তৈরি হল। ঠেলে ঠুলে কোন গতিকে স্টেশনের বাইরে চলে এলাম আমি। মহাত্মা গান্ধী ধরে হাঁটতে হাঁটতে চিত্তরঞ্জনের মোড় অবধি এসে এস-১১ পাকড়ালাম। মসজিদ মোড়ে যখন পৌঁছুলাম, মধ্যরাত। বারাকপুর পরিক্রমা সেরে খাটিয়ায় চড়ে মনীশের লাশ চলেছে গঙ্গার দিকে। আমার সঙ্গে ওর দেখা হল মসজিদ মোড়ের কাছাকাছি। ওকে যারা বইছে, তাদের চোখে চিক চিক করছে জল, জলের মধ্যে ঝিকমিক করছে আগুন, আগুনের ফুলকি। বাসটা তখনও বাজার-স্টপেজে আসে নি, আমার মনে হচ্ছিল, বাসের মধ্যেই না বমি করে ফেলি।

॥ পাঁচ ॥

আসলে স্রেফ একটা কৌতূহল।

দেওয়ালের ছবিখানা দেখে কি প্রতিক্রিয়া হয় অন্য সকলের, সেটাই দেখতে

চেয়েছিলাম। সেই কৌতূহলের বশেই বসবার ঘরের ঐ ছবিটাকে গেল পরশুর আগের দিন মধ্যরাতে শুয়ে আবার উল্টো করে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম নিঃশব্দে। পরশু তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরলাম ঐ কারণে। দেখলাম, সবাই নির্বিকার,- খাচ্ছে-দাচ্ছে, পেপার পড়ছে, ক্যারাম খেলছে, আড্ডা মারছে....। ছবিখানাও দেওয়ালে নির্বিকার ওলটানো। সারা সন্ধ্যে সবাইকে নিয়ে আড্ডা মারলাম বসবার ঘরেই। যুদ্ধ নিয়ে কত কথা হল। চেঙ্গিস খান, তৈমুর, নেপোলিয়ন, হিটলার, ইরাক, ইরান, রুশ....কিছুই বাদ গেল না, কেউই না। ছবি রইল ছবির মতোই, ওলটানো। কাকটা পাহাড়ের চূড়ো থেকে ঝুলছে, নিরালম্ব শূন্যে, পাক্কা একদিন, কেউ খেয়ালই করল না।

সে রাতে বলতে গেলে ঘুমই এল না আমার।

শেষরাতে ঐ স্বপ্নটা দেখলাম। তোমাদের সেটা আগেও বলেছি জনে জনে। পাহাড়ের চূড়োয় উঠে দাঁড়িয়েছি, কি করে উঠলাম জানি নে, এমনি সময়ে পেছনের অন্ধকার থেকে টিকটিকিগুলো প্রাণপণে ঘোরাতে লাগল ছবিখানা। চূড়োখানা নেমে গেল মেঝের দিকে, আর আমি ঐ চূড়ো থেকে নিরালম্ব ঝুলছি। আমার পায়ের তলায় মহাশূন্য, ছায়াপথ, গ্রহ-নক্ষত্র, সৌরমণ্ডল, নীহারিকা,…স্থির নিস্তব্ধতা, কনকনে শীতলতা, ঘোর নির্জনতা, কনকনে শীতলতা, ঘোর নির্জনতা,…বায়ুহীনতা, আমি গলগলিয়ে ঘামছি, আমার ঘাড় টনটন করছে, আমার গা গুলোচ্ছে, বমি পাচ্ছে, মাথা ঝিমঝিম, পায়ের পাতা চিনচিন করছে, আমার গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। সারা গায়ে দেড়শোটা লাথি খাওয়া ব্যথা। আমি চিৎকারও করতে পারছি নে। সারা শরীর জুড়ে আতঙ্ক, শুধুই আতঙ্ক। ঝুলন্ত আতঙ্ক হয়ে আমি দেখলাম, চারপাশ দিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জ....। একে অন্যের সঙ্গে প্রবল ধাক্কা খেয়ে ভেঙে ধুলো ধুলো হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ আলোক কণা, দড়িয়ে পড়ছে মহাশূন্যে, হাউই পুড়লে যেমন ঝরে ঝরে পড়ে আলো। সারা শরীর ঘেমে নেয়ে একসা, পায়ের পাতাও ভিজে গেছে। পাহাড়ের চূড়োয় থেকে ক্রমশ আলগা হয়ে আসছে পায়ের পাতা। আমি কি পড়ে যাব তবে! আমি কি মহাশূন্যে অনন্ত হারিয়ে তলিয়ে যাব! ভাবতে ভাবতে আচমকা পাহাড়ের চূড়ো থেকে খুলে গেল পায়ের পাতা। আমি পড়ে যাব, মহাশূন্যে, পড়ে যাচ্ছি,—আমি—আহ্— !

আমার প্রবল চিৎকারে বাড়ির সবাই ছুটে এল। আমার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমার গলাটা বুক অবধি শুকিয়ে কাঠ। ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়েই টের পেলাম, আমার শরীরের নীচের দিকটা অচল।

—আর ছবিটার কি হল?

—ছবিটা ? ওল্টানো রয়েছে এখনও। আজ তিনদিন—। তি—ন দি—ন। কেউ খেয়ালই করে নি। কারো নজরেই পড়ে নি। ভাবতে পার। অথচ ঐ ছবিখানা সম্পর্কে আমরা কতই না সচেতন। ওটাই না আমাদের স্মৃতিকে পুষ্টি জুগিয়েছে এতকাল।

—ঠিকই তো। আসলে, আমাদের দৃষ্টিতে আর কোন ছবিই ধরা পড়ে না। সোজা-উল্টো দুইই সমান মনে হয় তাই।

—শুধু ছবি কেন ? কিছুই ধরা পড়ে না। আজ তবে উঠি সান্যালদা। ভাল হয়ে উঠুন জলদি। আপনি না ভাল হয়ে উঠলে আমাদের সবারই মুস্কিল।

সান্যালদার ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। আমরা বসবার ঘরে ঢুকে দেখি, ছবিখানা ঠিক-ঠাকই টাঙান রয়েছে। উল্টে যাওয়া তো দূরের কথা, ডাইনে-বাঁয়ে সামান্যতম-ও হেলে নি।

———

পাঁজর

অমর মিত্র

বি. ডি. ও. অবনী মল্লিককে বাঘের পাঁজরের গুঁড়োর কথা বলেছিল তার পূর্বসূরী, আগের বি. ডি. ও. রমাকান্ত পাল। লোকটা বছর আট ছিল এখানে, মধ্যবয়সী, প্রমোশন পেয়ে এই পদে এসেছিল। তার কাছ থেকে চার্জ বুঝে নেওয়ার সময় কথায় কথায় সে শুনিয়েছিল জোসেফ সর্দারের কথা। এই দ্বীপ অঞ্চলের সেরা সাহসী মানুষ, খালি হাতে বাঘের সঙ্গে লড়েছিল। বাঘের পাঁজরের কথা তার কাছেই না হয় শুনবে অবনী।

আশ্চর্য লাগে অবনীর। চারদিকে নদী আর নদী, মাঝে মধ্যে ছোট ছোট ভূখণ্ড। নানান দ্বীপ নিয়ে তার ব্লক। ট্যুরে যেতে হয় লঞ্চে কিংবা ভুটভুটি-মটর বোটে। মাস খানেকের ভিতরেই তার কাছে এসেছে রমাকান্ত কথিত জোসেফ সর্দার, বুড়ো, চুল দাড়ি সব সাদা। কত বয়স হবে? সে জানাল পিয়ার্সন সায়েবের আমলে সবে জোয়ান, এই দ্বীপের মালিক ত তিনিই ছিলেন। অবনী হিসেব কষে, পিয়ার্সন সাহেবদের যুগ ছেচল্লিশ বছর আগে শেষ হয়ে গেছে। তার আগে যদি আরো সাত আট বছর ধরা যায় ত বুড়ো জোসেফের বয়স কম করেও পঁচাত্তর। একটু ঝুঁকে হাঁটে বটে, তবে লাঠি ধরতে হয়নি এখনো। বাঘের পাঁজরের গুঁড়ো কাঁচা গোদুগ্ধে মিশিয়ে কত মানুষকে খাইয়েছে সে, এ হল তার অভ্যাস। যৌবন শক্ত হয়, আটো-সাটো হয় ওতে। লাগবে সার ওই জিনিস?

এনো দেখি জোসেফ বুড়ো। অবনী বলেছে তাকে সন্ধের কোয়ার্টারের

সামনের খালি জমিতে বসে নদী বাঁধের দিকে তাকিয়ে। এখানে অন্ধকার আদিমতম, জ্যোৎস্না যখন হয়, আলোর ওই গভীর স্রোতময়তা অবনী মল্লিক আর কখনো দ্যাখেনি।

আনব সার, পিয়ার্সন সাহেব ত পাঁজরা চালান করত বিলেতে, তখন ত বাঘ মারা নিষেধ ছিল না। বলল জোসেফ সর্দার।

অবনী হাসে, চামড়া হলে না হয় বোঝা যেত, বাঘের পাঁজরের হাড় বিলেতে পাঠাবে কেন, কত দাম তার?

বুড়ো জোসেফ বলে, চীন দেশে যেত, নেপাল দেশ তিব্বত দেশে যেত, ও জিনিসের কী গুণ তা এই জোসেফ বুড়োকে দেখে বুঝতে পারবেন না সায়েব, দেখতেন পিয়ার্সন সায়েবকে। তার মাথার চুলগুলো কালো থাকলে কে বলত বুড়ো?

অবনী বলল, ঠান্ডা দেশের বুড়ো আমি অনেক দেখেছি, তার জন্য বাঘের পাঁজর লাগবে কেন? ওরা এমনিতেই শক্ত হয়, সত্তর বছরেও বিয়ে করে।

লাগবে কেন তা পিয়ার্সন সায়েব জানত স্যার, তিনি নিজে হাতে গুঁড়ো করে কাঁচা দুধের সঙ্গে খেয়ে কী কান্ডই না করেছিল।

কী? অবনী যেন গল্পের খোঁজ পায়, তার কৌতূহল বাড়ে। জোসেফ সর্দার তাকে শোনায় সেই কাহিনী, সেই দুধ খেয়ে সায়েবের কী তেজ। একরাত্তিরে তিনটে মেয়েমানুষ ধরে আনতে হয়েছে গাঁ থেকে। বিড়বিড় করে বলতে বলতে জোসেফ বুড়ো ঝিমোয়, আপনাকে আমি বাঘের পাঁজর এনে দেব সায়েব।

কথা এই পর্যন্ত। এরপরে অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে-নিভিয়ে বুড়ো উঠে যায় নদী বাঁধে। অন্ধকারে নদী বাঁধে তখন আলোর জ্বলা নেভা। আলো চলছে। নদীর ওপার থেকে জঙ্গলের বাতাস আসে। বাতাসে যেন বুনো গন্ধ পায় বি. ডি. ও. অবনী মল্লিক। দ্বীপ নিথর। নদীতে জোয়ার আসার শব্দ বিপুল প্রকৃতিতে ছড়িয়ে গিয়ে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর।

লোকটা ঘুরে ঘুরে আসে। বাঘের পাঁজর, বুনো শুয়োরের চোয়ালের হাড় নিয়ে বিচিত্র সব কথা বলে। বুনো শুয়োরের চোয়াল গুঁড়ো মদে মিশিয়ে খেয়ে নিলে রোষ বাড়ে। রাগ নাকি চন্ডাল হয় তখন। এসব হলো এই নদী অরণ্যের দেশের আদিম টোটকা। ব্যবহার কমে আসছে। পাবে কোথায় মানুষ? গল্প করতে করতে বুড়ো জোসেফ বলে, তাকে একটা লোন বের করে দিতে। গরু কেনার লোন দিক সায়েব। সে ক্যানিং গিয়ে গো-হাট থেকে গরু নিয়ে আসবে। বদলে বাঘের ছাল এনে দেবে সায়েবকে। নিষিদ্ধ বস্তু বটে, কিন্তু কার ঘরে নেই। আগের বি. ডি ও. সায়েবের ঘরে গেলেও দেখতে পাবেন আপনি। বাঘের ছালে বউমাকে নিয়ে শোবেন সায়েব। বাঘের ছালে শোয়া কপালের ব্যাপার।

অবনী মল্লিক বলে, বাঘের লোমের উপর মানুষ শোয় কী করে? তা কি সম্ভব?

হাসে জোসেফ সর্দার, সম্ভব। পিয়ার্সন সায়েব নাকি বাঘছালে শয়ন করতেন। আগের দিনে মুনি ঋষিরা ব্যাঘ্রচর্মে বসে ধ্যানস্থ হত। তাতে তাদের পরীক্ষা হয়ে যেত। ও খুব গরম চামড়া। ছুঁলে বাঘের ভাব জেগে ওঠে ভিতরে।

অবনী মল্লিকের মনে হয় বুড়ো সবটা বানাচ্ছে। তৈরি করছে গল্প। আর। তাকে যেন তাতাচ্ছে বুড়ো জোসেফ। সে বলে, বাঘের ছাল তার লাগবে না। গরু কেনার লোন সার্থসিদ্ধির বিষয়টি সে দেখবে। কিন্তু সত্যিই কি গরু কিনবে জোসেফ সর্দার। তার হাতে ত টাকা দেওয়া হবে না, গরু কিনে দেওয়া হবে তাকে। গরু চায়, না টাকা চায় সে?

বুড়ো জোসেফ হাসে নিঃশব্দে। বিড়বিড় করে, গরু আমি কী করব সার, আমি হচ্ছি বাঘের সর্দার, পিয়ার্সন সায়েব ডাকত টাইগার বলে, গরু আমার কাছে কতক্ষণ জীয়ন্ত থাকবে? টাকাটা পেলেই বাঁচি সার।

দুই

জোসেফকে টাকা বের করে দিতে বেগই পেতে হয়েছিল অবনীর। আগের সায়েবের আমলে পোলট্রির জন্য টাকা নিয়েছিল সে। সে লোন ত শোধই করেনি। মুরগিগুলো সব গেল কোথায়? পোলট্রি করেইনি।

এই প্রশ্নে জোসেফ বলেছে, সব তিনদিনের রোগে সাফ সার, ভয়েই মরে গেল মুরগিগুলো।

ভয়ে! কেন?

জোসেফ সর্দার বলে, আমার গা দিয়ে নাকি এখনো বাঘের গন্ধ বেরোয় সায়েব, ঘরে আমার বুনো শুয়োরের চোয়াল আছে এইটুকুন, বাঘের পাঁজর আছে, তার ত একটা গন্ধ আছে, মানুষ না টের পেলে কী হবে, মুরগিগুলো সারাদিন ছটফট করল, চিৎকার করল তিনদিন ধরে, তারপরে পটাপট মরতে লাগল, পোলট্রি আমি করিনি একথা কে বলে?

রোগে মরেছিল না ভয়ে মরেছিল, নাকি মরেইনি, মুরগি কেনাই হয়নি, এখন সে অনুসন্ধান করবে কে? গরুর জন্য টাকা চাই জোসেফের। এক মানুষে ত কতরকম, ঋণ অনুদান পায়। ঋণটা শোধ করে অনুদানের টাকা খেয়ে ফেলে, এ যেন রীতি হয়ে গেছে। বুড়ো ঘুরতে ঘুরতে পঞ্চায়েত সমিতি ধরে শেষ পর্যন্ত টাকা আদায় করলই। বি. ডি. ও. বলল, গরু দেখতে যাবে। যাবে জোসেফ সর্দারের ঘরে। আসুন সায়েব, ডাকল জোসেফ।

ভিটে ত নয়, ভাঙা ভিত, অবহেলায় পড়ে আছে নদীর পাড়ে, কাদা-

মাটিতে মুখ থুবড়ে। ঘরে বিধবা মেয়েছেলে, ছেলের বউ নাতিনাতনি, হাঁসের পাল যেন লালন করছে বুড়ো জোসেফ। সম্পত্তি বলতে বাঁশবাগানের ধারে পড়ে থাকা এই পোড়ো ভিটে, আর একটি পুরনো টর্চ। কিছুদিন সে চৌকিদারি করেছিল, টর্চটা তখন পাওয়া। ন্যাংটা বাচ্চা, রুগ্ন, আদুড় গায়ের বালক-বালিকা হাঁ-করে দেখল সায়েবকে। সায়েব হাঁকল, গরু কোথায় ?

বুড়ো জোসেফ বলল, বসুন সার, জলখান ॥

ছেঁড়া দড়ির একটা খাটিয়া টেনে আনল সে নিম গাছের নিচে। কেমন একটা বোটকা গন্ধ পায় অবনী মল্লিক। গা ঘিনঘিনে। মেঘ বিহীন ভাদ্র মাসের গুমোট দুপুর। রোদের তাপ খুব। চারদিকে নদীঘেরা ভূখণ্ডে এখন জলের শীতলতা নেই। জোসেফ বুড়ো তার সামনে উবু হয়ে বসেছে, চা খাবেন সার, আমার কী কপাল। বড় সায়েব এয়েছে ভিটেয়। পিয়াস্সান সায়েবও আসেনি কোনকালে।

অবনী বলল, গরু যে কিনেছ, গেল কোথায় ?

বুড়ো সোসেফ কথা এড়িয়ে বলে, গন্ধ পাচ্ছেন সার ?

অবনী বলল, আমার কথার জবাবত হল না।

জোসেফ সর্দার অবনীর বিরক্তি গায়েই মাখেনা। বলল এই গন্ধে আগের সায়েবের বমি হয়ে গিইছিল, ভয় পেয়েছিল। বুঝতে পারছেন বোটকা জানোয়ারের গন্ধ এটা।

অবনী বুঝল বুড়ো তাকে ভোলাচ্ছে। জানোয়ারের গন্ধ আসবে কোথা থেকে? বাঁশবাগানের কোণে পতিত জমিতে খড় গোবরের সারগাদা, পচা ডোবা পচা মাটি থেকে গন্ধটা উঠে আসছে, পচা গন্ধে বাতাস ভারী। নাকে রুমাল দিয়ে সে উঠে দাঁড়াতেই বুড়ো জোসেফ হা হা করে ওঠে। বসুন সার, চা খাবেন।

মাথা ঝাঁকায় অবনী. না। গরু তাহলে কেনা হয়নি ?

হি হি করে হাসে বুড়ো, বাঘের ঘরে গরু পোষানি হয় সার ? আপনি আর একটু বসুন। বুনো শুয়োরের চোয়াল দেখাব। গুড়ো করে মদে দিয়ে খেলে মানুষ জঙ্গল নদী তছনছ করে দৌড়তে পারে, বুনো শুয়োরের পাল যেমন গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে ছোটে, ও সাবি নিয়ে আয় দেখি কৌটোটা।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় অবনী। ভিটের ধারে মাটিতে উবু হয়ে বসে আছে নিষ্পত্র বৃক্ষের মত ক্ষীণ শরীরের বছর তিরিশের এক রমণী। সে বুড়োর কথায় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় মাত্র। চোখে চোখ পড়ে অবনীর। চোখের মণি স্থির। তাকে দেখছে রমণী। তাকে যেন জরিপ করে নিতে থাকে। তারপর মাটিতে ভীত চোখ ঘুরিয়ে মাথা নামিয়ে দেয়। থর থর করে

কাঁপছে বোধ হয়। উঠল না বুড়োর ডাকে ও। কিন্তু বুড়োর ডাকে আর একজন বেরোয়। ঘরের ভিতর থেকে আঁচলে ঢেকে যে বেরোয় সে বোধহয় জোসেফ সর্দারের পুত্রবধূ। মাথায় মেটে সিঁদুর, হাতে শাঁকাও রয়েছে। আঁচলের আড়াল থেকে একটি কৌটো বের করে সে বুড়োর সামনে রেখে সরে গেল দূরে।

অবনী জিজ্ঞেস করে, তুমি খ্রীষ্টান ত ?

বুড়ো ঘাড় কাত করে, হ্যাঁ, কিন্ত, শাঁখা সিঁদুর থাকবে না ঘরের বউ-এর ? আগের বি. ডি. ও. সায়েবও এই জিজ্ঞেস করেছিল সার. উনি কিছু লিখবে বলেছিল, আপনি লিখবেন ?

না। মাথা নাড়ে অবনী। বলল, কই দেখি শুয়োরের চোয়াল।

বুড়ো বিড়বিড় করে, কোন্ জ্ঞানের শাঁখা সিঁদুর, কালীপুজোয় দোষ হয় ?

জানিনে। অবনী মল্লিকের ভিতরে বিস্ময় অসহিষ্ণুতা একই সঙ্গে প্রকট হয়। বিস্ময়বোধ তাকে অনেক প্রশ্নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহল বাড়ছে ক্রমশ, কিন্তু বুড়ো জোসেফ তাকে নিবৃত্ত করছে সেই কৌতূহল প্রকাশে। জানিনে বলে ও সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে শাঁখা সিঁদুর লালপেড়ে সস্তার মোটা শাড়ি পরা জোসেফের পুত্রবধূকে। জোসেফ কৌটো খুলছে। ছোট জর্দার কৌটো টাইট হয়ে আটকে গেছে। জোসেফ খুলতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়। শেষে খুলে ফেলে যেন কৌটোর লুকোন ভ্রমর দেখায় অবনীকে। দেখুন স্যার।

কী দেখবে অবনী ? হীরে নয় জহরত নয়, বুড়ো জোসেফের হাতের তালুতে পড়ে আছে হলদেটে পাথরের মত ছোট একটুকরো হাড়। হাতে নিল সে। ওজন আছে। হাড় হতে পারে, পাথরও।

বুড়ো জলজলে চোখে বলে, দেখেছেনত স্যার, দেখুন, খাঁটি বুনো শুয়োরের চোয়াল, কী ভার।

অবনীর মনে হয় পাথর। কিন্তু হাড় কি পাথর হয়েছে ? না মাটি জমে জমে শিলা ? সে দেখতে দেখতে উঠে দাঁড়ায়, আবার, যাই।

জল খাবেন না সার, সাবি এই সাবি।

এবার আর পুত্রবধূ এগিয়ে এল না। অবনী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ভিটের কোণে বসে থাকা রমণী চমকে মুখ তুলে আবার স্থির। বুড়ো জোসেফ ডাকল, এদিকে আয়, নতুন সায়েব, সায়েব দেখবার জন্য ভাতা হয় না ?

বাঘে মেরেছিল ?

না। সাপে কেটেছিল।

অবনী বলল, দরখাস্ত দিয়ো পঞ্চায়েতে, উইডো পেনশন স্কিম ত আছে।

জোসেফের চোখ উজ্জ্বল হল, বলল, শুয়োর চোয়াল নেবেন সার ? আমি

মদ এনে দেব। বাঘের পাঁজরা আছে ঘরে, কিন্তু আজ দেখান যাবেনা সার, দেখানর তিথি আছে, অমাবস্যা পূর্ণিমের মত তারও লগন আছে, যখন দরকার, তখন দেখাব, সবেত এলেন।

কঠিন চোখে অবনী তাকায়। বুড়োর মাথা নিচু, বিড়বিড় করল, ঠিক আছে সার নতুন বাঘের পাঁজরা, ছাল এনেদেব, লোকত বায় জঙ্গলে, ভাদ্র-আশ্বিন যাক, একটু ঠান্ডা পড়ুক, ধানক্ষেতের মাটি শুকোলে বাঘ এপারে গরু খুঁজতে আসবে গাঙ সাঁতরে, সময় হোক।

বুড়ো বিড়বিড় করতে থাকে। অবনী কিছু শোনে, কিছু শোনে না। এগোতে থাকে। দুদিন বাদে জোসেফের দরখাস্ত বি. ডি. ও.-র হাতে পড়ে দরখাস্ত করেছে জোসেফের বিধবা মেয়ে মেরিরানি সর্দার। দরখাস্ত দেখে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অবাক, ক'টা মেয়ে ওর, বিধবা ত একটা।

হ্যাঁ। তাই ত জানি। বলল, বি. ডি. ও।

সে ত পাচ্ছে উইডো পেনশন। সাবিত্রী মিদ্যে, স্বামী হরি মিদ্যে, রেজিস্টার আনুন, পেয়ে যাবেন।'

তাই-ই হল। সাবিত্রি মিদ্যে পাচ্ছে, মেরিরানি কে? সন্ধের বুড়ো জোসেফ এই কথা শুনে বিচলিত হল না, পঞ্চাশ টাকা ভাতায় কী হয় সার, চাল কিনে খেতে হয়। বাঘে নিলে টাকা পাওয়া যায়। সাপে কাটলে যায় না, মরণ ত দুয়েরেই হয়। বনে বাঘ ভিটের সাপ, মানুষ বাঁচে কেমন? বে'তে হি'দু হয়ে গেছলো, বেধবা হয়ে আমার ঘাড়ে এসে ফের কেস্তান, সাবিত্তি নাম ওর সোয়ামীর দিয়া ছেল, এখন মেরি নামে হবে না কেন? কে জানছে?

সবাই জানে।

জানে জানুক, আপনি বললিই হয়ে যায় সার, আপনার কত ক্ষ্যামতা।

না, তুমি আর এনিয়ে কথা বলোনা।

বুড়ো ত বসে পড়েছে বারান্দায়, এডা না করলি হবে না সার, মেরিরানি আর সাবিত্তি এক নয়। ওতে ওর সোয়ামীর নাম হরি মিদ্যে, এতে হ্যারিশ, হ্যারিশ ছেল পিয়ার্সন সায়েবের চাকর, বিদ্দি ছাড়া বাঙলা বুঝত না।

যতটা সহজে বুড়োকে বিদায় করবে ভেবেছিল অবনী, তা হল না। বুড়ো ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল পঞ্চাশ টাকায় কী হয়? মেরিরানি আর সাবিত্রি যে এক তা বুঝবে কে? শেষে হতাশ হয়ে বলল, তালে সারের লোনডা দেন।

এখন সারের লোন কী করে হবে, চাষত শেষ।

চাষ শেষ বলেই ত লাগবে। ভাদ্দর মাস লোন না দিলে বাঁচি কী করে?

জমি আছে।

পাট্টা আছে, জমি নেই, বেচে দিইছি সায়েব।

তা হলে সার কী করবে?

খাব সায়েব, ডিলারকে দিয়ে টাকা জিয়ে নেব।

অবনী মল্লিক রেগে যায়, বেচলে কেন জমি?

বুড়ো বারান্দার মেঝের হাত ঘষে, রাখতে জানিনে, গরু, ছাগল, মুরগি কিছুই রাখতে জানিনে সায়েব, বেচে খাওয়া অব্যেস, না রাখা অব্যেস, আমি সার এ জায়গায় পুরনো লোক, পিয়াস্সন সায়েবের খাস লেঠেল ছিলাম। তাব চাকর হ্যারিশ ও আমারে ভয় করত। মেস সায়েব আমারে পছন্দ করত। একদিন কাঁচা দুধে বাঘের পাঁজরার গুঁড়ো মিশিয়ে খেয়ে, আমারে ডাকল জোসেফ জোসেফ, কামিয়ার জোসেফ, ডাকটা এখনো কানে লেগে আছে সার, এখন কেঁদে মরি, সায়েবের সঙ্গে বিলেত চলে গেলাম না কেন তাব জুতো মাথায় নে, মেরিয়ানিরে আপনি বাঁচান, পঞ্চাশ টাকায় কিছু হয় না।

অবনী মল্লিক দেখে বলতে বলতে বুড়ো হাঁপাচ্ছে। কপাল আদুলগা ঘামে ভিজে যাচ্ছে ক্রমাগত। চোখের কোলে জল, বিড়বিড় করছে বুড়ো, সে সবদিনত আর নেই সায়েব, কিন্তু সায়েব ত আছে, আপনিই সায়েব, দারোগাবাবু সায়েব, আপনার হ্যাঁ করলি হ্যাঁ, না করলি না, বাঘের পাঁজরা, শুয়োরের চোয়াল দুধে মদে মিশেল দিয়ে খাবেন, বাঘের ছালে শোবেন····।

অবনী মল্লিক হাত তোলে, থাক জোসেফ বুড়ো, থামো এবার।

জোসেফ সর্দার বলল, থামাই সায়েব, কিন্তু আপনি আমারে দেখুন, না দেখলে মরে যাব· আমার বাপ এখেনে এয়েছিল পিয়াস্সন সায়েবের বাপ বড় পিয়াস্সন সায়েবের হাত ধরে, তখন এখেনে জঙ্গল বাঘ সাপ····। আমি আপনারে বাঘের পাঁজরা এনে দেব, ছাল এনে দেব সায়েব। পিয়াস্সন সায়েব কত ছাল জিয়ে গেছে, আপনার আগের বি. ডি. ও সায়েব বাঘের পাঁজরা নিয়ে গেছে, না করবেন না।

বুড়ো গেল সেদিনের মত। কিন্তু তার যাওয়া ত রাত্তিরের জন্য। সকালে হাজির। সকালে এসে রোদ চড়া হলে চলে যায়। তখন বি. ডি. ও সায়েব চলে অফিসে। আবার আসে সন্ধে হওয়ার সময়। বি. ডি. ও ফিরে দেখে সে বসে আছে বারান্দায়। কত রকম তার খবর। কৈবর্ত পল্লীতে বৈশাখ মাসে আগুন লেগেছিল। তারা ক্ষতিপূরণ পাবে। দু-হাজার টাকা পাচ্ছে ঘর-প্রতি। এইসব পরিবারের তালিকায় তার নামও ঢুকিয়ে দিক সায়েব। কেন হবে না? কে খোঁজ রাখছে? ওখেনেও পঞ্চাশ ঘরের সবগুলো পোড়েনি। না পোড়া ঘরের লোকও ত তালিকায় আছে।

অবনী মল্লিক রেগে যায়, তুমি বেরোও ত এখান থেকে, মগের মুলুক নাকি?

না সার, সায়েবের মুলুক, রাগবেন না।

কেঁপে যায় অবনী। এক্ষুনি চলে যাও।

বুড়ো জোসেফ যেন আরো থিতু হয়ে বসে, বিড়বিড় করে, পিয়ার্সন সায়েবও এমনি রেগে যেত, রাগলে আর মাথা ঠিক থাকত না। জুতোপেটা করত আমাকে। একবার অবশ্য না রেগে আনন্দ করে আমাকে লঞ্চ থেকে গাঙে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, কেন জানেন সায়েব ?

কেন ? কৌতূহলী হয় অবনী কেননা বুড়োর বাচন-ভঙ্গিমায় স্বাদু আছে।

বুড়ো হাসে। সায়েবের আনন্দ হয়েছিল, তার আগের দিনই ওই গাঙে একটা বউকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কুমীরে, গাঙে তখন ভয় লেগেছে, সায়েবের ইচ্ছে হয়েছিল কুমীর দেখা, বড় কুমীর যেটা ঢুকে পড়েছিল ছোট গাঙে তা স্বচক্ষে দেখা, কুমীরে কেমনভাবে মানুষ খেয়ে নেয় তা দেখা, আমাকে ঠেলে দিল জলে। উঠে এলে বলল ওই কথা, কুমীর আমার ধারকাছে আসেনি, সায়েব ওসব করত কেননা ভালও ত বাসত, আপনি আমারে ভালবাসুন সার। গাঙে ঠেলে দিন, কিন্তু উপকারটা করুণ। গাঙ থেকে উঠে আসব ঠিক, বাঘ কুমীরে ছুঁতে পারবে না জোসেফ সর্দারের মাংস, কিন্তু জোসেফ সর্দার ত পারবে না ঘরপোড়া মানুষের লিস্টিতে নিজের নাম তুলতে। সেডা আপনি পারেন, খুব কঠিন কাজ তা জানি কিন্তু আপনার ক্ষ্যামতাও আছে। জোসেফ সর্দারের চেয়েও বড় ক্ষ্যামতা। গাঙে কেন সমুদ্দুরে যদি পড়েন। হাঙরেও ছুঁতে পারবে না আপনারে। আপনি আমাকে ডাকুন কামিরায় জোসেফ, সেলাম ঠুকে চলে আসব যখন ডাকবেন।

পাগলের মত বকতে বকতে, একই শব্দ বাক্য বারবার উচ্চারণ করতে করতে অন্ধকারে উঠেছে জোসেফ সর্দার। উঠনে নেমে জনতে প্রসারিত ভাদ্রের আকাশ, গ্রহ-তারার দিকে চেয়ে বিড়বিড় করতে থাকে। একদিন নয় সবদিন। নদী বাঁধে উঠে বসে থাকে জলের দিকে চেয়ে, জলতল থেকে আকাশ পর্যন্ত ছেয়ে যাওয়া অন্ধকারের দিকে চেয়ে ওই কথাই যেন বলে। ঘুরে ঘুরে আসে। মেরি রানির নামে বিধবা ভাতা না হোক ঘরপোড়া লোকের তালিকায় তার নাম উঠুক। তা না হয় সায়ের লোন দিক সায়েব। বীজের লোন দিক। এসব না পারে আবার খাস জমি দিক সরকার। সে তা বেচে দিয়ে কিছু আয় করতে পারবে। এসব না হলে সে ব্যবসা করবে, ধান চালের তার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকার ব্যবস্থা করে দিক সায়েব। তা না হলে ব্লক থেকে মৌমাছি পালনের জন্য টাকা দিক। মধু খাওয়াবে সে সায়েবকে। মধুর সঙ্গেও বাঘের পাঁজরের গুঁড়ো খাওয়া যায়। তাতেও তেজ কম হয় না।

ভাদ্র ত গেল, আশ্বিন গেল, শীত গেল, এল বৈশাখ, তা গেল। বৃষ্টি এল আবার। লোকটা আসে। ঘুরে ঘুরে যায়। তারজন্য আর কিছুই ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি বি. ডি. ও., কিন্তু তার চেষ্টা আছে। পারছে না।

পারা সম্ভবও নয়, তার না পারাতেও অসন্তুষ্ট নয় বুড়ো জোসেফ। সে জানে সায়েব পারবে। সায়েব বদলির চেষ্টা করে গোপনে, মিটিং-এ চেষ্টাও করে। বুড়ো জোসেফের নামে বৃদ্ধভাতা, সায়েব লোন, যা দেওয়া যায়। এবং পারলও। সে পারে। বুড়ো জোসেফ যা বলেছিল তা আক্ষরিক অর্থেই ত সত্য। অবনী মল্লিক নিজে জানল সে পারে। পঞ্চায়েৎ সমিতির সঙ্গে তার সম্পর্ক নিকটের। পঞ্চায়েত সমিতিও সুবিধে নেয়, তা বি. ডি. ও.-কে দেখে চুপ করে থাকতে হয়। সেই সুবাদে বি ডি. ও.-র ইচ্ছেরও দাম দেয় পঞ্চায়েত সমিতি। পঞ্চায়েত সমিতি এতদিন যেন দেখছিল বি. ডি. ও.-র ইচ্ছেটা কত গভীর। বি. ডি. ও. থেমে যায় কিনা বলতে বলতে। বি. ডি. ও. হয়ত থেমে যেত যদি চুপ করে যেত জোসেফ সর্দার। জোসেফ সর্দার থামেনি বলে বি. ডি. ও. থামতে পারেনি। সে সময়ে সুযোগে বলে গেছে। যেভাবে সরকারি পদাধিকারী তার আত্মজনের জন্য বলে সেইভাবে বলে গেছে। বলার সুযোগ ছিল তার তাই বলেছে। বলার ক্ষমতা ছিল তার, তাই বলেছে। এতে সে নিজে নিজের ক্ষমতার স্বাদ পেল। সে জানল, সত্যিই সে না পারে এমন কাজ নেই। বুড়ো জোসেফের জন্য মাসিক একশো টাকা ভাতা বরাদ্দ হল। কথাটা সে গোপন রাখল এই ভয়ে যে এরপরেও ছাড়বে না জোসেফ। আবার আরও কিছুর জন্য আবেদন করবে। হয়ত এবার ছেলের জন্য, কিংবা ওই বিধবা মেয়ের জন্য। জোসেফের জন্য বরাদ্দ টাকা আসতে দেরি আছে। সুতরাং সে চুপ করে থাকল যাতে নতুন কোন পাইয়ে দেওয়ার কথা আবার শুনতে না হয়। বুড়ো জোসেফ আসে। বাঘের পাঁজর, শুয়োরের চোয়াল, প্রাক্ত কুমীর জলজ কাঠ মধু পিয়ার্সন সায়েব—এসব বলতে থাকে। আবার ভাদ্র গেল, আশ্বিন গেল। বাঁশগুলিতে শীত নামতে থাকে। তখন জোসেফ সর্দার আসে পুরনো ছেঁড়া কোট গায়ের উপর চাপিয়ে মাথায় ছেঁড়া মাঙ্কি-ক্যাপ লাগিয়ে। কোটটা নাকি পিয়ার্সন সায়েবের আমলের। মাঙ্কি ক্যাপটি দিয়েছিল আগের বি. ডি. ও.।

এই অগ্রহায়ণে বি. ডি. ও. চলে যাবে। বড় ছুটিতে গিয়ে নতুন জায়গায় জয়েন করবে ছুটি শেষে। তখন অবনী খবরটা জানায় জোসেফকে। হয়ে গেছে। টাকাও এসে গেছে। শুনে লোকটা মাটিতে মাথা ঠুকতে থাকে, আপনি পারেন।

অফিসে মাথা ঠুকল। বিকেলে নদী বাঁধে মাথা ঠুকে সে তিন মাসের টাকা নিয়ে ফিরে গেল বাড়ি। বি. ডি. ও. ফিরে এল তার কোয়ার্টারে। ফেরার আগে বলল জোসেফকে, বাঘের পাঁজর ত পেলাম না, বাঘছালও না।

জোসেফ শুনল, কথা বলল না। নদীর বাঁধ ধরে হাঁটল দক্ষিণে। সে কি সোজা চলে যাবে জঙ্গলে। গোমর পেরিয়ে ওপারে পৌঁছে হেঁটে চলে যাবে বাঘমারাতে। মেরে পাঁজর নিয়ে আসবে? ইচ্ছে হলেই সে যেন পারে, যেমন

পারে বি. ডি. ও. তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে জোসেফ সর্দারের জন্য ডাক্তার ব্যবস্থা করতে।

সন্ধে পার হয়ে গেছে। শীত বেশ ঘন হয়েছে। রাত যত বাড়ে এখানে, শীত পাথর হয়। দ্বীপ ঘেরা নদীর জল বরফ হয়। শীত এখানে ভিনদেশী প্রকৃত অর্থেই। বাতাস আসে উত্তরের পৃথিবী থেকে। স্থলভূমি থেকে সেই বাতাস নদীবাহিত হয়ে দ্বীপে দ্বীপে ছড়িয়ে যায়। এল বুড়ো জোসেফ অনেক রাত্রে, কুয়াশা জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে দক্ষিণের বন থেকে, ডাকল, সায়েব।

ডাকল অবনী, এস, আমি এবার চলে যাচ্ছি।

বুড়ো টলছে, টলতে টলতে মাটিতে পা ঠুকছে, চলে ত যাবেন সায়েব, পিরাম্সন সায়েবও গেল তার জমিদারি ছেড়ে, সায়েব এই যে বাঘের পাঁজর আর কাঁচা দুধ, তুমি খেয়ে ফেল।

মাতাল হয়ে এসেছে বুড়ো, খেয়ে নাও, বুড়ো জোসেফ এমনিতে কিছু নেয় না।

অবনী বলল, দাও শহরে নিয়ে যাই, কলকাতায়।

না, এখেনে খাও। যেন গরগর করে ওঠে জোসেফ, এখেনেই খেতে হবে, এই বাতাস, গাছের গন্ধ, জঙ্গলের ডাক, এই দ্বীপ, গাছের পরে গাছ, এর ভিতরে না খেলে কাজ হয় না, তুমি আমার এত করলে, এটুকু দিতে পারব না, আয় ত দেখি মেরিরানি, রাতে ও থাক এখেনে।

অবনী মল্লিক চমকে ওঠে। এতক্ষণ সে দেখেনি, নজরে এল, কুয়াশার চাদর মুড়ি হয়ে কে যেন উঠনের শেষ প্রান্তে বড় জবা গাছটির ছায়ায় লুকিয়ে বসে আছে। বুড়ো ডাকে, আয় মেরি, আয়, সায়েব বাঘের পাঁজর খাবে।

অবনী আর্তনাদ করে ওঠে। কি ব্যাপার জোসেফ বুড়ো, কী বলছ? কাকে এনেছ?

জোসেফ বলল, ওর সোয়ামীকে সাপে কেটেছিল, বাঘে খায়নি, সায়েব এমনি এমনি উপহার নেব কেন, নাও বাঘের পাঁজর নাও, মিশিয়ে দিয়েছি দুধে।

অবনীর গলা দিয়ে স্বর আর বেরতে চায় না, বলল, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?

পিরাম্সন সায়েবও ওই কথা বলত, এ দ্বীপের মেয়েমানুষ দেখে তারও পছন্দ হত না, কিন্তু তারেও ত বাঘের গন্ধ শুঁকিয়ে এনেছি সায়েব, সেও ত বাঘের দুধ খেয়ে এসেছে, ও মেরি আয়, নেন সায়েব, এমনি উপহার নেব কেন আমি?

অবনী মল্লিক চিৎকার করে ওঠে, যাও বেরোও।

মেরিরানি জবা গাছের ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। চাদর মুড়ি

দিয়ে ধীর পায়ে জ্যোৎস্নার উপরে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে। নুব্জ্য, দুবলা দেহ, চোখ দুটিতে কোন আলো নেই। ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে, শীতে কাঁপছে। ভয় লাগল অবনী মল্লিকের, আবার গর্জে উঠল, চলে যাও, তুমি আমাকে চেনোনি জোসেফ বুড়ো।

একই কথা বলত পিয়ার্সন সায়েব, দেশী রূপ মেয়েমানুষ পছন্দ হবে কেন, কিন্তু তারেও ত ভাঙা পাঁজরের গুঁড়ো খাইয়ে এনেছি সায়েব, সেও তো সমান হয়ে যাবে তখন, বাঘের ছালে শুলে দুজনেই বনের পেয়ারী হয়ে যায়, কোন চিন্তা নেই, ও জঙ্গল করে তুলবে তোমার ঘর, অ্যাই এদিকি আয়, সায়েবের পায়ে মাথা দে।

অবনী মাথা ঠান্ডা করতে থাকে। সে বোঝে মাতালের কান্ড। মেয়েটাকেও মদ খাইয়ে এনেছে কিনা কে জানে! মেয়েটা ত ঘাড় হেঁট করে বারান্দার সিঁড়িতে বসে হিমে ভিজছে। অবনী মল্লিক শান্ত গলায় বলল, তুমি চলে যাও বুড়ো, আমার কিছুই লাগবে না, ওকে নিয়ে যাও।

মাথা নাড়ে জোসেফ, তা বললে হয়, দারোগাবাবু আসে দারোগাবাবু যায়, বি. ডি. ও. আসে বি. ডি. ও. যায়, যে আসে সে আগের জনের কাছ থেকে জেনে নেয় সব, সায়েব বাঘের পাঁজরের কথাডা তুমি ত বলে যাবে যে আসছে তাকে, আমার ত আরো চাই....

অবনীর গা শিরশির করে, আগের জন নিয়েছিল বাঘের পাঁজর ?

না নিয়ে কেউ যায়, এই সাবি ঘরে যা।

না! গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরোয় অবনীর।

বুড়োর চোখ দপদপ করে, ঘরে যা সাবি ঘরে যা, সায়েব পাঁজর ভেঙে দিচ্ছি, তুমি নাও, সায়েব এই পাঁজর ভেঙে দিচ্ছি তুমি ঘরে যাও, পিয়ার্সন সায়েব আমারে বলত টাইগার! বুক বাজাতে বাজাতে বুড়ো টলতে থাকে, পাঁজরা যে কী তা তুমি জান না সায়েব ? ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিচ্ছি তুমি ঘরে যাও।

অবনীর পিঠ দেওয়ালে। সে হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাতে চেষ্টা করে মেয়েটাকে, চলে যা, পালা, তোর বাপ পাগল! ওহে জোসেফ পাঁজর ভাঙছো কেন, তুমি ওই বুনো শুয়োরের চোয়াল ভেঙে মদে মিশাওনি আজ ?

বুড়ো বপ করে বসে পড়ল উঠনে। সে ক্ষ্যামতা আমার আর নেই, চোয়ালের হাড় পাথর হয়ে গেছে, পাথর ভাঙার ক্ষ্যামতা আমার নেই, তুমি আমার ভাঙা পাঁজর নিয়ে আরো কিছু করে যাও, বলে যাও যে আসছে সে যেন মেরিয়ানির নামে জাতাটা করে দেয়।

অবনী মল্লিক দেখল বিধবা বারান্দায় উঠেছে। বিধবা তার ঘরের দরজায় পা রেখেছে। সে ত আর একদিন মাত্র। বুড়োর গলার স্বর স্তিমিত।

থেমে গেছে বুড়ো। দ্বীপ একা হয়ে গেল সহসা। একা ছিল, আরো একা। অবনী মল্লিকের ভিতরে পিয়াম্সন সায়েব জেগে ওঠে যেন, সে চাপা গলায় হিস হিস করল, বাঘের ছাল?

বাঘ না মরলে ত পাবে না সায়েব।

পাঁজর ভাঙলে ত মরে।

মুখ তুলল বুড়ো জোসেফ, মরে না, মরা বড় কঠিন, যাও সায়েব, রাত বাড়ছে। বলতে বলতে বুড়ো কেঁদে উঠল। কাঁদতে লাগল গুনগুন করে। ভাঙা পাঁজর নিয়ে কাঁদতে লাগল। বয়স নিয়ে কাঁদতে লাগল। অভাব নিয়ে কাঁদতে লাগল। আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাঁদতে লাগল। পিয়াম্সন সাহেবের কথা মনে করে কাঁদতে লাগল। অবনী মল্লিক ছোটে ছোটে ঘরে যায়। ঘরে ফিরে শুনল কান্নার শব্দ। বাপের সঙ্গে মেয়েও গলা জুড়েছিল। তাকে দেখেই থেমে গেল।

দ্বৈপায়ন

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

জোর জমে উঠেছে তাসের আড্ডা। ধোঁয়া উড়ছে, চা ফুটছে আর ভাঁজা তাসের শব্দ উঠছে ফট্‌ফট্‌। চার ব্যক্তির খেলা; পাশে আরও দু'ব্যক্তি। ফোড়নদার। রাস্তার উলটো দিক থেকে হঠাৎ একটা কান্নার শব্দ ভেসে এলো। সে কান্নার করুণ আর্তি ছড়িয়ে গেলো সমস্ত বাড়িটার আকাশে বাতাসে। তাসুড়েদের খেলায় তন্ময়তা ভেঙে গেলো। সকলে উৎকর্ণ হলো।

মহিম একটু কান খাড়া করে শুনে বলে উঠলো—কে কাঁদে?

রসভঙ্গে বিরক্তিভরা কণ্ঠে সতীশ বলল—ছাড়ো, যতো সব। ওঃ, তাল কেটে দিলো।

মহিম চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর তাসে মন দিল।

কান্নাটা জোরে, আরো জোরে যেনো দেয়াল ভেদ করে সারা ঘরে ছড়াতে লাগল। মহিম আবার কান খাড়া করলো। ডাকল—সেন্টু, সেন্টু—দেখতো কে কাঁদে।

অন্তর উত্তর দিল—সেন্টু, সেন্টু করে চ্যাঁচাচ্ছে। সেন্টু এখন বাড়ী থাকে?

—ওঃ। চুপ করলো মহিম।

অন্তর কথায় রেশ টেনে বলল—হরিনাথবাবুর নীচের তলায় ভাড়াটে বউটা কাঁদছে।

—কেন ?

—ওর স্বামী মারা গেলো ?

—কেন মারা গেলো ?

—আদিখ্যেতা দেখ না। মানুষ কেন মারা যায়, জান না। অন্তরের কণ্ঠে বিরক্তি ঝরে পড়লো।

মহিম তাস ভাঁজতে ভাঁজতে বলল—ওঃ। শুনেছো, ছ কাপ চা পাঠিয়ে দিও।

অন্তর নিরুত্তর।

কারখানাকেন্দ্রিক এই বস্তিটাই সব চেয়ে অভিজাত। কারখানার যারা একটু বেশী মাইনে পায়। ব্যাঙ্ককর্মচারী কোলিয়ারীর কিছু কুদে অফিসার—এরাই এ বস্তির বাসিন্দা। কিছু কিছু অকুলীন মানুষও আছে, তবে তাদের সংখ্যা নগণ্য। বস্তির নামে জেল্লা আছে। অমরকুঞ্জ পল্লী। এই অমরকুঞ্জের জনৈক অমর মহিম—মহিম হালদার। অন্য তাসুড়েরাও এই পল্লীরই বাসিন্দা।

তাসের আড্ডা বসেছে মহিম হালদারের বৈঠকখানায়। প্রতি সন্ধ্যায় বসে—চলে অনেক রাত পর্যন্ত। মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত গড়িয়ে যায়।

কান্নাটা থামে নি। কখনও তীব্র, কখনও নিম্নগ্রামে কান্নাটা বাজতে থাকে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মহিম বলে—আর একজন গেলো।

সহসা দার্শনিক হয়ে ওঠে সতীশ—সংসারের এই তো অমোঘ নিয়ম। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে—

আর এক তাসুড়ে প্রণব চক্রবর্তী উত্তান কণ্ঠে বলে—তাস, সব তাসের খর।

চায়ে চুমুক, তাসে থাপ্পড় আর দার্শনিক কথাবার্তার মধ্য দিয়ে রাত গড়িয়ে চলে। কেউ কিন্তু ওঠে না। বস্তির একজনের মৃত্যু কোন চাঞ্চল্যই আনে না বস্তির জীবনে, এমন কি মৃত যে তাদের প্রতিবেশী ছিল, এ বোধও কবে ভোঁতা হয়ে গেছে। এক বাড়ীর লোক অন্য বাড়ীর খবর রাখে না, এমন কি প্রতিবেশীর নামও জানে না। প্রতিটা গৃহে যেন এক একটা স্বতন্ত্র দ্বীপ ; সকলেই ব্যস্ত নিজেকে নিয়ে। একমাত্র মৃত্যু কয়েক মুহূর্তের জন্য সচকিত করে এ-বাড়ী ও-বাড়ীর বাসিন্দাদের। ঐ পর্যন্তই। তারপর যথাপূর্বম তথা পরম্।

কয়েকজন লোক জড়ো হয়েছে বাড়ীটার সামনে। দু-একজন একটু উঁকি-ঝুঁকি মেরে গেছে। কান্নার উৎসস্থান আবিষ্কার করেই তারা চলে গেছে।

বাড়ীওয়ালার স্ত্রী হেমাঙ্গিনীদেবী নীচে নেমে এসে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন একবার। সুমিতা মৃত স্বামীর বুকে মুখ রেখে কেঁদেই চলেছে। মুখ একবারও তোলে নি, কথা বলে নি। সুমিতা কাঁদছে। এ কান্নার যেন শেষ নেই।

রাত বেড়ে চলেছে। পাড়ার রাস্তার মোড়ে আড্ডা দেওয়া ছেলেরা অবশেষে এসে দাঁড়ালো সুমিতার ঘরের দরজায়।

—কাকীমা, আপনি কিস্সু ভাববেন না, আমরা এসে গেছি। অভয়-বাণী শোনালো ছেলেদের একজন। এবার মুখ তুললো সুমিতা। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল, ফুলো মুখ, বিধ্বস্ত চুল। শূন্য অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল ছেলেদের দিকে।

ব্যাপারটা কেমন যেনো খেই হারিয়ে যাচ্ছে। অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করেও বুঝতে পারছে না সুমিতা। চোখ তুলেও সে কিচ্ছু দেখছে না, শুনছে না একটা শব্দও।

ছেলেদের একজন বলল—কাকীমা এখন তো কাঁদার সময় নয়। কাকুর সৎকার তো করতে হবে।

—সৎকার? হ্যাঁ, সৎকার—

—সৎকারের জন্য কিছু টাকা তো চাই। অন্য ব্যাপারগুলো আমরাই দেখবো।

সুমিতা চুপ করে বসে থাকে। তার দু চোখ বেয়ে জল ঝরে—টপ্‌টপ্‌ করে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শুষ্ককণ্ঠে—স্বগোক্তির মতো বলে—টাকা? টাকা তো নেই।

—কেন হাল্‌য়া, টাকা নাই? একশো দুশো—কিছু?

—না বাবা, ঔষুধ কিনতে আমার শেষ সম্বল ১০'০০ টাকা—তাও শেষ হয়ে গেছে।

কেন হাল্‌য়া। পাড়ার লোকগুলো কি? মরার আগে সৎকারের টাকাটাও জোগাড় করে রেখে যেতে পারে না। আজকাল হলো কি?

—চল্‌ শালা। আমরা থাকতে সৎকার হবে না? চাঁদা তুলবো।

যেমন দুরদার করে এসেছিল, তেমনি দুরদার করে চলে যায় ছেলেরা। যাবার সময় একজন ছেলে চীৎকার করে বলে—কিস্সু ভাবেন না কাকীমা, আমরা ট্রাক নিয়ে আসছি।

সুমিতার চোখের জল এবার শুকিয়ে আসে। চোখ মুছে সে উঠে দাঁড়ায়।

অভিজাতপল্লী। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, টি, ভি, চল্‌ছে। পাশের বাড়ী থেকে ভেসে আস্‌ছে স্বামী-স্ত্রীর উচ্চকণ্ঠ—হাসির উচ্ছ্বাস। দূরে কোন গৃহে চলছে নৃত্যচর্চা। বাজছে ঘুঙুর, তবলায় সংগত। পাশীর

কোথাও কোন ছন্দপতন ঘটেনি। একজন মানুষের মৃত্যু, সুমিতার জীবনের এই অন্ধকার, তার বুক-ফাটা কান্নার ঢেউ—কোন কিছুই এই পল্লীর পাষাণ হৃদয়ে এতটুকু স্পন্দন জাগায় নি।

সুমিতা ঘরে এসে আবার মৃতের পাশে বসে।

ছেলেরা হৈ হৈ করে বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় করে। বিরক্ত বাসিন্দারা দু-এক টাকা চাঁদা বিনাবাক্যব্যয়ে দিয়ে দেয়। প্রশ্নও করে না কিসের চাঁদা। চাঁদার একটা মাসিক বাজেট প্রতিটি পরিবার করে রাখে। পাড়ার চাঁদাবু-ছেলেদের ওরা চটায় না। সময়ে অসময়ে চাঁদার পুজো দিয়ে শনিদের তুষ্ট রাখে। মাঝে মাঝে বচসাও হয়, যখন চাঁদা বরাদ্দ বাজেট অতিক্রম করে। তবে ঘটনা বচসাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, অতিক্রম করে না।

সুমিতাদের পাশের বাড়ী থেকে চাঁদা নিয়ে ছেলেরদল ফিরে আসছিল। হঠাৎ তাদের কানে যায় গৃহকর্ত্রীর কথা—বাবারে, চাঁদা, চাঁদা-চাঁদা। পাগোল করে দিলে।

মায়ের কণ্ঠস্বরে ছোট মেয়ে মিনা কাছে আসে—মা, কিসের চাঁদা মা?

—কিসের আবার? মদ খাবার। গৃহকর্ত্রীর কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠে।

কথাগুলো কানে যায় ছেলেদের। তারা ঘুরে আসে।

বন্ধ দরজায় কড়া নড়ে ওঠে। প্রথমে মৃদু—পরে সজোরে।

ছুটে আসে বাড়ীর ছোট ছেলে। দরজা খোলে।

—ডাক তোর মাকে।

ডাকতে হয় না। গৃহকর্ত্রী আর একপ্রস্থ চাঁদার জন্য তৈরী হয়ে এগিয়ে আসেন।

—শুনুন, মাসিমা।

—কি, কি, আবার কি?

—না, আর চাঁদা নিতে আসিনি। চাঁদা ফেরৎ দিতে এসেছি।

—ফেরৎ, কেন বাবা, ফেরৎ কেন? আমি তো স্বেচ্ছায় চাঁদা দিয়েছি। তোমাদের অসম্মান কখনও করেছি?

হো হো করে হেসে ওঠে ছেলেরা। গৃহকর্ত্রী চমকে ওঠেন। —শুনুন মাসিমা, চাঁদা নানা উপলক্ষ্যে আমরা নিই ঠিকই। আমাদের কেউ কেউ হয়তো মদ-টদ একটু-আধটু খায়, কিন্তু শুধু মদ খাবার জন্যে আমরা চাঁদা আদায় করি না।

গৃহকর্ত্রী এবার বুঝতে পারেন—ছেলেরা তাঁর কথা শুনে ফেলেছে। তবু শুকনো মুখে হাসি ফুটিয়ে বলেন—না বাবা, সে কথা কেউ বলতে পারে? তোমাদের মতো সোনার চাঁদ ছেলে—

—না মাসিমা, আমরা সোনার চাঁদও নই, হীরের টুকরোও নই। আমরা

আপনাদের জুতোর শুখতলা। পায়ের নীচেই থাকি। নিন, চাঁদাটা ফেরৎ নিন।

—না, বাবা না—একি বলছ—

—শুনেন, আদিখ্যেতা করবেন না। নিন।

বাধ্য হয়েই হাত বাড়ান গৃহকর্ত্রী। তাঁর পাংশু মুখ মনে হয় মৃতের মুখ।

ছেলের দল চলে যায়। কে একজন বলে—আমরা মদ খাই, আমরা মস্তান, চোর—ডাকাত। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরা তাই। আর, আপনারা আমাদের চেয়েও নিকৃষ্ট জীব। পাশের বাড়ীর একজন মারা গেছে, তার স্ত্রী কেঁদে কেঁদে পাগল, আর আপনারা মহানন্দে হাসছেন, স্ফূর্তি করছেন। মানুষের চামড়ায় পশু, থুঃ—

অপমানে লজ্জায় গৃহকর্ত্রীর মুখ লাল হয়ে ওঠে। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে তিনি ঘরে ঢোকেন।

সুমিতার স্বামীর শবদেহ ছেলেরা ট্রাকে ওঠালো। দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নিথর সুমিতা। হরিধ্বনি উঠলো—বলহরি হরিবোল।

আশেপাশের বাড়ীর জানলাগুলো ধীরে ধীরে খুলে গেল। জানলায় জানলায় ছায়ামূর্তি। মহিম হালদার তাসের আড্ডা ভেঙে দিলেন। ছাদে উঠে দেখতে লাগলেন শবযাত্রা।

আবার হরিধ্বনি—বলহরি, হরিবোল।

যাত্রা শুরুর প্রস্তুতি শেষ।

উপানন্দবাবু সহসা অন্ধকার ফুঁড়ে এসে দাঁড়ালেন ট্রাকের সামনে। উপানন্দ অর্থাৎ উপানন্দ দে—জনকল্যাণ সমিতির সভাপতি।

—সব ঠিক তো? যাক, খবরটা পেয়েছিলাম আগেই, কিন্তু এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সভা ছেড়ে আসতেই পারছিলাম না। এবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকী আমরা খুব জাঁকজমক করেই করবো ঠিক করেছি, বুঝলে কিনা?

কেউ জবাব দিল না।

উপানন্দবাবু আবার মুখ খুললেন—মারা গেল কে?

ছেলেদের মধ্য থেকে কে একজন উত্তর দিল—সেই রঙ কলে কাজ করতো যে লোকটা—

—রঙ কলে—রেলপারে? মাঝে মাঝে থলি হাতে বাজার যেতে দেখতাম বটে লোকটাকে। কারো দিকে চোখ তুলে তাকাত না। আহা বেচারী—বড্ড ভাল লোক ছিল রে। তা, ওর কোন আত্মীয় স্বজন—

—বোধহয় কেউ নেই।

—ওঃ, তাতে কি ? আমরা তো আছি। মানুষ হিসাবে আমাদের তো একটা কর্তব্য আছে। তা বেশ, তোমরা যাও। পরে দেখা হবে।

বিদ্যাসাগর জয়ন্তী মাথায় করে উপানন্দবাবু চলে গেলেন।

ছেলেদের মধ্যে কে একজন বলল—শালা জনকল্যাণ। এবার বোধহয় একখানা বড় বাজেট হবে।

—বলহরি, হরিবোল।

কাজকর্ম চুকে গেছে। সুমিতার স্বামীর কারখানার বন্ধু দীননাথ মালিকের কাছ থেকে ৫০০ টাকা অগ্রিম এনে দিয়েছিল। তাই দিয়ে কোনক্রমে শ্মশান বন্ধুদের আপ্যায়িত করেছে সুমিতা। আজ দুদিন তার নিরম্বু উপবাস।

কারখানার সুমিতার স্বামীর নামে কিছু টাকা জমা আছে। তবে তা যৎসামান্যই। স্বামীর মাইনে বেশী ছিল না—তবে বাড়ী ভাড়া দিয়ে নুন-ভাত জুটে যেতো দুবেলা। কিন্তু কাল রোগ এসে সব ওলটপালট করে দিয়ে গেল। স্বামীর পুরানো সাইকেলখানা বেচে এতদিন চালিয়েছে সুমিতা। আর চলে না। তিন মাসের ভড়া বাকী। এ মাসেরটাও তার সাথে যুক্ত হবে। সংসারে সুমিতার কেউ নেই। জানে না, এরপর কি ?

কয়েকদিন পরে হঠাৎ বাড়ীওয়ালার ঘরে সুমিতা কথাপাকথনের আওয়াজ শুনতে পেলো। সবটা শোনা গেল না, তবু যেটুকু শুনতে পেলো, তাতে বোঝার কোন অসুবিধা হলো না যে তাকে এ বাড়ী সত্বর ছাড়তে হবে। কথাবার্তা চলছিল অনুচ্চ কন্ঠেই। সুমিতা উৎকর্ণ হলো। যে ছেলেরা তার স্বামীর সংকার করেছিল, তাদেরই একজনের সাথে কথা হচ্ছিল গৃহকর্তীর।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘরটা আমার খুব দরকার, সাধন, কিন্তু ও তো ছাড়বে না। তিন মাসের ভাড়া বাকী, এ মাসও যাচ্ছে। ও তো দিতে পারবে না ; তোরা একটু দেখ বাবা।

—মাসিমা, ওঁর এই অবস্থা। এখন ওঁকে ঘর ছাড়তে বলা মানেই ওঁকে পথে দাঁড়করানো।

—কি করব বাবা, সে দেখতে গেলে তো আমার চলে না। এই নে ২০০'০০ টাকা। তোরা স্ফূর্তি করিস। ঘরটা শুধু আমার খালি করিয়ে দে।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে সাধন। কোথায় যেন একটা কাটা খচ্খচ্ করে। তবু ২০০'০০ টাকার লোভ ছাড়তে পারে না। শেষে বলে—ঠিক আছে দিন। দেখি কি করতে পারি।

—না বাবা, দেখি নয়। এ কাজ তোমের করতেই হবে। মাসিমার মুখ চেয়ে।

—হুঁ। ১০০'০০ টাকার নোট দুটো বুক পকেটে রেখে সাধন বে'র হয়ে যায়।

সুমিতা গলাখাঁকারি শুনে মুখ তুলে তাকায়। সাধন দরজায় দাঁড়িয়ে। বিস্মিত হয় না সুমিতা। সে তো সব জানে।

—কিছু বলছ?

—হ্যাঁ, আপনি যেতো কোথায় যাবেন বলছিলেন, কাকীমা।

—আমি? না কৈ তো কিছু বলিনি। আমার তিনকুলে কেই বা আছে যে যাবো?

—কিন্তু এ বাড়ী তো আপনাকে ছাড়তে হবে।

—জানি।

—কবে ছাড়ছেন?

—কারখানা থেকে ক'টা টাকা পাবো। পেলেই ছেড়ে দেবো।

—সে জন্য তো কেউ অপেক্ষা করতে পারে না। আপনি এই মাসের শেষে ঘর ছেড়ে দিন, কাকীমা।

—এই মাসের—শেষে—

—হ্যাঁ, বলেই সাধন যেন পালিয়ে যায়। সুমিতার সামনে সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

মাস শেষে ঘর ছাড়তে পারে না সুমিতা। এখনও টাকা ওঠেনি, আর উঠলেই বা সে কতটুকু? তবু ঘর তাকে ছাড়তেই হবে; সুমিতা সে কথা জানে. জানে না ছাড়ার সময় সুযোগ কবে হবে। এই বস্তি, এখানকার মানুষ, ঘরবাড়ী—সব যেন আতসবাজীর মতো শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে আর সুমিতা—সে যেন এক গভীর শূন্যতার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

সুমিতা অমরকুঞ্জ পল্লীতে বাসাভাড়া করেছিল এই ভেবে যে এ পল্লীতে শিক্ষিত মার্জিত ভদ্রলোকের বাস। আর্থিক সংগতি সীমিত হওয়া সত্ত্বে তাই শিক্ষিতা সুমিতা এখানেই বাসা নিয়েছিল। সুনীলের আপত্তি ছিল। সুমিতা কোন আপত্তিই শোনেনি। বলেছিল—খাই না খাই, একটু ভদ্র-ভাবে তো বাঁচতে পারবো। কিন্তু বাসা করার কিছুদিন পরেই সুমিতার ভুল ভাঙতে শুরু করে। সে ভুলের মাশুল আজ তাকে কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হবে।

পরের মাসের ঠিক পয়লা সাধনরা এলো। কোন কথা না বলে, ঘরের সামান্য যা জিনিসপত্র ছিল একে একে বাইরে এনে ঠেলাতে ওঠাতে লাগল। সুমিতা সবই দেখলো, কিন্তু কোন কথা বললো না, প্রতিবাদের ভাষা তার

হারিয়ে গেছে। জিনিসপত্র বের করে দিয়ে সাধনের দল চলে গেলো। ঠেলাওয়ালা হাঁক্‌লো—কাঁহা জায়গা, দিদিমণি? কোন উত্তর দিল না সুমিতা। রাস্তা ছেড়ে ঠেলা একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেলো ঠেলাওয়ালা।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আস্‌ছে। আকাশে একটি একটি করে তারা ফুট্‌ছে। আলো পাশের বাড়ীতে একে একে বাতি জ্বলে উঠ্‌লো। বাড়ীওয়ালা এসে দাঁড়ালো বারান্দায়।

দাঁড়িয়ে রইল সুমিতা। সুমিতার মনে হলো সে এক বিশাল সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে তার অসংখ্য দ্বীপ। সেই অসংখ্য দ্বীপে যারা বসবাস করে, তারা জারোয়া, ওঙ্গী বা ঐ জাতীয় কোন আদিম মানুষ। এক একটি দ্বীপ স্বতন্ত্র—একক। সে দ্বীপে সুমিতাদের স্থান নেই। সেও এতো দিন এমনি একটা দ্বীপে জীবন-যাপন করেছে, সেও এক দ্বৈপায়ণ। দ্বীপচ্যুত সুমিতার সামনে পিছনে আজ শুধু উথাল-পাথাল সমুদ্র। সুমিতার জন্য আজ আর কোন দ্বীপের আশ্রয় নেই। মহাপ্লাবনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সুমিতা এক দীর্ঘশ্বাস মোচন করলো। তাকালো আকাশের দিকে। এই অসীম প্লাবনের বুকে দ্বীপগুলো কেমন যেন রহস্যময়। মানুষ মানুষের সহজ সমুদ্র ছেড়ে একে একে দ্বীপে উঠে গেছে; যে যার নিজের স্বতন্ত্র আশ্রয় তৈরী করে নিয়েছে। এক দ্বীপের মানুষ চেনে না অন্য দ্বীপের মানুষকে। তাদের সামনে শুধু উথাল-পাথাল সমুদ্রের সীমাহীন বিস্তার।

সুমিতা এবার স্বস্তির নিশ্বাস নিল। এই মহাসমুদ্রের বুকে সে আজ ভেলা ভাসাবে। আর দ্বীপের আশ্রয় নয়, অকূল সমুদ্র তাকে ডাক দিয়েছে। সে চায় এই সমুদ্র সমস্ত দ্বীপ ভাসিয়ে একাকার করে দিক। মানুষ আবার ভাসুক মহাপ্লাবনের বুকে।

তারপর এ ওর হাত ধরে আবার নতুন স্বপ্নের দ্বীপ গড়ে তুলুক। সুমিতা প্লাবন-শেষের সেই নতুন দ্বীপের সন্ধানে সম্মুখে এগিয়ে গেলো; পিছনে পড়ে রইল তার দ্বৈপায়ন জীবনের শেষ স্মৃতিটুকু ভাঙা খেলনার মতো।

মর্গে দুখিয়ার সঙ্গে কিছুক্ষণ

উদয় ভাদুড়ী

১০ তারিখ, ডিসেম্বরের দশ, সন্ধের মুখটায় দুখিয়া মারা গেল। দুখিয়া মরবেই, এটা আমাদের জানাই ছিল। শুধু মৃত্যুর সঙ্গে সে কতক্ষণ পাঞ্জা লড়তে পারে সেটাই ছিল দেখবার।

অন্তিম মুহূর্তে দুখিয়ার কাছে আমরা কেউই ছিলাম না। গঙ্গাজল সম্বন্ধে ওর একটা দুর্বলতা ছিল। প্রায় চল্লিশ বছর কোলকাতার যে এলাকায় ওর বসত, ওর এবং ওর ঠেলাগাড়ির স্ট্যান্ড, সেখানে গঙ্গা জীবন-যাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্নান করা, কাপড় কাচা তো আছেই, পানীয় বা রান্নার জল হিসেবেও গঙ্গোদক স্বীকৃত. চল্লিশ বছর কেন, সম্ভবতঃ উনিশ শতকের গোড়া থেকে, যখন স্ট্রান্ড রোড বরাবর বিভিন্ন বাজারের পত্তন হয়েছিল। চুণের আড়ত, চিটেগুড়ের আড়ত, নুনের, তামাকের—চিনির কাঁসের নয়। একটু এগিয়ে গেলেই নিমতলায় কাঠের আড়ত। রাস্তার এদিকটায় আলু পোস্তা, পেঁয়াজ পোস্তা। মাঝবরাবর একটা ট্রামলাইন ছিল আগে, এখন নেই। রাস্তার ধারে ধারে কিছু কাঁপড়ি, মাথা ভাঙ্গা কলে, জোয়ারের জলই প্রচণ্ড তোড়ে উঠতে থাকে ফোয়ারার মত। যদি তেল মেখে, গঙ্গার মাটি মেখে ঘাটে গিয়ে স্নান না হল, তো আন্ডার গ্রাউন্ডের পাইপের গঙ্গাজলই সই। পাইপবাহিত, গঙ্গা তো গঙ্গাহী হ্যায়, দুখিয়া বলত। শেষ মুহূর্তে দুখিয়া যখন বিধ্বস্ত, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে করে আরও কিছু নিঃশ্বাসের জন্য প্রাণপণ আকুপাকু, তখন ওর বেদম হাঁ করা মুখে করেকফোঁটা

গঙ্গাজলের প্রশান্তি হয়ত তার পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তটিতে আমি বা আমাদের কেউ দুখিয়ার পাশে ছিলাম না। ওর দেশওয়ালি রামখিলাওন, সেও একই পেশার—শহরের এই এলাকার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠেলা-ওয়ালা, বিকেলের দিকে আমাদের ঠেলাচালক সমিতিতে গিয়ে মাথা নীচু করে বলেছিল, দুখিয়া আর বাঁচবে না। তার থাকার কথা ছিল, থাকলেও পারত শেষসময়ে, ছিল না।

আমাদের ঠেলাচালক সমিতির সক্রিয় সহযোগী, চল্লিশ বছরের ওপর, শহরে, কলকাতার এ মাথা থেকে ও মাথা ও তার নিজস্ব বৈধ লাইসেন্সযুক্ত ঠেলা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। কখনও এরকম কিছুই ঘটেনি না, শুধু আটই ডিসেম্বর রাত্রে কারা যে এভাবে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমরা অনেক খোঁজ করেও তার হদিস করতে পারিনি।

শহরের এদিকটা সেভাবে দাঙ্গাবিধ্বস্ত না হলেও কয়ক্ষতি কিছুটা হয়েছে। আনসার আলির তামাকের গুদামে আগুন লেগেছে, নন্দুরাম ভুষিওয়ালার চিটেগুড়ের গদিতে বোমা পড়েছে, রাস্তার ওপর, ফুটপাতে রাখা কিশ-তিরিশটা টিন বিস্ফোরণে ফেটে-ফুটে গেছে—রাস্তায় ফুটপাতে গড়াচ্ছে, ওদিককার ছয়-সাতটা দোকানের দেওয়ালে ছিটে পড়েছে।

দশ তারিখ দুপুরেও এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হচ্ছিল, দুখিয়া বাঁচলে বেঁচে যেতে পারে। আমাদেরই একজন বলেছিল, ঠেলাওলার জান, কঠিন জান—এত সহজে যাবার নয়।

দুখিয়া যে অবস্থায় হাসপাতালে এসেছে এবং তারও পরে বারো ঘণ্টার ওপর মৃত্যুর সঙ্গে যুঝে গেছে, তাতে আমরা খানিকটা অবাকই হয়েছি এবং সত্যিই ক্ষীণ আশা পোষণ করতে শুরু করেছিলাম, দুখিয়া হয়ত এ ধাক্কা কাটিয়ে উঠবে। আমরা মনে মনে ওর আঘাতের একটা পরিমাপ করারও চেষ্টা করেছিলাম। বছর সাত আট আগে, চিৎপুরের কাছাকাছি কোনো এক জায়গায় ট্রামলাইনে আটকে পড়া ঠেলার চাকা তোলা যাচ্ছে না। দুখিয়া আর তার সঙ্গী কে ছিল, এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। ঘোর শ্রাবণের কলকাতা, তার চীৎপুর—পিছনে বিশাল এক জ্যামজট অধৈর্য ট্রামের ঘণ্টি, তার পিছনে আটকে পড়া ডবল ডেকারের যাত্রীদের অপ্রাচ্য খিস্তি, বিচলিত দুখিয়া, বৃষস্কন্ধ ছিল সে, ঠেলায় চাকায় কাঁধ লাগিয়ে তিনটন মাল চাপান। ঠেলার চাকায় সমস্ত দম লাগিয়ে ট্রামলাইন থেকে সরে যেতে লড়ে যায়, ভয়ংকর ঠেলায় আহাম্মকী, মর্মান্তিক লড়াই। দুখিয়া পা পিছলায়, ঠেলা সরে যায়, কিন্তু ট্রামের লোহার চাকা দুখিয়াকে হেঁচড়ে নিয়ে যায় অন্ততঃ দশহাত।

দুখিয়া কিন্তু বেঁচে ফিরল। মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটির এই একই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার দিন, ওর দেশওয়ালী দু'তিনজন, সঙ্গে রামখিলওনও ছিল, আমি ওকে রিকিজ করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেবার

পাঁজরের কটা হাড়ে চিড় ধরেছিল। বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটা বাদ চলে গিয়েছিল। মাথার যেখানটা থেঁতো হয়েগিয়েছিল ট্রামের লোহার চাকার পার্শ্বচাপে, সেখানে অর্ধবৃত্তাকারে দশ-বারোটা সেলাই পড়েছিল। এই কদিন আগে শিব চতুর্দশী না কোন পরবে মাথা নেড়া করেছিল দুখিয়া, ওর মাথার পিছনে বাঁদিকের কান ঘেঁষে সেই সেলাইয়ের অর্ধবৃত্তাকার দাগটা এখনও প্রকট দেখা গেছে।

হাসপাতালের ডাক্তার বলেছিল, ধরে নিন ও মরেই এসেছে। নিজে আসেনি, কে বা কারা ওরই ঠেলাতে ওকে চাপিয়ে মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটির হাসপাতালের সামনে ফেলে রেখে গেছে।

বিষয়টা আমি যতই গভীরে ভাবার চেষ্টা করেছি, ততই আমার কেমন অদ্ভুত লেগেছে, সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে। এমন নয়, দুখিয়াকে আমি বিশ বছর ধরে চিনি বলেই দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে, তার হত্যারহস্য নিয়ে আমি আলাদা ভাবে মেতে উঠেছি। দাঙ্গায় খুন, রাহাজানি, অথব লুটপাটের মোটিভ, অন্ততঃ যেখানে লড়াইটা ফুটপাতে প্রকাশ্য রাজপথে অনেকটাই তাৎক্ষণিক মনে হয়। পরিকল্পিত খুনের সঙ্গে এই সাময়িক চাগাড় দিয়ে ওঠা জিঘাংসার সম্ভবতঃ তুলনা চলে না। দুখিয়াকে মেরে, এমন কি রাম মন্দির বা বাবরি মসজিদ কোনো ইস্যুই ঠিক কীভাবে কতটা এগোবে, অন্ততঃ আমাদের এই মেট্রোপোলিশে, তার বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্র—পোস্তায়, বড়বাজারে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

দুখিয়া মৃতই এসেছিল বলা ভালো। কে বা কারা যেন তাকে ভোররাতে হাসপাতালের সামনে তারই ঠেলাতে ফেলে রেখেগিয়েছিল, তারা কারা? রাম সমর্থক, নাকি বাবরি সমর্থক, অথবা এর বাইরে কোনো তৃতীয় গোষ্ঠী, অন্য কিছুর সমর্থক, অথবা সেরকম কিছুই নয়, হয়ত দুখিয়ার রক্তাপ্লুত শরীরের কাছে তার ঠেলা ছিল বলে, তাতেই চাপিয়ে—বেই আন্দক, হাসপাতালের সামনে ফেলে দিয়ে যাওয়ার একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে, হয়ত তারা দুখিয়াকে চেনে অথবা চেনে না, দুখিয়া বাঁচুক, বাঁচার শেষ চেষ্টা করুক। সম্ভবতঃ পুলিশের ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তারা ঠেলাটিকে রেখেই পালিয়ে গেছে। সেই ট্রামের পাইলট আর কনডাকটারদের নিয়ে আমরা বেশ খানিকটা টানাহ্যাঁচড়া করেছিলাম। কলকাতা বলেই কি না জানি না, দুখিয়া, রক্তাক্ত ট্রামের চাকায় খানিকটা থেঁতলে যাওয়া ঠেলা-ওয়ালা তাৎক্ষণিক একটা গণসমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু পথচারী দু-একটা চড়থাপড়, কিলঘুঁষিতে শেষ করলেও, ঠেলাওয়ালাদের সংগঠিত প্রতিবাদে পরবর্তী ঘন্টাতিনেক কলকাতার এই প্রান্তে, হুগলী নদীর অববাহিকার

সমান্তরালে যানজট। সেই জট ছাড়াতে শেষাবধি লালবাজার থেকে একজন ডেপুটি কমিশনারকেও ছুটে আসতে হয়েছিল।

এবারেও পুলিশ এসেছে, বড়বাজার থানার সাব-ইনস্‌পেক্টর পাকড়াশ, এসেছেন প্রায় ঠেলার ওপর শায়িত দুখিয়ার অর্ধমৃত শরীরের পিছু পিছু। ঠেলার ওপর রক্তাপ্লুত দেহটি যে মানুষের, এতদঞ্চলের—দুখিয়া ঠেলাওয়ালার, এটা সাব-ইনস্‌পেক্টর পাকড়াশীর জীবগাড়ীর হেডলাইটের দৈবী আলোতেই ধরা পড়ে।

খবর পেয়ে আমরা হাসপাতালে পৌঁছলে, এক জেনারেল ডিউটি এ্যাসিস্ট্যান্ট, এই হাসপাতালে আমার যাতায়াতের সুবাদে—ওই ঠেলাচালক বা রিক্সাচালক সমিতির তাগিদেই মুখচেনা, বললেন, প্রাণ আছে—তবে আর আধঘণ্টাটাক পার হলেই নাকি সোজা মর্গেই পাঠাতে হত।

দুখিয়া মর্গেই গেল শেষপর্যন্ত, কেবল সে তার প্রাণশক্তিতে, ঠেলার লাগানো জোয়াল টেনে অভ্যস্ত বৃষস্কন্ধে খানিকটা লড়াই দিয়ে গেছে। অসম লড়াই, কিন্তু লড়েছে।

অনেকটা আমাদেরই হস্তক্ষেপে, আমাদের কয়েকজনের মদতে, সমিতির তিনজন রক্ত দিয়েছিল, দুখিয়ার রক্তশূন্য হিম হয়ে আসা শরীর—ডিসেম্বরের পারদ কলকাতাতেও যখন মধ্যরাতে চোদ্দ পনের, তখন খানিকটা উষ্ণতা পেয়েছিল।

ডাক্তার বলেছিলেন, আমাদের তো চেষ্টা করতেই হবে, নাকে অক্সিজেনের নল, একদিকে জীবনের লবণ, অন্যদিকে রক্ত, আমরা রসদ জুগিয়ে যাচ্ছিলাম, দুখিয়াকে যেন বলেছিলাম, রক্তে-রক্তে, এটাই আমাদের লড়াই, অযোধ্যার বিরুদ্ধে লড়াই, বাবরির বিরুদ্ধে লড়াই। আবেগ, হবেও বা।

নার্স বলেছিলেন, গলার জখমটাই মারাত্মক, হেঁসো কিংবা রামদা—নেপালা বা ভোজালি হতে পারে। কাঁধের যেখানটায় আততায়ী নির্মম টেনেছে সেখানে গজ, ব্যান্ডেজ ধরে রাখা শক্ত, কাঁধ ঘেঁষে পশু বলি দেওয়ার—আদলে, শুধু কী করে যে কণ্ঠনালী, আর দুটো জরুরী ভেন বেঁচে গেছে, নার্স আশ্বস্ত করতে চাইছিলেন, দেখুন কী হয়। মধ্যরাতে নগরীর কান্তবে তিনিও লড়ছিলেন সাদা পোশাকে নিঃশব্দ পাদচারণায়, তিনি এবং গোটা হাসপাতালের আহত-নিহত আর তাদের আত্মীয় পরিজন, স্বজনবর্গ আর পুলিশের স্কুটারের সেই ভয়ংকর নৈরাজ্যে একটা কলকাতা, একটা হাসপাতালের কয়েকটা ওয়ার্ডে ধরে রাখতে চাইছিলেন, অকুতোভয় ভালোবাসায়। এমন একটা পরিসর চাইছিলেন যা, আমি দেখেছি অযোধ্যা নয়, রাম নয়, রহিম নয়। অন্য একেবারে অন্যকিছু।

অভ্যস্ত কলকাতাকে দ্রুত ফিরে পেতে চাইছিল সবাই। ধরে নেওয়া যেন,

সামনের বেডে পারিত দুখিয়া ঠেলাওলার গলায় কোপ পড়েছে, অন্য কোনো কারণে। শহরের নৈমিত্তিক খুন 'জখম' ধর্ষণ, রাহাজানির জগতের কাম্য নিরুদ্বেগ তারা খুঁজে পেতে চাইছিল। শহর থাক শহরে, তার নিত্যস্ব ক্ষত ঘা পচন নিয়ে, তাতে অযোধ্যা কেন ?

সাব-ইনসপেক্টর পাকড়াশি, মধ্যবয়স্ক, মাথার চুলে অল্প পাক ধরেছে, হাসপাতালের চত্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, কলকাতায় দাঙ্গা, মানে বুঝতে পারছেন কমুনাল ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হয় আপনার ? লোকজন হানাহানি করবে, খুন জখম করবে শুধু হিন্দু বলে, শুধু মুসলমান বলে ? কলকাতায় ? হয় বলুন ?

জীপে উঠতে উঠতে বললেন, পেশেন্টের জ্ঞান এলেই, আমায় খবর দেবেন, স্টেটমেন্ট নেব, হতেও তো পারে এটার সঙ্গে বাবরির কোনো সম্পর্ক নেই।

গাড়ীতে স্টার্ট দিতে দিতে বললেন, আমার জন্ম কিন্তু এই বাংলায়। পার্টিশানের পর এসেছি। পাকড়াশিকে আমি এর আগেও কয়েকটা উপলক্ষ্যে দেখেছি। প্রকাশ্য দিবালোকে ট্রাক, ভ্যান, ঠ্যালাগাড়ী দাঁড় করিয়ে পয়সা তুলতেও দেখেছি, সিকিটা, আধুলিটা—টাকাটা। আজ এই হাসপাতালে মধ্যরাতে পাকড়াশির ভিতরের সাব-ইনস্পেক্টর মাথা ঝাঁকাচ্ছিল, না এটা অযোধ্যা ইস্যু নয়, রামমন্দির বাবরি মসজিদ নেই এতে—দুখিয়া বা তার ঠেলা কলকাতার অনুষঙ্গ। ডিসেম্বরের সেই দিনগুলি, রাতগুলি বলেই বোধহয় অযোধ্যা ছুঁয়ে যাচ্ছিল শহরের সমস্ত মৃত্যুকে—রাহাজানি আর লুটপাটকে।

এমত অবস্থায় দুখিয়া একবার চোখ মেলে তাকিয়েছিল। ন' তারিখ ভিজিটিং আওয়ার্সে এসে আমরা শুনলাম, বিকেলের দিকে কয়েক লহমার জন্য দুখিয়া চোখ মেলে তাকিয়েছিল, নিষ্পলক। সাব-ইনস্পেক্টর অজিত পাকড়াশি আগের দিন দুজন নামজাদা সমাজবিরোধীকে এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে ভর্তি করে গিয়েছিলেন। গঙ্গার ধারেই কয়েকটা অস্থায়ী চালায় ওরা আগুন দিয়েছিল। পরে আমি শুনেছিলাম, ধর্মত একজন হিন্দু, একজন মুসলমান, একই গ্যাংয়ে অপারেট করে। চালাগুলো অস্থায়ী দোকানঘরের। পান-বিড়ি, চা, পাইস হোটেল, ছেঁড়াছাটকা তামাকপাতার কারবারী সব, লোক-গুলোকে উচ্ছেদ করে ওরা নতুন লোক বসাবার তালে ছিল। অসমর্থিত সংবাদ, পাকড়াশিও বিশদ হননি, কোনও এক স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের মদতেই ওরা নাকি দাঙ্গার রাত্রে, আরেকটি সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু তৈরি করেছিল।

পুলিশের একাংশেরও নাকি সায় ছিল, এই উচ্ছেদে, নতুন পত্তনিতে। কোন্ পড়তি ঠিকা টেনান্সির মালিকের ওই এক চিলতে জমি, বহুদিনই সরকারের কোনো এক ডিপার্টমেন্টের হাতে। বেওয়ারিশ সেই অর্থে, কিন্তু অযোধ্যায় রামমন্দির বা বাবরি মসজিদ হলে যা হয়, আর কি, পাশাপাশি দুই থানার মধ্যেও জ্ঞাতব্য সম্পর্কে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফাঁক থেকে যায়। এখানেও ছিল। অযোধ্যার ছয়ই ডিসেম্বরের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমাজবিরোধীদের পুলিশ চার্জ করে। দুজন এখন এই হাসপাতালে এমার্জেন্সীতে, নিজেদের জ্বালানো আগুনেই একজন পালাতে গিয়ে থার্ড ডিগ্রী বার্নিং ইনজুরি নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। অন্যজন একটু ভালো।

এটা অযোধ্যা বলুন তো, পাকড়াশি জিজ্ঞেস করেছিলেন। এতে মশায়, আপনাদের ভাগজোকের লড়াই, এলাকা দখলের লড়াই, নয় কী? এটা পান মুখে ফেলে, দুবার চিবিয়ে পাকড়াশি বললেন। ফচ্ করে পিচ ফেললেন।

দুখিয়া যখন চোখ মেলেছিল, তখন তা সজ্ঞানে কিনা, ওয়ার্ডের সিস্টার বলতে পারলেন না। তন্দ্রার মত একটা অস্ফুট অবস্থায় বিড়বিড় করে কী যেন বলেছিল শোনা যায় নি। একটু দ্বিধাগ্রস্ত বলেছিল, জয় রামজীবন, বলেনি তো!

নার্সের দেওয়া ওই তথ্যর মধ্যে পাকড়াশি অযোধ্যার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে একটু বিমর্ষই যেন, বললেন, ওতো আপনার সমিতির লোক, ও কী বজরঙ্গবলীর দলের ভিড়েছিল।

সত্যিকথা বলতে কি, বজরঙ্গবলীর দলে ভিড়ে থাকলেও, আমি বা আমাদের ঠেলাচালক সমিতির কেউই তা জানতাম না। চোখ খুলেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়, ধরা যাক দুখিয়ার মত মানুষের চল্লিশ বছরের ঠেলাওয়ালার অবচেতন বলে যদি কিছু থাকে, সেখানে, শ্রীরামচন্দ্র কী এভাবেই আছেন, থেকে গেছেন যে, নাকে অক্সিজেনের নল, গলায় গভীর রক্তাক্ত ক্ষত নিয়ে সে নিমেষের জন্য চোখ খুলে জয়রামজীকা বলেছে? দুখিয়া রোজ গঙ্গা স্নান করত এটা তো সত্য!

এ অবস্থায় মাগো, বাবাগো কিংবা হায় আল্লা প্রকৃতি কাতর উক্তি কেবল দিনগুলো ডিসেম্বরের অযোধ্যা ছুঁয়ে থাকে বলেই কী তা একান্তই সংকীর্ণ, ব্যক্তিগত অবচেতনের সগোত্রতার যা সেক্ষেত্রে গর্ভধারিণী নয়, বাবা নয় উত্তরাধিকারের পরিচিতি বা বংশগতিতে চিহ্নিত হয় চার্লি, নয় শিব এবং সমস্তটাই অযোধ্যা প্রভাবিত, রামচন্দ্র প্রভাবিত। ঠেলাচালক সমিতির অন্যতম পুরনো কর্মী হলেও, আমার কেমন খেল আচ্ছন্নেয়ে মত লাগে নিজেকে।

আমি মনে মনে চাইছিলাম, দুখিয়া আরেকবার চোখ খুলুক, ওর সেই চেনা চোখ সচেতনে, অন্য কিছু বলুক, অন্য কিছু। রাজপথে সমিতির,

মেহনতী মানুষের লড়াই করতে গিয়ে ও গলায় ভোজালি বা নেপালার কোপ খায়নি, যেও ইনক্লাব বলবে, তবুও ও অন্য কিছু বলুক। আমি আশ্বস্ত হতে চাইছিলাম। ও কোনো প্রিয়জনের নাম বলুক, শ্রীরামের নয়, ওর পেয়ারের সেই মেয়েছেলের কথা বলুক, তার নাম ধরে ডাকুক—হলেই বা রানডি, হাড়কাটার গলির কোনো অন্ধকূপ থেকে ছিটকে পড়া মোতি বিবি, তবু একবার চোখ খুলে, ওর তো আপনার জন বলতে এখন মোতিবিবিই, ও মোতিবিবির নাম বলুক, অস্ফুটে।

এমন একটা অদ্ভুত ভাবনা আমার মাথায় কেন এল, জানিনা, স্পষ্টতঃ ধর্মবিষয়ে বা রামবিমুখতা নয়, তবু সেদিনের ওই রাতে রক্তাপ্লুত সংজ্ঞাহীন দুখিয়ার অবচেতনে হাড়কাটা গলির বেবুশ্যের নাম অস্ফুটে তার মুখে আমি শুনতে চাইছিলাম। জয় শ্রীরাম নয়, মোতিবিবি—অবচেতন যাকে ছুঁতে পারে, চেতনা যাকে ছুঁয়েছে এমন একজন স্বজন। যেন দুখিয়া চোখ খুলে হাড়কাটা গলির সেই বেশ্যাটার নাম বললেই কলকাতা স্বাভাবিক হবে।

দুখিয়া চোখ খুলেছিল, আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে একবার এবং সেটাই শেষবার। বিস্ফারিত চোখ মেলে সে গত শতকের শেষদিকে তৈরি এই পুরোনো বাড়ীটার কড়িবরগার সংযোগস্থলে দৃষ্টি স্থির রেখেছিল। সে কিছু বলেছিল কিনা, দশ তারিখে, ডিসেম্বরের দশ সন্ধের মুখটায়, কিছু বলার জন্যই সে চোখ খুলেছিল কিনা কেউ বলতে পারে না। সাব ইনসপেক্টর পাকড়াশিও এসেছিলেন, খোঁজ খবর নিলেন, যদি শেষসময়ে একান্তে কাউকে কিছু বলে থাকে।

মৃত্যুর সময় দুখিয়া তার নির্দিষ্ট বেডে ছিল না। সে ফীমেল ওয়ার্ডে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখটায় মরে পড়েছিল। বিস্ফারিত চোখে, কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে, তার কটাক্ষে চোখের মণি প্রায় ঠেলে বেরিয়ে আসছে, সে শেষবারের মত কোলকাতার বাতাস বুক ভরে নিতে চেয়েছিল।

আসলে ন তারিখ কোনো একসময়ে আমরা শেষবার ওকে দেখে আসার পর, অথবা দশ তারিখেই দুখিয়াকে লোহার বেড থেকে, তোষক-রক্তাক্ত চাদর, বা বুকফাটা তাকে সাময়িক স্বস্তি দিয়েছিল নির্ঘাৎ—দুখিয়া তার চওড়া পিঠটাকে পুরোপুরি বিস্তৃত করে দিতে পেরেছিল, কোনো একসময় মেঝেতে দুটো কম্বল পেতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। দোতলায় ফীমেল ওয়ার্ডে ওঠার সিঁড়ির মুখটায় দুখিয়া কতক্ষন ছিল, আমার জানা নেই। আমরা সেদিন শান্তি মিছিল, স্থানীয় জনসংযোগ ইত্যাদিতে ব্যস্ত ছিলাম বলেই বিষয়টা আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওপর দোষারোপ করা সম্ভবতঃ ঠিক হবে না। এমনিতেই জনাকীর্ণ এতদঞ্চলের এই হাসপাতালে লোহার যে কটি বেড আছে,

তাতে স্থান সংকুলান হয় না। সারা বছরই বেশ কিছু রোগীকে কম্বল পেতে ভূমিশয্যা নিতে হয়। আর ডিসেম্বরের নয় তারিখ অথবা দশই, সারাদিন তো আপৎকালীন অবস্থা।

আমাদের কেউ দুখিয়াকে আবিষ্কার করে, হাসপাতালের দোতলার সিঁড়ির একপাশে জীবিত না মৃত ঠাহর করতে সময় লাগে একটু। তারপরই সে তুলকালাম শুরু করে। দুখিয়া মৃত, সে সিঁড়ির ওপরে প্রায় তিনতলা সমান উঁচুতে কড়িবরগার সংযোগস্থলে বিস্ফারিত চোখ মেলে, মরে কাঠ হয়ে আছে।

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছাই তখন রাত প্রায় আটটা, দুখিয়া সেভাবেই সিঁড়ির মুখে। গলার কাছে গভীর ক্ষত কোনোমতে চাপা দেওয়া হয়েছিল, রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঘাড়ের একপাশ থেকে বুকের অনাবৃত খানিকটা অংশ পর্যন্ত চাপচাপ পাঁশুটে। আর সেই রক্তে গায়ের চাদর এমন সেঁটে রয়েছে যে, বেশ হ্যাঁচকা টানে চাদরটা খুলে না নিলে, চাদর টেনে দুখিয়ার মুখ বিস্ফারিত চোখ চাপা দেওয়া যাচ্ছিল না।

আমরা ঠেলাচালক সমিতির কয়েকজন সদস্য দুখিয়ার দেশোওয়ালী ভাই রামখিলাওন হাসপাতালে পৌঁছবার পর, কিছু কাগজপত্রে সইসাবুদ করে দুখিয়াকে মর্গে পাঠানো হল।

সমিতির তরফ থেকে আমরা একটা বড়সড় মালা দিলাম। এসব ক্ষেত্রে যে ধরনের মালা দেওয়া হয় তেমন ধরনেরই মালা। পুলিশ থেকে বলা হয়েছিল মর্গ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মালা দিতে; কিন্তু সেটা নিয়ে অনিশ্চিয়তা থাকার জন্য, কখন দুখিয়ার শব কাটাছেঁড়ার পর ছাড়া পাবে—আজ রাতে না কাল সকালে, আমরা সলাপরামর্শ করে মালা দিলাম।

আমরা অবশ্য হাসপাতালে ইনকিলাব বলতে পারিনি, দুখিয়া তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলবনা জাতীয় কিছু বলিনি। ম্যাটাডোরে চাপাবার সময় শুধু কয়েকজন হরিধ্বনি দিয়েছিল।

আর সম্ভবত আমিই, ঘণ্টাখানেকের এই দমবন্ধ করা সময় অতিক্রম করে পুলিশকে বলেছিলাম, পাকড়াশি নয়, অন্য একজন কনস্টেবল, ওর চোখের পাতাটা নামিয়ে দেওয়া যায় না? একটু দিন না। কনস্টেবলটি ইতস্ততঃ করে চেষ্টা করেছিল, দুখিয়ার চোখ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। দুখিয়া এবং সঙ্গে আরও দুজনের দেহ নিয়ে ম্যাটাডোর গাড়িটা মর্গে চলে গেল। সমিতির লোকেরা হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই যে যার ঘরে ফেরার রাস্তা ধরল। নিরাপত্তা বোধের অভাবে, অজানিত আশঙ্কায় তাদের বড় দুর্বল লাগছিল। তারা খিল আঁটা ঘরের নিরাপত্তায় আপন মহল্লার আপনজনের কাছে ফিরে যেতে চাইছিল। আমি বাধা দিলাম না, মর্গে কিংবা

আমার নিজের ডেরায়, নতুন বাজারের কাছে একটা ঘরে যেখানে আমি থাকি, কোথায় ফিরব ভাবতে ভাবতে আমি হাঁটতে শুরু করলাম।

রাস্তায় একটু শিশির পড়েছে। আমার ডানদিকে হুগলী নদীর রাত দশটার, ডিসেম্বরের শিশির-ভেজা হাওয়া। রাস্তায় যান চলাচল বড় একটা নেই, এখান থেকে মেডিকেল কলেজ আমি বহুবার হেঁটেই গেছি, একটু এগিয়ে গিয়ে কিছুটা জায়গা মুসলমান এলাকা বলে চিহ্নিত। সংশয় যে একেবারে ছিল না, তা নয়—তবু হাঁটতে শুরু করলাম।

আমার পাশাপাশি সহসাই একটা ছায়া, এখন যেন তার শ্বাস পড়ছে আমার পিঠে। আমি বললাম, কি রে, দুখিয়া? দুখিয়া বলল। জয় রামজীকা।

একটু পরেই আসলমের সঙ্গে দেখা, আসলম কি মারা গেছে? শুনেছিলাম ওর আড়তে নাকি আগুন লেগেছে। আসলাম নিঃশব্দে খানিকটা হাঁটে, এমন যে পা চলার শব্দ হয় না। খুদা হাফিজ বলে, সে চিৎপুরের এই ট্রাম লাইন যথার্থ ভাবে রবীন্দ্র সরণি বরাবর নাখোদা মসজিদের দিকে চলে গেল। চলতে চলতে আমি মুসলমান মহল্লা পেরিয়ে গেলাম।

দুখিয়া এতক্ষণ কোথায় ছিল? মহল্লা পেরতে গিয়ে আমি কিছু ভীত-ত্রস্ত চোখ দেখেছি। গলির মুখে মুখে চাপা জটলা শুনেছি। নিজের জন্য ভয় করিনা, কিন্তু এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজে দুখিয়া জয় রামজীকা বললেই তো ইস্যু এসে পড়ে—অযোধ্যার রামমন্দিরের, বাবরি মসজিদের। আসলমকে সতর্ক করা দরকার ছিল, ছোট আড়তদার—তোমার ব্যবসা দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুমি খুদা হাফিজ বলবে না।

দুখিয়া বলল এবার রামনবমীতে ছাপড়ার দল আসবে, সমিতি থেকে দুশো টাকা চাঁদা লাগবে বাবুজী।

ছাপড়া দুখিয়ার নিজের জেলা। গত নির্বাচনে, ও আর রামখিলাওন উদ্যোগ নিয়েই ছাপড়ায় দল আনতে পারেনি। সেবার তিনদিন রামধুন হয়েছিল। চারদিনের মাথায় নির্বাচনী প্রচার। রামের সুবাদে আমরা ভোট কতটা পেয়েছিলাম জানি না, তবে রামায়ণ গানের ব্যবস্থা তাও একেবারে খাস-তাদার দেহাতি গায়কিতে সমিতিই যে করেছিল এটা ঠিক। আর সমিতির পৃষ্ঠপোষক যে রাজনৈতিক দল, বামপন্থীই অবশ্য, তাদের ভোটের দু দুটো মিটিং তো রামায়ণের মঞ্চে গান শুরু হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগেই করতে হয়েছিল— বলা ভালো জনসমাগমের জন্য, হয়ত বা ভোটের জন্য। কোলিয়ারি থেকে আমাদের যে নেতা এসেছিলেন, তিনি তো সরাসরি বিরোধীপক্ষকে আর আমাদের দলের নেতাকে রামের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন; দেহাতী হিন্দিতে। সভায় ধ্বনি উঠেছিল জয় রামজীকা, জয় বজরঙ্গবলী।

দুখিয়া আমার সঙ্গে ছায়ার মত হাঁটছে। ফিসফিস করে কথা বলছে

দুখিয়াই তো ? কথা বলতে ওর কষ্ট হচ্ছে, আমি বুঝি। হাত বুলিয়ে দেওয়ার উপায় নেই, কণ্ঠনালীর কয়েক চুল তফাতে সেই গভীর ক্ষত থেকে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে, কলার বোনের ওপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে বাঁদিকে বুকের ওপর নেমে আসছে। চোখ একইভাবে বিস্ফারিত, এখন পচা মাছের চোখের মত বর্ণহীন চোখের কটাশে মণি দুটো এই যা। যেন এক ভয়ংকর অন্ধ প্রখর দৃষ্টিতে দেখছে, আমি ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠলাম।

দুখিয়া বলল, আসলমদের চাঁদা নিয়ে তুমি যে মুলুকে মজলিশ করলে, হাদিস হল কুরান হল—মিউনিসিপালিটি ভোটে আমাদের রামায়ণটা বাদ দিলে বাবু ?

এটা সত্যিই, ওই মহল্লাটা, যেটা আমি একটু আগে পার হয়ে এলাম, আসলমই পার করে দিল, চেয়েছিল—শুধু ভোটের মিটিং করলে লোক হবে না কমরেড, বলেছিল, একটু মজলিশ হক, হাদিস, কোরান আসুক—মৌলবী আসুক। বক্তারা বলুক হজরত, শেষ নবী সমাজতন্ত্র চেয়েছিল। আশ্চর্য, খিদিরপুর আড্ডা থেকে আসা আমাদের বক্তা তাই বলেছিল। আমরা ভোট কি পেয়েছিলাম জানি না। আমার অবচেতনে এখন রক্তাক্ত দুখিয়ার পাশা-পাশি, বিশেষ ও যেভাবে চোখ মেলে আছে, হাঁটতে হাঁটতে আমি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে আমার এবং আমাদের দলের সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম একটা যোগসূত্র খুঁজে পাই যেন, শ্রীরাম কিংবা হাদিসের উপযোগী ব্যবহারে।

আর এই অবস্থাতেই দুখিয়া অদৃশ্য হয় সহসাই। হঠাৎ যেন বুঝি ছায়াটা ছিল, এখন নেই। আমি তখন মেডিকেল কলেজের কাছে, মর্গের প্রায় সামনে।

ঠেলাসমিতির আমার সহকর্মীদের শ্বাস-প্রশ্বাসে রাম আছে, বজরঙ্গবলী —গলা টিপে তা তাদের ভিতর থেকে বার করি কী করে? যেটা আছে সেটাকে ওই জিনবাহিত, ডি. এন. এ অনুষঙ্গে রাম তাকে রাজনীতির আঙিনা থেকে ভোটবাক্সের গণতান্ত্রিক লীলাখেলা থেকে সরাই কী করে? ধর্ম জনতার আফিঙ এবং আফিঙ বড় খারাপ বস্তু বলাতে রামখিলাওন তো একবার বলেই ফেলল, আফিঙ বহুত বড়িয়া চীজ। ওর বড় বাবা অর্থাৎ ওর ঠাকুর্দা রোম নাকি বেশ খানিকটা আফিঙ গুলির মত পাকিয়ে খেত, তার সঙ্গে পুসের দুধ নয়ত দু পোউয়া মালাই খেত। ওদের মহল্লায় ওর বড়বাবা ডাকসাইটে পালোয়ান ছিল।

মর্গের সামনে অত রাতেও আট-দশজন পুলিশের একটা গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম, দুখিয়ার দেহ মর্গের মেঝেতে শোয়ানো আছে। ডাক্তার আজ রাতেই আসবেন। নাকি কাল সকালে ছুরি ধরবেন, এ নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল।

আট-দশজনের ছোট জটলার মধ্যে থেকে, আমি মর্গের সামনের বারান্দার একপাশে, একটু দূরেই কে যেন এগিয়ে আসছে। মাথায় অনেকটা করে ঘোমটা টানা, স্ত্রীলোক। মুখ দেখা যাচ্ছে না বলে, অধিকন্তু চারপাশের আলোগুলো এমন টিমটিমে, আমি চিনতে পারছি না।

মহিলাটি প্রায় আমার সামনে, এমন যে তার ছোট্ট ছায়া আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, একটু লক্ষ্য করলে আদলটা যেন চেনা যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কিছু বলবেন।

সে বলল, হামার নামটো মতিবিবি, হাপুনে কী পহচানবে ?

মতিবিবি—দুখিয়ার ঠেলাকেন্দ্রিক সংসারে তিনচার বছরের ঘরণী। আমি তো দেখেওছি। পোস্তার কিছু দোকানের সামনে পেঁয়াজ বাছে, রসুন বাছে—বাতিল পড়তি কিছু পেঁয়াজ, রসুন নিয়ে স্ট্রান্ড রোডের পাশে ফুটপাতে বসে।

বছর পাঁচেক আগে এক শীতের রাতে, লাইসেন্স প্রাপ্ত ঠেলাটাকে ফুটপাতে এক অদ্ভুত কায়দায়, দুখিয়ে যখন ঠেলার নীচে ঘুমোয় তখন প্রায়ই সেই কায়দায় ঠেলাটাকে একটা চারচালার চেহারা দেয়, দুখিয়া ঘুমোচ্ছিল। একটু দূরে ছোট করে একটা আগুন করা হয়েছিল। ঠেলার ওপর, শীতের হিমশিশির থেকে বাঁচার জন্য একটা কালো পলিথিন সামিয়ানার মত, ঠেলার নীচে কম্বল দিয়ে আপাদমস্তক মুড়ে দুখিয়া ঘুমোচ্ছিল। সেইসময়, রামখিলাওন রামকসম বলেছিল—সে দেখেছে ওই মাগীটা, রান্ডীটো ঠেলার নীচে ঢুকেছে। সরম কী বাত, তারপর কী হয়েছে, রামখিলনও দেখেনি।

কিন্তু মোতিবিবি থেকে গেছে, ফুটপাতের ওপর পেঁয়াজ রসুনের সওদা নিয়ে, মাঝে মাঝে বড় একাকীত্বের রাতে, অতীব অসহায় মুহূর্তে পোস্তাও যখন শুনশান, ফুটপাতে ঠেলার নীচে মানুষ মগ্ন ঘুমে বা হয়ত স্বপ্নে, মোতিবিবিও থেকে গেছে, কয়েকঘণ্টা দুখিয়ার পঞ্চাশোর্ধ বৃষস্কন্ধ শরীরের উত্তাপে।

মোতিবিবি বিধর্মী এটা জানার পর ওর দেশওয়ালী কয়েকজন আতঙ্কিত হয়, পঞ্চায়েত ডাকে এবং দুখিয়াকে জানায় কলকাতায় কিছু না হলেও দেশে তার হাল বহুত খারাপ হয়ে যাবে।

দুখিয়া কবে কলকাতা এসেছে, সে নিজেও তা বলতে পারে না। শুনেছি, ছেচল্লিশের দাঙ্গা নাকি সে দেখেছে. তব হুখনে বহুত ছোটা থা। তারপর এই শহরে কোথায় বা মা, কোথায় বাপ, দুখিয়া কীভাবে ঠেলাওয়ালা হয়, লাইসেন্স পায়—তার ইতিবৃত্ত তার দেশওয়ালি অনেক ভাইয়ের মত। দুখিয়া দু দুবার বিয়ে করেছিল। প্রথমটা ফুটপাতের ধকল সহ্য করতে পারেনি, কলেরায় মারা গেছে। দ্বিতীয়টি ভেগে গেছে এক ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে।

বছর কয় হল মোতিবিবি এসে জুটেছে। হাড়কাটা গলির অনেক ভেতরে মতিবিবি যেখানে ছিল, শুনেছি সেখানে খুব সামান্য হলেও দুখিয়ার যাতায়াত ছিল। সে তো অনেকেরই ছিল। কিন্তু দুখিয়াই কেবল কোনো এক সকালে লোটা হাতে গঙ্গাস্নানে যাবার সময় বিধ্বস্ত মোতিবিবিকে দেখে। কোঠিতে সে ফিরায়া দিতে পারে নি, তার তার গালে, ঠোঁটের পাশে শ্বেতীর চিহ্ন দেখা দিয়েছে, কেউ বলেছে কুঠ—কুষ্ঠ। মোতিবিবি পোস্তার ফুটপাতে দিকভ্রান্ত বসে থেকেছে।

দুখিয়াই তাকে ঠেলা দেয়, জয় রামজীকি। দেহাতী সুরে দুখিয়া বড় ভালো রামায়ণ গাইত।

ডাক্তার এসে গেছেন। যেহেতু হত্যা তা অযোধ্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে হলে, তাঁকে ছেঁড়াকাটা করতেই হবে। মৃত্যুর কারণ বলতে হবে, যা একান্তই শারীরিক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিরা-উপশিরা সংশ্লিষ্ট। শরীরের বাইরের, যা মৃতের অ্যানাটমির বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না, তা মর্গের কাটাছেঁড়ার হিসেবের আওতায় পড়ে না। ক্ষত দেখে বলা শক্ত কোন্ সম্প্রদায়ের মানুষ দুখিয়ার ওপর এমন মর্মান্তিক আঘাত হেনেছে।

ঘাতক হিন্দুও হতে পারে, মুসলমানও। সম্ভাবনাটা সাব ইনস্পেক্টর পাকড়াশিও উড়িয়ে দিলেন না। দুখিয়া লাইসেন্স প্রাপ্ত চল্লিশবছরের ঠেলাওয়ালা। স্বভাবতই ঠেলাচালকদের পক্ষেও সেই মুখিয়া। লাইসেন্স-বিহীন ঠেলাওয়ালাদের একটা চাপা অসন্তোষ আছে, দুখিয়া বা তার মত কিছু পুরনো ঠেলাচালকদের ওপর। গতবছর ঠেলার ওপর একটা সরকারি সমীক্ষায় দুখিয়া, রামখিলাওন আরও কিছু পুরনো ঠেলাওলা তো খোলা-খুলিই আর্জি জানিয়েছে, তারাই একমাত্র ঠেলাচালানোর হকদার, কারণ তাদের লাইসেন্স্ আছে। সরকারের, করপোরেশনের বৈধ কাগজ যাদের নেই কলকাতা থেকে ঠেলা উচ্ছেদ হলে, তাদের ক্ষতিপূরণ পাওয়া উচিত নয়, এই ছিল ওদের বক্তব্য। এ নিয়ে দুখিয়ার আমার বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল। কারণ, আমাদের সমিতিতে সব ঠেলারই যে বৈধ লাইসেন্স আছে, একথাটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারব না।

মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল—ঠেলা সম্পর্কিত এই ক্ষোভ তো অযোধ্যাকে পেছনে রেখে আত্মপ্রকাশ করতেও পারে। লাইসেন্সবিহীন ঠেলাচালকদের মধ্যে দেহাতী হিন্দু-মুসলমান দুইই আছে। কিন্তু তারা তো কমবেশি দুখিয়ারই সহোদর, কাজের সূত্রে কলকাতার একই রাস্তার ঠেলাচালকের সূত্রে, পুলিশ আর করপোরেশনের নানা কর্মচারির সূত্রে, প্রায় একই মাটিতে দাঁড়িয়ে, লাইসেন্স নিয়ে বা না নিয়ে। তাহলে কী লাইসেন্সের গোটা ব্যাপারটার পিছনেও এক কুৎসিৎ দলীয় রাজনীতি ঢুকে

পড়ছে, তার হাতিয়ারে শান দিয়েছে অযোধ্যা? আমি উত্তেজিতভাবে মর্গে ঢুকে গেলাম।

মর্গের মেঝেতে দুখিয়ার দেহ প্রায় নগ্ন, কিন্তু দুখিয়ার বিস্তারিত দুই চোখ একইভাবে খোলা। ডাক্তারকে বললাম, আপনি ওর চোখের পাতা দুটো একটু নামিয়ে দিন না। বাইরে খোলা আকাশের নীচে, এই মধ্যরাতে ডিসেম্বরের কনকনে হাওয়া, কয়েকজন লোক এসে নতুন করে ঢুকল। আমি মর্গেতে সামনের আলোটা থেকে চোখ আড়াল করে, একটু পাশে অন্ধকারে সরে গেলাম। আমার বমি আসছিল মর্গের মধ্যে বাসি-পচা-গলা মৃতদেহের গন্ধে, ক্ষুধায় আমার পেটের মধ্যে পাক খাচ্ছিল, কপালের শিরা দপদপ করছিল।

দুখিয়া আমার পাশে নিঃসাড়ে কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, গরমিট সব ঠেলা কেড়ে নিলে হামাদের কী হোবে বাবু? লাইসিন যাদের নেই, তাদের ভী হাপনে, সমিতি মদত দিবে, এঠো ঠিক নেই বাবু—

দলের জন্য, মানে সমিতির জন্য সবই করতে হয় দুখিয়া, তাছাড়া যে ঠেলা-চালাচ্ছে, লাইসেন্স না থাকলেও সে তো ঠেলাই চালাচ্ছে। সেবার ঠেলা উচ্ছেদ অভিযানে দুখিয়ার ঠেলাও আটক হয়েছিল। দুখিয়া অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সে ঠেলা উদ্ধার করেছিল। ঠেলাতে ফুলের মালা চড়িয়ে, চন্দন আর সিঁদুরের টিপ দিয়ে সমিতির অফিসে এসে হাঁক দিয়েছিল, জয় বজরঙবলী, জয় রামজীকী।

মার্কস-লেনিন প্রত্যাশিত নয় সেভাবে দুখিয়া বা তার দেহাতী ভাইদের কাছে। পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে দেখে আমি তাকে রামজীর ব্যাপারটা একটু সমঝে চলতে বলেছিলাম। দুখিয়া বলেছিল, সমিতি ভী থাকবে, রামজী ভী থাকবে।

এই সহাবস্থান বড় ঠুনকো বোধ হল। মর্গে দুখিয়া খোলা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে আমাদের সমিতিরই কেউ, দুখিয়ার ঠেলাটার নিশ্চিত অবস্থান যে জানে, দুখিয়া যে ওই ঠেলার ওপরই হিমরাতেও খোলা রাস্তায় শুয়ে থাকে, ঘুমোয় যে জানে—তেমন কেউ যদি ঘাতক হয়ে থাকে? দুখিয়ার চোখ কী সেজন্যই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে ওভাবে বিস্ফারিত? সে কী তাকে চিনেছে? সে কী মুসলমান বাবরি-মসজিদ ভেবে, অথবা হিন্দু রাম-মন্দির ভেবে?

দুখিয়া হিন্দু নেহি আছে, মোতিবিবিকে ও ঘরে তুলেছে।. ওরই দেহাতী জাতভাই বলেছে, আমি বললাম ঘর কোথায়, ও তো ফুটপাত। ফুটপাত আর ঘর এক হল?

দুখিয়া হয়রোজ মোতিবিবির হাতে খানা খাচ্ছে। সে তো কলকাতার ফুটপাতে অজস্র চায়ের দোকান, পাইস হোটেল, ছাতুর দোকান, তোমরা সবার জাত জান?

দুখিয়া কী তার মৃত্যুর কারণ জানত? শেষ মুহূর্তে ঘাতক তার নেপালা বা ভোজালিতে যখন চরম আঘাত হানতে উদ্যত—দুখিয়ার কাছে তখন কি স্পষ্ট হয়েছিল, এ আঘাত কী জন্য, সে হিন্দু বলে, জাতিভ্রষ্ট হিন্দু বলে, অথবা সে এখানকার বাঁধাধরা রাজনীতিরই আরেক শিকার, সে জানতেও পারেনি অযোধ্যা ইস্যু তার মৃত্যুকে অন্য এক মাত্রা দিয়েছে।

দুখিয়া খোলা চোখে আমার মুখোমুখি। আবছা আলোর গলার ক্ষত থেকে কালো পাঁশুটে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। বিস্ফারিত চোখ থেকে পচা মাছের বিবর্ণ চোখের মণিটা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। আমি চীৎকার করে মর্গের দরজায় ধাক্কা দিলাম। আমার ভয় হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমার কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ, লক্ষ্ণৌয়ের সাদা পাতলুনে কিংবা পাঞ্জাবিতে রক্তের দাগের ছিটে লেগে আছে, আমিও কী খুন করে থাকতে পারি, পারি না কি?

ডাক্তার, আমি সকলকে সচকিত করে আর্তনাদ করে উঠলাম, ওর চোখের পাতা দুটো নামিয়ে দিন। কতক্ষণ ও এভাবে তাকিয়ে থাকবে। সাবইনস-পেক্টর পাকড়াশি বললেন, আপনি বাইরে আসুন, আপনার জামা-কাপড়ে রক্তের ছিটে সবাই দেখতে পাবে।

আমি দেওয়ালের দিকে, একটু অন্ধকার কোণের দিকে সিঁটিয়ে গেলাম। আমার পিঠে হাত রাখল মোতিবিবি।

আর তখনি পূব আকাশে আলোর উদ্ভাস, পরিচিত পাখ-পাখালির ডাক। গঙ্গার দিক থেকে ভেসে আসা সকালের হাওয়া মর্গের ভেঙে পড়া জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল হুড়মুড় করে। একটু অন্যরকম, তবু একটা সকাল হচ্ছে।

মোতিবিবির মুখ থেকে ঘোমটা সরে গেছে, নাকের পাটার পাশে দু আঙুল প্যাচ এখন সকালের নরম আলোতেও স্পষ্ট। ওপরের ঠোঁটের এক-পাশও যেন গলতে শুরু করেছে।

মোতিবিবি বলল, 'হাপনেরা যান বাবু, হামি আঁখ বুজিয়ে দিচ্ছি।

কয়া কয়া পাঁচটা আঙুল প্রসারিত হল, সূর্য খানিকটা আকাশে উঠে এল যেন। পরিচিত কলকাতার ট্রামবাসের শব্দে, ঠেলার শব্দে শহর জেগে উঠছে।

মোতিবিবি টেবিলে শোয়ানো দুখিয়ার দেহের দিকে এগিয়ে গেল।

দুখিয়ার বিস্তারিত চোখের ওপর সে বড় মমতায় আঙুল কটা নামিয়ে আনল। কোঁকড়ানো গলে যাওয়া নখহীন অমানবিক আঙুল কুষ্ঠগ্রস্ত।

আমি দরজার দিকে ফিরে চললাম। শেষ সময়ে দুখিয়ার একান্তে মোতি-বিবিকে ছেড়ে দিয়ে।

বাড়ী গিয়ে প্রথম কাজই হবে জামা-কাপড় থেকে রক্ত ধুয়ে তোলা। কার রক্ত কীভাবে কখন লেগেছে কে জানে? আজ দুপুরে কোথাও আর যাব না, ঘুমোব। বড় ধকল গেছে কটা দিন।

আমার চোখ খুলতে অসুবিধে নেই, কেমন যেন মনে হচ্ছিল, মোতিবিবি আঙুল ছোঁয়ালেই দুখিয়ার চোখের পাতা নেমে আসবে। কলকাতা স্বাভাবিক হবে।

প্রার্থনা

অরুণ মিত্র

অপেক্ষার সময়ের মধ্যে রয়েছি। রাত্রি তুমি তাপের
বলয় জুড়ে আগলাও এই ভাঙাচোরা ঘরটাকে। আমার
চোখে হিমছায়া ছড়াও শীতঘুম ঢালো। দুজোড়া
পাতা বন্ধ হোক। দিনের দাপতাল আমাকে ঘিরে
চৌদুন বনবন, কাঁচগুঁড়ো ওড়ে, ধুলো ওড়ে। অপেক্ষার
ভেতরে রয়েছি, আমার চোখ দুটোকে বাঁচাও আমি
সেখানে রেখেছি আমার প্রেম আলতো মুঠোয়
এক পাখির ছানা যেমন। আমার চোখ বাঁচাও
রাত্রি যাতে নিশ্চুপ ঘুমের পর দেখতে পায়
রোদের পরব।

পাখিদের শ্বাপদের কাছে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

পাখিদের কাছে আমাদের কোনো জিজ্ঞাসা নেই।
তারা বড়ো নিষ্কলুষ,
কিছু চাইলেই হয়তো অপ্রতিভ হয়ে পড়বে।

শ্বাপদের কাছেও মানুষের কোনো প্রত্যাশা নেই।
হিংস্রতা তাদের নখরে,
বিষ প্রত্যেকটি প্রবল থাবায়;
ধারালো জিহ্বায় জমে আছে রক্তের স্বাদ,
দূর নিরাপদ গন্ডীর ওপার থেকে
মন্দ লাগে না দেখতে।

অথচ মানুষ চারদিকে,
প্রতিবেশী আলিঙ্গন প্রীতি আর ভালোবাসা
এসবের স্পর্শ কে না চায় ?
একালে বৈরিতা যতো মানুষে মানুষে অবিরাম,
পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার স্বপ্নগুলি
দীর্ণ হয়ে যায়।
কী জিজ্ঞাসা আছে পাখিদের শ্বাপদের কাছে ?

আস্থা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আমি একটা সুন্দর স্বপ্নকে সযত্ন পুষেছিলুম বুকের খাঁচায়
আর আদর করে নাম রেখেছিলুম, আস্থা।

কত তাকে দানাপানি যুগিয়েছি পোষ মানানোর, পাখিপড়া শিখিয়েছি ঃ
ভালোবাসা ভালোবাসা
আর এলোমেলো ধুলোর ঝাপ্‌টায় টলমল খাঁচায় ঝট্‌পট-ঝট্‌পট আস্থা।

একটা উত্তাল জীবনমরণ-সমস্যার তরঙ্গে চেয়েছিলুম মাথা জাগিয়ে রাখতে
আর বুক ভরে নিশ্বাসের শব্দে কথা বলে উঠেছিলুম ঃ আস্থা।

মৃত্যুর মতো ভারি এক বিভ্রান্তির চাকায় যাচ্ছিলুম বারে বারে থেঁতলিয়ে,
আর নির্বান্ধব অন্ধকারে খুঁজে ফিরছিলুম তোমার হাত, আস্থা।

তুমি। তুমি আমায় মুড়ে নিলে ফুলপাখি-আকাশবাতাস-কোলাহল
নৈঃশব্দ্যের তবকে
আর হাত ধরে পৌঁছে দিলে ধসে-পড়া সদর অন্দর পার কন্দরের রাস্তায়,
আস্থা।

বাড়ি বদল

কৃষ্ণ ধর

হঠাৎই হয়ে গেল তার বাড়ি বদল
প্রতিবেশীরা কেউ জানতেও পারেনি

আগের দিনও যথারীতি বাজার দরদস্তুর ও কুশল সংবাদ বিনিময়
পার্কের বেঞ্চিতে এক সঙ্গে ওঠা-বসা, বেড়ানো সময় সময়
অথচ তিনিই কাক এসে ঠোকর দেবার আগেই
টেম্পোতে জিনিসপত্র তুলে হাওয়া।

এসেছিলেনও আচমকা কোথায় কোন দূরে প্রবাস থেকে
এখানেই থাকবেন বলে স্থির করেছিলেন
অথচ তিনিই পশ্চিম থেকে পুবে এসে আপাতত দক্ষিণে
ছিল কি কোনো অভিমান অথবা গভীর বেদনাবোধ?
একা একা রাতে বেড়াতেন ছাদে।
নিঃসঙ্গতা তাকে সঙ্গ দিত সারাক্ষণ
কোনো স্লোগানে বিচলিত হতেন না তিনি
স্বচ্ছতার ঝরোকা দিয়ে দেখতেন তারই মতো
এক নিঃসঙ্গ নীলিমায় আক্রান্ত সময়ের দিগন্ত।

এখন কোথায় গেলেন তিনি কোন দক্ষিণে?
সেখানেও তো জনপদ, প্রতিবেশী এবং রাস্তার মানুষ
ঠিকানা বদল হলেই কি বাড়িবদলের স্বাদ পাওয়া যায়?
আবহমানের অভিমান বুকে নিয়ে বাঁচে যে শহর
তার প্রতিটি পাথর খুঁজলে পাওয়া যায়
এমনি কতশত বাড়ির ঠিকানা
বর্ষার জল এসে তাদেরও একদিন ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়েছিল
পশ্চিম থেকে পুবে তারপর উত্তরে দক্ষিণে
এইভাবে জনপদ তার ইতিহাসের বিস্তৃতির পরিধি বাড়ায়।

নিয়ত সংবর্ত থেকে

রাম বসু

সব হাড় ঘুমিয়েছে ধুলোয় প্রান্তরে
ঘাসের গোড়ায় পরম নিশ্চয় ভেবে পতঙ্গেরা নিয়েছে আশ্রয়
আকাশ আলগা করে উঁকি দিয়ে বন্ধ করে সমস্ত দরজা
এখন পরম ভয় সমুদ্রকেও স্তব্ধ করে দেয়
নৈঃশব্দ্য তর্জনি নেড়ে পাহাড়কে ইংগিতে বলে—পালা
পুরাণ-কথিত সেই চরিত্রের মত সময়কে ছিঁড়ে খাবে স্টীলের সময়।

বিশৃঙ্খলা চিরকালই থাকে। নিয়ত সংবর্ত থেকে ভারসাম্য ও গৌরব
যদিও তা সাময়িক। আবার সংবর্ত। এরই মধ্যে প্রজ্ঞা মেলে করুরেখা
পৃথিবীর পথ ঘাট থেকে কুড়িয়ে ইচ্ছার শব স্তোত্র পাঠ করে।

জ্বলন্ত ভাবনাগুলো মানুষের হৃদ্‌স্পন্দনের সাঁকো
যদিও আবার সর্বনাশের স্বভূমি মানুষ হায়নার চেয়েও চতুর
গাধার চোয়াল ধরে কত আদর ও সোহাগ করে গেছে
বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, ঘূর্ণি ও পতঙ্গ, মানবিক কোমল বিভূতি
তবু হৃদয়ের সুড়ঙ্গ বেয়ে মিথুন মুদ্রায় সাপ ও সাপিনী।

এর থেকে পরিত্রাণ আছে কি কোথাও ?

নিতান্তই দুর্ঘটনা, পৃথিবীতে এসে গেছি বা নিক্ষিপ্ত হয়েছি
জীবন তো কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মুখচ্ছবি
একটা নিষাদ প্রশ্ন সকলেরই অস্তিত্বকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খায় ঃ
তোমার কি সুনির্দিষ্ট মুখরেখা আছে ?

নেই। আমি তো নিতান্ত আমার নিজেরই কর্মের নির্মাণ
প্রেতলোকে ঋষিদের পাপীদের ধূসর পাণ্ডুর মুখ সরিয়ে সরিয়ে
সরিয়ে শ্যাওলা ও কাঁকড়া তৈরি হয় সময়ের চিতা এবং আমারও।

এই তো নিয়তি। তবে কেন উদ্বেগ আতঙ্ক ?

আত্মপ্রেম রূপসী গরল
নিজেকে নিজের থেকে সজোরে ছিনিয়ে একমনে যদি নিরীক্ষণ করি
ভাব তরঙ্গের ভাঙা গড়া, গর্জন শুনতে শুনতে
দেখবো, নদী হচ্ছে শিরা উপশিরা, আস্তে আস্তে বিশ্ব হয়ে গেছি।
উত্তম পুরুষ হয়ে গেছে তৃতীয় পুরুষ।

নিয়ত সংবর্ত থেকে ভারসাম্য এবং গৌরব

দেওয়া-নেওয়া

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

দেবার যা ছিলো দিয়েছো পুষিয়ে,
তুমি, মালবিকা, অম্বর গ্রীবা বাড়িয়ে দিয়েছো।
যখন চেয়েছে পাখির মতন সেই গ্রীবা খুঁটে কি যেন খেয়েছে!
চেয়েছে বলেই পেয়েছে দুগুণ, না গুণে দিয়েছো;
দেবার ছিলো যা দিয়েছো পুষিয়ে—
একে একে বহু বহুতর ক'রে,
দেবার যা ছিলো দিয়েছো পুষিয়ে,
নেবার যা ছিলো কিছুই নাওনি দুই হাত পেতে।

জন্মদিনে

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

ছটি জেলেকে দিগন্ত-পেরিয়ে যাওয়া অতল জলরাশিতে
পাঠিয়ে দিয়েছি।
তারা ঢেউয়ের দোলনায় ঘুমিয়ে পড়বে, জেগে উঠে
নৌকো বোঝাই করে নিয়ে আসবে
হাঙরের তেল, শঙ্খমালা, সিন্ধুপাখির ডিম
আর প্রচুর রুপালি মাছ।

আমার দুচোখের তারা ভাসতে ভাসতে
জলের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলে
একটি প্রখর তিমি
অনন্তের এক প্রান্ত থেকে উঠে গিয়ে
নক্ষত্রমণ্ডলীকে গ্রাস করল, এবং
গহন কালো মহাশূন্য আর একটি বিশাল তিমি মাছ
নেমে এলো তরঙ্গ মালার বুকের উপর—
তার সঙ্গে যুক্ত হলো মেহগিনি অরণ্যের মতো বাতাস
বিদ্যুৎসঞ্চারী স্তম্ভের উপর উঠে এলো আনন্দ আঁখল শিকান—
ওলটপালট খেতে লাগলো আমার ছটি নৌকো,
রুদ্ধশ্বাস, লবণাক্ত আলিঙ্গনে নরম হয়ে এলো মাঝিরা।

একটা নৌকোও ডোবেনি।
শুধু একের পর এক ঝাপটা খেয়েছে।
আমার সমস্ত কদম্ববন এতদিন তাদের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলো—
তারা তরণী বোঝাই করে নিয়ে আসছে
সোনালী মেঘ, মুক্তোভরা ঝিনুক, আর
নীল সমুদ্রের গান।

সবাই তোমার জন্য।

পেয়ালা পিরিচ

বাসুদেব দেব

পেয়ালার নিচ থেকে পিরিচের মতো
আজ আমি সরিয়ে এনেছি নিজেকে,
এই আবছায়ায় এই ভুল বয়সে

অসম্পূর্ণতার জন্য খুঁতখুঁত করছো তুমি
বানান ঠিক করতে গিয়ে উসখুস করছেন কবি
পেয়ালা ও পিরিচের সঙ্গে ছিল
একটি বিবরী চামচ
সেটিকে এখন খুঁজতে শুরু করেছে সংসার

আবছায়ার আড়ালে আর এক টুকরো ছায়া
তারও পিছনে অকাতরে ঘুমুচ্ছে অসম্পূর্ণতা
আদুরে বেড়াল ছানার মতো
আমার মন খারাপ
তোমারও মন খারাপ
শুনেছি তাদেরও কারো মন ভালো নেই আজ

জলের কথা

রত্নেশ্বর হাজরা

জলের নিজস্ব কোনো মুখ নেই
আলাদা চেনানো যায় তেমন পোশাকও তার নেই

কেবল শরীর আর স্বভাবের চিহ্নগুলো আছে—
জনকে আঘাত দেয় এমন দুঃখের কথা
অন্তত আমার জানা নেই
তার ইচ্ছা বুঝতে পারে প্রতিবেশী গুল্মের শিকড়
কিছু পাখি
কিছু ফুল
কোনো কোনো নীলাঞ্জন মেঘ
তার সঙ্গে কথা বলতে নির্জনতা পারে
যুবকেরা পারে—আর
যুবতীর অভিমান পারে—

রাধা

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

মুক্তিবাদী তুমি রাধা? তবে কেন শিরোধার্য করেছ ধিক্‌কার
এতকাল ধরে?
ভালবাসা নষ্ট করে—সে কি নষ্ট নারী?
তুমি পোড়ো নিজের আগুনে ঘরে, পোড়ো বাইরে
পুড়ে যাও উন্ডালিত রোষে।

শতাব্দীসমান গ্লানি সহ্য ক'রে নিলে দণ্ডকেই
না রেখেছো প্রতিবাদ, না কোনও জিজ্ঞাসা।
নারী যদি বহুধান শুদ্ধ, সে কি নয় অসম্মান
পুরুষশাসন থেকে বেশি?

তুমি এসো, ভালবাসা শেখাও নারীকে
স্বাধীনতা ভালবাসা চায়।
খুলে দাও দরোজা-কপাট, মনুষ্যজন্মের দাবি
উপার্জিত সমান-অধিকার
তুমি কর্ত্রী রাধা
আকাশে উড়িয়ে দাও নিজস্ব পতাকা
তুমিই আদি ও অন্ত, নারী একাকিনী
দিতে পারো শেকলভাঙার চাবি, নির্যাতনে ভাষা।

বর্ণান্ধ পুরুষ-নারী, হিংসা-পরিবেশ
সমস্ত ছাপিয়ে দেখ
আকাশে উড়েছে ওই তোমারই আঁচল বর্ণময়।

বুদ্ধের সঙ্গে সংলাপ

রণজিৎ দাশ

'সমস্ত ক্ষণিক,
সমস্তই দুঃখময়,
সমস্তই স্বলক্ষণ, এবং
সমস্তই শূন্য।'
—আপনি বলেছেন। কিন্তু এই নিরাশ্রয় চতুর্ভাবনার
বিপরীতে যে চারটি ধাতুরূপ
কিংবদন্তী হয়ে, শুদ্ধ চিত্রকলা হয়ে
আপনারই জীবনীসূত্রে, সজল মেঘের মতো
আমাদের জন্যে থেকে গেল,
তার তালিকাটি আমি আপনাকে বলি—

'শান্ত ও সুন্দর গ্রাম উরুবিল্ব,
ছায়াঘন নৈরঞ্জনা নদী,
সুলক্ষণা যুবতী সুজাতা, আর
তার কাছে ভিক্ষালব্ধ, আন্তরিক অন্ন।'

বজ্রপদ্ম

অমিতাভ গুপ্ত

বিপ্লব
চিরজীবনের

পদ্মও হ্রদে
ফুটবেই

উভয়ের স্বভাব

থাক্ অমলিন
থাক্

আকাশে পদ্ম
টলমল

পতাকার বুকে
টলোমল
২.
সর্বনাশের মাথায় পা
হে সর্বনাশ চলো যা

চুলের আগুনে গনগনালো
আকাশ জ্বালে পদ্মনিশান
৩.
দোলা লেগেছিল পতাকার মাঝখানে
বিশাল ডানায় শূন্যতা জনতার
ডানাটি যেমন পাখির গভীর চায়
কপালের কাছে কম্পিত ভুরেখায়
তেমনই জনতা শূন্যতাকেও জানে
শূন্যতা থাক্ নীড়ভরা হাহাকারে
বজ্র-তিলকচিহ্নের অধিকারে

ঘোড়া

তুষার চৌধুরী

ঘোড়া
তারপর ২০৩৯-এ কোনো ভয় ছিল না
তুমি যুগোপযোগীইনও
লিপস্টিক কথা বলে
ওদিকে উপাসনা
কথা মাংসের মতো
বিষাদের চাকাও হুল্লোড়
মুদিত চোখের তারা

যাকে কাজলপরা দেখতে চায়
সে শকুন্তলায়
মুন্দফরাস পাখি
নয় তো হাওয়া
উড়িয়ে নেবার অবাধ
তূনীর
থেকে একটা তীর
পাটখড়ির
আর
বাঁকুড়ার পুতুল
ভোরের
ভৈরবী বা জবা
আর কান পেতে শোনো
আর এক মায়াদেবী
ও শাদা হাতির গল্প

আমি ফিরে চলি

তুলসী মুখোপাধ্যায়

কুসুমরাণীর ডাকে
রূপপায় যেমন ছোটে বিমুগ্ধ ভ্রমর
একমুঠো তৃষ্ণা নিয়ে আমিও তেমনি গেছি
তিলোত্তমা প্রেমের আহ্বানে
বুকের মৌচাক ভেঙে চুম্বন করেছি
শরীরের ভাঁজ খুলে আকণ্ঠ ডুবেছি....
হায়! সমস্ত বসতি তবু দাউদাউ মরুর দহনে!
পিছু ফিরে ক্রুর হেসে বলি—
হে রমণী, তৃষ্ণার জল নেই তোমার কাননে।

ফ্যাট ও প্রোটিনে ঝলমল বিপুল বৈভব
কলস্বরে ডাক দেয় দুহাত বাড়িয়ে
ক্ষুধার্ত পশুর মতো উড়ে যাই আমি
সব কিছু ছুঁয়ে ছেনে দেখি—
এটা চাখি, ওটা চাখি তারিয়ে তারিয়ে....

তারপরই অবসাদে ভেঙে গিয়ে বলি—
গুড বাই, চলি।

চাকঢোল পিটিয়ে মহাধুমধামে
হাজার বাহবা আসে আমার আকাশে
বরমাল্য আসে, রাজার শিরোপা নাচে সহাস্য উল্লাসে
নন্দিত লোকারতে রাতারাতি দেয়াল পুরুব....
তারপরই নুয়ে পড়ি বিরক্ত বিষাদে—
দিন যাবে এই তুচ্ছ প্রমোদে প্রমাদে ?
বারুদ চিৎকারে আমি আর্তনাদে বলি—
এই অসার লক্ষ্যে
নিবেদন করেছি কি জবার অঞ্জলি ?
এক আকাশ নতুন বিদ্রোহে
নতুন আলোর মন্ত্রে আমি ফিরে চলি।

যখন সুচিত্রা গান রবীন্দ্র-গান

মৃণাল দত্ত

যখন সুচিত্রা গান রবীন্দ্র-গান
গায়কি তাঁর প্রথায় বাঁধন ছেঁড়ে
পথ চলাতেই আনন্দ তাঁর, সেই তালে
আগল ছেড়ে
বিদ্রোহী সে বেরিয়ে পড়ে একলা পথের নিরুদ্দেশে
যে উদ্দেশে
সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গানে গানে।

তখন আকাশ জুড়ে বজ্র-মাণিক জ্বলে
অন্তরীক্ষে জলে স্থলে
পাতায় কাঁপন বইয়ে দে'য়া হাওয়ার মতো সুরের বাহার
সুকণ্ঠে তাঁর
অনুরণন জাগিয়ে তোলে রক্ত রণ সফলতার গান
যখন সুচিত্রা গান রবীন্দ্র-গান।

একটা সাদা পাতা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

প্রতিশ্রুতি মতো সবুজ কালিতে
কিছু কিছু লেখা হয়ে গেলেও
শূন্য সিঁথির মতো একটা সাদা পাতা
ধু ধু সাদা পাতা।

রক্তের এপার ওপার নীল হাওয়ায়
হু হু বয়ে যেতো দীর্ঘশ্বাস
শোকে তাপে সন্তাপে বড় স্তব্ধ হয়ে থাকা।

এক পরাক্রান্ত ঝড়ের বিকেলে
বিভ্রান্ত আয়নায় কার মগ্ন মুখ দেখে
রক্তহীন ক্লিন্নে ঘুমিয়ে পড়েছে
সেই হাহুতাস মাখা সাদা পাতা;

আমার মাথার উপর দিয়ে
সাঁতরে যেতে যেতে টপটপ ক'রে রক্তপাত হতো
জামায় রক্তের দাগ লেগে যেতো
তবু সেই হত্যা দৃশ্যের
অগ্নি-সাক্ষী হতে চাইনি কখনো।

মুখ ও মুখোশ

গণেশ বসু

মুখোশ, আমি দেখতে চাই তোমার মুখ
ছিলো কি লাল, ছিলো কি নীল গভীর সুখ
অথবা কিংশুক ?

মুখোশ, তুমি দেখাও তোমার বধির মুখ
ওটা কি লাল, ওটা কি নীল জটিল সুখ
অথবা কৌতুক ?

মুখোশ, তুমি এখনও বুকে সাহস রাখো
মুখোশ, তুমি এখনও চোখ স্বপ্নে ঢাকো
এখনও গড়ো সাঁকো ?

কোথায় মুখ, দেখতে চাই কোথায় মুখ
ছিলো কি লাল, ছিলো কি আর তেমন বুক
করবী কিংশুক ?

হায়রে মুখ, দেখতে চাই তেমন মুখ
ভালোবাসার ছন্দোময় দীপ্ত বুক
সকলি কৌতুক ?

কোথায় মুখ, সাহসভরা কোথায় আর ?
মরা কোটাল ঘনায় কালো মেঘের ভার
এটাই লজ্জার।

নেই সে মুখ, নেই সে মুখ কেমন সাজ
রক্তবেরও মুখোশ পরা এই সমাজ
আত্মঘাতী আজ।

দৃশ্যান্তর

সত্য গুহ

জানালা দিয়ে তাকালেই দেখা যেতো দূরের তালগাছটা
ঐ-ই ছিলো নাম
আমি ওর ফুল দেখিনি কোন দিন
দেখেছি গিজগিজ করে মাথায় সবুজ পাতা-রঙ
ছিটেটাক উঠোনের মতো করে রেখে
বাবুই-এর বাসা....শুধু বাসা
বাসা আর বাসা···উজ্জ্বল...সোনালী
সারাদিন পাখিদের কর্মব্যস্ততা···উৎসবের মতো কোলাহল
সন্ধ্যায় সারসার জলা-দীপ
দোল খায় শান্ত স্নিগ্ধ নিষ্তাপ আলোক
কেনো ঝড়...বজ্রবিদ্যুৎ সম ঝড়ই কখনো

পারেনি খসাতে কিম্বা ছিঁড়ে ফেলতে কোন একটা বাসা
চিল শকুনের ছায়া দূরে থেকেই বেসেছে ব্যর্থতা
কী এক গরজে বাপসা জানালায় তাকিয়েই দীর্ঘ দিন বাদে
বুক ফেটে গেছে
বাবুই-এর বাড়িটার বদলে সবার চোখে স্থির
তালগাছটা ভরে আছে তাড়ির কলসে ॥

নিরাপত্তা

সুশান্ত বসু

নিরস্ত্র ক্রোধের নীচে জমে থাকা রুদ্ধ নীরবতা
ফুঁসে ওঠে রুদ্ধ স্রোতে, বাবুদের নব্য সংবাদমে
নিরাপত্তা টলে ওঠে, বেড়ে যায় ত্রস্ত রক্তচাপ।
তৃপ্ত দুধে-ভাতে-থাকা চতুর্দিকে ভাঁড়ুর সন্ততি
নীরটুকু ফেলে দিয়ে সুধাময় ক্ষীরের প্রসাদ
খেয়ে দিব্যি হৃষ্ট পুষ্ট তৃপ্তবাস মার্জারের সুখে
যদিও কেবলি দ্যাখে পদতলে ছায়া যায় সরে—
তবু এক জায়মান ঊর্ধ্বমুখ অম্লান তরুর
আত্মরতি বুকে নিয়ে শঙ্খে ও আগুনে সেঁকে পাপ
হাঁকে তারা, প্রতিদিন বৃহন্নলা বিক্রি করে ছদ্ম-সম্ভাবিত।

নিরস্ত্র ক্রোধের নীচে জমে থাকা রুদ্ধ নীরবতা
ফুঁসে ওঠে আমাদের জয়াসন্ধ গ্রামে ও শহরে।

একেকটা দিন আর আমি

অঞ্জী সেনগুপ্ত

একেকটা দিন অনেক গভীর কথা আগলে নিয়ে আসে
আমার ভেতর অবধি টেনে নামায় আমাকে
কৈশোরের পাড়াতুতো দাদার মতন সাহস যোগায় সেই সব দিন
 ভুল-আভুল শুধরে দিয়ে
 আমাকে শেখায় লেগস্পিন

কড়া পাট্টা মেরে অশ্লীল ইঙ্গিতের বিষদ ব্যাখ্যা করে, আদেশের দৌলতে
সুবিধা আদায় করে কারণে-অকারণে
এভাবেই সম্মোহক শিষ্যের মতন আমি পাড়াতুতো দাদার হাস্যকর
প্রেমপত্র চালান করি
সুলেখা দাশের হাতে
আমার ভেতর বুজকো অন্ধকারে খালবিলশ্যাওলাকাদার অবিরাম
বেদনা আর অপমানের জোড় লাগে
নীল ডিম ফুটে কিলবিল ক'রে ওঠে লিক্‌লিকে সাপের বাচ্চারা
বেড়ে ওঠে অবহেলার, বেড়ে ওঠে স্যাঁৎস্যাঁতে নির্জনতায়
যথারীতি দ্রুত ভুলে যাই আমি সেলিম্পিনের গ্রিপ, অশ্লীল ইঙ্গিতের
কিই-বা দরকার আর যখন
নির্জন দুপুরের পর দুপুরে খোদযুবতী সুলেখার কাছে শিখে নিই আমি
শরীরের চির নতুন খেলা
একেকটা দিন এভাবেই অতিক্রান্ত হয়, আমার ভেতর অবধি আমাকে
টেনে নামাতে গিয়ে নিজেই
আলুথালু উঠে আসে জলের ওপর—তাজা বাতাসের খোঁজে।

মন্ত্র তার

শ্যামল সেন

মন্ত্র তার নীরবের যন্ত্রণা
বিষনীল যৌবনের রুদ্ধ ফণা
মোহমুগ্ধ দোলে না আর, স্থির, বিষম-গম্ভীর।

এই নীরক্ত নির্জীব বেলাশেষে
অবিরাম ঝিমঝিম বৃষ্টিপাত চোখের পাতায়,
কে যায়?
সাঁকোপথ পেরিয়ে তবু কে কোথায় যায়?
রাষ্ট্রীয় আদমসুমারী দেবে তার মন্ত্রের সন্ধান
দেবে মাটি, অন্নজল শিকড়ের প্রাণ?

তার নামে আজ কোনো ধর্ম নেই, জয়ধ্বনি নেই;
শহরগঞ্জ নির্বিকার, তার কোমলগান্ধার নাম
মুছে যায়, চারপাশ ডাকে রসনা—
সাড়া নেই, এই বিকট রাজসভার
যৌতুক-কৌতুকে আড়ম্বরে ঘিরেছে স্বয়ম্বর।

এখন মন্দ্র তার নীরবের শমীবৃক্ষ কল্পনা
স্মৃতিগন্ধ পারাপার, শৈশব নির্ভর।

চড়া পর্যায়

অপূর্ব কর

আমাদের বিবেক নেই বলে কি
আকাশের থাকবে না
তাই দেখ, সময় যখন হাতে বেলফুল জড়িয়ে
বিলোল নারী সেজেছে, আকাশ অশনিময়
দারুণ রুখু

নূপুর আর সারেঙ্গি মাতানো জলসাঘর
তখতে-বালিশে এলিয়ে যায় সব গুণধর পুরুষ

একদিন অন্তত এদের অন্য বিলাস ছিল
টগবগ ঘোড়া ছুটিয়ে তেপান্তরে যাওয়া
বন কাঁপিয়ে হুল্লোর তুলে সিংহ শিকার
নৌযাত্রায় যাওয়া সুবর্ণ দ্বীপে বা লবঙ্গ বনে

কি ভাবে যে মদ সুরা-সাকী রাক্ষসে প্রমোদঘর
এদের রসে-বশে গিলেছে
খাজাঞ্চীখানায়ও আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ
ছলাৎ ছলাৎ

দেউড়িতে মৌন যন্ত্রণা—হাহাকার
রাজ্যপাট ধুম মারা, নিশ্চুতি পাওয়া
মাটি আরো নির্বাক গাঢ় নির্বাক

মেঘ ডঙ্কা বাজাচ্ছে, বৃষ্টি চোখা বল্লম
কি যেন কখন প্রলয় নামবে, নামুক

ধিক্কৃত আমার কাছে আগুন পুরুষের বুকে যাওয়া
আমি জোড় পায়ে লাথি মারতে পারি
যে কোন অশুভ মহাক্ষণে।

ভালবাসার চতুর্দশপদী

রাণা চট্টোপাধ্যায়

তোমাকেও আমি জাদুঘরে রেখে এসে
ভেসেছি ভেলায় অমর্ত মান্দাসে
পিছুটান নেই, জননীর কোলজোড়া
আছে কিছু স্নেহ সজল দূর্বা ঘাসে।
'সবই অভ্যাস' তুমিই বলেছো কতো
'ভুলে যাও ঘর প্রতিবাদে হও দড়ো'
এখন দেখছি এ যেন সৌভাগ্য ব্রত
তুলসী তলায় প্রদীপ করেছি জড়ো।

এই গ্রহ আজ কারোর হাতের মুঠোয়
পূব থেকে সোজা পশ্চিমে ঘর বাড়ি
কবিতার কাছে ফিরেও আসিনি ছুতোয়
আম্রপালীর ছিন্ন করেছি নাড়ী।
তোমাকে মৃত্যু আর্ত গলায় ডাকে,
কস্তুরী চাঁদ শ্রাবণের মেঘে ঢাকে।

দৃশ্যান্তরে

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

তিন তিনটে তোষকের নিচে
কেউ এক কনা অনুতাপ রেখে গিয়েছিল
তুমি এমন বিলাসী সারারাত ঘুমাতে পারনি
অথচ দ্যাখো আরো তীব্র উত্তাপের মধ্যে
তুমি দংশন আর আশঙ্কাকে উপাধান করে
কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছ
সময়ের ছাত্রসেনা যখন সমস্ত খেলাঘর ভেঙে দিয়েছে

আমাদের সাবালক হওয়ার সময় হল
বৃক্ষে বৃক্ষে ফল আর ফলের ভিতরে উদ্ভিন্ন বীজ
ক্রমশ পার্থিব পিপাসা জাগিয়ে তুলছে
এক একটা কোরক প্রস্ফুটিত হওয়ার মত

আমাদের মধ্যে জেগে উঠছে অরণ্য প্রকৃতি
সায়াহ্ন তার মঙ্গলদীপ সবে মাত্র
মধ্যরাতের কাছে সমর্পণ করেছে
এখন প্রত্যেকটি শস্যদানায় সম্ভাবনা ও শঙ্কা
প্রহরার পিছনে প্রহরা বসাতে বসাতে
আমাদের হৃদয়প্রাঙ্গন ভাবতে ভাবতে সমাকীর্ণ
তিরস্কার ও পুরস্কারের কাছে সমভাবে
নতজানু হতে হতে

আমাদের মুখে মুখে প্রেম ও প্রতিশ্রুতি

এক কথা অনুতাপ তোমাকে বিনিদ্র রেখেছিল
আজ অগ্নি উদ্গীরণের মধ্যে
তুমি কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছ।

সে প্রিয়তা কি এত মারাত্মক ?

অমরেশ বিশ্বাস

না,—সে আমার কেউ ছিল না।
যখন আততায়ী বাজপাখি
প্রায় এক কানাগলির মধ্যে ঠেসে ধরে
দিতে চেয়েছে শেষ ঠোকর
সেই মুহূর্তে
দশভুজা তাকে দেখেছি।
লাইফ অ্যাট স্টেক থেকে
ছিনতাই হয়ে
তারই দৌলতে ঘুরে বেড়াই রাজপথে।

শাদা চাদর থুতনি পর্যন্ত দেখে
স্বজনদের সেই ভয়ঙ্কর ভয়ের মুহূর্তে
শমনকে ডাক করে দাঁড়িয়েছে আজ
তার গোটা পরিবারশুদ্ধু, পাহারায়
মুখটুকু ঢাকা পড়েনি আমার।

কী—কী-ই বা দরকার ছিল
এক আধচেনা আনপড় গাঁইয়াকে নিয়ে
এত গাজা কথাকবি ?
মন্দ দেখেনি কারো, সকলের ভালো চেয়ে
দুনিয়াকে আশ্রয় দিতে তার এই বাড়ি—
ভালোবাসায় জাপটে ধরা এই বাড়ি।

লাউ-কুমড়োর ডগায় এখনও জানালায় উঁকি
প্রিয় ফুল ব্লিডিং হার্ট সদরের সিঁড়ির পাশে।
সে প্রিয়তা কি এত মারাত্মক ?
রক্ত মাখামাখি হয়ে কোন্ বাড়ি গিয়েছে সে ?
এ বাড়িতে আজও বেহায়া সূর্য ঢোকে
ছিঁচকে চোর বৃষ্টি
ভাসায় বিবশ ছাদ
আজও আমি এ বাড়িতে—শেষ দৃশ্যে নেপথ্যে ছিলাম।

এত যদি দাহ দিলে

নন্দদুলাল আচার্য

হ্রেষাধ্বনি শোনো ঐ উন্মাদ টিলার নিচে জ্বরে পুড়ে যায় সারা দেহ।
বহতা জলের বুকে টিউনিক ভেসে যাওয়া দেখে, ওরা করেছে সন্দেহ।
সন্দেহ করেনি শুধু, সাতটি গ্রামের লোক, গোল হয়ে ঘিরে এই বন
দুজন মানুষ খোঁজে ; এত চোখে ধুলো দিয়ে কি করে যে পালাই এখন।
কোথায় লুকোই বিভা, কোন পল্লবের আড়ে, কি করে যে চেপে রাখি প্রাণ—
এত যদি দাহ দিলে বৃষ্টি ও মালঞ্চ দিতে কেন ভুলে গেলে মঘবান!

অধর্ম

বাহারউদ্দিন

৮

সদন পেরিয়ে, ক্যাথিড্রাল
গাছের গোড়ায় ওরা বসেছিল

একটি পরুরুতে কাক, চৌকিদার যেন
জিগ্গির ঝাপটায়........
মানুষ-মানুষী হেই, এটা তো চিলের স্বর্গ
দূর হও, হেই........

আজব শহর বটে
নিষ্পাপ বসার মত তৃণভূমি নেই

মাটি ছুঁয়ে

জিয়াদ আলী

তুই তো সুকলা নারী বৃষ্টি ধোওয়া বৃক্ষের মতোই
মাটিতে রয়েছে তোর নিজস্ব আবাস
তবে তোর লজ্জা কেন
থেকে মিথ্যে ভয়,
লীলাবতী কন্যা তুই
মাটি তোর জন্মদাত্রী মা
মাটি কোনদিনই
বিশ্বাসঘাতিনী হয় না।

বরং গোপন ভয় বেশ কিছু মানুষকে নিয়ে
চেঁটেপুটে খেয়ে যায় দিব্যি চুপচাপ
তারপর দলছুট হলে
ছিঁচকে চোরের মতো বলাবলি করে ছিঃ ছিঃ
বড্ডো বেসরম
তোকে ছুঁলে তাদের মরণ।
আমি তাই কখনোই ওই সব মানুষের ছায়ায় হাঁটিনা
মাটি যে আমারও প্রিয় জন্মদাত্রী মা
মাটিতেই থাক তুই
তোর দেহে সাপ ছোঁবে না।

জলের বুকে

অজয় বসু

ছুটির দিনের ভাবনাগুলি নিয়ে আজ কোথাও যাওয়ার কথা ছিল
অথচ স্টেশনে পৌঁছাবার এক মিনিট আগেই চলে গেছে ট্রেন।
সারাদিন মৃতদেহের ওপর ছেটানো খই থেকে কুড়িয়ে নিয়েছি পয়সা
জলের বুকে এঁকে চলেছি জটিল অঙ্কের হিসেব.
পকেটে রেখে দিয়েছি বন্ধ্যা জমিতে ফসল-ফলানো গোপন তত্ত্ব
দু'কাঠা জমির উপর বানিয়ে নিয়েছি এক পলেস্তারাহীন ছোট বাড়ি।
এখন জলের শেকড় আর রোদের গুঁড়োর মধ্যে শুধুই আত্মীয়তা খোঁজা.
পরের ট্রেন কটায় ?

যাপনচিত্র

প্রবালকুমার বসু

বাজার থেকে মুরগী নিয়ে ফিরতে ফিরতে....
কী ভাবছে মুরগী
আজ রাস্তাটা একটু অন্যরকম ?

প্রথমেই মুরগীর মাথা কেটে ফেলা হল
তারপর পালক আর ছাল ছাড়াতে ছাড়াতে
মুরগী কী ভাবছিল···কেমন লাগছে ?
ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নিলে আমাকেও এরকম দেখাবে ?

টুকরো টুকরো হয়ে মুরগী এখন আমার পাতে
একটা ঠ্যাঙ চিবোতে চিবোতে...মুরগী ভাবছে
নিজের মাংসের স্বাদ কীরকম, লবন ঠিক আছে কিনা ?

ক্ষোভ ও অপমান

(অরুণ মিত্র স্মরণীয়েষু)

প্রদীপ পাল

ভালো নেই ভালো নেই মন ভালো নেই
যেদিকে তাকাই, একাকী শূন্যতার ভয় ও শিহরণ

আমাদের নীল বাড়ি তোমাদের লাল বাড়ি
ক্ষোভ ও অপমানে অহ্নহ্ রাঙা স্মৃতির স্মরণ

'কাঠকুটো আসবার আবার বন্য হয়ে উঠবে'
দু পায়ে ভালোবাসার শেকল, প্রতিজ্ঞা আমরণ
তবুও ঝড়, তবুও অকাল বৃষ্টি, নিশ্বাসে ঘৃণায়

নদ-নদী, খনি ও খনন, শুধু কথা বলাই কারণ

ক্ষোভ ও অপমানে অহ্নহ্ রাঙা স্মৃতির স্মরণ
শুধু সত্য, এই দুটি চোখ এবং জীবন-মরণ

ঠগ

কেশব দাশ

আগড় ঠেলে বাইরে আসে শ্যামাপদ। বাইরে দাওয়ার ওপর দাঁড়ায়। মাটির দাওয়া। গোবর লেপা। জমি থেকে প্রায় হাত তিন উঁচু হবে দাওয়াটা। তিন ধাপ সিঁড়ি নিচে নেবে গেছে দাওয়া থেকে। শ্যামাপদ দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দেখে, রাতের অন্ধকার এখনো নিঃশেষ হয় নি পুরো মাত্রায়। গাছ-গাছালি বাঁশ ঝাড়ের আড়াল আবডালে এখনো অন্ধকার থাবলা থাবলা। জমাট ও থকথকে। তবে ফাঁকা জায়গায় অন্ধকারের অবয়বে ভোরের ছোঁয়া লেগে ফিকে রঙ ধরেছে। সেখানে অন্ধকার অতো কালো ও ঘন নয়। আলোর কুঁড়ি পাপড়ি মেলছে ধীরে ধীরে। পাখি জাগছে; একটা দুটো করে। সমস্ত পাখির কলকাকলিতে এখনো মুখরিত হয়ে ওঠে নি চতুর্দিক। অবশিষ্ট আঁধার ওদের চোখে এখনো জড়িয়ে রেখেছে ঘুমের আবেশ। আকাশটা বড় ঝকঝকে নীল নিপাট। ঘষা আধুলির মতো নিষ্প্রভ চাঁদটা ঝুলে রয়েছে পশ্চিম আকাশে বাঁশ গাছের আড়ালে। আকাশ বাতাসে কেমন এক রকম বুঁদ করা ভাব—শান্ত স্নিগ্ধ মাদুমাখা।

শ্যামাপদ কপাট দুটো টেনে দেয়। এক রকম ধাতব শব্দ, কোঁকানি আর্তনাদের মতো, কব্জার দাঁতে দাঁত ঘষায়, বেরিয়ে, দরজাটা বন্ধ হয়। শ্যামাপদ দুয়ারে চালের বাতায় গোঁজা হেঁসোটা হাতে নেয়। সিঁড়ি বেয়ে নেবে আসে বাড়ির বার আঙিনায়।

রাত্রি শেষের সমুদ্র-তাড়িত বাতাস গায়ে এসে লাগে। গা জুড়িয়ে

দেয়। ভোরের বাতাসে আলাদা এক রকম স্পর্শসুখ। সুখদ ক্লান্তিহর। অথচ এই বাতাস সূর্যের তাপে ক্রমশ তপ্ত হতে হতে দুপুরে এতই খর হয়ে উঠবে যে, গায়ে লাগলে মনে হবে সাপের ছোবল।

বার-আঙিনার শেষ প্রান্তে শুরু হয়েছে তরমুজের খেত। খেতের চার ধারে ব্যাখারি আর বাবলা গাছের ডালের বেড়া দিয়ে ঘেরা। তরমুজ লতানে গাছ। ফলও স্বাদু এবং লোভনীয়। তাই গরু ছাগলে যাতে মুড়িয়ে দিতে না পারে সে জন্য বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখতেই হয়।

শুখনো বাবলার ডাল সরিয়ে শ্যামাপদ খেতের ভেতর ঢোকে। দাঁড়ায়। এক লপ্তে দু-কাঠা জমি। সবটাতেই তরমুজ ফলেছে। আড়াআড়ি মাটির ওপর শুয়ে লতানে গাছগুলো। গাছের প্রায় প্রতিটা পর্বে একটা করে তরমুজ। একটার সঙ্গে আর একটার ব্যাবধান প্রায় হাত খানেকের। শ্যামাপদ নিজের দৃষ্টির প্রসারে এই খেতটাকে ধরে দেখে খুটিয়ে খুটিয়ে। বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম, তারপর গাছ হয়ে ওঠা. ফুল ফোটা এবং ফুল থেকে ফল হয়ে ওঠা ইস্তক শ্যামাপদ সজাগ সতর্ক দৃষ্টিতে প্রায় প্রতি মুহূর্ত নিরীক্ষণ করে যায়। নিরীক্ষণ করে আর এক রকম নিখাদ পুলক অনুভব করে মনের মধ্যে। নিজের শ্রমসৃষ্টি দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায় তখন।

শ্যামাপদ হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে খেতের ওপর। ওর হাতের সামনেই একটা তরমুজ, সবুজ পাতার ঘোমটার আড়ালে শ্যামলা বৌটির মতো। দু-হাত দিয়ে পাতা সরাতেই রাখ ঢাক সরে যায়। বেআব্রু হয়ে পড়ে তরমুজটি। কালো মসৃণ গা। সুগোল গড়ন ঠিক একটা ফুটবলের মতো। যেন পূর্ণগর্ভা নারীর উদর। শ্যামাপদ তরমুজের গায়ে হাত রাখে। আলতো ছোঁয়। হাত বোলায় সস্নেহে।

ঠিক তখন ঝনঝনানি শব্দে শ্যামাপদর তন্ময়তা টুটে যায়। কি যেন পড়ল। শ্যামাপদ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, খেতের বেড়ার গায়ে মাটির পথটায় লতু উবু হয়ে বসে পড়ে বাওয়া থালা বাসন কুড়োচ্ছে। লতু শ্যামাপদর স্ত্রী। রাতের এঁঠো বাসন এখন ঘাটে মাজতে নিয়ে যাচ্ছিল, হাত থেকে পড়ে গেছে। শ্যামাপদ উঠে এসে পথের পাশে বেড়া ধরে দাঁড়ায়। বাসন কুড়োতে কুড়োতে স্বামীর দিকে মুখ তুলে চায় লতু। বলে, 'সকালেই হাত থেকে পড়ল—কে আসবে বলত ?'

বৌয়ের সঙ্গে একটু খুনসুটি করতে ইচ্ছা হয় শ্যামাপদর। বলে, 'আমার শালি আসবে।'

দু-চোখে কটাক্ষ হেনে বলে লতু 'খুব যে শখ!'

'কেন এলে কি তাড়িয়ে দেবো!'

'রাখবে নাকি ?'

'আমি তো রাখতেই চাই, শ্বশুর মশাই যদি....'

'বুড়ো বয়সেও এতো! একটাতেই হিমসিম, আবার....' বলে মুখ ভঙ্গিতে একটা অদ্ভুত ঝনকা মেরে উঠে চলে যায় লতু। লতুর যাওয়ার দিকে চেয়ে শ্যামাপদ হাসে। লতু বাসন হাতে নিয়ে ঘাটে নেবে যায়।

রাত্রি শেষের আঁধার এখন নিঃশেষিত। চলাচলি গাছ-গাছালির ফাঁক ফোকর থেকেও অন্ধকার বিতাড়িত। ঝলমলে দিনের সূচনায় আলোকিত চতুর্দিক। অজস্র পাখির কলধ্বনি প্রকৃতির বুকে যেন সুরের লহর তুলেছে।

শ্যামাপদ এবার কাজে নাবার জন্য প্রস্তুত হয়। সকালেই শ-দুই তরমুজ পাইকারের আড়তে দিয়ে আসতে হবে। তাড়াতাড়ি দু-শো তরমুজ কেটে তুলতে হবে গাছ থেকে। শ্যামাপদ হাতের মুঠোয় হেঁসোটা বাগিয়ে ধরে।

গাছ থেকে শ্যামাপদ তরমুজ কাটে যেভাবে—কোমর ভেঙে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে হাতে হেঁসোর ডগাটা তরমুজের বোঁটায় ঠেকিয়ে ঈষৎ টান দেয়, আর তৎক্ষণাৎ বোঁটাটা কুচ করে কেটে গাছ থেকে তরমুজ ছিন্ন হয়ে মাটিতে কাত হয়ে পড়ে। এক মাথা থেকে শুরু করে এভাবে কাটতে কাটতে এগোয় শ্যামাপদ। একটা সারি শেষ হলে আর একটা সারি থেকে শুরু করে। পাঁচটা সারি শেষ করলেই দু-শোটা কাটা হয়ে যায়। সাকুল্যে সময় লাগে আধ ঘণ্টা মাত্র। কিন্তু এই অল্প পরিশ্রমেই, যেহেতু পরিশ্রম করতে হয় টানা ও বিরামহীন, তাই শ্যামাপদ হাঁপিয়ে যায়। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে কপালে ও কণ্ঠায়। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে।

কচুবেড়িয়ার পাইকারি বাজারে তরমুজের ভালো দাম যাচ্ছে। কাল সন্ধ্যায় পাঁচপাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানে বসে খবরটা পেল শ্যামাপদ। অধর পাত্র বলল, 'দুশো টাকা কুণ্টল পেইচে আজ।' অধর নাকি আজ সকালে বিক্রি করে এসেছে। শুনে তৎক্ষণাৎ শ্যামাপদ চলে গেছে ভ্যানওলা হারুর কাছে। 'হারু কাল তোকে সকাল আটটার মধ্যে ভ্যান নিয়ে আসতে হবে আমার বাড়ি।'

'কেন গ শ্যামাদা?'

'তরমুজ নিয়ে যাবো কচুবেড়ে।'

হারুর সাইকেল ভ্যান আছে। চালায়। আর একটু পরই ভ্যান নিয়ে আসবে হারু। তার আগে খেত থেকে মাল তুলে তৈরি রাখতে হবে।'

বাসন মেজে ঘরে নিয়ে যেতে যেতে লতু ফের খেতের সামনে এসে দাঁড়ায়। 'হ্যাঁ গা শুনছ—'

শ্যামাপদ বেড়ার কাছে আসে। 'কি বলছ?'

লতু বলে, 'কচুবেড়ে তো যাচ্ছ। ফেরার পথে আমার জন্য দুটো ব্লাউজ এনো।'

খুনসুটি করার ইচ্ছাটা এখনো মাথা থেকে যায় নি শ্যামাপদর। বলে, 'শালি তো আসছে, তার জন্য কি আনব ?'

'আহারে হয়েছে অনেক—বিয়ে তো আজ হয়নি, কি দিয়েছ আমার বোনকে ?'

'শ্বশুর রাজি হলে দেবো আমার সম্বন্ধ !'

'বেহায়া কোথাকার !' আবার সেই কপট রাগ ও লজ্জার মিশ্রণে মুখে এক অপূর্ব ভঙ্গির ঝিলিক খেলিয়ে লতু চলে যায়।

শ্যামাপদ হাসতে হাসতে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলে, 'শোনো, গদাইকে বিছানা থেকে তুলে পাঠিয়ে দাও একটু। হাতাপাতি করে মালগুলো সাজাতে হবে।'

শ্যামাপদ কোমরের কষি থেকে শলাই আর বিড়ি বের করে। ধরায়। বিড়িটা ধরাতে গুকে, যেহেতু বাতাসের প্রবাহ প্রবল, উবু হয়ে বসে বাতাস আড়াল করতে হয়। বাম হাতে দুই আঙুলের ডগায় বিড়িটা চেপে ধরে টানে মৌজ করে। টানতে টানতে আপন মনে একটা তরমুজ ডান হাতে তুলে নেয়। নেড়ে চেড়ে দেখে। তরমুজটার গোলাকৃতি এত নিখুঁত, মনে হয়, যেন মেশিন বা মানুষের কুশলী হাতের তৈরি। আর এসব তরমুজের ওজনও বেশি নয়, বেশি হলে আড়াই তিন কেজি এক-একটা। আর কাটলে ভেতরটা দেখবে লাল রক্তের মতো টকটকে। মুখে দিলে মিষ্টি রসে মুখ ভরে যায়।

হালফিল এই জাতের তরমুজের চাষ হচ্ছে খুব এই সাগরদ্বীপ অঞ্চলে। অবশ্য শুধু সাগর দ্বীপ নয়, সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়েই চাষ হচ্ছে কম বেশি। সারা গ্রীষ্মকাল শহর ও গ্রামের হাটগুলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই সমস্ত চালানি তরমুজে ছয়লাপ হয়ে যায়। এই নতুন তরমুজের দাপটে হুগলীর ঢাউস ঢাউস সাবেক তরমুজের চাষ প্রায় উঠেই গেল।

'বাবা ডাকছ—' চোখ রগড়াতে রগড়াতে শ্যামাপদর ছেলে গদাই এসে দাঁড়ায়। গদাইয়ের গড়ন রোগা পাৎলা। বছর বারো-তের বয়সের বালক। না-আঁচড়ানো চুল এক মাথা। খালি গা। পরণে হাপ প্যান্ট। শ্যামাপদ বলে, 'এলি, আয় বাপ ভেতরে। ঝটপট দুজনে মালগুলো লাট দিয়ে দি।'

শ্যামাপদ হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে ওঠে। খেতের বাইরে গিয়ে বেড়ার কাছটায় দাঁড়ায়। গদাই ঢোকে খেতের ভেতর। খেতের কাটা তরমুজ হাতে তুলে নিয়ে খেতের বাইরে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বাপের দিকে ছুঁড়ে দেয়। গদাই ছোঁড়ে আর শ্যামাপদ লোফে। এবং লুফে নিয়ে যায় আঙিনার এক জায়গায় একটার পর একটা জড়ো করে। আলু ঝিঙে পটলের মতো ঝোঁড়া বা চুপড়িতে করে ফসল তোলার চেয়ে তরমুজ তোলার এটাই সুবিধাজনক পদ্ধতি। কাজটা চলে দ্রুত। বালক গদাইও এ কাজে বেশ দক্ষ। দু-হাতে তরমুজটা ধরে ঘুড়ির তুলাই দেওয়ার মতো তরমুজটা শূন্যে

তুলে দেয়, আর সেটা গিয়ে পড়ে ঠিক শ্যামাপদর হাতে। শ্যামাপদর হাত ফস্কে পড়ে গেলে তরমুজ মাটিতে পড়ে ফেটে যাবে, কিন্তু পড়ে না। শ্যামাপদ দু-হাতে লুফে নাবিয়ে রাখে ভুঁয়ে। এভাবে বার আঙিনায়, ঘাটে যাবার পথে তরমুজের ওপর তরমুজ জমে তরমুজের স্তূপ তৈরি হয়। কাজ শেষে গদাই খেত থেকে বেরিয়ে এসে শ্যামাপদর সামনে দাঁড়ায়। বলে, 'বাবা, আমার রঙ পেন্সিল কিনে আনবে না ? আজ তো যাচ্ছ কচুবেড়ে, আনবে ?'

শ্যামাপদ ছেলের ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, 'দেখবক্ষণ, যা পড়গে যা—'

আটটার আগেই হারু আসে ভ্যান নিয়ে। প্যাঁক প্যাঁক শব্দে রবারের ভেঁপু বাজাতে বাজাতে ভ্যান নিয়ে ঢুকে পড়ে বার আঙিনায়। শ্যামাপদর কাছে এসে ব্রেক কষে। সাইকেল ভ্যান থেকে নেবে বলে, 'এসে গেইচি শ্যামাদা—'

হারুকে দেখে শ্যামাপদর ব্যস্ততা হঠাৎ বেড়ে যায়। বলে, 'এসেছিস, হাত লাগা তাড়াতাড়ি। দেরি হয়ে গেল !'

'আমায় দুষতে পারবে না দাদা, আমি এইচি আগে।'

'না তোকে দুষছি না। আসলে দেরি হলে কষ্ট তোরই। রোদ উঠে যাবে। তখন চড়া রোদে ভ্যান টানতে হিমসিম খাবি।'

শ্যামাপদ ঘরের ভেতর সেঁধিয়ে যায়, এবং ফিরে আসে হাতে দুটো বাঁশের তৈরি টুকরি নিয়ে। টুকরি দুটো ভ্যানের পাটাতনের ওপর রাখে। ওরা তরমুজ তুলে তুলে টুকরি বোঝাই করে। টুকরির ওপর দড়ির জালের ঘের। টুকরি এবং জালের ঘের তরমুজে ভর্তি হয়ে যায়। তখন জালের মুখ ফাঁস দিয়ে বেঁধে দেয়। সমস্ত তরমুজ ভর্তি হয়ে যায় দুটো টুকরিতে। কাজ শেষে শ্যামাপদ দু হাতের চেটো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, 'হারু, তোর ভ্যানের টায়ার ঠিক আছে তো ?

'ফাস্ট কেলাস—নতুন টায়ার শ্যামদা। সকালেই পাম দিয়ে নে এইচি।'

'দাঁড়া, জামাটা গায়ে গলিয়ে আসি' বলে শ্যামাপদ আবার বাড়ির ভেতর চলে যায়। জামা গায়ে বেরিয়ে এসে দাওয়ায় দাঁড়ায়। হারুকে ডাকে। হারু দাওয়ায় উঠে এলে ওকে বসতে বলে। হারু বসে দাওয়ায়। লতু দু-বাটি মুড়ি দিয়ে যায় দু-জনকে। মুড়ির বাটি হাতে নিয়ে হারু বলে, 'বৌদিদি চা হবে না ?'

'মুড়িগুলো খাও তো—' বলে লতু ভেতরে চলে যায়। খানিকক্ষণ পর চা নিয়ে আসে। ওরা খায়। খেয়ে ওঠে গা ঝাড়া দিয়ে। দাওয়া থেকে নিচে নেবে হারু সাইকেল ভ্যানের সিটের ওপর উঠে বসে। শ্যামাপদ বসে হারুর নিচে, পাটাতনের ওপর পা ঝুলিয়ে। হারু দু-হাতে শক্ত করে চেপে ধরে

হ্যাণ্ডেল। প্যাডেলে পায়ের চেটো রেখে সজোরে চাপ দেয়। প্যাডেল ঘোরে, চাকা ঘোরে, গাড়ি চলতে থাকে।

গ্রাম ছেড়ে পাকা সড়কে ওঠে ওরা। সড়কের নিচে খাল। কোথাও জল আছে, কোথাও শুখনো। এই দ্বীপ চারধারে সমুদ্রবেষ্টিত। ধমনী প্রবাহের মতো বহু নদী নালা খাড়িও বয়ে গেছে দ্বীপদেহে। এত জল, কিন্তু কোনো কাজে লাগে না। জলের স্বাদ লবণাক্ত। এ জলে সেচ হয় না, চাষ হয় না। এই দ্বীপে বৃষ্টি-নির্ভর চাষ একটাই—আমন ধান। বিকল্প চাষ হিসাবে ইদানীং অবশ্য মাটির গুণে এই তরমুজ আর লঙ্কার চাষও হচ্ছে।

কচুবেড়ে থেকে আসা যাত্রাবাহী একটা বাস সাঁই সাঁই বেগে ওদের টপকে চলে যায় দক্ষিণে। ওদের পার হয়ে যাবার মুহূর্তে বাসটা ওদের গায়ে বাতাসের প্রবল ঝাপটা মেরে যায়। বাসটা শেষ গিয়ে থামবে সাগর তীর্থ ক্ষেত্রে। বাসটা আসতে দেখে হারু ভ্যানটাকে রাস্তার কিনারে নাবিয়ে এনেছিল। বাস চলে যেতে এখন আবার পিচ ঢালা সড়কে উঠে আসে।

সমুদ্রঘেরা এই ভূখণ্ডে এমনিতে বাতাসের প্রবাহ খুব প্রবল। সমুদ্র-তাড়িত বাতাসের হিস হিস গর্জানী সব সময় লেগেই আছে। অবিরাম। এই বাতাসের বাধা কাটিয়ে গাড়ি টানতে হারুর যথার্থ কষ্ট হয়। পায়ের চাপে চাকা সচল রাখতে ওকে শরীরের সমস্ত ভার ও শক্তি আরোপ করতে হয় প্যাডেলের ওপর। শরীরটা বেঁকে যায়, কখনো ডানে কখনো বাঁয়ে। ঘামসিক্ত দেহে জেগে ওঠা পেশীগুলো পিছলে পিছলে যায়। শ্যামাপদ বলে, 'ঠেলব নেবে ?'

'ঠেল—'

শ্যামাপদ ভ্যান থেকে নেবে ভ্যানের পেছনে পাটাতন ছুঁয়ে ঠেলতে থাকে। শ্যামাপদ ভ্যান ঠেলতে ঠেলতে ভ্যানের সঙ্গে দৌড়ায়। ভ্যান চলতে থাকে জোরে। হারুর ভ্যান টানার পরিশ্রম খানিকটা লাঘব হয়। সিটের ওপর বসে সাময়িক জিরেন নেবার ফুরসৎ একটু পায় হারু। এভাবে কখনো ঠেলে, কখনো হারু একা চালিয়ে কচুবেড়িয়া যখন পৌঁছায়, তখন সকাল ফুরিয়ে ধা ধা রোদ।

ভ্যানে চেপে আসতে আসতে দূর থেকে শ্যামাপদর চোখে পড়ে হাটটা। সমুদ্রের তীরে পার ঘাট। তার বগলে এই পাইকারি বাজার। শহর থেকে পাইকাররা প্রতি বছর এ সময় থলে ভর্তি টাকা নিয়ে ওঠে এই দ্বীপে। এখান-টায় হোগলা বা ত্রিপলের অস্থায়ী ছাউনি পাতে। তার নিচে বিকিকিনি হয়। চাষীরা তাদের খেতের তরমুজ নিয়ে আসে, মহাজনরা কেনে। বড় বড় লঞ্চ ভর্তি হয়ে সে তরমুজ চলে যায় কলকাতা, কাঁথি কি ডায়মণ্ড হারবার।

তরমুজ ওঠার মরসুমে এই তিন-চার মাস বেচা কেনা হয়। বছরের বাকি সময় এখানে হাটের চিহ্নও থাকে না।

ভ্যান টানতে টানতে হারু বাম হাতি খাড়ির বাঁকটা দেখিয়ে বলে, 'ওই যে ওখেনে সুটিন হইছিল—জিম আমপুরার, শত্রুঘ্ন সিনহা, হিন্দী ফিলিমের হিরো, এসেছিল সুটিন করতে…'

হারুর কথায় মন দেবার মতো আগ্রহ এখন নেই শ্যামাপদর। হাটের কাছাকাছি এসে হাটের হালচাল, আজকের পাইকারি দাম এসব অনুমান করতেই ওর মন উন্মুখ।

হাটে পৌঁছে যা দেখে যা শোনে তাতে মাথার আকাশ ভেঙে পড়ে শ্যামাপদর। দেখে পাইকাররা সব হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। তাদের আড়তের সামনে দাঁড় করানো তেপায়া বাঁশের মাঝখানে ঝুলন্ত দাড়ি পাল্লার কাঁটা অনড়। মাল কিনছে না কেউই। কারণ কি? না, চালানি পাঁচটা লঞ্চের মধ্যে তিনটে বিকল। তাই তারা মাল কিনে করবে কি? চালান দেবে কি ভাবে?

একজন চাষী ক্ষোভে চিৎকার করে ওঠে, 'ব্যাটাদের এসব কারসাজি, আঁটঘাট বাঁধা।'

'এখন এখনই বিকল হয় কি করে তিনটে লঞ্চ? আমরা কি সব ঘাসে মুখ দে আচি, বুঝি না কিছু!'

'ব্যাটাদের দাম নাবানোর ফিকির!'

'এখন মাল নে কি করি? তুলে দে আসি কোন সম্বন্ধির ঘর?'

মাল নিয়ে আসা চাষীরা সব এমন ভাবে হা হুতাশ চিৎকার চেঁচামেচি করছে। হাটে চাষীরাও জুটেছে প্রচুর। কদিন দাম উঠেছে ভালো, সেই খবর বাতাসে আতরের খুশবুর মতো ছড়িয়ে গেছে চাষীদের কাছে। আর শ্যামাপদর মতো আশায় আশায় সবাই মাল নিয়ে হাজির হয়েছে হাটে। চাষীদের এখন বাড়া ভাতে ছাই। কোপ বুঝে কোপ মেরেছে মহাজনরা। লঞ্চ খারাপ হওয়ার খবরটা যে আসলে ভাঁওতা, তা শ্যামাপদর মতো গোদা বুদ্ধির লোকও বোঝে।

হাটে তরমুজের আমদানিও হয়েছে রাশি রাশি। তরমুজভর্তি সাইকেল ভ্যান মোটর ভ্যানগুলো ইতস্তত দাঁড়িয়ে বিশাল হাট চত্বরে। সময় অপচিয়ত হয় জ্বলন্ত মোম বাতির গায়ে গলে গলে গড়িয়ে পড়া মোমের মতো। চাষীদের মনে ক্ষোভের বারুদ জমে। সামনে সমুদ্রে উত্থিত ঘূর্ণি বাত্যার মতো তাদের মনে ক্ষোভ গুমরে গুমরে ওঠে যেন বা।

'ভেঙে দে পুড়িয়ে দে শালোদের আড়ত মাড়ত….'

'ভেঙে দে ভেঙে দে…'

রে রে করে ওঠে হাজার কণ্ঠস্বর। অনেকে ধেয়ে যায় মহাজনদের গদির

দিকে। চাষীদের মধ্যে থেকেই কয়েকজন মাতব্বর তৈরি হয়ে যায়। তারা বাধা দেয়। তারা খেপে ওঠা চাষীদের শান্ত করার চেষ্টা করে। 'থামো, থামো সব....'

'না থামব না। শালা খুনে চুসতে এয়েচে আমাদের। জ্বালিয়ে দেবো সব।

'জ্বালিয়ে দিলে কি তোমাদের মাল বিক্রি হয়ে যাবে?'

চাষিরা উত্তর খুঁজে পায় না। এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। দিশাহীন ক্ষোভ থিতোয় যেন বা। তখন ঘটনায় যারা হাল ধরতে এগিয়ে এসেছিল, তারা মহাজনদের সঙ্গে শলাপরামর্শে বসে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে সময় ফুরোয় তিল তিল করে। চাষিদের মধ্যে যারা আলোচনায় বসেছিল তারা উঠে এসে বলল, 'শোনো, মহাজনরা বলছে ওরা সব মাল কিনতে পারবে না। ওরা প্রত্যেকের কাছ থেকে দু-কুইন্টাল করে মাল নেবে। দাম দেবে কুইন্টাল প্রতি দেড়শ টাকা...'

'না না না—'

আবার সকলের কণ্ঠে এক রা—প্রতিবাদের ধ্বনিতে, সমস্বরে, সামুদ্রিক বাত্যা প্রবাহের প্রবলতায়। কিন্তু চাষিরা ক্রমশ বোঝে তারা এখন মহাজনের বড়শিতে গাঁথা। তারা লেজের ঝাপটা মারতে পারে, কিন্তু অবশেষে মহাজনের বড়শিতে গাঁথা হয়েই উঠতে হবে। তারা কি করবে হাটে নিয়ে আসা এই মাল নিয়ে? এ তো লোহা লক্কড় ইট কাঠ নয়। এ তো পচে যাবার মাল। ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখে কি করবে? তারপর এই হাটে নিয়ে আসা, আবার ফেরৎ নিয়ে যাওয়া, আবার নিয়ে আসা—এসব করতে যে মেহনত, যে গাড়ি ভাড়া, তাতে তো ঢাকের দায়ে মনশা বিক্রির দশা হবে।

এইসব স্বাভাবিক বোধ, সহজ হিসেব নিকাশ ওদের ক্ষোভের তীক্ষ্ণতা ক্রমশ ভোঁতা করে দেয়। মনে জাগে হতাশা। তখন মহাজনদের প্রস্তাব ওদের কাছে গলা কাটা হলেও, ওরা তা মেনে নেওয়ায় নাচার হয়ে পড়ে। 'ভাইরে কর্জ নে চাষ করলাম মহাজনের কাছ থেকে, আবার মহাজনের ঘরে মাল তুলে দাও লোকসানে....'

'মহাজন হল শাঁখের করাত, যেতে কাটে আসতেও কাটে...'

'যা বলেছিস ভাই, চাষির কথা কেউ ভাবে না।'

এমনতর বুক-ছেঁচা আক্ষেপ বেরিয়ে আসে চাষিদের গলা থেকে। গ্রীষ্মের রোদ বাড়ন্ত, বেলায়। আগুনের আঁচের মতো গরম গনগনে। রোদ লেগে মাথার তালু বন বন করে। মহাজাগতিক আবর্তনক্রিয়ায় সূর্যটা খাড়াখাড়ি মাথার ওপর উঠে এসেছে এখন। চাষিরা খিদে ক্লান্তিতে বিমোয়। তাদের জেদি মনোভাব নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন দু-চারজন করে মহাজনের গদির

সামনে এসে ভিড় করে। তাদের দেখাদেখি আরো অনেকে আসে। যারা তখনো প্রতিবাদে একরোখা, তারা বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের বাধা কুটোর মতো ভেসে যায়। গদির সামনে ভিড় বাড়ে। সকলে মাল দিতে চায় আগে ভাগে। হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তখন উদ্যোগী হয়ে দু-চারজন লাইন তৈরি করে। সকলে দাঁড়ায় লাইনে। শ্যামাপদও দাঁড়ায়। লাইনে দাঁড়িয়ে শ্যামাপদ ভাবে, তার কত যত্নে বোনা সাধের এই ফসল তুলে দিতে হচ্ছে পড়াতি দামে। কত পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে এই ফসল বুনতে! কুপিয়ে কুপিয়ে জমি তৈরি করা, বীজ পোঁতা, জমির চার ধারে বেড়া দেওয়া, সার দেওয়া, জল সেচ করা···। ফল ধরার পর তরমুজ গাছে দু-বেলা জল দিতে হয়। না হলে তরমুজ বাড়ে না, সরস হয় না। শ্যামাপদ, তার বৌ ছেলে সবাই মিলে গাছে জল ঢেলেছে। পুকুর থেকে জল তুলে জমিতে সেচ করতে করতে শ্যামাপদর হাতের চেটোয় শক্ত কড়া পড়ে গেছে।

শ্যামাপদ মনে মনে হিসেব কষে দেখে, এই দেড়শ টাকা কুইন্টাল দরে বিক্রি করেও তার লোকসান হবে না। লাভ হবে, কম। শ্যামাপদর এই লাভটুকু হবে যেহেতু শ্যামাপদর অল্প জমি এবং চাষের জন্য তাকে মজুর লাগাতে হয় নি। পরিবারের সকলে গায়ে-গতরে শ্রম দিয়েছে জমিতে। কিন্তু যাদের সবটাই করতে হয়েছে মজুর দিয়ে। শ্যামাপদ ভাবে, তাদের লাভের মুখ দেখতে হবে না।

আবার এভাবেও হিসেব কষে শ্যামাপদ—সে মাল নিয়ে এসেছে চার কুইন্টালের মতো। দু-কুইন্টাল বিক্রি করে যদি দু-কুইন্টাল ঘরে নিয়ে যায় তাহলে হড়েগড়ে আর লাভ থাকে না।

মহাজনের গদিতে মাল কেনা শুরু হয়েছে। সামনে দাঁড় করানো পেল্লাই দাঁড়িপাল্লার কাঁটা একবার ডাইনে ঝোঁকে একবার বাঁয়ে ঝোঁকে। লাইনে দাঁড়ানো চাষিদের যার যখন পালা আসে তখন সে গাড়িতে করে নিয়ে আসা মাল আড়তের সামনে এনে নাবায়। মাল ওজন হয়। টাকা হাতে নিয়ে চাষি বেরিয়ে আসে লাইন থেকে।

যারা মাল বিক্রি করে চলে যাচ্ছে তাদের মুখে খুশীর লেশ নেই। তারা দুঃখী মুখে নিঃশব্দে চলে যায়। একজন চাষি তার এক টুকরি মাল পায় ঘাটের কিনারায় নিয়ে গিয়ে টুকরির মুখে দড়ির ফাঁস খোলে। টুকরিটা দু-হাতে চাগিয়ে ঈষৎ সামনে কাৎ করে। খোলা মুখ দিয়ে গোল তরমুজগুলো বেরিয়ে হড় হড় করে গড়িয়ে গিয়ে পড়ে সমুদ্রের জলে। আশপাশের মানুষরা হায় হায় করে ওঠে। "কি করো, পাগল নাকি!"

মানুষটা জামার আস্তিনে চোখ মুছে বলে, 'ভগবানের মার তবু সইতে পারি, কিন্তু এতো মানুষের মার, এ যে সয়া যায় না রে ভাই!"

সামনে লাইন খাটো হতে হতে এক সময় শ্যামাপদর পালা আসে। হারু আগেই সাইকেল ভ্যানটা টেনে এনে দাঁড় করিয়েছিল আড়তের সামনে। এখন শ্যামাপদ আর হারু দুজনে মিলে ধরাধরি করে এক টুকরি মাল নাবায়। মাল দাঁড়ি পাল্লায় ওজন হয়। এক টুকরির মালে দু-কুইন্টাল হয়েও পাঁচটা তরমুজ উদ্বৃত্ত হয়। সেগুলি হারু তুলে নিয়ে গিয়ে রাখে ভ্যানের ওপর। মহাজন শ্যামাপদর দিকে তিনটে একশ টাকার নোট বাড়িয়ে দেয়। শ্যামাপদ নোটগুলো হাতে নিয়ে যে যন্ডা মার্কা লোকটা মাল ওজন করছিল, তাকে বলে 'ভাই, আর এক টুকরি মাল আছে, নেবে ?' অতঃপর গলার স্বর খানিক নিম্ন খাতে নাবিয়ে বলে, 'না হয় আরো কিছু দাম কমই দেবে।'

ওজন করা লোকটি খেঁকিয়ে ওঠে, 'হাটো, হাটো তো—'

শ্যামাপদ শুখনো পাংশু মুখে লাইন থেকে বেরিয়ে আসে। ফসল বিক্রি করে হাতে টাকা পাওয়ার তার মনে খুশীর কোনো রোমাঞ্চ নেই। বরং বুকে ব্যথা বাজে রিন রিন শব্দে। এই কটা টাকা দিয়ে কিই বা হবে ? সাংসারিক চাহিদার বিশাল থাবাটার ফাঁক দিয়ে এই সামান্য টাকা ফস করে কোথায় গলে যাবে, শ্যামাপদ তার হদিস করতে পারবে না। হাটে আসার সময় বৌ লতু ও ছেলের সামান্য শখ—ব্লাউজ আর রঙ পেন্সিল কিনে নিয়ে যাবার আর্জি, সে পূরণ করবে কি ভাবে ? অবশিষ্ট তরমুজগুলো যদি বিক্রি করা যেত, তবু না হয় কিছুটা মানানসই হিসাব জুড়তে পারত শ্যামাপদ। সাইকেল ভ্যানের ওপর রাখা টুকরি ভর্তি তরমুজগুলোর দিকে শ্যামাপদ তাকায়। তরমুজগুলো দেখে শ্যামাপদর শরীর রাগে রি রি করে। এই ফলগুলো এখন এক রাশ জঞ্জালের চেয়েও মূল্যহীন। এগুলো এখানে ফেলে দিয়ে গেলে কিছু যায় আসে না। বরং টেনে বাড়ি নিয়ে যাবার ঝক্কি কমে। কিন্তু ফেলে দিতেও মন চায় না। নিজের হাতে বোনা ফসল তো ? একটা টান, কেমন একরকম মমতা অনুভব করে মনে।

শ্যামাপদ ভ্যানটার কাছে এসে হারুকে বলে, 'চ, এগো—'

পারঘাটা চত্বরে এতো খুচরো ভিড় যে ভ্যান চালিয়ে যাওয়া মুশকিল। তাই হারু হ্যান্ডেল ধরে ভ্যান টেনে নিয়ে যায়। পাশাপাশি হেঁটে চলে শ্যামাপদ। পারঘাটায় যাত্রীবাহী ভেসেল এসে ঠেকল। স্রোতের মতো যাত্রীরা আসছে ভেসেল থেকে। এই ভেসেল বা বড় লঞ্চ দূরে কাকদ্বীপের কাছে ৮ নং জেটি থেকে মানুষ বয়ে নিয়ে নাবিয়ে দেয় এই দ্বীপে।

ওরা খানিকটা যেতেই ডানহাতি পড়ে দোকান, সারি সারি। দোকানের সামনে বিশাল তাওয়ায় পরোটা ভাজা হচ্ছে। পেছনে শোকেসে সাজানো নানা রকমের মিষ্টি। পরোটা ভাজার গন্ধে বাতাস ম ম। এখন, এই গড়ানো দুপুরে, শ্যামাপদর পেট এমনিতেই চুঁই চুঁই করছে, তদুপরি দোকানে

ওই সব সুখাদ্যের দিকে চোখ পড়তেই পেটের ভেতর খিদের আগুন হিল হিল করে নেচে ওঠে। যেতে যেতে শ্যামাপদ দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ। হারু বলে, 'কি হল, চলো—'

শ্যামাপদ বলে, 'খাবি, পরোটা—'

হারু হ্যাঁ অথবা না কোনো উত্তর দেয় না। দেবার প্রয়োজন হয় না। শুধু চোখ দুটো লোভে চকচকিয়ে ওঠে তার। একটা খাবারের দোকানের সামনে আসে শ্যামাপদ। পিছু পিছু ভ্যান টেনে নিয়ে আসে হারু। শ্যামাপদ বলে, 'টুকরিটা নাবা।'

'কেন থাক না ভ্যানে।'

'বলছি তো নাবা।'

দুজনে ধরাধরি করে তরমুজ ভর্তি টুকরিটা নাবিয়ে রাখে ঠিক দোকানের সামনে। অতঃপর শ্যামাপদ বলে, 'ভ্যানটা রেখে আয় ওই গাছটার তলায়। এখানে রাখলে দোকানে ঢুকতে বেরুতে লোকের অসুবিধা হবে।'

হারু দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় ভ্যানটা দাঁড় করিয়ে রেখে ফিরে আসে। দুজনে ঢোকে খাবারের দোকানে। একটা ফাঁকা টেবিলের সামনে দুজন বসে পাশাপাশি। দোকানের বয় ওদের সামনে দু-গ্লাস জল নাবিয়ে দিয়ে বলে, 'কি দেবো?'

'পরোটা কত করে?'

'পঁচিশ টাকা কিলো।'

'দুশো করে দাও দুজনকে।'

পেটাই পরোটা, টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া, দুটো প্লেট ভর্তি—ওদের সামনে দিয়ে যায় বয় ছেলেটি। তার সঙ্গে ছোলার ডাল ফ্রি। গরম ডালের ওপর থেকে ধোঁয়া উড়ছে। প্লেটে সাজানো পরোটার টুকরোগুলো যেন শ্বেত পদ্মের একরাশ পাপড়ি। এমন লোভনীয় খাবার পেয়ে পেটের ভেতর খিদের অদৃশ্য ছানাপোনা গুলো যেন ধেই ধেই নৃত্য শুরু করেছে। দুজনে হামলে পড়ে খাবারের ওপর। খানিকটা খেয়েছে, শ্যামাপদ মুখ তুলে ইশারায় বয় ছেলেটিকে ডাকে। ছেলেটি সামনে এলে বলে, 'রসগোল্লা দাও দুটো করে।'

'ছোট না বড়?'

'বড়।'

প্লেটে বড় বড় দুটো করে রসগোল্লা দিয়ে যায় ছেলেটি। হারু ড্যাবডেবে চোখে রসগোল্লার চেহারা দেখে, তারপর মুখ তুলে শ্যামাপদর দিকে তাকায় মুগ্ধ দৃষ্টিতে। এই মুগ্ধতা বড় অমলিন ও খুশীতে ভরপুর। হারু আঙুল দিয়ে ধরে একটা রসগোল্লা তুলে নেয়। মুখের ভেতর অর্ধেকটা ঢুকিয়ে দাঁত

দিয়ে আলতো চাপ দেয়। রসগোল্লার গা থেকে একটু রস পিচকিরির মতো পুচ করে বেরিয়ে পড়ে প্লেটের ওপর। মুখের ভেতরটা মিষ্টি রসে ভরে যায়। তৃপ্তিতে হারুর চোখ দুটো বুজে আসে স্বত।

প্লেটে পরোটা শেষ হতেই আরো দুপো করে পরোটার অর্ডার দেয় শ্যামাপদ। তার সঙ্গে বড় বড় অমৃতি দুটো করে। হারু অবাক দৃষ্টিতে তাকায় শ্যামাপদর দিকে। বলে, 'কি করছ শ্যামাদা! ওঠো—'

শ্যামাপদ হারুর দাবনায় ঈষৎ চাপ দিয়ে বলে, 'খা খা....'

তারপর শ্যামাপদ আর থামে না। একের পর এক অর্ডার দিয়ে যায়। গজা পানতুয়া মোন্ডা রসমালাই মায় বড় বড় সন্দেশ। প্লেটের পর প্লেট খালি হয়ে যায়। এর মধ্যে আরো এক দফা পরোটা আসে। খেতে খেতে কয়েকবার বাধা দেবার চেষ্টা করেছে হারু। শ্যামাপদ শোনেনি। দয়ার সাগরের মতো ভঙ্গি করে বলেছে, 'খা হারু, খেয়ে যা···'

এক সময় নিবৃত্ত হয় শ্যামাপদ। তখন প্লেটে প্লেটে টেবিলে প্লেটের মেলা বসেছে। পেটটাও ভরে উঠেছে বেশ। এক গ্লাস জল ঢক ঢক করে গিলে শ্যামাপদ ওঠে। দোকানদারের সামনে এসে দাঁড়ায়। 'কত হয়েছে?'

'একাশি টাকা।'

শ্যামাপদ কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে এমন বাদশাহী ভঙ্গি করে যেন একাশি টাকাটা ওর কাছে কিছুই নয়। পাশ পকেটে হাত ঢোকাতে দু-এক টাকার কয়েকটা খুচরো নোট বেরিয়ে আসে। কোমরের কষিতে গুঁজে রাখা তরমুজ বেচারা টাকায় হাত দেয় না। পকেটের সামান্য টাকা পকেটে ঢুকিয়ে দেয়। দোকানের নিচে রাখা তরমুজের টুকরিটা দেখিয়ে সহজ স্বরে বলে 'ওটা রইল। মহাজনের কাছে টাকা পাবো, নিয়ে এসে দিচ্ছি এক্ষুনি....'

দোকানদার হ্যাঁ অথবা না কোনো উত্তর দেয় না, অথবা ভেবে চিন্তে উত্তর দেবার ফুরসৎটুকু পায় না। তার আগে শ্যামাপদ দোকান ছেড়ে নেমে আসে। পেছু পেছু আসে হারু। দুজনে দ্রুত গাছতলায় দাঁড়ানো সাইকেল ভ্যানটার দিকে হেঁটে যায়। ভ্যানটার কাছে আসতে শ্যামাপদ বলে, 'তাড়া-তাড়ি সাইকেলে উঠে চালা হারু—'

গোটা ব্যাপারটা হারুর কাছে কেমন যেন রহস্যময় ঠেকে। কিছু বুঝতে না পেরে বেকুফের মতো গড়িমশি করছে দেখে শ্যামাপদ খেঁকিয়ে ওঠে, 'আরে শুয়োর, ওঠ না গাড়িতে জলদি···'

ধন্ধ ঝেড়ে ফেলে হারু তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওঠে এবং চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো জোরে গাড়ি ছুটিয়ে দেয়। শ্যামাপদ চলন্ত গাড়ির পাটাতনে উঠে বসে। অবিশ্রাম ও সমান্তরাল গতিতে মিনিট পাঁচ গাড়ি চালানোর পর,

ওরা যখন হাট এলাকা ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে এসেছে, তখন, হারু গাড়ির গতি শ্লথ করে, এবং গাড়ি চালাতে চালাতে পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে পাটা-তনের ওপর বসে শ্যামাপদ আয়েশ করে বিড়ি ফুঁকছে। শ্যামাপদর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসে হারু।

'কি রে হাসছিস যে বড় !'

এবার হারু সজোরে হেসে ওঠে। হাসির ধকলে সিটের ওপর ওর দেহটা বেঁকে চুরে যায়।

'শালো হাসে দেখো পাগলের মতো !'

হাসতে হাসতে হারু বলে, 'শ্যামাদা বেড়ে খেল দেখালে মাইরি !'

আত্মপক্ষ সমর্থনের স্বরে শ্যামাপদ বলে, 'কি করব বল ! বাড়ি নে গিয়ে তো কেটে কুচিয়ে গরুকে খাওয়াতে হতো, তার চে....একাশিটা টাকা তবু অশুল হল....'

হারু রাস্তার কিনারে একটা গাছের ছায়ায় গাড়ি দাঁড় করায়। নাবে। বলে, 'একটা বিড়ি দাও দাদা, টানি—'

শ্যামাপদ পকেট থেকে বিড়ি বের করে দেয়। ঠোঁটে লাগিয়ে ধরায় হারু। টানতে টানতে বলে, 'খাওয়াটা বেশ যুতসই হল শ্যামাদা। এক সাথে এত রকমের মিষ্টি খাই নি কখনো। পেট ভরে গেছে একেবারে—তোমার ?

শ্যামাপদ উত্তর দেয় না কোনো। একটা ঢেকুর, দীর্ঘ ও ভারি, টেনে তোলে শুধু পেটের গূঢ় গহ্বর থেকে....।

অনামিকা শিব-এর কয়েকটি কবিতা

মায়ের প্রতি

অনুবাদ : জয়া মিত্র

মা, বলো না
যখন তুমি ঘুমোও
কে জেগে থাকে তোমার শিয়রে ?
মা,
যখন কাঁদো তুমি
কি সে যা তোমার ভিতর
শুকিয়ে ওঠে ?

মা
যখন রুটি বেলতে বস
দলা পাকিয়ে যায়
তা কি ?

যখন সেলাই কর ছেঁড়া আঁচল
কি বলো না
রয়ে যায় তখনও
যেমনকার তেমন ছেঁড়া ?

মা,
যখন দাঁড়িয়ে ওঠো তুমি
তখন সে কে
যে তোমার সামনে বামন হয়ে দাঁড়ায় ?

কি করে সে বন্ধু হবে

গাছ
বন্ধু হতে পারে না
বন্ধু হতে পারে না গাছ
বন্ধুরা তো স্থির থাকে না কখনও
তারা দৌড়ে চলে যায় আমাকে পার করে

দৌড়ে যায় না গাছ
দাঁড়িয়ে থাকে একই জায়গায়
প্রতীক্ষা করতে থাকে
বিছিয়ে রাখে ছায়া

বন্ধুকে হনন করা
কিংবা
নিহত হওয়া বন্ধুর হাতে
এমন হতে নেই

নিহত হচ্ছে গাছেরা
কেননা
গাছের বন্ধু তো নয়

এই সময়

যে কোনদিন
বাবা যখন বাড়ি ফিরবে দোকান থেকে
আপনাদের কাউকে আর
জীবিত দেখবে না
মায়ের হাত চুড়ি সমেত
পড়ে থাকবে কাটা
ছিঁড়ে নেওয়া
আমার কানফুল সুদ্ধ কান

রিংকি পিংকির মৃতদেহের চোখ
বিস্ফারিত থাকবে আতঙ্কে
পড়শিরা
সত্যি মিথ্যে মিশিয়ে
গল্প করবে এইসব কথা
একদিন
বাবা যখন দোকান থেকে ফিরে আসবে।

খবরের কাগজ

রোজকার খবরের কাগজের মত
খোঁজ পড়ে আমার
সারাদিন নানাবিধ খবরে সাজান
কেটে যায়
রাত শেষ হয়ে গেলে—বাসি।

শেষ হয়
আমাকে হাতে পাওয়ার
বুকে নেবার কাল
কাছে পাবার ইচ্ছেও
আর থাকে না বাকি
আমার নিয়তি
প্যাকেট কি মোড়ক হওয়া
কিংবা
পড়ে থাকা আবর্জনার গাদায়।

[গত বছর ভাগলপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শিনী একটি ছোট্ট মেয়ে অনামিকা শিবাদিন্দ থেকে তাঁর কবিতাগুলো অনুবাদ করা হয়েছে।]

কী জানি

সুব্রত সেনগুপ্ত

আমার কী চাই ! আমার কী কী দরকার ? এ সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আসলে এখন আর বিশেষ ভাবতে হয় না। এসব ভাবার জন্য বিশেষজ্ঞরা আছেন। তাঁরাই আমাকে জানিয়ে দেন। জানানোর ব্যাপারে তাঁদের কোন ক্লান্তি নেই। আহ কী সুন্দর সময়ে আমরা বেঁচে আছি !

আমার কী প্রয়োজন জানিয়ে দিয়ে আমাকে যে ভিড়ের রাস্তায় ছেড়ে দেয়া হবে, তা নয়। আমি কোথায় পাব, কী পাব ? —তাও আমাকে জানিয়ে দেয়া হবে।

অতএব নিশ্চিন্তে আমি ঘুম থেকে উঠতে পারি। ঘুম থেকে কী রকম ব্রাশ দিয়ে কোন টুথপেস্টে দাঁত মাজতে হবে...শুরু এখান থেকে এরপর সারাদিন, বিকেল-সন্ধ্যে এবং রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত আমার সমস্ত কাজে পরামর্শ দেওয়ার জন্য তাঁরা আছেন। তাঁরা আছেন। তাঁরা মানে বিজ্ঞাপনদাতারা। তাঁর সব জানিয়ে দেন তাঁরা সব বুঝিয়ে দেন।

এখন আমার মনে হয় আমার কী কী সমস্যা আমি জানতামই না। আমার কীসের অভাব, আমি কী চাইব সে সম্পর্কে আমার ঠিক ঠিক ধারণা ছিল না। চুপি-চুপি বলছি, বিজ্ঞাপনের এত উপকারিতার কথা আমি জানতামও না। জানলাম কীভাবে ! জেনে গেলাম কিচুর জন্য।

কিচু কে ? কিচু একটা মেয়ে। যুবতী। আমাদের অফিসের নতুন চাকরি পেয়েছে। তাকে দেখেই আমার মনে হল...ভাবছেন মনে হল, যেন

কত কালের চেনা?…না না, সেসব নয়। ওর পোশাক, ওর মেকআপ, ওর চুল কাটার স্টাইল, ওর বসার ভঙ্গি, কথা বলার ধরণ, এমনকি ওর হাসা, বিস্ময় প্রকাশ করা সবাই যেন কার মতো অথবা কাদের মতো। প্রথমে ভেবেছিলাম কোন সিনেমার অভিনেত্রী হয়ত ওর আদর্শ।….কিন্তু না, তারপরই বুঝলাম ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনে, টি ভি-র বিজ্ঞাপনে যে-রকম মেয়েদের দেখা যায় ও তাদের মতো। একদিন ওর হাতে অনেকগুলো মেয়েদের পত্রিকাও দেখলাম।

আমি, অবশ্য, মেয়েদের পত্রিকা পড়ি না। পড়ি কমিকস—যতটা পড়ি, দেখি তার চাইতে বেশি। কিচুকে দেখে আমি আকৃষ্ট হলাম কিনা জানি না তবে ওর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে হল খুব।

একটা মেয়ের সঙ্গে বিশেষ করে সহকর্মিনীর সঙ্গে আলাপ করাটা অনেকের কাছে কোন সমস্যা নয়। কিন্তু আমি আমি এখনও এতটা স্মার্ট নই।

আমি জানি, সপ্রতিভ হওয়া দরকার কিন্তু আমাকে সপ্রতিভ বলা যায় না।

আমি জানি চটপটে হওয়া দরকার কিন্তু আমি তেমন চটপটে নই।

আমি জানি কথাবার্তায় তুখোড় হওয়া দরকার কিন্তু আমি তা নই? কী করা যাবে?

আমার এক বন্ধু আমাকে এক সময় উপন্যাস আর কবিতা পড়ার পরামর্শ দিয়েছিল। এতদিন পড়া হয়নি। কিচুর সঙ্গে কীভাবে আলাপ করব শিখতে বেশ কয়েকটা বই সংগ্রহ করলাম। আমি জানতাম এ ব্যাপারে কমিকস আমাকে কোনরকম সাহায্য করবে না। সেজন্য ছুটির দিন কবিতা আর উপন্যাস নিয়ে বসলাম। পড়তে আমার ভাল লাগে না। পড়ার অভ্যাস নেই আমার। ফলে শুয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে আমার ঘুম পেয়ে গেল। বুঝলাম, বই আমার কোন কাজে লাগবে না। এর আগে দেখেছি কোন বিষয়ে বেশি ভাবতে গেলেও আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমার চোখে ঘুম নেমে আসে।

আমার জেঠু যা বলতেন—আমি আসলে খুব অলস। আমি কখনও আলসেমি কাটিয়ে উঠতে চাইনি, কাটানোর চেষ্টাও করিনি। ফলে বই পড়তে গিয়ে ঘুম পেয়ে যাওয়ায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়িতে দেখলাম সাতটা বাজে। সাতটা রাতের এমন একটা সময় যখন কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। আবার ঘুমিয়ে পড়াও চলে না। এক গ্লাস জল আর কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে টি ভি খুলে বসলাম।

আরেকটু পরেই খবর শুরু হবে। খবর-টবর আমার ভাল লাগে না। এসব দেখেশুনে আমার বন্ধু পরেশ। সে এক অদ্ভুত ছেলে। গাদা গাদা বই পড়ে। বই কেনে আর পড়ে। পরেশ কথায় কথায় সংস্কৃতি-সাহিত্য এসব ভারি ভারি বিষয় নিয়ে জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করে। টি ভি-কে ও বলে…

যাক পরেশের কথা। ও হয়ত এখন স্টুডেন্টস হল বা অন্য কোথাও কবিতা পাঠ শুনতে গেছে। ওর যা ভাল লাগে ও করুক। আমার যা ভাল লাগে আমি করি। টি ভি-র মেট্রো চ্যানেল চালিয়ে দিলাম। অনুষ্ঠানগুলি আমার ভাল লাগে ঠিকই, তবে অনুষ্ঠানের চাইতেও বেশি ভাল লাগে বিজ্ঞাপন, মানে এখন কিচুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে। সে ঘটনাই বলছি। ছোট পর্দার ওপর চোখ রেখে আমি আরাম করে সোফায় বসে আছি। ইস পড়াচড়ায় কী পরিশ্রম। টি ভি দেখায় কোন পরিশ্রম নেই। কিন্তু....

একটানা টি ভি দেখতে-দেখাত আমার মাথা ধরে গেল। টি ভি-টা বন্ধ করলাম। কিন্তু তাতে মাথার যন্ত্রণা কমার কথা নয়।....তাহলে আমি কী করব ?

হঠাৎ মনে পড়ল, টি ভি তে সেদিন মাথার যন্ত্রণার একটা ওষুধের বিজ্ঞাপন দেখেছি। পর্দার ছবিতে একটা মেয়ের মাথা ধরেছিল খুব। তারপর আড়াল থেকে একজন তাকে সেই ওষুধটা খাওয়ার উপদেশ দিল। সে খেল এবং খাওয়ার পর সে হাসতে লাগল। হাসতে-হাসতে নাচতে লাগল।....

আমার বাড়ির কাজের লোক বেনুকে টাকা দিয়ে সেই ওষুধটা কিনে আনতে বললাম। সে ওষুধ নিয়ে ফিরে এসে বললাম, এক গ্লাস জল দে।

বেনু জল নিয়ে এল।....জল দিয়ে ট্যাবলেটটা গিলে ফেললাম। আর আশ্চর্য ! কিছুক্ষণের মধ্যে আমার মাথার যন্ত্রণা সেরে গেল !—তাহলে বিজ্ঞাপনে যা দেখায় তা সত্যি। মোটেও মিথ্যে নয়। আবার টি ভি চালিয়ে দিলাম। আবার সোফার আধশোয়া অবস্থায় টি ভি দেখতে লাগলাম। কিন্তু কিন্তু হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপন দেখতে-দেখতে আমাকে সোজা হয়ে বসতে হল। বিজ্ঞাপনে একটি ছেলে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করছে। প্রথমে সে ব্যর্থ হল—পর পর দু'বার। তৃতীয় বার সে বিশেষ কোম্পানীর চকলেট নিয়ে হাজির হতে মেয়েটি ভুবন-ভোলান হাসি হেসে বলল, হ্যালো ?

মেয়েটির হাতে চকোলেট তুলে দিয়ে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, বন্ধুত্ব করবে আমার সঙ্গে ?

মেয়েটি তার সুন্দর হাতে ছেলেটির হাত ধরল। বাহ্ চমৎকার ?

পরের দিন অফিসে সেই চকোলেট নিয়ে গেলাম। নিজের চেম্বারে বসে কাজ করতে করতে ভাবছি কীভাবে কিচুকে চকোলেটটা দেব ? কী ভাবে ? কোন অজুহাতে ওর সামনে নিয়ে দাঁড়াব ? জিনিসটা দিতে গেলে আমাকে তো ওর কাছে পৌঁছতে হবে ? ওর কাছাকাছি যেতেই ও যদি ভ্রু কুচকে প্রশ্ন করে, কী চাই ?

তখনই চটপট চকোলেট দিতে গেলে ও চেঁচিয়ে উঠতে পারে, একী এটা অফিস, না কী ? কেন ? চকোলেট কেন ?

ওর কেন-র প্রতিক্রিয়ার চারপাশে থেকে জোড়া জোড়া চোখ আমার দিকে পড়বে। সেই সব চোখে লেখা থাকবে, কেন? কী জবাব দেব আমি?

তাহলে কী করব? অফিসের ছুটির পর পকেটের চকোলেট পকেটে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাব? কিচুর জন্য কেনা জিনিস নিজেই সোফায় বসে খাব? আহ্ এই সময় পরেশের সঙ্গে দেখা হলে বড় ভাল হতো। ও বেশ চিন্তা করতে পারে—যাকে বলে অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা করতে পারে। কিন্তু বেশি ভাবতে গেলেই আমার মাথা ধরে যায়।

বেলা যত বাড়তে লাগল আমার উত্তেজনাও বাড়তে লাগল। কী করি? কী যে করি?

শেষে নিজেকে টেনে নিয়ে গেলাম কিচুর টেবিলের সামনে। ও মুখ তুলল না। যেমন কাজ করছিল করতে লাগল। আমার যে প্রশ্ন করার কথা ছিল না তাই করে বসলাম, আপনি টি ভি দেখেন?

এই সেরেছে। কিচুর মুখে বিরক্তির ছাপ পড়ছে, নাকি রাগের, নাকি দুটোরই ছাপ পড়ছে? দৌড়ে পালিয়ে যাব নাকি!...পালানোর আগে ওর জন্য কেনা জিনিস দিয়ে যাই। যা আছে কপালে।

তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ঢোকালাম। পকেটে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই। চকোলেট নেই। তার মানে ভুল পকেটে হাত ঢুকিয়েছি। অন্য পকেট থেকে মোটা সোটা চকোলেট বেরুল। ওর টেবিলের ওপর রেখেই পালাব।

রাখলাম। রাখতে গিয়ে শব্দ হল। কিচু চোখ তুলল। সেই চোখ পড়ল সুন্দর মোড়কে ঢাকা চকোলেটের ওপর। কিচুর মুখ কোমল হয়ে উঠেছে। কে জানে এ আবার কোন ছলনা? কিন্তু...কিন্তু আমি যা দেখছি, সত্যি দেখছি তো?

কিচু চকোলেটটা তুলে নিল। এবং আমার দিকে তাকিয়ে হাসল একেবারে সেই বিজ্ঞাপনের মেয়েটির মতো।

আমি যা শুনছি, সত্যি শুনছি তো?

কিচু আমার দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলছে, হ্যালো?

আমি বিজ্ঞাপনের সেই ছেলেটির মতো বলার চেষ্টা করলাম, বন্ধুত্ব করবে আমার সঙ্গে?

এবার ওর আমার হাতের দিকে হাত বাড়ানোর কথা। মানে টিভি-র বিজ্ঞাপনের মেয়েটি তাই করেছিল। কিন্তু ও হাত বাড়াচ্ছে না তো? আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। আমার পয়সায় কেনা চকোলেট হস্তগত করে এখন আমাকেই অপমান করবে না কি?

না, কিচু হাত বাড়াল না। চোখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, অফিসের পর কী করছেন?

না-ভেবেই প্রশ্ন করলাম, ছুটির পর তোমাকে এগিয়ে দেব ?

ও ঘাড় কাত করে হাসল।

আমি আমার চোখের সামনে কোন মেয়েকে কোনদিন এভাবে হাসতে দেখিনি। সুখে আমার যে কী করতে ইচ্ছে করছে ? কী করে, কী করতে হয় এরকম সময় ? আমি জানি না। জেনে নিতে হবে। না, পরেশের কাছ থেকে নয়। জানতে হবে কোন বিজ্ঞাপন দেখে। ওহ বিজ্ঞাপন। আশ্চর্য তোমার মহিমা।

হয়ে গেল কিচুর সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং দ্রুত পাল্টে যেতে লাগলাম আমি। আমার মধ্যে যে এত কিছুর অভাব ছিল তা আমি জানতামই না। কেউ তো বলে দেয়নি। নিজেরও মনে হয়নি কখনও। এখন জানাল বিজ্ঞাপন।

সরাসরি বিজ্ঞাপন দেখে আমি কিছু জানতে পারি। কিচু বিজ্ঞাপন দেখে এসে আমাকে কিছু জানিয়ে দেয়। এইভাবে পাল্টে গেল আমার বাড়ির বসার ঘর শোয়ার ঘর মায় বাথরুম। পাল্টে গেল আমার জুতো-মোজা-জামা। এমনকি যাকে অন্তর্বাস বলে সেই গেঞ্জি ইত্যাদি। পাল্টে গেল আমার চুলের-গোঁফের ছাট জুলপির কাট। পাল্টে গেল ব্যবহারের জিনিসপত্র। ব্যবহারের তালিকাও বেড়ে গেল। আমার হাঁটা-চলা-দাঁড়ানোর ভঙ্গি কথা বলার ধরণ। আমার মুখের ভাষাও পাল্টে গেছে। নতুন এই ভাষার নাম হিংলিশ—কিছুটা ইংরেজি কিছুটা হিন্দি। বিজ্ঞাপন জিন্দাবাদ।

মানুষের কত কিছু প্রয়োজন মানুষ কী জানে ? কার কীসের অভাব বিজ্ঞাপন তা জানিয়ে দেয়। জানিয়ে সমস্যায় ফেলে না। সমাধানের পথও বাতলে দেয়। আহ বিজ্ঞাপন।

কিচুকে একদিন মেট্রো রেলে তুলে দিয়ে ফিরছি হঠাৎ দেখা ব্যাটা পরিতোষের সঙ্গে।

এতক্ষণ কিচুর সঙ্গে ছিলাম মনটা ভারি ভাল ছিল। হাত বাড়িয়ে বললাম হ্যালো ইয়ার…

পরিতোষ আমার দিকে কটকট করে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, তোর সঙ্গে একদিন যেন একটা মেয়েকে দেখলাম ?

ব্যাটা কিচুর কথা বলছে। আমাকে ওর সঙ্গে ছাড়া কার সঙ্গে দেখবে ? আর ওকে আমার সঙ্গে ছাড়া আর কার সঙ্গে দেখবে ? হেসে জিজ্ঞেস করলাম, ক্যাইসা লাগা মেড ফর ইচ আদার ?

বিজ্ঞাপনের ভাষা বলতে পেরে গর্ব বোধ করলাম। কিন্তু পরিতোষ নাক কুঁচকে জিজ্ঞেস করল তোর গায়ে কীসের গন্ধ ? তুই মেয়েদের মতো…

না-রেগে হেসে বললাম, ফোরেন…ফ্যান্সি মার্কেট থেকে….

পরিতোষ জিজ্ঞেস করল এবং উদ্বেগের গলায়, তোর কী হয়েছে ?

আশ্চর্য, কোথায় আমাকে দেখে ও বিস্মিত হবে, ঈর্ষা করবে আমাকে—তা নয় ও যেন আমাকে দেখে দুশ্চিন্তায় পড়েছে। জানতে চাইছে, আমার কী হয়েছে? পরিতোষ আবার বলল, তোকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন? তুই এরকম বাঁদরের ভাষায় কথা বলছিস, ব্যাপার কী?

বলে কী এ? ও জানে না এখন এই ভাষা-ই চলছে। ও একে বলছে বাঁদরের ভাষা! নিশ্চয় হীনমন্যতা থেকে বলছে। কিন্তু আমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে! আমাকে তো ক্লান্ত দেখানোর কথা নয়। বেশ আছি। তোফা আছি। পরিতোষও আর যাই হোক মিথ্যে কথা বলার ছেলে নয়। তবে?

পরিতোষ আবার কথা বলল, আজ আমার তাড়া আছে। চলি। এর মধ্যে একদিন তোর বাড়ি যাব। ঠিক আছে রবিবার সকালে।

যাক পরিতোষ। ব্যাটা যেন বিবেকের ভূমিকায় নেমেছে। আমার পোশাক-আসাক, চাল চলন দেখে ঘাবড়ে গেছে বোধ হয়। ভালই হল ও আমার বাড়িতে আসবে। আমার বাড়ির আসবাবপত্র সাজসরঞ্জাম দেখে ওর মাথা ঘুরে যাবে। দেখব তখন ও কী বলে। কিন্তু ওর কথা বলার ধরনটা কেমন না? রবিবার সকালে তোর বাড়ি যাব। যাওয়াটা যেন শুধু ওর ওপরে নির্ভর করছে। আমার বাড়ি যাবে অথচ আমার সুবিধে-অসুবিধে সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার কোন দরকার নেই। নিজেকে কী মনে করে ও? কিছু ওকে দেখলে তো হেসেই অস্থির হয়ে উঠবে।

পরিতোষ চলে যেতে আমি দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলতে লাগলাম, যেভাবে বিজ্ঞাপনের ছেলেরা হাঁটে।...শিস দেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঠোঁট ছুঁচলো করা সত্ত্বেও শব্দ বেরুল না।

রবিবার পরিতোষ এল কথা মতো। আমি ওর ভালো দিকে বসেছি। পায়ের ওপর পা তুলে। ওকে লক্ষ করছি। পরিতোষ হঠাৎ আমার হাতে ধরে বলল, তোর কোন অসুখ করেছে?

কোথায় ভেবেছিলাম আমি ওর মাথা ঘুরিয়ে দেব এখন দেখছি আমারই মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। আমি অসুস্থ? মানে কী? ও কী বলতে চায়?

পরিতোষ উঠে দাঁড়াল, বলল, কাল তোর অফিসে যাব। তখন কথা হবে।

চলে গেল পরিতোষ। আমি ওকে থাকতে বলার সাহস পেলাম না।

সোমবার ছুটির মুখে পরিতোষ এল। রাস্তায় বেরিয়ে ও জিজ্ঞেস করল, জামা-প্যান্ট, সারিসারি দোকানে এক রকম পুতুল সাজিয়ে রাখে দেখেছিস?

আমার হিংলিশ শুনে ও সেদিন বলেছিল বাঁদরের ভাষা, ফলে সে ভাষা ব্যবহার করতে সাহস পাই না। বলি, হুঁ।

পরিতোষ আমাকে নিয়ে গেল লিন্ডসে স্ট্রীটে। দাঁড় করাতে লাগল একেকটা দোকানের সামনে। দোকানে যে জানালার মতো থাকে; সেই জানালার সাজানো টবে মানুষ-প্রমান পুতুল সুবেশ ও সুবেশা নর ও নারীর পুতুল সেই সব জানালার সামনে গিয়েও বলতে লাগল, দেখ।

ওর দেখ-দেখ-দেখ শুনে আমার মাথা ধরে গেল। ও কেন এসব দেখাচ্ছে আমাকে? ও কী চায়? পরিতোষ বলল, দেখ। তুই আর মানুষ নেই ঐ পুতুল হয়ে গেছিস। যা বাড়ি যা।

পরিতোষ আমার ভাষাকে বলেছে বাঁদরের ভাষা।

ও বলেছে, আমাকে ক্লান্ত দেখাছে।

ও বলেছে, আমি অসুস্থ।

ও বলেছে আমি পুতুল-পুতুল-পুতুল।

ও কি আমাকে অপমান করতে চায়? আমি কি সত্যি ক্লান্ত?

টেলিভিশন না খুলে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। যেন বহুদিন নিজেকে দেখিনি। নিজেকে দেখার ব্যাপারে কোন বিজ্ঞানদাতা আমাকে সাহায্য করতে পারবে? কে জানে?

মৃত্যু পেরিয়ে

সুবর্ণম সেনশর্মা

জমাদারটির নাম শিউপ্রসাদ বাল্মীকি। এর নামে আপৎকালীন বিভাগে আগেও নালিশ হয়েছে শুধু রোগীরা নয়, নালিশ করেছে অন্য জমাদার. ড্রেসার, ট্রলিবয়রাও। ডিউটির সময় প্রায়ই সে সুরাসক্ত অবস্থায় দুর্ব্যবহার করে থাকে....

টেব্‌লের উল্টোদিক থেকে একজন হাত তুলে শমীককে থামিয়ে দেয়: আপনি নতুন কিছু বলছেন কি? এত জানা কথাই হাসপাতালের সুইপার কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও রোগীকে বেডপ্যান দেয় না, অ্যাটেনডেন্ট একসঙ্গে চার রোগীর দেখভালের দায়িত্ব নিয়েও মুমূর্ষু রোগীদের ফেলে রেখে করিডোরে তাস খেলে ইউনিয়ন অফিসে আড্ডা মারতে যায় আর যে রোগীর অ্যাটেনডেন্ট রাখার পয়সাই নেই তার কথাত ছেড়েই দিলাম···

শমীকের এক সিনিয়র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: এসময়ে ডঃ শমীক বোসকে বলতে দেয়া হোক। ব্যাপারটা যথেষ্ট গুরুতর অন্য প্রসঙ্গ তুলে আড়াল করলে....আড়াল করা হচ্ছে না। জানি যথেষ্ট দুঃখের একটি কারণ ঘটেছে। জমাদারটিকে সাসপেন্ড করলে সমস্যা মিটে যাবে?

—অন্তত দৃষ্টান্তমূলক বরখাস্ত করা হোক। এর আগেও ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সাময়িক হলেও ওর শাস্তি এখনই পাওয়া উচিৎ। আর ও যদি এখনও ইমার্জেন্সিতে ডিউটি করতে থাকে, আমরা ইমার্জেন্সি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দাঁড়ান দাঁড়ান। সুপারকে ইঙ্গিত করতেই তিনি টেলিফোন তুলে,

বললেন ওয়ার্ড মাস্টারের লাইনটা দেখি। সরিয়ে নিলে হবে ত, তিনি শমীকের দিকে ফিরলেন।

শমীক বলল, এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। শিউপ্রসাদ আজকেও বহাল তবিয়তে ইমার্জেন্সি গেটে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুকছে। হি সিম্পলি লাফড্ এট মি—ভাবটা এমন তুই আমার এই করলি। স্যর বহুকষ্টে আজ নিজেকে আমি সামলেছি। ওর গায়ে হাত তুললে ত তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যেত, ভাঙচুর হত—কাগজে খবর বেরত হাসপাতালে ডাক্তার সুইপার মারামারিতে হাসপাতাল বন্ধ।

টেব্‌লের উল্টোদিকের ভদ্রলোক আবার হাত তুললেন, লিসেন, ওয়ান মিনিট—সুইপার ট্রলিটা তক্ষুনি এনে দিলে বাঁচাতে পারতেন ?

শমীকরা সবাই হৈ চৈ করে উঠল। আপনি একটা ইম্পরট্যান্ট ইস্যু এড়িয়ে যেতে চাইছেন। শমীকের এক সহকর্মী বলে উঠলেন, দুর্ঘটনাটা শিউপ্রসাদেরও ঘটতে পারত—তখন একই রিফ্লেক্স কাজ করত শমীকের অথচ শমীক চেঁচিয়ে ট্রলি চাইলে সুইপার খুব তাচ্ছিল্য সহকারে বলে উঠল—'যো কই হো—ট্রলি হাম নেহি দেঙ্গে।'

শমীক হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, রাজনীতির লোক গুলো এত ব্লান্ট হয়। অথচ বলার সময় তো একটাই গৎ বাজান হয়—ডাক্তার বাবুরা রোগীদের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পাবলিক সেন্টিমেন্টকে এমন কৌশলে সুরসুরি দেয়া হচ্ছে যে পুলিশের পরেই জনরোষে ডাক্তারদের ওপর। এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল এখন অব্দি বাসটাকে ধরা গেল না, হাসপাতালের সামনে একটা স্কুল, একটা সিনেমা হল—প্রতিনিয়ত জীবন হাতে করে পারাপার করতে হয়! একটা ফুট ব্রিজ এত উঁচু করে বানান হল যে যেখানে উঠলে একটা বাচ্চা ছেলেরও হার্ট থ্রব হবে। নামকাওয়াস্তে পুলিশ থাকে, থাকলেও তারা বেশী ব্যস্ত কোলেমার্কেটের দিককার লরিওয়ালাদের সঙ্গে লেনদেন-এ। কোনমতে আপনি রাস্তা পেরলেও নিস্তার নেই—সাবওয়ে দিয়ে উঠে আসা কোন গাড়ি আপনাকে ধাক্কা দিতে পারে। নিষেধ না মানা ট্রামলাইনের দিকে ছুটে যাওয়া বাসও পারে আপনাকে পিষে দিয়ে যেতে…

এই তো সেদিন ব্যাঙ্কশাল কোর্টের লইয়ার বন্ধু শ্রীপতি এক শনিবার ওদের আড্ডায় শমীককে ডেকেছিল। আড্ডায় সেদিন নানারকম আলোচনা চলছিল। আন্তর্জাতিক, জাতীয়, প্রাদেশিক রাজনীতি সাম্প্রদায়িক ইস্যু নিয়ে আলোচনা চলতে চলতে হঠাৎ ওরা ডাক্তারদের নিয়ে পড়ল। শ্রীপতির পাশে বসা, ওদেরই এক বন্ধু (সেদিনই নতুন তাকে দেখল শমীক) হঠাৎ এক গাল হেসে শমীককে বলল আপনি সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার ? আপনাদের একটা মানি আর্নিং স্কিম না কি একটা চালু হয়েছে....

শমীকের কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিল খোঁচাটা ধরতে। সে সেটা গায়ে না'মেখেই হেসে উত্তর দিয়েছিল আপনি ভুল করছেন ওটা মানি আর্নিং স্কিম নয় ওটা এম. ই. এস ঠিকই ওটা মেডিক্যাল এডুকেশন সিস্টেম। সরকারী হাসপাতালে শিক্ষায় নিয়োজিত চিকিৎসকরা প্রাইভেট প্র্যাক্টিশ করতে পারবেন না....

তা তো জানি, তা তো জানি বলে ভদ্রলোক এমন ভাবে হেসে উঠলেন, হেসে উঠে বললেন কি হচ্ছেত দেখতেই পাচ্ছি....বলার ধরণে শমীকের পিত্তি জ্বলে গেল। সেটা বুঝতে পেরে শ্রীপতি বলল—ডাক্তারা সত্যিত বাড়িতে পুলিশ পাহারা চাইতে পারেন—প্রতিবেশীর কিছু একটা হল তখন ডাকলে ডাক্তার গেল না—তখন কি হাল হবে। ডাক্তারকেও তো বাঁচতে হবে... ফিস না নিলেও ক্যাক খাটতে খাটতে...শ্রীপতি শমীকের দিকে ফিরে বলল—শমি তোমার সেই ট্রেনের অভিজ্ঞতার কথাটা বলনা...ওকে বল।

শমীক অনিচ্ছায় গল্পটা বলেও, একদিন ট্রেনে দেশের বাড়ি থেকে ফিরছি কম্পার্টমেন্টে, ডাক্তারদের এক মধ্য বয়স্ক চুটিয়ে গাল দিয়ে যাচ্ছেন—'শালা এর নাম ডাক্তার,শুয়োরের বাচ্চা ডাক্তার হয়েছিস কেন—রাত্তে ডাকলে যাব না বৃষ্টিতে যাব না....তাও যদি না দেখত একবার দেখেছিস যখন ডাকবো তখন তোকে আসতে হবে...আর ডাক্তারদের বৌগুলোও তেমনি হয় জানলেন—কি মিথ্যুক কি মিথ্যুক—'ওতো বাড়িতে নেই। ডাক্তার ওনাতে আছেন, বাড়িতে নেই।'

ট্রেনের এক বৃদ্ধ শুধু মৃদু আপত্তি তুলে ছিলেন। আপনার ওভাবে বলাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছেনা...ডাক্তারদেরও শরীর খারাপ হতে পারে—তেমনি সিরিয়াস হলে সাধারণতঃ....

আপনি থামুন। আমার ঢের দেখা আছে। এরপরও ভদ্রলোক আরও কিছু খারাপ কথাবার্তা বলাতে শমীক বলে ওঠে—আপনি ঠিকই বলেছেন ডাক্তারদের তো মা বাবা নেই, শরীর খারাপও তাদের হতে নেই যখন ডাকবেন তখনই তাদের যেতে হবে...কিন্তু আপনার পেসেন্টের ঠিক কি হয়েছিল বলবেন কি!

—আমি মিথ্যে কথা বলছি। আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে, আপনি কে মশায়? তারপরই ও হ্যাঁ ঠিক ধরেছি আপনি ডাক্তার তাই গায়ে লেগেছে, আমি মিথ্যে বলিনি—, শমীক একটু অপ্রস্তুত হয়ে তাকিয়ে দেখল তার পকেট থেকে সেই স্টেথোস্কোপের কান বেরিয়ে আছে।

শমীক রণে ভঙ্গ দেবার আগে বলেছিল আপনার মুখটা আমি আমার এই খুপরির ক্যামেরায় তুলে নিলাম একদিন দেখা হবে। সেদিন উত্তরটা আপনাকে দেব।

—যান যান আপনারা আবার কি বলবেন !

সত্যি এমনও হয়। ছ'মাসও হয়নি হঠাৎ একদিন শমীক দেখে হাস-পাতালের মধ্যে এক ভদ্রলোক তার সদ্য স্কুল পেরোন ছেলেকে নিয়ে কি খ‍ুঁজছেন। হঠাৎ শমীকের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল আরে....কি খ‍ুঁজছেন ? শমীক এগিয়ে যায় ভদ্রলোক চিনতে পারেননি 'আজ্ঞে আপনাদের সেন্ট্রাল হলটা কোথায় হেঃ হেঃ আমার এই ছেলেটি এবার জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিচ্ছে...সেন্ট্রাল হলে সিট পড়েছে।'

'সে তো খুব ভাল কথা, খুউব ভাল কথা, চলুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, বলেই শমীক ছেলেটির কাঁধে হাত তুলে দেয় তাকে বলে 'গুড লাক মে গড ব্লেস ইউ'। সেন্ট্রাল হলে গিয়ে সিট খ‍ুঁজে দিয়ে ছেলেটিকে বসিয়ে—তখনও পরীক্ষার বেশ কিছু দেরি—সে ভদ্রলোককে আড়ালে ডাকে—ফিচেল মুখ করে বলে 'আপনার সঙ্গে দাদা একটা কথা ছিল...

ভদ্রলোক তো ততক্ষণে বিগলিত 'বলুন না কি বলবেন।' তারও খানিকটা তখন গদগদ ভাব।

শমীক আর সময় নেয় না, বিনা ভূমিকায় বলে 'এত কাণ্ডের পরও ছেলে-টাকে শুয়োরের বাচ্চা বানাবেন। মানে ? ভদ্রলোক চমকে ওঠেন।

ঐ যে শ্রীরামপুরে, ট্রেনে একদিন আপনি ডাক্তারদের শ্রাদ্ধ করছিলেন—কতবার ডাক্তারদের বরাহনন্দন বললেন এখন নিজের নন্দনকেও সেই পথে... ভদ্রলোকের তখন মুখটা...

বাহ্‌ বাহ্‌ আপনার কল্পনা শক্তির প্রশংসা না করে পারছি না। থ্যাঙ্কইউ —শ্রীপতির পাশের ভদ্রলোক বলে উঠলেন। 'গল্প হলে জমতো।'

শ্রীপতি আবার বলে 'শমী আমাকে গল্পটা আগে বলেছে, তবে এটা গল্প নয় আমি জানি...

বেশ বেশ, শ্রীপতিদের আড্ডার সেই ভদ্রলোক তখন শমীককে দুমুহূর্ত দেখেন, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বলেন আপনাদের একটা প্রোগভর্ন মেন্ট জোহুজুর মোসাহেব মার্কা অ্যাসোশিয়েশন আছেনা...মন্ত্রী ডাক্তারদের দমদম দাওয়াই দিতে বললেও যে অ্যাসোশিয়েশন প্রোটেস্ট করে না ? আপনি সেই অ্যাসোশিয়েশন করতেন ? ডাক্তার সর্দার আমার একটু দূর সম্পর্কের রিলেটিভই হয়—যে লোকটা হাসপাতাল থেকে ওষুধ পাচার ঠেকাতে গিয়ে বেঘোরে মরল কি করেছে আপনার অ্যাসোসিয়েশন—একটা লোক দেখান মিছিল করা ছাড়া ?

থাক ওসব কথা। ভদ্রলোক আবার হাসি হাসি মুখ করেন।

আমি এক ডাক্তারের কথা জানি, তাদের অনেক পয়সা হঠাৎ একটা স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ঘিলু বেরিয়ে গেল !

তারপর ? শ্রীপতি বলল।

—আর কি হবে। লোকটা ভেলোর গেল। বাকি ব্রেনটুকুও বের করে নিল।

—বাঁচল ?

ওমা বাঁচবে না কেন। সে এখন সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার। ব্রেন বার করে খুপরিতে অন্য কিছু প্যাকিং মেটেরিয়াল পুরে দিয়েছিল—ব্রেন ট্রান্সপ্লাণ্ট তো এখনও হয় না...লোকটা এখন পুরো সুস্থ। তবে ওই স্পাইনাল রিফ্লেক্স নিয়ে বেঁচে আছে। আর ওই স্পাইনটা সোজা নেই....

শ্রীপতি ছাড়া সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

শমীক তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—থ্যাঙ্ক ইউ আমি আজ যাচ্ছি। আপনার কথাটা আমার মনে থাকবে।

শমীকের সম্বিৎ ফেরে, এক সহকর্মী বলে উঠল আমরা জানতে চাই ঘাতক বাসটা এখনও ধরা পড়েনি কেন ? ডি সি ট্রাফিক আপনাকে কি কি বলে গেলেন ? আমরা ডাক্তার বলে রাস্তা অবরোধ করাত আমাদের মানাবেনা।

হেল্থ সেণ্টারে থাকতে একবার শমীককে কুকুর কামড়েছিল। চোদ্দখানা ইন্জেকশন নিয়ে ক'দিন ছুটির পর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌছে দেখে দু'নম্বর ব্লকের বিধায়ক গৌর সাধক বসে আছেন। তিনি একগাল-হেসে বললেন, এইত ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। সত্যি কুকুরে কামড়েছিলত···নাকি কলকাতায় ছুটি কাটাচ্ছিলেন···আরে মশাই ডাক্তারদের কুকুরে কামড়ায় এত জীবনে শুনিনি···

বিধায়ক যখন, তখন তদন্ত করার হক তো আছেই, শমীক জামাটা তুলে —সাধক বাবুকে বলল এইত আপনি পেটে হাত দিন গোল্লাগুলো ফিল করতে পারবেন।

এই শমীক...মিটিং যে শেষ হতে চলল তুই কিছু বলবি না....তুই চুপ করে গেলি যে···

আমি শুনছিত।

—শুনলেই হবে। তুই কিছু বলবি না। তোর মতামত জানাবি না তুই ক্যাজুয়াল্টি থেকে রেসকিউ করলি বলে ত তবু চেষ্টা করা গেল—কিছুক্ষণ বন্ধ করা গেল···

—যুদ্ধত রাস্তাতেই শেষ হয়ে গেছিলরে বন্ধ।

একদিন ভরপুর বর্ষার সন্ধ্যায় হাতে টর্চ, সঙ্গে সাগবেদ বিধায়ক গৌর সাধক হেল্থ সেণ্টারে এসে ব্যাজার মুখে বললেন—ডাক্তার আমাকেও কুকুর কামড়েছে ইন্জেকশন নিতে হবে ?

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক সিস্টারের বেকার স্বামী তখন শমীকের ওখানে বসে।

সেই হঠাৎ বলে উঠল সেকি স্যার 'আপনি এম. এল এ বলে কথা। কুকুর এমন বেয়াক্কেলে কামড়ে দিল। পাড়ার ? ব্যাটা এম. এল, একে চেনে না ?

গৌর সাধক মিটি মিটি হাসছিলেন এই ডাক্তার বলনেত ইঞ্জেকশন কি নিতেই হবে। পাগলা তো নয়। পাড়ার দশ দিন দেখি।

হেল্থ সেন্টারের নার্স এর স্বামীটি বলল, ইঞ্জেকশন না নিলেও পারবেন স্যার আপনি। আমার বৌ যখন ক্লাস ফোরে পড়ে না—তখন ওদের চারজন বন্ধুকে পাগলা কুকুর কামড়েছিল। দুজন ইঞ্জেকশন নিয়েছিল তাদের কিছু হয়নি। আমার বৌ, আর একজন ইঞ্জেকশনই নেয়নি। আমার বৌটা এখনও বেঁচে আছে…তবে অন্যজন যে ইঞ্জেকশন নেয়নি সত্তেরো দিনের দিন মরে গেছে। আমার বৌ যখন ঝগড়া করেনা আমার সংগে—আমি বলি ঐ বিষ উঠছে…আপনার তো আবার একটা বিরুদ্ধ গোষ্ঠি হয়েছে—ইলেকশনের আগে যদি আমার বৌ এর মত মাথায় আপনার বিষ উঠে যায় আপনাকে পায় কোন শালা…

শমীক খুব গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল। গৌর সাধক ছেলেটিকে মৃদু ধমক দিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল—এই তুমি থামত—ডাক্তার এ বেশী কথা বলে বড়, তাই না.....

শমীকের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়েই গৌর সাধক আবার ফিরে এল, তখন তার অন্য মূর্তি—সাকরেদ তাকে বুঝিয়েছে আপনি কি। ডাক্তার বাবুরা আপনার সঙ্গে মজা করল আপনি বুঝতে পারলেন না।

কুকুর আপনাকে চিনবে কি ? আপনি কুকুরদের এম. এল. এ. নাকি।

একটু আগের হাসি হাসি মুখটা, তখন তাই রাগে লাল। ডাক্তার আমার সঙ্গে রসিকতা ভাল নয়। আমি কি কুকুরদের এম. এল. এ.—ছেলেটাকে আপনি কিছু বলছেন না—তারপর ছেলেটির দিকে তর্জনি তুলে ছড়া কেটে বললেন প্রায়,—নার্সকে ট্রান্সফার করে দেব দিশেরগড়ে—বুঝবে তখন কড়ম পরে—হ্যাঁ। বাবা ভাল নয় দিনকাল, বোঝ তবে কত ধানে কত চাল।

সুপার বললেন, আমরা তবে ডা বসুকে বলি ঘটনাটা গুছিয়ে বলতে। ম্যানেজমেন্টের সেই ভদ্রলোক মাছি তাড়ানোর মত করে বললেন—ঠিক আছে।

এই শমীক তুই বল তুই এবার বল।

শমীক হঠাৎ এতক্ষণে উঠে দাঁড়ায়। একটু থেকে সে বলতে শুরু করে, ডাঃ জাবিদ আমার বহু দিনের সহকর্মী। আমরা হাউস স্টাফশিপের সময় থেকে এক জোরে কাজ করছি। গ্রাম থেকে ঘুরে এসেও আমরা আবার এক জোরে। মঙ্গলবার আমার নাইট ডিউটি ছিল। ভোরে বাসায় গিয়ে আবার ওটি অ্যাটেন্ড করতে ঠিক নটা দশ-বারোতে ইমার্জেন্সিতে এসে—লকারে জিনিস রেখে ওটিতে যাচ্ছি—হঠাৎ দেখি অনাচারেক লোক একজন মুমূর্ষুকে

চ্যাংদোলা করে ঢুকছে—আমি মেডিক্যাল অফিসারদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করি—এই খারাপ পেসেন্ট এসেছে...তখনও জানি না...যে মুহূর্তেই নিউরো-সার্জারির আর. এম. ও. র স্ত্রী ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে দেখেই বলেন ডাঃ বসু—জাবিদ স্ট্রীট অ্যাক্সিডেন্টে...আমি রাস্তা থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি।

আমি ডাঃ জাবিদকে চিনতে পারিনি—সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে ট্রলি চাই—শিউপ্রসাদ রিফিউজ করে আমি আর জানি না—দেখি পাল্স নেই, জাবিদদা গ্যাস্প করছে একদম শরীরটা দুমড়ে মুচকে গেছে—আমি কোনক্রমে আমার কাঁধে তাকে চাপিয়ে ছোটা শুরু করি—দুটো পা এমন ভাবে পিষে দিয়েছে—যে আমি পায়ের দিকের কন্ট্রোল পাচ্ছি না—ইমার্জেন্সি ওটিতে পৌঁছে আমি চিৎকার করে সবাইকে ডাকি—অ্যানাসথেসিস্ট ছুটে আসেন—সব ডিপার্টমেন্টের সবাই ছুটে আসেন—যুদ্ধ শুরু হয়—কিন্তু কিছুই ত করার ছিল না—হেড ইন্জুরি, দুটো পা স্ম্যাসড্—পেলভিস পালপড্—পেলভিক ভিসেরা ছিন্ন ভিন্ন।

অপারেশন করে সামলানোর চেষ্টা হয়েছিল...সবাই জানেন—কিছু ত করা যায়নি—প্রায় পাঁচ ঘণ্টা যুদ্ধের পর হাল ছেড়ে দিতে হল—আমরা ডাঃ জাবিদকে—

এ-প্রসঙ্গে আপনাদের আর একটা কথা বলব। আমার সেদিন শেয়ালদা কোর্টে একটা শমনও ছিল। কবে ইন্জুরি রিপোর্ট লিখেছি সাক্ষী দিতে ডেকেছে। জাবিদ যখন ডিক্লেয়ার্ড ডেড তখন আমার কোর্টের কথা মনে পড়ল। তখন আমার যা মনের অবস্থা...আমাদের যা। সাড়ে তিনটে সময় অধ্যাপক মিত্রায় আমাকে বললেন—যা হবার ত হয়েছে—ওরা কিন্তু সব পারে—একটা ওয়ারেন্ট ইস্যু করে দিলে—আমি গেলাম। কোর্ট চত্বরে সবাই ছেঁকে ধরল—কি দাদা, জমির দলিল, এফিডেবিট—ফৌজদারি—স্ট্যাম্প পেপার কিনবেন। আমি কাগজটা দেখাই। তারা তিনতলা দেখিয়ে দেয়। একজন ল-ইয়ারকে ধরি, নিজের পরিচয় দেই, দুর্ঘটনার কথা বলি—তিনি আমাকে দু'শো আট নম্বর ঘর দেখিয়ে দেন।

সেখানে গিয়ে একটা ভরসা পাই। দেখি এক চেনা মহিলা—তিনি আমার এক প্রতিবেশীর নিকট আত্মীয়া তিনি চিনতে একটু দেরি করলেন—বললেন আপনার নামে ত ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়ে যাচ্ছিল—যাক এসেছেন?

এ-ঘটনাটা এজন্যই বলা—ম্যাজিস্ট্রেট মশাইও নাকি আমায় পুরো বিশ্বাস করেননি—বলেছেন ডাক্তাররা কোর্ট ফাঁকি দিতে নাকি অমন কত কি বলে—আমাকে একটা মুচলেকাও দিতে হল—লিখলাম স্যর আই কুড নট অ্যাটেন্ড ইয়োর কোর্ট, বিকস এ নিউরোসার্জন কলিগ ওয়াস সিভিয়ারলি ইনজিয়োর্ড

বাই এ রেকলেস বাস ইন ফ্রন্ট অব আওয়ার হসপিটাল—আইওয়াস বিজি উইথ হিজ রিসাসিটেশন—হি হ্যাজ জাস্ট নাউ বিন ডিক্লেয়ার্ড ডেড—আই উইল অ্যাটেন্ড নেক্সট ডে পাঁজাটিভলি—আদার ওয়াইস আই উইল পে দি ফাইন অব....

—আপনারা ডাক্তার—আবার সেই ভদ্রলোক—এত ইমোশোনাল হলে চলেনা—আপনি আপনার কর্তব্য করেছেন—কোর্টও—

ভদ্রলোক, ম্যানেজমেন্টের সেই ভদ্রলোক—(মহাকরণ থেকে এসেছেন ?) বললেন—আপনারা আপনাদের কর্তব্য করুন—হাসপাতালের কাজ বন্ধ করবেন না—আপনারা ডাক্তার—আপনাদের কাজটা ত একটু অন্যরকম। কথা দিচ্ছি এখানে বাম্পের ব্যবস্থা হবে। বাসটাকে ধরা হবে আপনারা রাস্তা অবরোধ টবরোধ···

শমীক নির্লিপ্ত যেন খুব—বলল না না স্যর। এমনিই ত আপনারা কথায় কথায় বলেন ডাক্তাররা রোগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে—সেটা ঠিক নয়—আমরা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যাচ্ছি মৃত্যুরই সঙ্গে—মৃত্যুর অমোঘ প্রাত্যাহিকতার মধ্যেই—আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছিল—পনেরো বছরের সহ-কর্মীত। সবাই পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করতে গেল—বডিটা ইমার্জেন্সীর এক কোনায় পড়েছিল ট্রলিতে—এক নিউরোসার্জন যে হাসপাতালে ডিউটি করতে আসার সময় হাসপাতালের দোড়গোড়ায় খুন হয়ে ট্রলিতে শুয়ে ছিল—পাশেই একটি বাচ্চার অপারেশন করতে হচ্ছিল—কাজত থেমে থাকেনা —খুব কষ্ট হচ্ছিল—পনেরো বছরের সহকর্মীর মৃত শরীরটা একলা শুয়ে আছে যেন পরিত্যক্ত—আমি চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলাম—সিস্টার প্লিজ জাবিদ দার বডির ওখানে কাইন্ডলি একটা পর্দা লাগিয়ে দিন।

মন্বন্তর ও দুটি উপন্যাস

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

১৯৪৩ পেরিয়ে গিয়ে এখন আমরা ১৯৯৩-এ দাঁড়িয়ে। যাঁদের বিভিন্ন ধরনের জয়ন্তী পালনে উৎসাহ আছে তাঁরা মন্বন্তরের পঞ্চাশবর্ষ পূর্তিকে অনায়াসে উপলক্ষ করতে পারেন। কিন্তু একে উৎসবের উপলক্ষ না করে স্মরণের উপলক্ষও করা যায়। মহামন্বন্তরকে বিষয় করে সমসাময়িক কালে বেশ কিছু উপন্যাস ও গল্প লেখা হয়েছিল। এখানে সবগুলির কথা স্মরণ করবার সুযোগ নেই। তাই দুটি স্মরণীয় উপন্যাসকে এই আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। একটি তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর'; অপরটি বিভূতিভূষণের 'অশনিসংকেত'। দুটি উপন্যাসই প্রায় একই সময়ে লেখা। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' শারদীয় সংখ্যায় মন্বন্তরের প্রথম প্রকাশ। পরে ১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হবার সময় এর কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়। 'অশনি-সংকেত' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় ১৩৫০-এর মাঘ থেকে ১৩৫২-এর মাঘ পর্যন্ত। পত্রিকাটি উঠে যাওয়ায় বিভূতিভূষণ উপন্যাসটি শেষ করতে পারেন নি। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় অনেক পরে, ১৯৫৯ সালে, বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে, অর্থাৎ বাংলা ১৩৫০ সাল অথবা ইংরেজি ১৯৪৩ সালই এই দুটি উপন্যাসের। আর এই সময়টাই মহামন্বন্তরের সময়। পটভূমি গ্রাম এবং শহর উভয়কেই এই মন্বন্তর চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। তবে শহরের তুলনায় গ্রাম-জীবনেই ভাঙন যে দেখা দিয়েছিল বেশি তা নিয়ে মতভেদ নেই। বিভূতি-

ভূষণের বিন্যাসে গ্রামীন ভাঙন যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি তারাশঙ্করের উপন্যাসে ধরা পড়েছে নাগরিক বিপর্যস্ত জীবনের চেহারা। উপন্যাস দ্বটিকে বেছে নেওয়ার আসল কারণ এটাই।

ঔপন্যাসিকদের দেখা দ্বর্ভিক্ষের চেহারা বর্ণনার আগে এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদদের মতামত আর একবার স্মরণ করে নেওয়া বোধহয় ভালো। আমাদের ঔপন্যাসিকেরা যে সময়কে নিষ্ঠার সঙ্গে অন্বসরণ করেছিলেন এর দ্বারা তা প্রমাণিত হবে। ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদের মতামতের উদ্ধৃতি কিছ্বটা দীর্ঘ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আলোচনার স্বার্থে তা প্রয়োজন। এক, "পেন্ডেরেল মুনের মতে ব্রহ্মদেশ ও জাপানী অধিকৃত দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে চাল আমদানী বন্ধ হয়ে যাওয়াই 'basic cause of the Bengal famine', সুমিত সরকারও তাই মনে করেন। কিন্তু মবহারুল ইসলাম দেখাচ্ছেন ১৯৩১-৩২ থেকে ১৯৪১-৪২ বছর পিছু ১১ লক্ষ টনের বেশি চাল আমদানি হত না। তা আভ্যন্তরীণ যোগানের ১'৪ থেকে ১'১% বেশি নয়—অর্থাৎ নগন্য। দেশময় শস্যচলাচলের অসুবিধা দেখা না দিলে হয়তো এমন অভাব দেখা দিত না। কিন্তু যুদ্ধকালীন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য মেদিনীপুর, বরিশাল, খুলনার উদ্বৃত্ত শস্য সরকার কিনে নেন, উপকূলবর্তী জেলা থেকে সব নৌকো সরিয়ে বা নষ্ট করে দেন। এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং চালের চাহিদা যোগানের ওপর দেখা দেয় তার প্রতিক্রিয়া। উদ্বৃত্ত উৎপাদকেরা খাদ্য মজুত করতে থাকে ভয়ে, আর বড়ো উৎপাদকেরা, ফড়ে ও ব্যবসায়ীরা করতে থাকে চড়া দামের লোভে। শুধু যুদ্ধ সংক্রান্ত কণ্ট্রাক্টের দৌলতে বড়লোকের দাবিই বাড়ে না, যুদ্ধজনিত নানা কাজে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা বেড়ে যায় ও তাদের চাহিদাও বাড়ে। বিরাট সৈন্যবাহিনীর দাবি তো ছিলই। স্যার টি রাদারফোর্ড লিনলিথগোকে জানান ভয় ও অনিশ্চয়তার কারণে ও মুনাফার লোভে সামান্য উৎপাদন হ্রাসের অনুপাত-বহির্ভূত প্রতিক্রিয়া হয়। ওয়াভেল চার্চিলকে যে চিঠি লেখেন তাতে ঘাটতি ছাড়াও দায়ী করা হয়েছে 'human qualities of fear, selfishness, greed and provincialism'—কে। এ দুর্ভিক্ষ শুধু প্রকৃতির নয়, মানুষেরও কৃষ্টি (অমলেশ ত্রিপাঠী: স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫—১৯৪৭)। দুই. "১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মহামন্বন্তরে বাংলার প্রায় তিরিশ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। তখন দেশের জনগণের জন্য মাথাপিছু যে পরিমাণ খাদ্যের যোগান ছিল তা এমন কিছু কম নয়। সত্যি বলতে কি, সেই মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ ছিল ১৯৪১ সালের তুলনায় ৯ শতাংশ বেশি। কিন্তু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কেন দুর্ভিক্ষ হয় নি। ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক আর মৎস-

চাষীদের মতো মানুষেরাই হয়েছিল তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের শিকার। বাজারে এদের ক্রয়ক্ষমতা ভয়ানক কমে যায়। যুদ্ধকালীন সমৃদ্ধি-স্ফীত সেই অর্থনীতিতে তখন চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতির চাপ, খাদ্যমূল্য ক্রমবর্ধমান। নিজেদের মজুরি বা আর্থিক আয়কে সম্বল করে এই পরিস্থিতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না তারাই মরল। অন্যদিকে তখন সম্প্রসারিত নগরজীবনের জন্য এসেছে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্যের রেশন বরাদ্দব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে শুধুমাত্র শহরের সেবায়। বাকি অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান খাদ্যমূল্যের যে চাপ শহরের বেচাকেনা তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত (অমর্ত্য সেন : জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি)।

দুই বিশেষকের মতামতে একথা স্পষ্ট যে এই দুর্ভিক্ষ ছিল প্রধানত মনুষ্যসৃষ্ট এবং এর শিকার হয়েছিল প্রধানত ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক, জেলে এবং কারিগরদের দল। অবশ্যই নগরে আগুন লাগলে যেহেতু দেবালয়ও নিষ্কৃতি পায় না, তাই বিশেষ করে স্বল্প পরিমাণ জমির মালিক গ্রামীন গৃহস্থের ঘরেও এই দুর্ভিক্ষের আঁচ এসে লেগেছে। শহরের চাকরিজীবী মানুষের জন্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে রেশন ব্যবস্থা চালু ছিল, তাই মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবী মানুষ কিছুটা রক্ষা পেয়েছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে শহরের রেশন ব্যবস্থা, রেশনের দোকানের লম্বা কিউ-এর বিবরণ আছে। সময়কালীন খবরের কাগজের উদ্ধৃতিতে জানা যায় যে দুঃস্থ মধ্যবিত্তদের জন্য সস্তায় রেশন দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে, food supply at cheap rate যুদ্ধকালীন কলকাতা আর দুর্ভিক্ষ তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে সমার্থক। কালই কলকাতা রাস্তার একদিকে সারিসারি আমেরিকান লরী যেতে দেখছে, অপর দিকে, "সামনেই একটি কণ্ট্রোলের দোকানে অস্বাভাবিক রকমের লম্বা কিউ দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েদের কিউ। গৃহস্থ ঘরের বিধবা-সধবা-কুমারী, শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বোরখা নেই, ঘোমটা নেই, মাথার রুক্ষ চুল ঠেলাঠেলিতে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, শীতের বাতাসে উড়ছে, মুখে অপরিসীম উদ্বেগ। কখন গিয়ে পৌঁছবে ওই দোকানের সম্মুখে।" গ্রামত্যাগী অনাহারী মানুষের শহরের রাজপথে ভিড় ও তারাশঙ্করের সঠিকভাবেই চোখে পড়ে, 'ওপাশে ফুটপাতে বসে আছে নিরন্ন গৃহহীনের দল—ভিক্ষা ওদের পেশা নয়, কিন্তু ওরা আজ ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে।' পাশাপাশি এই দুটি চিত্রের তাৎপর্য রয়েছে। শহরের অধিবাসীদের পরিচয়-পত্র থাকায় তারা স্বল্পমূল্যে রেশন পাওয়ার অধিকারী, কিন্তু গ্রামের পরিচয়পত্রহীন নিরন্ন মানুষের সে অধিকারও নেই। ওই উপন্যাসে বর্ধমান জেলার পাড়াগাঁয়ের চাষীর ছেলে কলকাতা রাজপথে গান গেয়ে ভিক্ষা করে, 'ঘর আমাদের বর্ধমান জেলা। ঘর দুয়োর আছে, বাবা ভাগে চাষ করে। তা মশায়, কাল যুদ্ধ লেগেই যে সর্ব-

নাশ করে দিলে গো। চালের দর কি মশায়। আগুন। আট আনায় এক সের চাল।' কৃষকসন্তানটি এখানেই থামে না। একটা মজার জিনিস তার কিশোর-চোখে ধরা পড়ে। অনাহারের ভয়ে তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে, আর বোমার ভয়ে শহরের মানুষেরা গ্রামের দিকে রওনা দিচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা সে প্রকাশ করেছে গানের মধ্য দিয়ে, 'কলকাতার সব মোটা গেরস্ত / বোমার ভয়ে পালাতে ব্যস্ত / গরীব লোকের মরণ হার রে, / নাইক অন্ন, নাইক রে বস্ত্র।'

যুদ্ধের ফলেই যে এই দুর্ভিক্ষ তারাশঙ্কর এই বক্তব্যের উপর জোর দিতে চেয়েছিলেন। 'জুয়া খেলার আসর বসে গেছে ধানচালের বাজারে। দিনদিন দর চড়িয়ে যাচ্ছে মহাজনেরা ক্রিদুশিত দান ধরার মত। চাষী আর কতক্ষণ ধরে রাখবে তার ঘরে।' যুদ্ধের ফলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য করে তোলে মানুষ। এই তথ্যে কোন ভুল নেই। সাধারণ চাষীরা যে প্রথমদিকে অপ্রত্যাশিত চড়া দামের লোভে ধান বেচে দিয়েছিল বিভূতিভূষণও তা দেখেছিলেন। কামদেবপুর গ্রামে 'গাঁ বন্ধ করা' উপলক্ষে গঙ্গাচরণ যখন গিয়েছিল তখনই চালের দর মণকরা দুটাকা বৃদ্ধির সংবাদে উল্লসিত চাষীরা বলে উঠেছিল, 'মণে দুটাকা। তাহলে আর ভাবনা ছিল না। কে বলেছে এসব কথা?' যে চাষী মণে দুতিন টাকা বেশি দাম পাবার লোভে বাজারে চাল ছেড়ে দিয়েছিল তাকেই যখন আবার চারগুণ দামে তা কিনতে হয় তখনই অনিবার্য ট্র্যাজেডি নেমে আসে। তবে সব থেকে বেশি ছিল গভর্নমেণ্টের ভয়। সেনাবাহিনী এবং শহরের রেশনের জন্য গভর্নমেণ্টের চাল সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল। গ্রামের মানুষের কথা চিন্তা না করেই তারা বেপরোয়াভাবে সংগ্রহ শুরু করে দিয়েছিল আর এর ফলে গ্রামের মানুষের ভীতি বেড়েছিল বেশি। গ্রামের কুণ্ডু বা বিশ্বাস মশাইরা কেবল ব্ল্যাক মার্কেটিং-এর জন্য চাল সরিয়েছিল তা নয়, সরকারের ভয়ও তাদের ছিল। কুলেখালি গ্রামের এক গৃহস্থ গঙ্গাচরণকে এই ভয়ের কথা বলেছিল। সামান্য তিনমণ চাল সে সরকারের লোকজনের ভয়ে লুকিয়ে রেখেছিল, 'যেদিন গভর্নমেণ্টের লোক আসে কার ঘরে কত চাল আছে দেখতে, সেদিন মাটির মধ্যে পুঁতে রেখেছিলাম বলে চালগুলো একটু গুমো গন্ধ হয়ে গিয়েচে। ধান নেই, শুধু ওই চালকটা সম্বল।' মজুতদারি নিরোধ অভিযানের এটাই ছিল হাস্যকর দিক। আসল মজুতদারদের গায়ে কখনোই হাত পড়ে নি, হাত পড়েছিল খাওয়ার জন্য দুচার মণ ধানচাল যারা সরিয়েছিল তাদের গায়ে। বিশ্বাস, কুণ্ডুবাবু বা খাঁ-বাবুদের মত বড় আড়তদারেরা বেশি দামে সরাসরি গভর্নমেণ্টের কন্ট্রাক্টারদের কাছে চাল বেচে দিয়েছে। একদানা ধানও গ্রামের মানুষের জন্য রাখে নি। এরজন্য তাদের কোন ক্ষতি হয় নি, কেবল আগে থাকতে মাল সরাতে না পারার জন্য

গঙ্গাচরণদের হাটে পাঁচু কুণ্ডুদের দোকানটি লুঠ হয়ে গিয়েছিল। এটা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম মাত্র। রাতের অন্ধকারে বিশ্বাস মশাইয়ের লাঠির ঘা খাওয়ার ঘটনাও তাই। এসব ঘটনা প্রায় ঘটেইনি বলা চলে।

"বিভূতিভূষণ স্বগ্রাম বারাকপুর এবং তৎ-পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল এবং বনগ্রাম মহকুমা শহরকে কেন্দ্র করিয়া 'অশনি সংকেতের' পটভূমি রচনা করিয়াছেন। অশনি সংকেত-এ অঙ্কিত নরনারী চরিত্রের মধ্যে সবই প্রায় কাল্পনিক। তবে অনঙ্গ বৌয়ের চরিত্রের মধ্যে বোধহয় তাঁহার স্ত্রীর চরিত্রের কিছুটা আদল আছে। তাঁহার তৎকালীন সংসারের কিছু কিছু চিত্রও ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ...১৯৪২/৪৩/৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রামে বাসকালে বিভূতিভূষণকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের কুফল পদে পদে ভোগ করিতে হয়। গ্রামের অসংখ্য মানুষের সঙ্গে কন্ট্রোল, কেরোসিন, চাউল ও চিনি প্রভৃতি জিনিসের অভাব পদে পদে অনুভব করেন। তাহারই ফলশ্রুতি স্বরূপ 'অশনি-সংকেতে' গ্রাম বাংলার একটা জীবন্ত ও বাস্তবানুগ চিত্র আমরা পাই (গ্রন্থ পরিচয়, বিভূতিভূষণ রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ)।' এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অশনি-সংকেতে গঙ্গাচরণের অভিজ্ঞতা যে কল্পিত নয় তা এতে আর একবার প্রমাণিত হলো। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রে পরিচয়কার চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের বিভূতিভূষণের জীবনের এই পর্বের কাহিনী জানা ছিল। তাঁর আর একটি সিদ্ধান্তও সমর্থনযোগ্য। গঙ্গাচরণ ও পথের পাঁচালীর হরিহরের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে সত্যিই মিল আছে। দুজনেই মধ্যবয়স্ক ছাপোষা সংসারী মানুষ, পুজো-অর্চনা করা বা শিষ্যবাড়ী যাওয়া দুজনেরই জীবিকা, তবে হরিহর গঙ্গাচরণের মতো পাঠশালার পণ্ডিতি করে নি, সে কল্পনাপ্রবণ ও বিষয়বুদ্ধিহীন। কিন্তু গঙ্গাচরণ বৈষয়িক ও অতিরিক্ত ধূর্ত। 'পথের পাঁচালী' বের হয়েছিল ১৯২৯ সালে, আর 'অশনি-সংকেত' রচিত হয়েছিল ১৯৪৩-এ। ইতিমধ্যে বিভূতিভূষণের কেবল বয়সই বাড়ে নি, অভিজ্ঞতাও বেড়েছে, "বিভূতিভূষণ পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতায় গঙ্গাচরণকে ভাববাদী হিসাবে অঙ্কিত না করিয়া বাস্তববাদী করিয়া আঁকিয়াছেন।" হরিহর আর যাই দেখুক না কেন, নিশ্চয় মন্বন্তর দেখে নি।

'অশনি-সংকেত' রচনার কিছুদিন আগে থাকতেই বিভূতিভূষণ তাঁর পল্লীগ্রাম বারাকপুরে বাস করতেন। তাঁর গ্রাম থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে গোপালনগরে হরিপদ ইনস্টিটিউশনে তিনি শিক্ষকতা করতেন। দুর্ভিক্ষ দেখবার জন্য তিনি গ্রামে আসেন নি, গ্রামে থেকে দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। তারাশঙ্কর যখন 'মন্বন্তর' লেখেন তখন তিনি কলকাতার স্থায়ী অধিবাসী। ঠিক এই সময়টিতেই গান্ধীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে জেলখাটা তারাশঙ্কর কমিউনিস্টদের একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের ১১

এবং ২০শে ডিসেম্বর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে, "ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম অধিবেশনে তিনিই ছিলেন মূল সভাপতি, সভাপতির ভাষণে তিনি কেবল তাঁর ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটান নি, প্রকারান্তরে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির অবলম্বিত জনযুদ্ধ নীতিকেও সমর্থন জানিয়েছিলেন," এ "বিষয়ে আমি সাহিত্যিক এবং শিল্পী সংঘেরই মুখের দিকে চেয়ে আছি। আমলাদের কণ্ঠোচ্চারিত বাণীর সঙ্গে আমিও আমার কণ্ঠস্বর মিশিয়ে দেব। ভারতের জনগণকে বুঝতে হবে-এ সংগ্রাম শুধু তোমার মুক্তি-সংগ্রাম নয়, সমগ্র বিশ্বের জনগণের মুক্তি সংগ্রাম। এই আবেগ এবং বিশ্বাস দীর্ঘকাল বজায় ছিল।১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে মহম্মদ আলি পার্কে সংঘের ছ'দিন ব্যাপী সম্মেলনেও তারাশঙ্কর সভাপতি মণ্ডলীতে আসন গ্রহণ করেছিলেন। প্রগতি লেখক সংঘের ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটের অফিসে তাঁর নিয়মিত যাতায়াতের কথা চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখদের সাক্ষ্যে জানা গেছে। 'পরিচয়' পত্রিকায় 'মন্বন্তর ও সাহিত্য' পর্যায়ের আলোচনায় বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করতেও তাঁকে দেখা গেছে, "বাংলা সাহিত্যে নাটকের ক্ষেত্রে নতুন আবেগ এবং নতুন সুর যোজনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। এই মন্বন্তরকে অবলম্বন করেই সে সুর সে আবেগ পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে (চৈত্র ১৩৫১)। [তথ্যসূত্র ও উদ্ধৃতি, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, ১ম খণ্ড, ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত]

তারাশঙ্করের এই রাজনৈতিক মনোভাব, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী-সংঘের সঙ্গে তাঁর এই ঘনিষ্ঠতা যে 'মন্বন্তর' উপন্যাসের পটভূমিকা রচনা করেছিল ভূমিকায় তার স্বীকৃতি রয়েছে, "দেশের বর্তমান অবস্থার পটভূমিতে এ যুগের বাঙালীর নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত ছেলেমেয়েদের জীবন নিয়ে এই বই লিখবার কল্পনা আমার ছিল। ...একটি আলোচনা আসরের বিতর্ক থেকে মন ব্যগ্র হয়ে ওঠে এবং মন্বন্তর লিখতে আরম্ভ করি।" লক্ষণীয় এই, যে রাজনৈতিক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারাশঙ্কর এই উপন্যাস রচনায় হাত দেন তা তাঁর জীবনে ছিল সম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী। তিনি কখনোই তার সঙ্গে একাত্ম হন নি। তাছাড়া উপন্যাসের ক্ষেত্রে গ্রাম ছেড়ে যখনই তিনি শহরে পা দিয়েছেন তখনই তিনি স্বধর্মবিচ্যুত হয়ে পড়েন। 'মন্বন্তর'ও তার ব্যতিক্রম নয়। তাছাড়া এই উপন্যাসে সাধু ভাষা ছেড়ে চলিত ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে কৃত্রিমতাই বেড়েছে। তারাশঙ্করের বোধ হয় ধারণা ছিল যে নাগরিক জীবনের পটভূমিকায় উপন্যাস লিখলে তা চলিত ভাষাতেই লেখা উচিত। তাঁর কৈফিয়তের মধ্যেও যেন এই মনোভাব লুকিয়ে রয়েছে, "এর পূর্বে বরাবরই আমি পূর্বচলিত সাধুভাষাতেই লিখে এসেছি, মন্বন্তর লিখেছি চলিত ভাষায়। এর অর্থ এ নয় যে বর্তমান উপলব্ধিতে চলতি

ভাষাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছি। তবে বিষয়বস্তুর বাহন হিসেবে এক্ষেত্রে এই ভাষাকেই গ্রহণ করেছি।" তারাশঙ্করের মতো লেখকের মন্বন্তরের উপন্যাস লেখার জন্য এতদিনের ভাষা ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

আসলে এই উপন্যাসের বিষয়, বক্তব্য অথবা রচনাভঙ্গি সবকিছুই তারাশঙ্করের পক্ষে নতুন। মন্বন্তরের পটভূমিকায় নাগরিক জীবনের বিপর্যয়ের চিত্র আঁকার জন্য তিনি আগ্রহী ছিলেন না। মন্বন্তর, মহাযুদ্ধ, ব্ল্যাকআউট, বোমাবর্ষণ, এ. আর. পি., জনযুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের কার্যকলাপ-এ সব কিছুই তিনি গোটা উপন্যাসে ধরতে চেয়েছিলেন। চরিত্র গুলিও মন্বন্তর-তাড়িত নয়। কানাই-নীলা-গীতা এদের ব্যক্তিজীবন এখানে বড় নয়। কমিউনিস্ট কানাই চক্রবর্তী পরিবারের দূষিত রক্তের প্রভাব সম্পর্কে যতটা আতঙ্কিত, মন্বন্তর বা ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে ততটা নয়। যে ছাত্রটির বাড়িতে কানাই গৃহশিক্ষকতা করেছে তার ব্যবসায়ী পিতার কথাবার্তা এবং আচরণে শহরের মুনাফাখোর কালোবাজারীদের চেহারা পাওয়া যায়। ছাত্র অশোক যখন গর্ব করে বলে, "বাবা হাসতে হাসতে বলছিলেন, আমাদের গুদামের চাবি যদি এক সপ্তাহ খুঁজে না পাওয়া যায় তবে আট দিনের দিন বাংলাদেশে উনুন জ্বলবে না" তখন অমলেশ ত্রিপাঠির এই মন্তব্যের সমর্থন মেলে, "কলকাতায় চালের দাম ১৯৪৩-এর ৩রা মার্চ ছিল মন প্রতি ১৫ টাকা। ঐ বছর ১৭ই মে তা বেড়ে হয় মন প্রতি ৩০ টাকা। কলকাতা ও হাওড়া বাদ দিয়ে মফস্বলে মজুতদারীদের বিরুদ্ধে অভিযান ঐ দুই অঞ্চলের মজুতদারদের কাছে মুনাফার সুবর্ণ সুযোগ এনেছিল।" সমস্ত নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে কিছু মধ্যবিত্ত যে কালোবাজারে নেমে পড়েছিল ছাত্রের অভিভাবকের প্ররোচনায় কানাইয়ের ব্যবসায়ে নেমে পড়াই তার প্রমাণ। অবশ্য কমিউনিস্ট নেতা বিজয়দা পূর্ববঙ্গের এক পল্লীগ্রাম থেকে নীলাকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে গ্রামীণ দুর্ভিক্ষের যথাযথ চিত্র আছে "এখন মাঘ মাস, এরই মধ্যে দেখছি ধানচাল অন্তর্হিত হয়ে গেল। গত বছরের ডিনায়েল পলিসি, এ বছরের অজন্মা, এর ওপর চোরাবাজারের কালো কাপড় ঢাকা হাত ধান টেনে নিচ্ছে.... মানুষ মরছে। দলে দলে দেশত্যাগ করছে, স্ত্রী-কন্যাকে ফেলে পালাচ্ছে, সন্তান বিক্রী করছে, বিশেষ করে কন্যা সন্তান।" এই চিত্র ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরে রচিত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়—গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে / শূন্য ঘর শূন্য গোলা / ধানবোনা জমি আছে পড়ে, / শুকনো তুলসীর মঞ্চে / নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে / আগাছায় ভরেছে উঠান (স্বাগত)। কিন্তু এই চিত্র তারাশঙ্কর আর আঁকেন নি। যে কমিউনিস্ট বিজয়ের চোখে মন্বন্তরের এই বাস্তব দৃশ্য ধরা পড়েছিল উপন্যাসের শেষে তারও মন্বন্তরের থেকে মহাত্মা গান্ধীর অনশন ভঙ্গের ঘটনায় উৎসাহ বেশি।

কিন্তু বিভূতিভূষণের মধ্যে কোন দোটানা ছিল না। গ্রাম থেকে দুর্ভিক্ষের যে ছবি তিনি দেখেছিলেন তার সঙ্গেই তিনি একাত্ম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার কলকাতা তার যে অজানা ছিল না, 'অনুবর্ত্তন' উপন্যাসই তার প্রমাণ। সেখানে বোমা, এ. আর. পি, ব্ল্যাকআউট, বোমার ভয়ে কলকাতাবাসীর দলে দলে শহর ত্যাগ, উপন্যাসের এ সমস্ত ঘটনাই বাস্তব। কিন্তু অশনি সংকেতের পটভূমি যেহেতু আলাদা তাই সেখানে তিনি শহরকে আসতে দেন নি। এ এমন এক গ্রামের পটভূমিকায় রচিত যেখানে যুদ্ধ মানে কয়েকদিন অন্তর মাথার উপর দিয়ে এরোপ্লেন উড়ে যাওয়া, চালের ক্রমশ দাম বাড়া ও বাজার থেকে উধাও হয়ে যাওয়া অথবা কেরোসিন তেল বা চিনির অমিল হওয়া। এটা এমন জায়গা যেখানকার অধিবাসীদের সিঙ্গাপুরের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কেও কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তাই গঙ্গাচরণের পুত্র হাবু পুরীর কাছে মেদিনীপুর জেলায় সিঙ্গাপুরের অবস্থান বলে সহপাঠীদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে পড়ে। কিন্তু দুর্গা পণ্ডিতের মতো সাধারণ ব্যক্তি আসল খবরটা ঠিকই জানে যে রেঙ্গুন থেকে সস্তা মোটা চাল আমদানী বন্ধ হয়ে যাওয়াতেই তাদের এই দুরবস্থা। শহর যে অশনি সংকেতে একেবারে আসে না তাও নয়। মহকুমা শহর বনগাঁতে সাপ্লাই অফিসে আটা, চিনি বা সুজির খোঁজে বিভূতিভূষণকে নিশ্চয় যেতে হয়েছিল। তাঁর উপন্যাসের গঙ্গাচরণও ক্ষেত্রকাপালীকে সঙ্গে নিয়ে মহাকুমা শহরে সাপ্লাই অফিসারের ঘরের জানলায় একই উদ্দেশ্যে লাইন দিয়েছে। অন্য সময় গ্রামের ব্রাহ্মণ পুরোহিত পাঠশালার প্রধান পণ্ডিত গঙ্গাচরণ কাপালীকে এতটা পাত্তা দিত না। কিন্তু দুর্ভিক্ষ তার ব্রাহ্মণত্বের গর্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। সাপ্লাই অফিসারের আচরণে সেই গর্ব একেবারেই ধূলিসাৎ হয়। তার ধারণা ছিল ভদ্রলোক বা ব্রাহ্মণ দেখলে অফিসার নিশ্চয় খাতির করবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গঙ্গাচরণ ও ক্ষেত্রকাপালীর অদৃষ্টে একই ব্যবহার। একই অনাহারের ও অপমানের জ্বালা উভয়েই সমান ভাবে অনুভব করে।

এখানেই মন্বন্তরের তুলনায় অশনি সংকেতের শ্রেষ্ঠত্ব। তারাশঙ্করের উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যায় না, তার আকস্মিক আগমন ঘটে যায়। বলা যেতে পারে সেখানে প্রস্তুতির কিছুটা অভাব। কিন্তু গ্রামের সুখী নিস্তরঙ্গ ও শান্ত জীবনে ধীর তথা নিশ্চিত পদক্ষেপে দুর্ভিক্ষের আগমন এবং সমগ্র গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তোলার চিত্র আঁকার জন্য বিভূতিভূষণের কাছে একটি নির্দিষ্ট গ্রাম ও নির্দিষ্ট কয়েকটি পরিবারই ছিল যথেষ্ট। তাঁর অকারণে গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবার প্রয়োজন হয় নি।
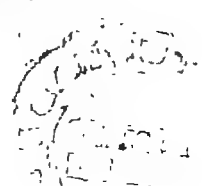
স্বামী বিবেকানন্দের 'শিকাগো-বক্তৃতা'

রমাকান্ত চক্রবর্তী

সম্ভবতঃ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে ধর্ম-প্রচারের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হায়দরাবাদে মেহ্‌বুব্‌-কলেজে একটি বক্তৃতা করে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। বিবেকানন্দ এবং তাঁর অনুগামীগণ জানতে পারেন যে, ১৮৯১ তে আমেরিকায় শিকাগো শহরে একটি ধর্মীয় 'পার্লিয়ামেন্ট'-এরঅধিবেশন হবে। অধিবেশনের প্রকৃত তারিখ তাদের জানা ছিল না। বিবেকানন্দের ভক্তবৃন্দ অর্থসংগ্রহ করতে থাকেন। প্রধানতঃ মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করা হয়। লক্ষণীয়, অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে বিবেকানন্দের বাঙালী গুরুভাইদের বাঙলা দেশে কোন ভূমিকাই ছিল না। প্রধানতঃ মাদ্রাজে এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়। ১৮৯৩ তে এপ্রিল মাসে এই যাত্রার জন্য বিবেকানন্দ 'ঐশ্বরিক নির্দেশ' পেলেন। তারপরে তিনি তাঁর শিষ্য ক্ষেত্রীর মহারাজার সঙ্গে মিলিত হন। এ সময়ে সেই রাজার দরবারেই নরেন্দ্র 'বিবেকানন্দ'-রূপে আখ্যাত হলেন। রাজা তাঁর জন্য উপযুক্ত পোশাকের ব্যবস্থা করলেন, সঙ্গে একটি টাকার থলে, এবং প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিলেন। 'পেনিনসুলার' জাহাজের যাত্রীরূপে ত্রিশ বর্ষ বয়স্ক বিবেকানন্দ বোম্বাই থেকে ১৮৯৩-এর ৩১ মে আমেরিকার দিকে যাত্রা শুরু করেন, এবং ২৫ জুলাই ভ্যাঙ্কুবার-এ অবতরণ করেন। পাঁচ দিন পরে তিনি শিকাগোতে এসে পৌঁছলেন।

ধর্মীয় পার্লিয়ামেন্ট-এর অধিবেশন শুরু হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর ৮

জুলাইয়ের শেষ থেকে সেই সময় পর্যন্ত বিবেকানন্দকে অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয়। তাঁর গরম জামা ছিল না, জানা ছিল না শিকাগোর রাস্তাঘাট, ছেলেপিলেরা তাঁর পিছনে পিছনে দৌড়িয়েছে, বিদ্রূপ করেছে। মালবাহকরা তাঁকে প্রায় সর্বস্বান্ত করেছে। কোথায় যে আশ্রয় পাবেন, তাও তাঁর জানা ছিল না। সকলেই এই বিচিত্র মূর্তির দিকে তাকিয়ে থেকেছে। শিকাগোর বিশ্বমেলা প্রাঙ্গণে এক ভারতীয় রাজার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। পূর্ব পরিচয় সত্ত্বেও এই রাজাসাহেব বিবেকানন্দকে গ্রাহ্যই করলেন না, কথাই বললেন না।

পরে বিবেকানন্দ শুনতে পেলেন যে, সেপ্টেম্বরে ধর্মীয় পার্লিয়ামেন্ট-এর অধিবেশন শুরু হবে। পরিচয় পত্র ছাড়া যে 'ডেলিগেট্' হওয়া যাবে না তাও তিনি শুনলেন। কোন পরিচয়-পত্রও তার ছিল না। আসলে পাশ্চাত্যে ধর্মজ্ঞান বিতরণ করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশের মঙ্গল বিধানের জন্য অনুগত সন্ন্যাসীদের সাহায্যে একটি হিন্দু-সংগঠন সৃষ্টি, এবং তারই প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ করা। প্রধানতঃ লোকশিক্ষার উপরেই তিনি জোর দিতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন:

> Suppose some disinterested Sannyasins,
> bent on doing good to others, go from
> village to village, disseminating
> education, and seeking in various
> ways to better the condition of all
> down to the Chandala, through oral
> teaching, and by means of maps,
> cameras, globes and such other
> accessories—can't they bring forth
> good in time?

শিকাগো-শহরে থেকে যেতে হ'লে প্রচুর অর্থব্যয় হবে,-এটা জেনে বিবেকানন্দ বোস্টন শহরে চলে গেলেন। ট্রেনে তাঁর সঙ্গে এক বৃদ্ধা ভদ্র মহিলার আলাপ হয়। মহিলার নাম ছিল কুমারী কেট্ স্যান্‌বোর্ন্। তিনি বিবেকানন্দের সঙ্গে হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক জন্ হেন্‌রি রাইট্-এর পরিচয় করিয়ে ছিলেন। অধ্যাপক রাইট্ নিজের চেষ্টায় একজন প্রতিনিধি রূপে বিবেকানন্দের ধর্মীয় পার্লিয়ামেন্টে যোগদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞ বিবেকানন্দ এই উদার হৃদয় অধ্যাপককে সর্বদা 'অধ্যাপকজী' বলে সম্বোধন করতেন। প্রথমে কিছুদিন তাঁকে কেট্ স্যান্‌বোর্ন্-এর আতিথ্য গ্রহন করতে হয়। সেখানে তিনি একজন 'Indian

'Rajah' রূপে কৌতুহলের বিষয় হয়ে পড়েন। স্থানীয় লোকজনদের 'রাজা' দেখিয়ে কেট্ স্যান্‌বোর্ন্ আনন্দ লাভ করেন। পরে বিবেকানন্দ অধ্যাপক রাইট্‌-এর গৃহে থেকেছিলেন'। অধ্যাপকের পত্নীর ভাষায়,[২]

> He came Friday. In a long saffron robe that caused universal amazement. He was a most gorgeous vision. He had a
> superb carriage of the head, was very
> handsome in an oriental way, about
> thirty years old in time, ages in
> civilization....Mrs. Merrill's eyes were
> blazing and her cheeks red with
> excitement.

প্রথম থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের রূপগুণসাধনাসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রায় অমোঘ। বহু তথ্য এবং প্রমাণের আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে, সেই বিদেশে প্রায় নিরাশ্রয় বিবেকানন্দ কোন বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য জ্যোতিষ বিদ্যার, কিংবা যোগমার্গের, কিংবা হরিনামের সাহায্য নেননি, কারু পদলেহন করেননি, কোন শ্বেতাঙ্গপুরুষের ভৃত্য হননি। ধর্মীয় পার্লিয়ামেন্টে যোগ দেওয়ার আগে একাধিক আলোচনা চক্রে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অতি কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর সমালোচনার ভাষা এইরূপ ;

> Ah ! the English ! Only just a little
> while ago they were Savages....the
> vermin crawled on the ladies' bodices···
> and they scented themselves to disguise
> the abominable odor of their Persons....
> most hor-r-ible !...But the judgment
> of God will fall upon them....Look at
> those Chinese, millions of them. They are
> the Vengeance of God that will light upon
> them.

এ সব তো রেখে ঢেকে 'কূটনৈতিক' কথা বলার নমুনা নয়। কিন্তু প্রশ্ন, বিবেকানন্দ ব্রিটিশ মহিলাদের গায়ে উকুনের অস্তিত্ব সম্পর্কে এবং ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ সম্পর্কে সংবাদ কোথায় পেলেন ? দ্বিতীয়তঃ, চিনের লোকেরা ইংরাজদের সর্বনাশ করবে—এ ধারণাও বা তাঁর হ'ল কেন ? ভারতের লোকদের কথা কি তাঁর মনে ছিল না ? তিনি ভারতে আর্থসামাজিক অসাম্যের সমা-

সমালোচনা করেন। এবং এটাই বলতে চান যে, এ জন্যই ঈশ্বরের প্রতিশোধ-রূপে ভারতে বর্বর ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়; তিনি বলেন[৪] :

> You look about India, what has the Hindoo
> left ? Wonderful temples, every where. What has
> the Mohammadan left ? Beautiful palaces. What
> has the Englishman left ? Nothing but mounds
> of broken brandy bottles !

তিনি দেশের জন্য শহীদ হ'তে চাইলেন[৫]...."My death would run through the land like a wild fire."

লক্ষনীয়, এরকম সব গরম কথা তিনি ভারতে বলেন নি। কেন যে আমেরিকাতে গিয়েই তিনি এসব কথা প্রায়শ বলতে থাকলেন তা সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু তাঁর মনোভাব যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। চরমপন্থার, তথা বৈপ্লবিক মানসিকতা তখন বিবেকানন্দের ভাষণে যতোটা স্পষ্ট, অন্যত্র ততোটা স্পষ্ট হয়নি।

'কলাম্বিয়ান বিশ্বমেলা'-র একটি অংশ রূপে শিকাগোতে ১৮৯৩-এর ১১ই সেপ্টেম্বরে ধর্মীয় পার্লিয়ামেন্টের অধিবেশন শুরু হল। বিবেকানন্দ তার আগেই শিকাগোতে পৌঁছেছিলেন, এবং ঠিকানা হারিয়ে ফেলার জন্য বিবিধ বিড়ম্বনা ভোগ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সৌভাগ্যক্রমে ২৬২, মিশিগান এভেন্যুতে জে. বি. লিয়ন্ নামক ধনীর গৃহে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হ'ল।

ধর্মীয় পার্লিয়ামেন্টে বিবেকানন্দের ভাষণ সমূহের বিষয়গুলো ছিল এইরূপ[৬] :

11 September, 1893 : Response To Welcome.
15 September, 1893 : Why Do we Disagree ?
19 September, 1893 : Paper On Hinduism.
20 September, 1893 : Religion Not The Crying Need Of India.
26 September, 1893 : Buddhism, The Fulfilment Of Hinduism.
27 September, 1893 : Address At The Final Session.

অপরিচিত, অখ্যাত বিবেকানন্দের এই বিশ্বধর্ম সম্মেলনে পাঁচবার ভাষনদান এবং হিন্দু ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ অবশ্যই এটা প্রমানিত করে যে, এ সম্মেলনে তাঁর প্রতিভা এবং গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। সেখানে এটাও প্রমাণিত হ'ল যে, তিনি একজন স্বাধীন অথবা Free-lance হিন্দু সন্ন্যাসী রূপেই হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কথা বলার অধিকার পেয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের যে

কোন সংগঠন ছিল না, তা প্রকটিত হ'ল। কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এ সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রতাপচন্দ্র পূর্বেও একবার আমেরিকাতে গিয়েছিলেন; পূর্বে তাঁর সঙ্গে বিবেকানন্দের বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু শিকাগোতে পূর্বের সেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক রইল না। বিবরণ পড়ে তাই মনে হয়।

বিবেকানন্দ স্বীকার করেছেন যে, এত বড়ো সম্মেলনে বরেণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে মঞ্চে বসে তিনি যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করেন :

> Of course my heart was fluttering and
> my tongue nearly dried up. I was so
> nervous, and could not venture to speak
> in the morning.

কিন্তু যখন তাঁর ভাষণদানের সময় এল, তখন তিনি অবিচলিত ভাবে সুস্পষ্ট উচ্চারণে সুন্দর ইংরেজিতে তাঁর কথা বলেছিলেন। সম্মেলনে যোগ দেওয়ার প্রায় দু'মাস আগে থেকেই তিনি বিভিন্ন সভায় এবং আলোচনা-চক্রে বক্তৃতা করার অভ্যাস করেন। সে অভিজ্ঞতাই এখন কাজে এল।

প্রথম দিন তাঁর খুব বেশি বলার সুযোগ ছিল না। প্রথম ভাষণে তিনি দুটি বিষয়ের উপরে জোর দিলেন। প্রথম বিষয়, হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত সহনশীলতা এবং বিশ্বজনীনতা। তিনি বললেন যে, এই আদর্শ অনুসৃত হয়েছিল বলেই ভারতে কালে কালে অন্যান্য ধর্মও প্রচারিত হতে পেরেছে। দ্বিতীয় বিষয়, সর্ব ধর্মের অন্তর্নিহিত সারবত্তা এবং প্রয়োজনীয়তা। এই বিষয় প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ শক্তিশালী ভাষায় সাম্প্রদায়িকতার, ধর্মীয় দলাদলির, এবং গোঁড়ামোর সমালোচনা করেন। ধর্মীয় পার্লিয়ামেন্ট যে সর্বপ্রকারের অধার্মিক এবং অমানবিক প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করবে, এই বিশ্বাসও তিনি ব্যক্ত করলেন। এখন যাঁরা হিন্দু মৌলবাদের সঙ্গে বিবেকানন্দের নামকেও সংযুক্ত করেন, তাঁরা যেন তাঁর এই ভাষণ ভালু করে পড়েন। প্রথম ভাষণেই প্রকৃত পক্ষে সর্বপ্রকার মৌলবাদের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, এবং মার্কিন শ্রোতাদের 'Sisters and Brothers of America' বলে সম্বোধন করে একটি সর্বজনীন ভাবকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। চারদিন পরে আরও একটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বর্ণোজ্জ্বল ভাষণে তিনি ধর্মচিন্তার এবং ধর্মাভ্যাসের ক্ষেত্রে কূপমণ্ডূকতার বিরোধিতা করেন।

১৯শে সেপ্টেম্বরে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে রচিত তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এ প্রবন্ধে পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়নি; প্রকাশিত হয়েছে প্রধানত হিন্দুধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে বিবেকানন্দের নিজস্ব ধারনা এবং মূল্যায়ন। তিনি মনে করেছেন যে, হিন্দু ধর্ম 'বৈদিক' ধর্ম। 'বেদ' বলতে তিনি কোন

বিশেষ ধর্মগ্রন্থকে বোঝানোনি বুঝিয়েছেন বহু যুগ ধরে সমাহৃত, বহু ব্যক্তিদ্বারা ব্যাখ্যাত 'আধ্যাত্মিক বিধান' সমূহ। হিন্দু ধর্মে যেমন আছে বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতা, তেমন আছে বিবিধ পৌরাণিক বিশ্বাস, মূর্তিপূজা, লোকধর্ম সমূহ। এমন কী বৌদ্ধ এবং জৈন অজ্ঞাবাদও হিন্দু ধর্মে স্থান পেয়েছে। বিবেকানন্দ ঘোষনা করেন যে বৈদিক আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত সমূহের একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে এক সময়ে ব্রহ্মাণ্ড ছিল না। তাঁর মতে এটি আধুনিক বিজ্ঞানেরও সিদ্ধান্ত।

তারপরে তিনি আত্মা এবং কর্মফল সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। গীতার প্রতিধ্বনি তুলে তিনি বলেন যে আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য, পদার্থের দ্বারা অপ্রভাবিত, চিরপবিত্র, অসৃষ্ট, এবং মৃত্যুহীন। তিনি কর্মফলের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, চেতনার গভীরে মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, পূর্বজন্মের বিবরণ জানা যেতে পারে। চৈতন্যতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব তাঁর ভাষায়, 'challenge thrown to the world by the Rishis'।[৮] মানুষের সুখ দুঃখ তাঁর মতে কর্মফল, অথবা তাঁর ভাষায়, 'inherited aptitude'।[৯] কিন্তু চৈতন্যজাত যে চিন্তা, তা কিন্তু বস্তু নিরপেক্ষ। তিনি ভেবেছিলেন যে, যদি দার্শনিক অদ্বৈতবাদ গ্রাহ্য বিবেচিত হয়, তবে বস্তুবাদী অদ্বৈতবাদও গ্রাহ্য বিবেচিত হবে।

যেহেতু আত্মা নির্মল, তাই আত্মার আধার মানুষ পাপী হ'তে পারে না। এ বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেন :[১০]

> Ye divinities on earth—sinners! It is
> a sin to call a man so....come up,
> O lions, and shake off the delusion
> that you are sheep; you are souls
> immortal, spirits free, blest and eternal.

বেদে শুধু কর্মফলের অনিবার্যতার তত্ত্বই নেই; সেখানে মুক্তির কথাও আছে, আছে আশার বাণী, মঙ্গল বোধ। সব কিছুর উপরে আছেন 'তিনি', যাঁর ইচ্ছায় বায়ু বহে, আগুন জ্বলে, বৃষ্টি হয়, এবং মৃত্যু আসে। এই মহা-জাগতিক ঈশ্বর সর্বত্র আছেন। তিনি অরূপ, সর্বশক্তিমান, সর্বজীবে দয়ালু। তাঁর উপাসনা প্রেমেই সম্পূর্ণ হয়; কিন্তু এই প্রেম নিষ্কাম।

আত্মার সঙ্গে জীবের সংযোগে আত্মার অধীনতা থাকে। এই সংযোগ ছিন্ন হ'লেই আত্মা সম্পূর্ণ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এই সংযোগ ছিন্ন হয়। অথচ, পবিত্রতা ছাড়া ঈশ্বরের কৃপালাভ করা যায় না। তিনি কৃপা করলেই তাঁর দর্শন পাওয়া যেতে পারে। তাঁর দর্শনলাভে সমস্ত সংশয় দূর হয়।

"This is the very centre, the very vital conception of Hinduism। হিন্দুধর্মে ঈশ্বরদর্শন এবং আত্মদর্শন এক এবং অভিন্ন। বিবেকানন্দ বলেন:[১২]

The Hindu religion does not consist in struggles and attempts to believe a certain doctrine or dogma, but in realising-not in believing, but in being and becoming.

মানুষ যখন এরূপ সাধনার দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে তখন তাঁর জীবনে আসে অশেষ আনন্দের উপলব্ধি। যা ব্রহ্মানন্দোপলব্ধি। মহাবিশ্বজীবনে যে ঘনীভূত আনন্দ আছে, তা পেতে হ'লে দেহবুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে হয়। সেই আনন্দে মৃত্যুর কোন স্থান নেই। বিজ্ঞানও সে কথাই বলে:[১৩]

Science has proved to me that physical individuality is a delusion, that really my body is one little continuously changing body in an unbroken ocean of matter.

বিবেকানন্দের মতে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মহাজাগতিক একতাকে আবিষ্কার করা। সেই পূর্ণতার সন্ধান না পেলে বিজ্ঞানের আরও বেশি দূরে অগ্রসর হওয়াই সম্ভব হবে না। "ধর্ম বিজ্ঞান"ও যদি সেই পূর্ণতার সন্ধান পায়, তবেই তা নিজেও পূর্ণ হবে।

প্রসঙ্গত বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন:[১৪]

At the very outset, I may tell you that there is no Polytheism in India.

এই অসাধারণ ঘোষণার ব্যাখ্যা রূপে তিনি দেখাতে চাইলেন যে, হিন্দু মন্দিরে যে কোন মূর্তিতেই পরমেশ্বর প্রতিফলিত হয়ে থাকেন। হিন্দুধর্মে বাইরের মূর্তিপূজো বড় কথা নয়; মূর্তিপূজোরও কতগুলো কারণ রয়েছে। সেগুলোকেও জানতে হবে, বুঝতে হবে। সত্য থেকে সত্যে আসা হিন্দু উপাসনার বৈশিষ্ট্য। তাই হিন্দু মূর্তি পূজা "does not mean anything horrible. It is not mother of harlots."[১৫] হিন্দুদের মধ্যেও ধর্মীয় উন্মাদনা থাকতে পারে; তবে তাতে আত্মহনন সম্ভাব্য হলেও পরহনন সম্ভাব্য হয় না। পরের উপরে অত্যাচার চলে না। অতএব হিন্দুমতে বিশ্বজনীন ধর্মে সাম্প্রদায়িকতারও কোন স্থান নেই। বিবেকানন্দের ভাষায় বিশ্বজনীন ধর্ম

Will be a religion which will have no place for persecution or intolerance in its polity,

which will recognize divinity in every man
and woman, and whose whole scope, whose
whole force, will be created in aiding humanity
to realise its own true, divine nature.[১৬]

শেষে তিনি 'স্বাধীনতার জননী কোলাম্বিয়া'র অথবা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গুণগান করে ভাষণ শেষ করলেন : [১৭]

Hail, Columbia, mother of liberty ! It has
been given to thee, who never dipped her
hand in her neighbour's blood, who never
found out that the shortest way of
becoming rich was by robbing one's neighbours,
it has been given to thee to march at the
vanguard of civilisation with the flag of harmony.

এই চিত্তাকর্ষক ভাষণ দেওয়ার পর দিনই (২০ সেপ্টেম্বর) বিবেকানন্দ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, অন্ততঃ ভারতে ধর্মপ্রচার নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। ভারতের গরিব মানুষকে আগে অন্নবস্ত্র দিতে হবে। যারা খেতে পায় না তাদের কাছে গিয়ে ধর্মের কথা বলা তাদের অবমাননা মাত্র। তিনি নিজেও ধর্মপ্রচার করার জন্য ব্যগ্র নন : [১৮] "I came here to seek aid for my improverished People..."

২৬ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হয়েছিল যে, বিবেকানন্দ বৌদ্ধ-ধর্মের 'সমালোচনা' করবেন। এই ঘোষণার পরেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বুদ্ধের এবং বৌদ্ধ-ধর্মের প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন যে, বুদ্ধদেবকে তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলেই মনে করেন। বুদ্ধের শিষ্যরাই তাঁকে ঠিকমতো বুঝতে পারেননি। বুদ্ধ বৈদিক ধর্মের সার কথাগুলোকেই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করেছেন। সকলের জন্যই তাঁর অসীম সহানুভূতি ছিল। তাঁর শিষ্যরা হিন্দু-দর্শনের সমালোচনা করে কিছুই লাভ করেননি। তাঁদের জন্যই ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ-ধর্মকে একে অপরের হাত ধরে চলতে হবে। ব্রাহ্মণদের মাথা আর বৌদ্ধদের হৃদয় যদি সংযুক্ত হয়, তবেই মঙ্গল। এই দুই বিশিষ্ট ধর্মের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দূরত্বের জন্যই ভারতের অধঃপতন হয়েছে, ভারতে অগণিত ভিখারী মানুষ হাজার বৎসর ধরে পরাধীন হয়ে আছে। তাই 'ব্রাহ্মণ'-বুদ্ধির সঙ্গে 'বৌদ্ধ'-হৃদয়ের মিলনই বাঞ্ছনীয়। পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী বিবেকানন্দ ইসলামের অসামান্য প্রাণশক্তির প্রশংসা করেন, এবং ভারতে তার প্রয়োজনীয়তাও ব্যাখ্যা করেন।[১৯]

২৭ সেপ্টেম্বরে বিবেকানন্দ শেষ ভাষণ দিলেন। এ ভাষণে তিনি ধর্মক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য আবেদন রাখলেন ; কিন্তু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যাতে বোঝাপড়া এবং সদ্ভাব থাকে, তার প্রয়োজনও বুঝিয়ে বললেন। কিছুটা তির্যক্ ভাবে তিনি বলতে চাইলেন যে, পবিত্রতা, দাক্ষিণ্য, সমৃদ্ধি কেন বিশেষ খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি নয় ; অন্যান্য ধর্মেও এ সব গুণের স্ফুরণ দেখা গেছে। তাঁর শেষ কথা :[২০]

> …upon the banner of every religion will be
> soon written, in spite of resistance : "Help and
> not fight," "assimilation and not destruction,"
> "harmony
> and peace and not dissension."

বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে ধর্মীয় পার্লিয়ামেণ্টে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতার এবং পঠিত প্রবন্ধের পৃষ্ঠা সংখ্যা সাকুল্যে মাত্র বাইশ। পরিমাণের বিচারে এতো প্রায় কিছুই নয়। কিন্তু এই ক'টি কথা সেখানে বলার জন্য তাঁকে যে কষ্ট পেতে হয়েছে, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও তাঁকে যে ভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে, অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে, তা ভাবলে প্রাণে ধাক্কা লাগে। এখনকার সিল্কের গেরুয়া পোশাক পরা, অনুচর-অনুচরীবেষ্টিত, দামি গাড়িতে যাতায়াতে অভ্যস্ত যোগী ও ভক্ত সাধুসাধবীর বিলেতে আমিরিকাতে যাওয়ার সঙ্গে বিবেকানন্দের আমেরিকা যাওয়ার কোন তুলনাই হয় না। তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ। নিজের আখের তিনি গোছাতে চাইলেন না। কোথায় গেলে তাঁর কি হবে, কাকে সন্তুষ্ট করলে তাঁর কি সুবিধা হবে, কোথায় মন রাখা কথা কইলে তাঁর সুবিধা হবে, এ সব প্রশ্ন আদপেই তাঁর মনে স্থান পেল না। ভাল করে খোঁজখবর না নিয়েই তিনি সীমাহীন সাগর পার হয়ে আমেরিকাতে এলেন। সেখানে কোথায় তিনি থাকবেন, তাও তিনি জানতেন না। সেখানে কিছুদিন তাঁর ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে। আস্তানা পাওয়ার জন্য কারু পায়ে তেল তিনি মাখেননি। কিছু বলতে হ'লে যা তিনি সত্য বলে ভেবেছেন, তাই নিঃসঙ্কোচে বলেছেন। তাঁর প্রায় বালকোচিত সরলতার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল অসম্ভব সাহস, অবিশ্বাস্য আত্মবিশ্বাস, অসামান্য দেশাভিমান, এবং দুরবগাহ, অথচ আকর্ষক ব্যক্তিত্ব। দেশের মানুষের কথা তো তিনি একবারও ভুলে যাননি। ধর্মীয় পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতা করে অভ্যর্থিত হওয়ার পরেও দেশের মানুষের সীমাহীন দুঃখ-দারিদ্র্য বঞ্চনার কথা ভেবে সারারাত কেঁদেছেন তিনি। অহঙ্কারে তাঁর বক্ষ স্ফীত হয়নি।

ওদিকে বিদেশী পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে তিনি কিছুতেই 'মেট্রোপলিটন'

সংস্কৃতিরূপে, সংস্কৃতির সার্বভৌম রূপ হিসাবে মেনে নিতে চাইলেন না। ভারত দরিদ্র ; ভারত পরাধীন ; ভারতের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কিন্তু তবুও ভারতকে 'মেট্রোপলিটন,' সার্বভৌম পাশ্চাত্যের একটি 'সাংস্কৃতিক প্রদেশ'রূপে ভাবতে পারলেন না তিনি। বলা যায়, অসামান্য জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেমই এই প্রতিভাবান যুবককে সেই অচেনা জগতে সর্বদা সোজা করে রেখেছে। পরাধীন, অন্ন, ক্ষুধার্ত, আশাহীন এক দেশে তাঁর জন্ম হয়েছিল ; সে দেশ থেকে তিনি এলেন এমন এক নতুন দেশে, যা কবি ওয়াল্ট হুইট-ম্যানের চমৎকার ভাষায় :[২১]

America, grandest of lands in the theory
of its politics, in popular reading, in
hospitality, breadth, animal beauty, cities,
ships, machines, money, credit....

কিন্তু বিবেকানন্দের ভীষণ উজ্জ্বল দুই চোখ তাতে ধাঁধিয়ে গেল না। বরঞ্চ সমৃদ্ধ, সুশিক্ষিত, সংস্কৃতি সম্পন্ন মার্কিন ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাগণ তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁদেরই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এমন ঘটনা বোধ হয় আর কখনও ঘটেনি।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হুইটম্যান্-রচিত বিখ্যাত কবিতা "Passage to India" পড়ে মনে হয়, অনেক মার্কিন কবি ও বুদ্ধিজীবী সুদূর ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার প্রতি একটা রোম্যাণ্টিক আকর্ষণ বোধ করতেন। হুইট-ম্যান, লিখেছিলেন :[২২]

Passage to India !
The old, most populous, wealthiest of earth's lands,
The Streams of the Indus and the Ganges and
their many affluents···
The flowing literatures tremendous epics,
religions, caster,
Old occult Brahma interminably for back,
the tender and junior Buddha....

বিবেকানন্দ "Passage to India" পড়েছিলেন কি না জানি না। কিন্তু হুইটম্যান, যে ভাবে, যে দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতকে দেখেছিলেন, বিবেকানন্দের আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা সমূহে অনেকটা যেন তারই আভাস অনুভব করা যায় ; এ যেন, সেই কবিরই ভাষায়,[২৩]

Reckless O Soul, exploring, I with thee, and
thou with me.

ভারত সম্পর্কে বহু রকমের 'অপসংবাদ' (disinformation) ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা, এবং তাদেরই মাসতুতো ভায়ের মতো কিছু কিছু মিশনারি সাহেবরা বহুকাল আগে থেকেই ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ধর্মীয় পার্লিয়ামেন্টে কোন বিতর্কে যোগ না দিয়েও বিবেকানন্দ দেখালেন যে ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম সম্পর্কে যা রটানো হয়েছে, তার অন্য একটা সদর্থক ভাষ্যও দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুধর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি, বহুরকমের নেতিবাচক প্রবণতা, বহুরূপ, বিবেকানন্দের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু ধর্মীয় সভাতে, এবং তারপরে এসব বিষয় নিয়ে তিনি কোন নেতিবাচক বক্তৃতা করেননি। আমেরিকাতে গিয়ে হিন্দু ধর্মের আদ্যশ্রাদ্ধ করা বিবেকানন্দের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। ধর্মীয় পার্লিয়ামেন্টে প্রদত্ত ভাষণ সমূহে বিবেকানন্দ এটাই প্রতিপন্ন করতে চাইলেন যে, মিশনারিদের দ্বারা হিন্দু ধর্মের বিদূষণে কিছু আসে যায় না, হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য তাতে কমে না।

অথচ, এটাও বলতে হবে যে, বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিলেন, তাতে সর্বাংশে হিন্দুধর্মের বৃহৎ ঐতিহ্যই স্পষ্ট হয়ে উঠল ; স্পষ্ট হ'ল সেই ঐতিহ্যে নিহিত উদারতা, বিশ্বজনীনতা, সদাচার, প্রেমভক্তি, মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ, এবং অবিনশ্বর আত্মা-বিষয়ক উচ্চাঙ্গের ভাববাদ। তা থেকে বাদ পড়ল জাতিভেদ, কর্মফলে বিশ্বাসের ভয়ঙ্কর নেতিবাচক পরিণাম, অবনত সব দেশাচার, দলাদলি, তেত্রিশ কোটি দেবদেবী, ধর্মের নামে ব্যভিচার, অন্ধ গুরুভক্তি, এবং সংখ্যাতীত কুসংস্কার। এ সব না ধরলে তো হিন্দু-ধর্মের প্রায় সবটাই বাদ পড়ে যায়। কাজেই এটাও বলা দরকার যে, বিবেকানন্দ অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, এবং ধর্মীয় পার্লিয়ামেন্টে হিন্দু ধর্মের একটি আংশিক, অসম্পূর্ণ, কিন্তু সদর্থক ভাষ্য উপস্থাপিত করলেন, যা মিশনারিদের অপপ্রচার মূলক আংশিক বিবরণেরই একটি ইতিবাচক বিকল্প-কথন মাত্র ছিল। এই বিকল্প ভাষ্য অবশ্যই দেশাভিমানী বিবেকানন্দের বিচারে প্রয়োজনীয় ছিল। তাঁর ভাষণ সমূহে ধর্মের উচ্চ আদর্শকে সামনে রেখে দেশপ্রীতির এবং জাতীয়তার বিবর্তনের সম্ভাবনাও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু এই দেশপ্রেম ও জাতীয়তা কোন অর্থেই সংকীর্ণ নয় ; সমগ্র মানব সমাজকেই তিনি আধ্যাত্মিক পূর্ণতা অর্জনের জন্য জেগে উঠতে বলেছেন। এই বিষয়টি সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা মন্তব্য করেছেন :[২৪]

> Of the Swami's address before the Parliament of
> Religions, it may be said that when he
> began to speak it was of "the religious
> ideas of the Hindus," but when he ended,
> Hinduism had been created.

বিবেকানন্দ সম্পর্কে এই মন্তব্য অতিশয়োক্তি হলেও কিছুটা অনুধাবনযোগ্য। বিবেকানন্দ দেখালেন যে, নতুন হিন্দুত্বের ব্যাখ্যাতে আর জাতপাতের কথা, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর বিবরণ, তন্ত্রমন্ত্র, দক্ষিণাচার বামাচার, পঞ্চোপাসনা, স্মৃতিশাস্ত্র প্রাসঙ্গিক হবে না; প্রাসঙ্গিক হবে হিন্দুধর্মের বৃহৎ ঐতিহ্যের ইতিবাচক বিশ্লেষণ, হিন্দুধর্মে সমন্বয় ও সদাচার, প্রতিমূলক ভাববাদের প্রশংসা। হিন্দুধর্মে বৈষ্ণব শৈব শাক্ত সাম্প্রদায়িকতাও বর্জনীয়। জল মিশ্রিত দুধ থেকে 'পঞ্চতন্ত্র'-এর হাঁস যেমন জলকে বর্জন করে দুধই পান করে, তেমন হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত খোসা আর ভুসিমাল একপাশে সরিয়ে রেখে হিন্দুধর্মের সারমর্ম, অথবা অদ্বৈতবাদই এখন গ্রাহ্য হবে। কিন্তু তার সঙ্গে দেশপ্রেমের সংমিশ্রণও প্রয়োজনীয়। আর্য সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, এবং সেই সঙ্ঘের "পরিবার" এখন সেই পথে চলতে চায়। হিন্দুধর্মের এবং হিন্দুত্বের একরৈখিক ভাষ্যের স্রষ্টা হলেন বিবেকানন্দ; শিকাগোর ধর্ম-সম্মেলনে তাঁর যোগদানের এইটে সবচেয়ে বড় তাৎপর্য। সেই ভাষণের শতবর্ষপূর্তির উৎসবাদিতে সেই তাৎপর্যই সম্ভবত ঘোষক যন্ত্রে তারস্বরে বিঘোষিত হবে।

বিবেকানন্দের মানসে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিবিধ দোষ এবং কুফল সর্বদা জাগরূক ছিল। পরিব্রাজকরূপে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন, এবং সাধারণ মানুষের অপরিসীম দুঃখকষ্ট দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি আমেরিকাতে গিয়ে দেখলেন যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে সে দেশের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। তাই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'mother of Liberty' বলে স্তব করেন।

সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের বিবিধ অসুবিধার কথা, রেড্ ইন্ডিয়ানদের উপরে ভয়ানক অত্যাচারের বিবরণ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অঙ্কুরোদ্গম প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তাঁর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকেই যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের নীতি অনুসরণ করে। মিড্‌ওয়ে দ্বীপ গ্রাস করে; নিকারাগুয়াতে বিশেষ অধিকার অর্জন করে। সান্টোডমিঙ্গো দখল করার চেষ্টা করে। কানাডাকে দখল করার জন্য চক্রান্ত করা হয়। ঐতিহাসিক লিখেছেন:[২৫]

> The emergence of the United States
> as a world power was not an isolated
> phenomenon, for the closing years of
> the nineteenth century witnessed every where
> an international struggle for new

markets and sources of supply.

কাজেই আমেরিকাকে 'mother of liberty' বলা অতিকথন ছিল। অথচ, ধর্মীয় পার্লামেন্টে অখ্যাত হয়েও বিবেকানন্দ যে বিপুল অভ্যর্থনা পেলেন, তাতে এ কথা বলা ছাড়া গত্যন্তরও তো ছিল না। কিন্তু "বাজারের পথ" খোঁজার জন্যই শিকাগোতে ধর্ম-সম্মেলন করা হয়,—আজিজুল হক্-এর এই সাম্প্রতিক মত, এঙ্গেলস্-এর একটি উক্তি থেকে উৎসারিত অনুমান-প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত।[৩৬]

॥ সূত্র নির্দেশ ॥

১. Marie Louise Burke, **Swami Vivekananda in America: New Discoveries** (Calcutta, Advaita Ashrama, 1966), PP. 12—13
২. তদেব, PP. 20—21
৩. তদেব, P. 23
৪. তদেব, P. 25
৫. তদেব, P. 26
৬. দ্রষ্টব্য : **The Complete Works of Swami Vivekananda**, Vol. I Mayavati Memorial Edition (Calcutta, Advaita Ashrama, 1962), PP. 3—24.
৭. M. L. Burke, পূর্বোক্ত, P. 59
৮. **The Complete Works**, পূর্বোক্ত, P. 9.
৯. তদেব, P. 8
১০. তদেব, P. 11
১১. তদেব, P. 13
১২. তদেব, P. 13
১৩. তদেব, P. 14
১৪. তদেব, P. 15
১৫. তদেব, P. 17
১৬. তদেব, P. 19
১৭. তদেব, P. 20
১৮. তদেব, P. 20.
১৯. তদেব, PP. 21—23.
২০. তদেব, P. 24.
২১. Walt Whitman, **Leaves of Grass**, ed. Sculley Bradley and Harold W. Blodgett (Prentice-Hall of India Private Limited, New Delhi, 1986), P. 734

২২. তদেব, PP. 411—421

২৩. তদেব, P. 421.

২৪. The Complete Works, পূর্বোক্ত, P. X.

২৫. দ্রষ্টব্য : S. E. Morison, H. S. Commager, W. C. Leuchtenburg, The Growth of the American Republic, Vol. I (Oxford, Oxford university Press, 1980), PP. 767 ff ; Vol. II, P. 235

২৬. আজিজুল হক, "সব পেয়ালের এক রা," 'পরিচয়' বৈশাখ-শ্রাবণ ১৪০০, পৃ. ১৪০। প্রসঙ্গতঃ মার্কসবাদী পণ্ডিত হেমন্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা স্মরণীয় : "বিবেকানন্দ বেদান্ত ও ভারতীয় সমাজ" সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন : "সমগ্র মানব সমাজের মৌলিক একতা, বিশেষতঃ এক মানসিক সংহতি, স্বার্থ সম্পর্কহীন স্বাভাবিক মানবীয় সহমর্মিতা। মানুষ মূলতঃ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অপাপবিদ্ধ,—ব্যক্তিগত লোভ, অন্যের উপরে পীড়ন ও শোষণ মূলে মানব প্রকৃতির বিকার,—ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী দর্শনের এই মানবদ্বেষী ব্যাখ্যা জগতের সামনে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তুলে ধরতে না পারলে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি পশ্চিম দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা সম্ভব হত না"। হেমন্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, 'সমাজ সাহিত্য ও দর্শন' (কলিকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ১৩৭৩, পৃ. ১২৪)

এই প্রবন্ধ রচনাকালে উপরে উল্লিখিত সূত্রসমূহ ছাড়াও The Life Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples (Calcutta, Advaita Ashrama, 1974) গ্রন্থটি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

রাজনীতি, সমাজ ও মূল্যবোধ

বাসব সরকার

দুনিয়ার ধারণা থেকে শুরু করে দুনিয়াদারী পর্যন্ত সবকিছু হোমো স্যাপিয়েনদের দৌলতে ঘটেছে, জানা গেছে, বোঝা ও বোঝানোর প্রচেষ্টা চলেছে। তবু দুনিয়ার আদিতে কি ছিল সেটা যেমন মোটামুটি অজ্ঞাত তেমনি তার অন্ত্যপর্বে কি থাকবে সেটাও অনিশ্চিত রয়েছে এবং থাকবে। এই আদি ও অন্ত্যপর্বের মাঝের অংশটা হোমো স্যাপিয়েনদের যুগ। তার শুরু নাকি একলক্ষ বছর আগে হয়েছে আর সমষ্টিগত উন্মত্ততা পেয়ে না বসলে অন্ত্যপর্ব বুঝি বা বহুদূরবর্তী রয়ে গেছে। দুনিয়ার হোমো স্যাপিয়েন পর্বেই গড়ে উঠেছে সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, এককথায় মানুষের বলার মতো সব কিছু তার মানুষের নিশানা। প্রাচীন গ্রীসের পণ্ডিতরাই সর্বপ্রথম মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাণী বলেছিলেন। মিশর, ভারত কিংবা চীনের সভ্যতা সুপ্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও এমন কথা কোথাও বলা হয়নি। গ্রীকরা সেখানেই থেমে থাকেন নি। রাজনীতিকতা কতোটা মানুষের সহজাত সেটা বোঝাতে the state is prior to man পর্যন্ত বলেছেন। কথাটা বাস্তবে সত্য না হলেও দার্শনিকতায় সঠিক। সুতরাং রাষ্ট্রের মতো রাজনীতির বয়সও সভ্য মানুষের সমান। এই যোগসূত্র ধরেই বলা যায় রাজনীতি, সমাজ ও সভ্যতার সমবয়সী।

গোড়ার যুগে সমাজ, সভ্যতা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার শৈশবে, মানুষ যখন রাজনীতি 'করতো' তার কথা ভাবার, বলার চেষ্টা করতো, তখন সেই রাজ-

নীতির চেহারাটা কেমন ছিল, সেটা জানার খুব কৌতূহল থাকলেও নির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলা যাবে না। কিন্তু একটা কথা রাজনীতির প্রকৃতি ও কর্মক্ষেত্র লক্ষ্য করলে বলা যায়, কাম্য কিছু পাওয়ার প্রচেষ্টাই ছিল রাজনীতি। একালে যখন রাজনীতির সর্বজনবোধ্য সংজ্ঞায় তাকে বিরোধ ও বিরোধ মীমাংসার প্রচেষ্টা বলা হয়, তখন যে কালে মানুষের নিজের ও অন্যদের সম্পর্কে ধারণা অসম্পূর্ণ, অপরিণত ছিল, সেকালে মানুষ যে বিরোধ করতে এবং সেটা মীমাংসারও চেষ্টা করবে, রাজনীতির সংজ্ঞায় সেটাই বলা হলে বোধহয় অন্যায় বা ভুল হবে না। এই ধারণাকেই আরো দুয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলা যেতে পারে বিরোধ মীমাংসার অর্থই হলো স্থিতাবস্থা ভাঙা। মানুষ স্থিতাবস্থা ভাঙে যা চলছে তা বদলাতে। সেই পরিবর্তন সামনের দিকে অথবা পিছনের দিকে যাবে কিনা, তার উপরেই রাজনীতির মান যাচাই করা হবে। মান যাচাই বা মূল্যায়ন হলো সমাজে পরিবর্তনের গতিমুখটা নজরে রাখা, তার নঙর্থক দিকগুলি সদর্থকদিক সমূহ নস্যাৎ করে কিনা খেয়ালের মধ্যে রাখা। সেই সম্ভাবনা না থাকলে পরিবর্তনকে প্রগতিশীল, আর থাকলে প্রগতি বিরোধী বলা রীতি।

পরিবর্তনের সদর্থক আর নঙর্থক ধারণা থেকেই মূল্যবোধের সূত্রপাত। তবে মূল্যবোধের একটা ব্যক্তিগত আরেকটা সামাজিক মাপকাঠি আছে। ব্যক্তিতন্ত্রের প্রাধান্যের যুগে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ বেশি গুরুত্ব পায়। সমাজে মানুষ যতোদিন সমষ্টিগত ভাবে ছাড়া বাঁচার কথা ভাবতে পারতো না, ততোদিন ব্যক্তিগত মূল্যবোধের ধারণা বেশিদূর ছড়াতে পারে না। সমষ্টিগত মূল্যবোধ তখন ছিল সামাজিকতার ভিত্তি। আমাদের পরিচিত সভ্যতা তার জন্মলগ্ন থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত মোটামুটি সমষ্টিগত মূল্যবোধকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। সেকালে ব্যক্তির জীবন, চিন্তাভাবনায় সমষ্টিগত মূল্যবোধের স্বীকৃতি ছিল মোটামুটি অকুণ্ঠ। কারণ তার জীবনের কোন লক্ষ্যই একক উদ্যোগে পূরণ করা সম্ভব ছিল না। সংস্কৃতিও তার ধারক বাহক ছিল। সেখানে প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটতো কখনো সখনো, কিন্তু সমাজকে অতিক্রম করে কিংবা অস্বীকার করে সেই ব্যক্তিত্ব আত্মকেন্দ্রিকতায় আপ্লুত থাকতে পারতো না। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেপোলিয়নকেও সিংহাসন দখল করার পর কর্সিকান সাবল্টর্নের দীনহীন পরিচয় চাপা দেওয়ার জন্য রাজনন্দিনীর সন্ধান করতে হয়েছিল, বিয়ের মাধ্যমে ইউরোপীয় অভিজাত সমাজে জাতে ওঠার ব্যবস্থা করতে। এদেশেও এই রকম ঘটনার বহু নজীর আছে। আসলে সভ্যতার আদিকাল থেকে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত সব দেশেই সামাজিক স্তর অনুসারে মূল্যবোধের এক ধরণের স্তরবিন্যাস ছিল। সমাজের উপর তলার ছিল বিশেষ এক ধরনের মূল্যবোধ, আর তার সমান্তরালে ছিল

প্রজা সাধারণের আরেকটা মূল্যবোধ। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির মেশামেশি হয়নি ঠিকই, কিন্তু চূড়ান্ত অবনিবনাও বোধহয় ছিল না। এদেশীয় প্রবাদ 'বড়ো লোকের কিংবা বড়ো ঘরের বড়ো ব্যাপার' তারই সাক্ষ্য বহন করে। ছোট ব্যাপারের ব্যাপারীরা তার থেকে দূরে থেকেছে, থাকতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু তাকে উপেক্ষা করতে পারেনি কিংবা সহসা ভাঙতেও চায়নি।

কিন্তু মূল্যবোধের স্তরায়ন, স্বাতন্ত্র্য থাকলেও ব্যাপকার্থে কোন স্তরই সমাজ নিরপেক্ষ ছিল না। আর ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এহেন পরিবেশে কোন দিনই মুখ্য হয়ে ওঠার সুযোগ পাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারতো না। সমাজের প্রবল উপস্থিতিতে ব্যক্তির স্ব-ক্ষেত্র তখন সীমিত ছিল প্রায় সর্বত্র। "ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা" নিয়ে প্লেখানভ কিংবা অন্য তত্ত্ববিদরা যে সব আলোচনা করেছেন, সেই ব্যক্তিরা হলেন অ-সাধারণ। বেশির ভাগ সাধারণ মানুষের জীবনচর্যা ও মূল্যবোধের সঙ্গে তাঁদের মিলের তুলনায় গরমিল বেশি। ব্যক্তিত্বের প্রবল অভিঘাতে তাঁরা অনেক-সময়ে সাধারণ স্তরে প্রচলিত মূল্যবোধ ভাঙতে চেয়েছেন, কখনো কিছুটা পেরেছেন কখনো আবার শেষরক্ষা করতে পারেন নি। বিদ্যাসাগরকেও সেই ট্র্যাজেডীর শিকার হতে হয়েছে। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনায় যিনি নোতুন মূল্যবোধের সূচনা করেছিলেন, জীবনের অন্তিম লগ্নে তাঁকেও বাল্যবিবাহ রীতিকে প্রকারান্তরে সমর্থন করতে হয়েছে। হিন্দু সমাজ মানসের গতানুগতিকতায় বাইরে জীবনের শেষপর্বে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়ার মতো ক্ষমতা তখন বুঝিবা বিদ্যাসাগরের মধ্যেও নিঃশেষিত হয়েছিল। সমাজ ব্যবস্থার গড়ন না বদলানো গেলে তাকে ভাঙার প্রচেষ্টার এই পরিণতি যে ঘটে থাকে, দুনিয়ার বহু দেশে তার নজীর পাওয়া যাবে।

রাজনৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে একথা বোধহয় অনেক বেশি প্রযোজ্য। বিশেষতঃ রাজনীতিতে গণযুগের সূচনায় মানুষের যে প্রত্যাশা জেগেছিল, সেই রাজনীতির গণভিত্তি যতোই প্রসারিত হয়েছে ততোই যেন প্রত্যাশার বিপর্যয় ঘটতে শুরু করেছে। গণরাজনীতি যতো সীমিত আকারেই হোক না কেন তার সূচনা পুঁজিবাদের প্রসারকে কেন্দ্র করে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যেই ঘটেছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রজাতান্ত্রিকতা, আমেরিকার বিপ্লবে স্বাধীনতার গণধারণা, ইংল্যাণ্ডে চার্টিস্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার বোধের প্রসার, সবই ঘটেছে পুঁজিবাদের বিকাশ-মুখিনতার সূত্রে। সঙ্গে সঙ্গে এবং প্রায় পাশাপাশি ঘটেছে শ্রম ও শ্রমজীবীদের মধ্যে নোতুন চেতনার আলোড়ন, মানবমুক্তির জল্পনা কল্পনা। শ্রেণী, সমাজ, সচেতনতা, শোষণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ এই গণরাজনীতির হাত ধরেই মানুষের মনকে প্রভাবিত ও আলোড়িত করতে আরম্ভ করেছে। বলা যায় ঊনিশ শতক মানুষের ইতিহাসে এমন এক ক্রান্তিকালের স্বাক্ষর রেখেছে যেখানে বিগত বহু শতাব্দীর চিন্তা চেতনার ঘেরাটোপ থেকে মানুষ বেরিয়ে

আসতে পেরেছে অতি দ্রুত এবং যথেষ্ট সংঘবদ্ধ ভাবে। মার্কিন ইতিহাসে from Log Cabin to White House কথাটির ব্যঞ্জনা শুধু একজন রাষ্ট্রপতির জীবন মহিমা কীর্তনে শেষ হয়ে যায় নি, সাধারণ মানুষকেও নিজের চারিপাশের বেড়া ভেঙে নিজেকে আরো বিস্তৃত করতে, ছড়িয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সমাজতত্ত্বে যাকে social mind বলে গণতান্ত্রিকতার সূত্রে তার সমষ্টিগত রূপ সমাজ মনস্তত্ত্বের পরতে পরতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে উনিশ শতকেই।

গণতন্ত্র ও গণ রাজনীতির সুযোগ ও সম্ভাবনা তখন থেকেই মানুষের মনকে এমন ভাবে আকৃষ্ট করে যখন রাজনৈতিক অধিকার লাভ করাকেই বেশ কয়েক প্রজন্মের মানুষ জীবনের চরম প্রাপ্তি বলে মনে করতে অভ্যস্ত হয়। উনিশ শতকের পশ্চিম দুনিয়ার নানা দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকার দাবিতে আন্দোলনের ইতিহাস লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে মানুষের শ্রেয় ও প্রেয় বোধে গণতান্ত্রিক অধিকারের সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠাই ছিল শেষ কথা। এই অধিকার কেন চাই, কিসের জন্য চাই, কোথায় কিভাবে তার ব্যবহার করতে হবে, সে সব কথা মানুষ ভাবতে চায় নি এবং পারেও নি। গণতন্ত্রীরা মনে করতেন মানুষের ভাবনাকে তখন সপ্রশ্ন করে তোলার যে কোন প্রচেষ্টা হলো গণতন্ত্র-বিরোধীদের মরীয়া কৌশল। ঠিক যেমন আমাদের দেশে গান্ধী যুগে গণরাজনীতির বিস্তার দেখে রবীন্দ্রনাথ যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বললেন গান্ধীর মুখে তাঁকে শুনতে হয়েছিল eduction may wait but Swaraj can not, পশ্চিমেও এরকম শেষকথা বলার লোক অনেক ছিলেন। অথচ রাজনীতি অভিজাতদের একচেটিয়া হয়ে যখন সাধারণ মানুষের স্তরে নামতে শুরু করে, তখন সমাজ পরিবর্তনের সেই যুগে সমাজের অন্তর্নিহিত কারণে যারা বাকি সকলের চেয়ে অনেক দ্রুত ও অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল, তারাও তখন রাজনীতির একটা এলিট বৃত্ত গড়ে তুলেছে। তারা রাজনীতিকে অতোটাই গণভিত্তি দিতে চায়, যাতে অভিজাতদের দাপট কমে আর তাদের প্রভাব বাড়ে। এরা ছিল সেই মধ্যশ্রেণী যারা গণতন্ত্র ও রাজনীতিকে প্রথম থেকেই নিজেদের মতো ব্যবহার করতে চেয়েছে।

ইউরোপে আধুনিক গণতন্ত্র ও রাজনীতি এই মধ্যশ্রেণীর হাতে গড়া, তাদের স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের দ্বারাই লালিত ও পালিত। দুনিয়ার অন্যদেশগুলির মতো ভারতেও তারা আধুনিক গণতন্ত্র ও রাজনীতি চালু করতে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছে। অন্যদিকে গণতন্ত্রকে যারা সংজ্ঞার্থে গ্রহণ করেছিল, তারা ভাবতে চেয়েছে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই হলো প্রথম কাজ। কারণ গণরাজনীতির যুগ শুরু হয়ে গেলে জগন্নাথের রথের রশিতে

সবাই হাত লাগাতে পারবে। তখন সকলের কামনা বাসনা পূরণ করার কোন অসুবিধা হবে না। আরো পরে যাঁরা বিপ্লব চেয়েছিলেন, সমাজ ব্যবস্থাটা বদলে দিতে চেয়েছিলেন তাঁরাও গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি দিয়েও রাজনীতির গণ-চরিত্র কায়েম করতে পারেন নি বলেই এখন নানা অভিযোগ উঠেছে। সমাজ-তন্ত্রের বিপর্যয়ের অনেক কারণের মধ্যে সেটাও একটা বড়ো কারণ বলে অনেকেই মত প্রকাশ করছেন। কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায়, গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ তার ব্যুৎপত্তিগত দিক আর বাস্তব ব্যবহারিক দিক, এ দুয়ের মধ্যে কতোটা সামঞ্জস্য করা সম্ভব? আসলে বিশ শতকে গণতন্ত্র থেকে শুরু করে রাষ্ট্রতত্ত্বের নানা বিশিষ্ট চিন্তা ভাবনা গুলি যতোটা প্রসারিত, মর্মবস্তুর দিক থেকে যতোটা বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, তার তুলনায় যে মানুষ নিয়ে তাদের কারবার সেই মানুষগুলি মনের দিক থেকে বদলে গেছে আরো অনেক বেশি। সব দেশেই কথাটা কম বেশি সত্যি। যেমন একালে দুনিয়ায় সব খানে কম বেশি এই অভিযোগ শোনা যায় মানুষ দ্রুত অরাজনৈতিক হয়ে পড়ছে। রাজনীতির তত্ত্ব, মতাদর্শ আর তেমন করে যেন মানুষের মনকে টানে না। গণ সংযোগ মাধ্যমগুলি যে কালে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে আপামর সমস্ত মানুষের খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছে, তখন মানুষের দ্রুত অ-রাজনৈতিক হয়ে পড়ার কারণ কি?

॥ দুই ॥

'কুকুর লেজ নাড়ে, না লেজ কুকুরকে নাড়ায়'? সাজাহান নাটকে অন্যতম প্রধান পার্শ্বচরিত্র এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামৎ খাঁ হাজী বিদূষক দিল-দারের ছদ্মবেশে মোগলদের দরবারী রাজনীতির এক বিশেষ পর্বে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তারপর নিজেই তার জবাব দিয়ে বলেছিলেন, কুকুরের জোর বেশি বলে কুকুরই লেজ নাড়ে। তবে লেজের জোর কুকুরের চেয়ে বেশি হলে লেজই কুকুরকে নড়াবে। কুকুর ইতর প্রাণী হলেও তার সবচেয়ে বড়ো গুণ বিশ্বস্ততা, আনুগত্য, প্রভুর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়ার মতো নিরন্তর প্রস্তুতি। গণতন্ত্রের ভূমিকা তার প্রভু সাধারণ মানুষদের জীবনে সেই রকম। মানুষের প্রতি বিশ্বস্ততা, আনুগত্য সেবার মনোভাব গণতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট। তার ব্যত্যয় ঘটলে গণতন্ত্র 'জনতাতন্ত্র' হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের লেজ সরকার, শাসন ব্যবস্থা। সরকার গণমুখী কর্মসূচি একনিষ্ঠ ভাবে পালন করবে, গণতন্ত্রে এটাই প্রত্যাশিত। গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ যাই হোক না কেন, এই প্রত্যাশা থাকবে। গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষতা কিম্বা পরোক্ষতার জন্যে সেখানে এই প্রত্যাশার পরিমাণগত মানে হেরফের হতে পারে কিন্তু গুণগত মানে ঘাটতি একই সঙ্গে হতে পারে না। তবে পরিমাণ ও গুণ, উভয় ক্ষেত্রেই মান কমতে শুরু করলে আশংকার সঙ্গত কারণ দেখা যায়।

গণতন্ত্র যদি পরিমাণগত মানকেই প্রাধান্য দেয়, সেখানে যা চলছে তা-ই চলবে বজায় বদলে, প্রত্যাশার একটা ভগ্নাংশ পূরণ করা গেলেই মানুষ বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোর চেহারাটা বজায় রাখতে চায়। ভারতে স্বাধীনতার পর একটানা রাজ্যগুলিতে বিশ বছর, আর কেন্দ্রে তিরিশ বছর ক্ষমতায় টিঁকে থাকার মধ্য দিয়ে কংগ্রেস দল প্রমাণ করেছিল গণতন্ত্রের পরিমাণগত মান বজায় রাখাকেই যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। সুতরাং কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠনের নামে সাধারণ মানুষের জন্য যা কিছু হয়েছে তার মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় টিঁকে থাকার কায়দা কানুন রপ্ত করা হয়েছে অনেক বেশি। ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতিতে তার সূচনা আর শেষ বোধহয় হবে গোষ্ঠীগত গৃহযুদ্ধে। কারণ গণতন্ত্রের মুশকিল হলো মানুষ পরিচালিত হ'তে হ'তে ক্ষমতায় থাকার কৌশল নিজেরাই আয়ত্ত করে নেয়। তখন ভোটের বাক্সেই পরিচালকদের বিপর্যয় ঘটে। তা ছাড়া সংসদীয় রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল what you can do, I can do better নীতির দ্রুত প্রসার। ক্ষমতা দখল করা ও দখলে রাখাই যখন লক্ষ্য, তখন কোন মূল্যই চরম নয়। গণতন্ত্রের গণ অংশ তখন থেকেই গৌণ হতে আরম্ভ করে।

অন্যদিকে গণতন্ত্র যদি গুণগত মানের দিকেই নজর দেয় বেশি তাহলে রাজনীতির চেহারা বদলে গণশাসনের প্রতিষ্ঠা হয়। তত্ত্ববিদ্রা যাকে partieipatory democracy বলেছেন, এটা হলো তারই বাস্তব চিত্র। তখন রাজনীতির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই 'মানুষই সব কিছু পরিমাপের একমাত্র মাপকাঠি' কথাটি আক্ষরিক অর্থে প্রযুক্ত হয়। এদেশে এই শেষের মানদণ্ডটি কোনদিনই গৃহীত হয়নি। জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্য দেশের সুপ্রাচীন সভ্যতার পরতে পরতে কাজের মধ্যে মানুষকে সমাজের সব কিছু বিচারের মাপকাঠি বলে গণ্য করেনি। ক্ষুধা, বঞ্চনার কাহিনী প্রচার ধর্মী বলে যদি অপাংক্তেয় হয়, সাম্প্রতিক কালের মণ্ডল বিতর্কে প্রমাণ হয়েছে গণতন্ত্রের গুণগত তাৎপর্য কিভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল। উপেক্ষিতরা যদি আজ বঞ্চনার মাশুল সুদে আসলে উসুল করতে চায়, ভারতীয় রাজনীতির চেহারা তখন কি দাঁড়াবে তাই নিয়ে শিষ্ট বর্গ যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করতে সুরু করেছেন। তাদের বরাবরের ধারণা অশিষ্টরা মূর্তিমান অশিব নানা কৌশলেও চেপে রাখা যাচ্ছে না। অথচ আক্ষরিক অর্থে গণতন্ত্র বজায় রাখতে গেলে এই অশিষ্টদের দোরে ধর্ণা দিতে হবেই কয়েক বছর অন্তর। যখন কাজ দিয়ে তাদের কাছে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন রঙিন মোড়কে প্রতিশ্রুতি দান, সেটাও অর্থহীন হয়ে পড়তে থাকলে, প্রচার বিশেষজ্ঞদের ডাক পড়তে থাকে জন মনস্তত্ত্বের নাড়ী টিপে তাঁরা কোন মন ধরানো বুলি বের করতে পারেন কিনা। আর এই সব প্রচেষ্টার পাশাপাশি দ্রুত রাজনীতির

পর্যায়ে উঠে আসতে থাকে মস্তান বাহিনীর সংগঠিত পেশী শক্তি যার থেকে সুরু হয়েছে রাজনীতির criminalization, যা ভারতে আজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিম বাংলা তার থেকে আদৌ মুক্ত নয়।

কথাটা হয়তো আরেকটু বিস্তারিত ভাবে বলা দরকার। এদেশে রাজনীতিকরা যখন থেকে ক্ষমতাশালি থাকাকে জীবনে মোক্ষলাভ বলে মনে করতে সুরু করেছেন, তখন সেই ক্ষমতা পেতে no holds barred politics চালু হয়েছে। এই মোক্ষ নিহিত অর্থে দাঁড়িয়েছে অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি, এক পুরুষ নয় কয়েক পুরুষের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সুখের ব্যবস্থা। রাজনীতিকরা জীবন মানের পরিবর্তন থেকে দৃষ্টিভঙ্গির বদল আর গোপন করার প্রয়োজন মনে করেন না। পঞ্চাশের দশক থেকেই শোনা যেত "মিটিং কা কাপড়ার" কথা, সভা সমিতিতে যাওয়ার জন্য জনগণের কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য, তাদেরই মতো পোষাক পরিচ্ছদ। অথচ আম জনতার সঙ্গে তাঁদের মানসিক দূরত্ব তখন বেশ বেড়ে গিয়েছে। সেই পর্ব অর্থাৎ মনকে চোখ ঠারার পর্ব, জনগণের জন্য মেকী দরদ দেখানোর ব্যাপারটা যখন ক্রমেই ধরা পড়তে থাকে, অথচ এই রাজনীতির ফাঁসি গলায় এঁটে বসে যায়, তখন আর মিটিংকা কাপড়ার দরকার হয় না। তখন থেকেই এই রাজনীতির নাম ভোটের রাজনীতি হয়ে পড়েছে। ক্ষমতা তা কেন্দ্র বা রাজ্য যে স্তরেই হোক না কেন ক্ষমতা ব্যবহারকারীর হাতে কিছু উপস্বত্ব তার আসবেই। সেটাই যখন প্রধান হয়ে দাঁড়ায় তখন তার পোষাকী নাম cut back, kick back হয়ে পড়ে, যার সঙ্গে আজ সবাই পরিচিত। বলা যেতে পারে পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক জীবনচর্যায় যাকে লাইসেন্স পারমিট রাজের পোষকতা বলা হতো গণতন্ত্রের প্রসার ও mass politics জোয়ারে সেটাই cut back, kick back হয়ে পড়েছে। রাজনীতির এই দিকটা আলোর নয় অন্ধকারের দিক। তাই তার হাত ধরে অন্ধকারের প্রাণীরা রাজনীতির জগতে প্রবেশ করেছে। দাউদ ইব্রাহিম, মেমন থেকে রশিদ খান পর্যন্ত সেই একই কাহিনি। তার কাজের ধরণে, এলাকায়, কৌশলে পাত্র পাত্রীতে রকমফের আছে কিছু, বিষয়টার আদত চেহারায় কোন তফাৎ নেই।

॥ তিন ॥

সমাজে mass politics ব্যাপক আকারে চালু হলে mass mobilization এর আয়োজনটাও ব্যাপক করতে হয়। মানুষ যদি স্বেচ্ছায় কিম্বা প্রাণের তাগিদে রাজনীতির ডাকে সাড়া দেয়, যেমন স্বাধীনতা আন্দোলনে দিয়েছে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে দিয়েছে, তখন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শই

তাদের কাছে আকর্ষণের বিষয় হতো। এখন মতাদর্শ হয়ে পড়েছে বাজারী পণ্যের লেবেলের মতো, মোটামুটি সমজাতীয় পণ্য, নামে না হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে কেবল তাদের brand name আলাদা। সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি পর্যন্ত মতাদর্শের ক্ষেত্রে রকমফের "নরম হিন্দুত্ব" থেকে "চরম হিন্দুত্ব" অর্থাৎ একই মেরুর মধ্যে দুই বিন্দুর অবস্থানে ঘোরাফেরা করছে। তাদের মতাদর্শের ব্যবহারিক দিকের মধ্যে মেরুগত ব্যবধান যে নেই এবং থাকতে পারে না, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ বাজারী অর্থনীতি দ্রুত থেকে দ্রুততর পদ্ধতিতে কায়েম করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মূলতঃ কোন বিরোধ নেই। জনতা দল যে অনুপাতে মণ্ডল প্রশ্নে আন্তরিক ও আপোষহীন, সেই অনুপাতেই তার সঙ্গে কংগ্রেস ও বি. জে. পি'র রাজনৈতিক দূরত্ব সূচিত হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তার সঙ্গে এই দুটি দলের পার্থক্য একই কারণে থাকবে। তবে বর্তমানে জনতা দলের ছেড়ে যাওয়া অংশগুলি মূল স্রোতে ফেরার পর একই কথা বলা যাবে কিনা, সে বিষয়ে সংশয়ের কারণ আছে।

বামপন্থী দলগুলি সম্পর্কে আপাত দৃষ্টিতে মতাদর্শগত অবস্থানের যে গুরুত্ব স্বীকার্য, বাস্তবের অভিঘাতে সে কথা অতো জোরে বলা যাবে কিনা, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মতাদর্শের ব্যবহারিক গুরুত্বের অবমূল্যায়ন pragmatism-এর নামে অনেক আগেই সুরু হয়েছিল। এখন বামপন্থা পোষাকী রাজনীতিতে যতোটা বজায় থাকে, তার আটপৌরে ঘরোয়া রূপে তার ভগ্নাংশ রাখার চেষ্টা করা হয় না। অবশ্য স্বীকার্য মেহনতী মানুষ এখনও সংকট মুহূর্তে মতাদর্শের কথা বলে, ভাবে, যদিও তাদের চিন্তা ভাবনায় বিভ্রান্তির, সংশয়ের কারণগুলি অন্ততঃ শহর ও শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক ভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে। মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষদের রাজনৈতিক চেতনায় মতাদর্শে যে ভাটার টান লেগেছে, বামপন্থীদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, আশাবাদী মানুষ সেকথা বলতে আজ দ্বিধা করে না।

মতাদর্শের অবমূল্যায়নের সূত্রে এখন যেটা খুবই প্রকট সেটি হলো রাজনৈতিক কর্মীরা, বামপন্থার শরিক হয়েও নিজেদের আর কমিউনিস্ট বলে ভাবে না, পরিচয় দেয় না, তাদের পরিচয় সোসিয়ালিস্ট বলে নয়, তারা কোন না কোন কমিউনিস্ট বা সোসিয়ালিস্ট দলের সদস্যরূপেই নিজের পরিচয় দেয়। মতাদর্শের অবক্ষয় এরপর আর বুঝতে বাকি থাকে না। তাই গণ-রাজনীতির অর্থ দাঁড়িয়েছে শক্তি কার কতো বেশি, সেটাই জাহির করার চেষ্টা। ফলে মতাদর্শের জায়গা নিয়েছে দলীয় সংগঠনের আঁটোসাটো ভাব, লোক জড়ো করার ক্ষমতা। বড়ো দল অর্থাৎ বেশি শক্তিশালী দলীয় সংগঠন, যা অল্প সময়ের মধ্যেই দলের ডাকে লোক জড়ো করতে পারে, পথজোড়া

মিছিল, মাঠ ময়দান উপচে পড়া সমাবেশ ঘটাতে পারে। সংগঠনের এই শক্তি অবশ্যই দরকার। তবে সেটা ভোটের রাজনীতিতে যতোটা জয়ৢরী মতাদর্শের লড়াইয়ে ততোটা নয়। যেহেতু সমাজ পরিবর্তনের কথা কেবল কর্মসূচীতে স্থান পেয়েছে, সেটা নিছক লক্ষ্য মাত্র, প্রাত্যহিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার রূপায়ণ করা সম্ভব নয় বা হচ্ছে না, তাই ভোটসর্বস্ব রাজনীতিও সংগঠন সর্বস্ব রাজনীতি হয়ে পড়ছে। ফলে সর্বত্র দলের লোক চাই, তাদের কাজ কর্ম দেখা ও তদারকের জন্য লোক চাই, যে চাওয়ার পরিণতি সর্বশক্তিমান সংগঠন গড়ে তোলা। গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের সূচনা তাই প্রথমে ঘটে দলের মধ্যে, তারপর দলীয় কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজে। আনুগত্যের এমন এক নিটোল পরিকাঠামোয় গণতন্ত্রের স্বাভাবিকতা নষ্ট হতে বাধ্য।

॥ চার ॥

তত্ত্বে ও বাস্তবে রাজনীতি, সমাজ ও মূল্যবোধের মধ্যে একটা গূঢ় সমীকরণ আছে। রাজনীতি স্থিতাবস্থাপন্থী হলে তার অনুকূলে শক্তি সমাবেশ ঘটিয়ে সমাজ ও মূল্যবোধের চলতি কাঠামো টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা হয়। রাজনীতি সংস্কারপন্থী হলেও এর ইতরবিশেষ হয় না, কারণ পরিবর্তন একটু একটু করে হবে। রাজনীতি পরিবর্তনমুখী হলে সমাজের পরতে পরতে আঘাত ও প্রত্যাঘাত চলতে থাকে। তখন সমাজের কাঠামো বদলানোর চেষ্টা হয়, মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে এবং বেশি দ্রুততার সঙ্গেই ঘটে। এই পরিবর্তনের পথ ছককাটা নয়, ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারও নয়। তার চরিত্রই এমন যা স্থিতাবস্থার সঙ্গে আপোষ করে না। সেই স্থিতাবস্থা সমাজ, সংগঠন কিম্বা অন্য যেখানেই হোক তাকে পরিবর্তনের রাজনীতি আঘাত করবেই। বলা দরকার আগে সংগঠন গড়ে, তাকে মজবুত করে, সে কাজ করা যায় না। পরিবর্তনের জোয়ারে মানুষ বদলায়, বদলে যায় তার সংগঠন ও সমাজ। সেখানে মানুষের আনুগত্য লক্ষ্যের দিকে, সংগঠনের দিকে নয়। যে সব দেশে সমাজ পরিবর্তন যতো বড়ো মাপের ঘটেছে, সেখানে পরিবর্তনীয়তা একটানা ধারায় সবকিছু প্রভাবিত করেই অগ্রসর হয়েছে।

পরিবর্তন করার জন্য রাজনীতির স্থিতাবস্থা রাজনৈতিক সংগঠনের কায়েমী স্বার্থবোধ গড়ে তুলতে বাধ্য। তখনই তারাই প্রধান হয়, সংগঠনের

সঙ্গে যাদের যোগ বেশি, সংগঠনের কাজে যাদের সাহায্য বেশি দরকার। সব দেশে সব দলে এই সংগঠনের প্রয়োজনেই অনাচার ও দুর্নীতির সূচনা, মূল্যবোধের ভাঙন দেখা গেছে। এদেশে, এই রাজ্য তার ব্যতিক্রম নয়। এই সার্বিক গতানুগতিকতার মধ্যে পরিবর্তনের কথা বলাও যেন হাস্যকর হয়ে পড়েছে। তবে বদলে যাচ্ছে কিছু একটা এবং অতি দ্রুত। হয়তো বাজারী ব্যবস্থার একমুখী বিকাশ প্রবণতার সঙ্গে তাল রাখতে, প্রকাশ্যে কিম্বা অপ্রকাশ্যে, স্বীকারোক্তি কিম্বা অস্বীকারের মধ্য দিয়ে, মতাদর্শ ও রাজনীতির মধ্যে, রাজনীতি ও মূল্যবোধের মধ্যে আন্তর সম্পর্ককে খাটো করে দেওয়ার, অন্তত রেখে দেওয়ার আগ্রহের বাড়বাড়ন্ত ছাড়া বাকি সব কিছু বাতিল করে দেওয়ার মানসিকতাই আজ একান্ত সত্য হয়ে পড়েছে।

শেষ

সম্পাদকীয়

শারদীয় 'পরিচয়' প্রকাশের মুখে আমরা সত্যিই এক মর্মান্তিক শোক-বিহ্বল পরিস্থিতির সম্মুখীন। দীর্ঘ সাতটি দশক ধরে যাঁর প্রতিভার দানে বঙ্গসংস্কৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হয়েছে, যিনি অর্ধশতাব্দী কাল 'পরিচয়' পত্রিকার পরিচালক, সম্পাদক এবং উপদেশক রূপে ছিলেন আমাদের অগ্রজতম অভিভাবক, সেই মানবিক মহিমাদীপ্ত, প্রবাদপ্রতিম সর্বজনশ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার গত ৩ অক্টোবর মধ্যরাতে এই মর্তভূমি থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেছেন। বঙ্গসংস্কৃতির বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এ যেমন ইন্দ্র-পতনতুল্য ঘটনা, 'পরিচয়-পরিবার'-এর ক্ষেত্রেও কথাটা তেমনি সমভাবেই প্রযোজ্য। কারণ, 'পরিচয়' আর গোপাল হালদার বিগত অর্ধশতাব্দীব্যাপী সমার্থক।

এই বিষাদঘন পরিবেশে প্রাজ্ঞ-মনীষী গোপাল হালদার-এর জীবন-মনন ও সাহিত্য-সাধনা তথা সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বহুব্যাপ্ত উজ্জ্বল অবদান নিয়ে আলোচনা করা আমাদের পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা শুধু বলতে পারি, নোয়াখালির গোপাল হালদার বাঙালির সমাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম প্রধান ভাষ্য-কার ও রূপকার হিসেবে নিজের যোগ্যতাবলেই যেমন দলমত নির্বিশেষে সংস্কৃতিমনস্ক প্রায় সকল মানুষের সশ্রদ্ধ ও সপ্রশংস স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পেরেছিলেন, তেমনি তাঁর গণতান্ত্রিক চেতনা, পরিশুদ্ধ মানবিকতা এবং বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের শৃঙ্খলমুক্তির জন্য তাঁর দায়বদ্ধতা আর নির্ভীক কণ্ঠস্বর স্বদেশের সীমা অতিক্রম করে সমাদৃত হয়েছিল বিদেশের বিদ্বজ্জন সমাজেও। এ হেন একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে আমরা তো বটেই, উভয় বাঙলার বাঙালিও আজ প্রকৃত অর্থে নিঃস্ব হয়ে গেল।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, গোপালদা ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস-পুরুষদের সার্থক উত্তরসূরী। বিংশ শতাব্দীর তিরিশ আর চল্লিশের দশকে মার্কসীয় মতাদর্শে দীক্ষিত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে অবিভক্ত বাঙলায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যতর আর এক রেনেসাঁস-এর যে-সূচনা ঘটেছিল, গোপালদা ছিলেন তারও অগ্রপথিক। গোপালদা নিজেই বলেছেন, মার্কসীয় সেই রেনেসাঁস নানা কারণে উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস-এর মতো অর্ধপথেই দিশাহারা হয়ে যায়। কিন্তু তার ইতিবাচক প্রভাব বঙ্গসংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজও দৃশ্যমান। গোপালদার তিয়াত্তর বছরে পদার্পণ উপলক্ষে ১৯৭৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতার স্টুডেন্টস হলে ভাষাচার্য সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা সভায় প্রবীণ কমিউনিস্ট

নেতা সোমনাথ লাহিড়ী সেদিন এইসব মনে রেখেই হয়তো দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, 'কমিউনিস্টদের মধ্যে গোপাল হালদার একজন যথার্থই শিক্ষিত লোক।'

গোপালদা আমৃত্যু চেয়েছেন—যা কিছু মানবিক তা গ্রহণ করতে এবং যা কিছু অমানবিক তা বর্জন করতে। অথচ ইতিহাসের কী নিষ্ঠুর পরিহাস, আমাদের দেশে সেই অশুভ অমানবিক শক্তিই কখনো আগ্রাসী হিন্দু-মৌলবাদ, কখনো মুসলিম-মৌলবাদের ফ্যাসিবাদী রূপ পরিগ্রহ করে আজ আমাদের সুমহান মানবিক ঐতিহ্যকে ভয়ঙ্করভাবে পদদলিত করতে উদ্যত হয়েছে। এমনকি আমরা লক্ষ্য করছি, বিদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এবং আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও ফ্যাসিবাদ আর ধর্মান্ধ মৌলবাদের প্রেতাত্মা আবার মাথা তুলতে চেষ্টা করছে, মানবিক মূল্যবোধ আর সুস্থ জীবনধর্মী সংস্কৃতিক প্রয়াসের গতিপথ রুদ্ধ করে দিতে চাইছে।

এই শোকের মুহূর্তেও আমরা নিশ্চিত জানি, গোপালদা বেঁচে থাকলে এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আমাদের আহবান জানাতেন। যাঁরা গোপালদার এই মানবিক ঐতিহ্যের অনুগামী তাঁরা এই আহবানে সাড়া দিয়েই গোপালদার অমর স্মৃতির প্রতি জানাবেন তাদের বিনম্র শ্রদ্ধা, এটাই আমরা বিশ্বাস করি। 'পরিচয়' পত্রিকা গোপালদার প্রদর্শিত পথ ভবিষ্যতেও অনুসরণ করার শপথ গ্রহণ করে তাঁর প্রতি শোকার্ত মনে জানাচ্ছে হৃদয়-উজাড় শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত স্ত্রী শ্রীমতী অরুণা হালদার এবং পরিবার-পরিজনকেও জানাচ্ছে আন্তরিক সান্ত্বনা ও সহানুভূতি। ভবিষ্যতে 'পরিচয়' পত্রিকার কোনো একটি সংখ্যা যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত হবে, এ কথাও আমরা পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে অনুচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছি।

আমাদের এই শোকাচ্ছন্ন মন নিয়েই 'পরিচয়'-এর লেখক-পাঠক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের আমরা জানাই শারদীয়ার প্রতি-শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সম্পাদকমণ্ডলী

পরিচয়

৬৩ বর্ষ নভেম্বর—ডিসেম্বর, ১৯৯৩, অগ্রহায়ণ—পৌষ, ১৪০০

৪-৫ সংখ্যা

প্রবন্ধ :

গল্প :

কবিতাগুচ্ছ :

[illegible]

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

বাংলা ছোটগল্পে 'কল্লোলের কাল': পালাবদলের প্রেক্ষিত

বীরেন্দ্র দত্ত

'কল্লোল' পত্রিকাকে সামনে রেখে যেসব তরুণ লেখক-বুদ্ধিজীবী সেদিন উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন দু'হাত-ওপরে-তোলা প্রতিবাদী অহংকারে, তাঁদের তখন জন্ম হয়েছে সবেমাত্র, এমন সময় থেকেই সমবেত মানুষের জাতিত্ব বুদ্ধি, মেধা-আবেগ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ তোলে সাম্রাজ্যবাদী শাসনে নতমুখ, জাতির যৌবনের স্রোতে। সময়টা বিশ শতকের একেবারে প্রথম দশকের প্রথম দিক। উনিশ শ পাঁচ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, এবং স্বদেশী আন্দোলনের উগ্রতা ও তীব্রতায় দেখা দেওয়া সন্ত্রাসবাদ, যুবজনতার আবেগদীপ্ত আন্দোলন ও তৎপরতা আশার জলন্ত অগ্নিস্বভাব থেকে নিরাশার ও ব্যর্থতার প্রদোষে অস্তমান হয়ে যায়। কালক্রমে সমুদ্রের একটা ঢেউ উঠে বিলীন হওয়ার পরে আর একটায় সামিল হয়ে আবার নিঃশেষ হওয়ার নিশ্চিত স্বভাবে। গভীর বেদনামথিত হতোদ্যম যুবকদের করে অস্থির, বিভ্রান্ত, বিমর্ষ, অসহায় আত্মকেন্দ্রিক। এর পরেও প্রতীচ্য খণ্ডে প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুর সুযোগে, ভারতের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনে-শোষণে থাকার আর এক সুবিধাভোগে বাঘা যতীনকে কেন্দ্র করে স্বদেশ ভাবনা সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার আন্দোলনে রূপ পেতে গিয়েও ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যে বড় বাধা পায়। গান্ধীজির নেতৃত্বে আন্দোলন হয়েছে উনিশ শ' উনিশ ও উনিশ শ' তিরিশেও। সেসব আন্দোলনেও দেশীয় যুবকদের প্রাণাবেগে এতটুকু ঘাটতি ছিল না। তবু যুবসম্প্রদায় কেন্দ্রিক এমন সব আন্দোলন যুবকদের প্রাণশক্তির বিকাশের পথকে সবুজ তৃণের আচ্ছাদনে রাখতে পারে নি। বেদনা, ব্যর্থতা, অনিশ্চয়তা, হতাশা, নৈরাশ্য, অস্থির-চিত্ততা তাদের মূল্যবান প্রাণশক্তির ভিতে এনেছে অবধারিত অবক্ষয়।

আমাদের মতে বিশ শতকের প্রথম দশকের প্রথম থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে পর্যন্ত যে যুবক প্রাণের অপব্যবহার ও বন্ধ্যগতির স্বভাব, তা শুধু আন্দোলনের ওঠানামায় মাত্র নয়, তার মূলে সবচেয়ে বড় কারণ প্রতীচ্যের

প্রথম মহাযুদ্ধ। কোন আন্দোলনই একটানা চলতে পারে না। দেশমুক্তির আন্দোলনে প্রথমে আসে বেগ, কিছুটা চলার পর দেখা দেয় প্রতিবেগ, বেগ-প্রতিবেগে যে সংঘর্ষ, তা থেকে বেরিয়ে আসে এক সাময়িক জড়তা, স্থিরতা, পরবর্তী আর এক আন্দোলনের প্রস্তুতির প্রথম পর্বের অ-দৃশ্য সূচনা। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধই একমাত্র ঘটনা বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে এবং যার সময় পরিধি চার বছর (১৯১৪-১৯১৮)—যা দিয়ে আমাদের দেশের যুবকদের চারিত্র্য নির্ণয় যথাযথ করা সম্ভব। যুবকদের হতাশা, ব্যর্থতা, নৈরাশ্য ছিলই একান্তভাবে দেশীয়, জাতিক প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর আগে। যুদ্ধশেষে সে সমস্তই হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক। যুদ্ধ ঘটেছে প্রতীচ্য খণ্ডে, কিন্তু যেহেতু ভারত বৃটিশ শাসনের অধীন এবং যেহেতু বৃটিশরা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত, তাই সুদূর যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব থাকতে বাধ্য এদেশে, এদেশীয় পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে, সর্বোপরি বুর্জোয়া অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থায়।

তাই কল্লোলের আবির্ভাবের আগে ও যুদ্ধশেষের পর ভারত তথা বাংলাদেশের জীবনে, অর্থনীতিতে ও সমাজব্যবস্থায় যে ত্বরিত পরিবর্তন আসে অন্তর্গূঢ় স্বভাবে, তা জাতীয় আন্দোলনে ব্যর্থ, নিরাশ যুবকদের জীবনে বাড়তি নতুন মাত্রা যোগ করে। সে মাত্রা নৈতিক অবক্ষয়ের, জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার অসহায়তার, সময়ের বিভ্রান্তির ও সংকটের। সমষ্টি জীবন নয়, ব্যক্তিজীবন ভয়ংকরভাবে আহত হতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবদান বাংলাদেশের যুবকপ্রাণে মূলত প্রাণ বিনাশের, অপচয়ের। ভাবের দিক থেকে এরই বহিঃপ্রকাশ কল্লোল গোষ্ঠীর, তরুণ মনের আয়নায় বিদের স্বভাবে ধরা পড়ে। জীবনের মূল্যবোধের সমূহ সংকট ও বিনষ্টি, বাস্তব অভিজ্ঞতার তিক্ততা, নিশ্চিত জীবন স্বভাবের উৎকেন্দ্রিকতা, অনিকেত জীবনমানে গভীর শূন্যতাবোধ যে উদ্‌ভ্রান্ত করে যুবকদের, সদ্য সচেতন হওয়া তরুণদের, তার মূলেই ছিল প্রথম মহাযুদ্ধ।

এই যুদ্ধ যে এক জটিল-যৌগিক সমাজ-মাটি তৈরী করে, তার মূলে বাস্তবত ছিল বিশ্বব্যাপী বাজারের অর্থনৈতিক মন্দা, চাকুরীপ্রাণ যুবকদের অসহনীয় বেকারত্ব। যারা সদ্য তরুণ হয়ে উঠছে তখন, তাদের সামনে তখন শুধুই সংশয় ও নেতিবাদের ঘন কালো মেঘ। আর এসবের বড় শিকার হয়েছে দেশীয় মধ্যবিত্ত সমাজ। কল্লোলকে কেন্দ্র করে যে লেখককুল দেখা দেন,

তাঁরা সকলেই তখন নানাভাবে কম বেশী পোড়খাওয়া মধ্যবিত্ত এবং বিত্তহীন বেকার। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনযাপন আর লেখক-মনস্কদের চিন্তা-ভাবনায় বিরাট পার্থক্য থাকেই। এঁদের রোমান্টিক মনের স্পর্শকাতরতা থেকে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাতেই তাঁদের আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিণত হতে থাকে। এই আক্রমণ সাহিত্যকে একমাত্র ভিত্ত করার কারণেই প্রধান লক্ষ্য হল সামনের সূর্য-আড়াল-করা অনড় পাহাড়ের মত রবীন্দ্রনাথ।

স্থিরবিন্দু থেকে বিচ্যুত মূল্যবোধে, সংশয়-সংকট জড়িত মূল্যবোধে মহাযুদ্ধ—পরবর্তী কাল বিশিষ্ট। যেখানে সমস্ত মূল্যবোধের সম্ভাব্য বিনাশের অমোঘ অশনি সংকেত, সেখানেই সাহিত্যের পালাবদল আপন নিয়মে দেখা দেয়। যেকোন সৃজনধর্মী সাহিত্যের, শিল্পের পালাবদল ঘটে কালের নির্দেশে তার ধারার ভিতর প্রাণের তাগিদে। তার ক্ষেত্রে আইনের সমস্ত ঘটনা, স্বভাব, বদল শুধু ইন্ধন জোগায়। বদলের জায়গাতে আছে রূঢ় প্রত্যক্ষতা ও মায়াবী বিস্ময়। একদিকে লেখকদের বাস্তবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি, আর একদিকে স্ব-স্বপ্নে লালিত যৌবন ধর্মের রোমান্টিকতার অভিসার—বাংলা ছোটগল্পের রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলে কল্লোলীয় গল্পকারগণ এই দুইকে রসদ হিসেবে নিয়েই যুযুধান হয়েছিলেন প্রহরনাথ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। যুদ্ধোত্তর সময়ের স্বভাবের নিরিখে তা 'বিদ্রোহ' নয়, 'প্রবল প্রতিক্রিয়া'র প্রকাশ্য রূপ। এসবের মধ্যে থেকে বাংলা ছোটগল্পের যথার্থ অর্থে, মোড়-ঘোরানোর দিক ধরা পড়ে বলেই এক আনন্দিত বিস্ময়ে আমরা স্থিত থাকি।

২. অব্যবহিত প্রাক-কল্লোল সাহিত্য-পরিমণ্ডল

বেশী দূরে যেতে হবে না, ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুর সময়ে যে 'সবুজপত্র' বেরোয়, তাকে ধরে প্রাক-কল্লোল কাল পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ অতি-তাৎপর্যপূর্ণ সময়-পরিধির সাহিত্য-পরিবেশ বিশ্লেষণ করলেই কল্লোলের আবির্ভাবের একটা প্রাক-সাহিত্য ভূমি স্পষ্ট হবে। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর মুখে 'সবুজপত্রে'র আবির্ভাব। এরসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী যেমন জড়িত, তেমনি জড়িত রবীন্দ্রনাথও। এই দুজনের সঙ্গে আমরা শরৎচন্দ্র, নজরুল এবং বিপিন পাল প্রমুখের বক্তব্য ধরে 'নারায়ণ' পত্রিকায় কিছু কিছু রবীন্দ্রগল্প সম্পর্কিত টীকা-ভাষ্য স্মরণ করতে পারি। প্রমথ চৌধুরীর আন্তরপ্রয়াসে ছিল 'নতুন

করে মানব প্রাণের মুক্তিকে চিহ্নিত করা। যা কিছু সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, পুরনো সমস্ত কিছুকে আঁকড়ে ধরে রাখার কঠিন মানসিকতা, যা কিছু কেবল সাধারণ কারণহীন আবেগ ও উচ্ছ্বাসকেই করে একমাত্র বর্মের, ধন, সেখানে ভাবালুতা মায়া-মোহের বাতাবরণ রচনা করে, প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণ মনীষা, মনন, বিবেকী বুদ্ধিপ্রাণতা তারই মূলে আঘাত হানতে কোমর বাঁধে। সঙ্গে থাকেন রবীন্দ্রনাথ। এসবই আসে সাহিত্যে, রবীন্দ্রসাহিত্যে তো নিশ্চয়ই, প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর শিষ্য ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের উত্তরকালীন রচনাতেও।

অর্থাৎ এক নিরাসক্ত বুদ্ধিনির্ভরতা, যুক্তির রক্তচক্ষু তাত্ত্বিকতা সাহিত্যের শরীরে ও স্বভাবে নানাভাবে সঞ্চারিত হতে শুরু করে। লক্ষণীয়, এসবই যুদ্ধ সমসময়ে ও প্রথম যুদ্ধের কালপ্রবাহিত সাহিত্যচেতনারই এক ব্যক্তিনির্ভর সচেতন প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে তরুণ প্রমথ চৌধুরী সেখানে এক অর্থে ভগীরথ। অপ্রচলিত অন্য কোন পত্রিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নতুন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। 'আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হইনি।' —রবীন্দ্রনাথের নিজেরই সমসময়বর্তী রচনাসমূহের 'নূতন পথে প্রবেশ' বিষয় এমন মন্তব্যের মধ্যেই সবুজপত্র ও প্রমথ চৌধুরীর এক নতুন সাহিত্য বাতাবরণের ইঙ্গিত মেলে। এমন সব সাহিত্য পরিবেশে নিরাসক্ত বুদ্ধি-নির্ভরতার যোগ, তা কল্লোলের কালের মাটিতে পরোক্ষে অতি ধীরে সার সরবরাহ নিশ্চয়ই করেছে। সাহিত্যস্তূপের নববিদেশী মর্যাদাভারও এক প্রখর ঐতিহ্য গড়ে ওঠে।

কিন্তু তা পরোক্ষ চিন্তায় থাকে, তখন বাংলাদেশের সমাজ জীবন ও ব্যক্তি-মনে প্রথম মহাযুদ্ধের মহামারীর মতো প্রভাব। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষের পর থেকে কল্লোলের আবির্ভাব, কালের আগের সামান্য কয়েক বছরের সময়ের, আমরা দেখি মহাযুদ্ধের ছায়ায় নিয়ে-আসা ভয়াল অনিশ্চয়তার এক জটিল বোধ। এখনকার সাহিত্যমণ্ডলে আসে বিদেশী সাহিত্য অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে continental সাহিত্যের সঙ্গে যোগ অনুভব। প্রমথ চৌধুরীর সময় থেকে ফরাসী সাহিত্যের অনুবাদের খবর আছে, মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধের কারণেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে আদানপ্রদান আত্মীয়তার স্বভাব পায়, আত্মীয়তা রক্তসম্বন্ধের প্রত্যয় পায়, গভীর গাঢ় হয়। কল্লোলীয়

লেখকদের কিশোর ও তরুণ মনে এর রোমান্টিক স্বপ্নময় আকর্ষণ অদ্ভুত এক জারকরসের কাজ করে। আমরা আগেও বলেছি, যে কোন সৃজনধর্মী—সাহিত্যধারার আন্দোলনের মূলে থাকে এক বিস্ময়কর স্বতঃস্ফূর্ততা তার শাখাবদলে তাই নিরাবয়ব প্রস্তুতিহীন, প্রস্তুতির ক্রিয়া থাকেই। কন্টিনেন্টাল উপন্যাস, গল্প, কবিতা পড়ার উৎসুক উৎসাহ ও অন্তিম আগ্রহ সেই ক্রিয়াকে গতি দেয়। বুদ্ধি প্রাণ ভাবনায় গোষ্ঠীচরিত্র নির্ণয়ে তা অমোঘ ওষধির মত কল্লোলে সমবেত তরুণ লেখকদের প্রাণে তারই প্রতিফলন।

কল্লোলের আগেই বাংলাদেশের পাঠক শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পাঠে মশগুল, বিভোর, মুগ্ধ। তরুণ নজরুলের কবিতার আবেগমথিত উচ্চকণ্ঠ তখন অগণন পাঠকদের কাছে আনতে সক্ষম। শরৎচন্দ্র গল্পরচনায় বেশ কিছুটা অনীহা—দেখিয়েছেন তাঁর বহেই উপন্যাসের তুলনায়। এই জনপ্রিয় কথাকারের বিপুল পাঠককুল তাঁর উপন্যাসের গল্পকথায় যতটা তৃপ্ত, তার থেকেও আরও তৃপ্ত হতে উৎসুক সে সময়ে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প তার ক্ষেত্রে বাড়িয়ে সোনা ফলিয়েছে অনেক, কিন্তু তাঁর সমস্ত রচনার বিরুদ্ধে অবোধ্যতা মিষ্টিসিজম-এর অভিযোগ তখনও কমেনি। রবীন্দ্ররচনায় অসামান্য সূক্ষ্মতা, মানবমনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে অভিনবত্ব, তাবার মধ্যকার কাব্যময়তা ও বৈদগ্ধ্যের অভাভূত সমাহার সার্বিক পাঠককুলের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায় নি, ব্যতিক্রম কিছু ইনটেলেকচুয়াল পাঠক।

মোটকথা, রবীন্দ্রনির্ভরতাও ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রয়াস যুদ্ধোত্তর কালে সাহিত্যের পরিবর্তনকে সমান প্রভাবিত করলেও যুদ্ধের অভিঘাতে সেখানে আসে ভিন্ন সুর। মনে রাখা দরকার যেকোন যুদ্ধে যূথবদ্ধ সৈনিকদলের প্রয়োজন থাকেই। অনেক সুরের মধ্যে একটা হল নরনারীর দেহনির্ভরতা, যৌনকামনা-বাসনার প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে সংযুক্তি। আমরা দেখেছি, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ১৯১৩-১৪ সালের মধ্যে ফ্রয়েডের সে মনোবিকলন তত্ত্ব ও তার ইংরেজি অনূদিত ব্যাখ্যার সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেছে পাঠকদের। ফ্রয়েডের শিষ্য এ্যাডলার, সেইসঙ্গে ইয়ুং ও হ্যাভলক এলিস অভিনন্দিত হচ্ছেন সমানভাবে। যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক লেনদেন-এ এঁদের প্রভাব সাহিত্যকে আর এক জটিল জালে জড়ায়। দেহসর্বস্ব প্রেম যৌনচেতনার জটিল অনুভবে 'মরবিড' প্রেমবোধের কথায় প্রাক্-কল্লোল সময় যে চালিত প্রমাণ আছে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও মনীন্দ্রলাল বসুর রচনায়।

এ বিষয়ে আলোচনার আগে আরেকটি সংবাদ স্মরণীয়। ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'। তারই যুবক নায়ক সুরেশের চরিত্রই যেন প্রৌঢ় রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে জীবানন্দ ১৯২০ সালে 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে। কিন্তু 'গৃহদাহে'র সুরেশের সে আশায় শরীর স্পর্শ ও ভোগের বাসনা, তা প্রাক্কল্লোল কালে রবীন্দ্রনাথ যা করেন নি শরৎচন্দ্র বাস্তবতায় তা-ই এঁকেছেন। এর নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আমরা স্মরণ করি সেই ১৯০০ সালে 'নষ্টনীড়' প্রাক্কালের প্রসঙ্গ। অর্থাৎ নরনারীর সমাজ-বিগর্হিত দেহ সম্পর্কের শুচিতাকে লক্ষ্য রেখেই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন রেখেছেন 'নষ্টনীড়ে', তারপরে বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক ধরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিন পাল, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ inmorality-র তর্কে ঝড় তুলেছেন 'নারায়ণ' ও অন্যান্য পত্রিকায়। একটা রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধে কল্লোলের কালের আগেই, আর সেই বিরোধিতা ছিল একদিকে নরনারীর অসামাজিক সম্পর্ক নিয়েও।

এই ধারায় যেন প্রজ্বলিত শলাকার মৃদুস্পর্শ দিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কল্লোলের আগেই ১৯২১ সালের 'নারায়ণ' পত্রিকায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই মৃদু স্পর্শে যে আগুন জ্বলে তার মূলে ছিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর সমাজ-অবক্ষয়। এই নির্মম অবধারিত অবক্ষয়ই নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে নষ্টনীড়ের পর আরও বেপরোয়া, বাস্তববাদী, অহংকারী করে তোলে, যার উপযুক্ত উত্তরসূরী কল্লোলের কালের লেখককুল—অন্তত সাহিত্যে জটিল যৌনতার প্রকাশ সূত্রে নিশ্চয়ই নরেশচন্দ্রের 'ঠানদি' (১৯১৮) গল্প। মৃত্যু দিয়ে ঠানদির স্বামীকে চিরকালের জন্য সরিয়ে দেবার পর বিধবা ঠানদি তার স্বামীর সম্পর্কে পিসতুতো দেওর শচীকান্তের প্রতি নিঃসঙ্গ নির্জন প্রণয় আকর্ষণে অবলীলায় বলে, 'তোমাকে দেখলে আমার লোভ হয়। তুমি আমার কাছে আর এসো না।' শুধু তাই না, শচীর দেহভোগের বাসনায় তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক-প্রতিম সংলাপের উত্তরে ঠানদির সলজ্জ তীব্র নম্র গোপন সমর্থন ও আত্মসমর্পণের অলৌকিক হৃদয় সংবাদ ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আয়না রচনা করে নরেশচন্দ্রের 'দ্বিতীয় পক্ষ' গল্পের নায়ক ভববিভূতির মধ্যেও আছে প্রেম ও যৌন সম্পর্কের চিন্তা ও জাতি দেহকে নির্ভর করে সে রোমান্টিক অস্থিরতা, অস্থিত-চিত্ততা,—এসবের পূর্বধার মেলে নরেশচন্দ্রে যেমন ওমনি অন্তভাবে মনীন্দ্রলাল বসুর একাধিক ছোটগল্পেও।

কল্লোলের কালের স্বভাববর্ম বুঝতে প্রসঙ্গত আর একটি দিক লক্ষ্য করার মত বা প্রাক-কল্লোল সাহিত্য পরিবেশের সমর্থক। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে একদল রবীন্দ্রানুরাগী লেখক যেমন থাকা স্বাভাবিক, তেমনি স্বভাবতই গড়ে উঠেছিল একদল রবীন্দ্রানুসারী লেখকগোষ্ঠি—কি কাব্যে, কি উপন্যাস গল্পের ধারায়। কি দেশী কি বিদেশী—সব সাহিত্যের ধারাতেই একদল 'average' লেখক থাকেন, আর একদল সচেতন 'Intellectual'। এ থেকেই কবিদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে একদল 'good বা 'minor poet' আর একদল great Poet, যাঁরা 'good' বা 'minor' তাঁদের বৈশিষ্ট্যই হল প্রতিভাবানের অনুসরণ, নকল করে ছাপোষা নির্বিরোধী নিরীহ মধ্যবিত্ত মানুষদের স্বভাবের মত সুখী সাহিত্য রচনা। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে এমন এক victorian স্বভাবের লেখকগোষ্ঠি অনড় হয়ে দেখা দিচ্ছিলেন। যথেষ্ট কম ক্ষমতাসম্পন্ন এঁরা নৈতিক দিক থেকে বাঁধা ছকের এবং কঠিন মানসিকতার অথচ সংস্কারে সীমার বাইরে যেতে অক্ষম। এঁদের রচনা গুরুপ্রণামীর মত, গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোও সারা হয়ে যায় এই মানসিকতার বৈশিষ্ট্যে। এই দল ক্রমশ মহাযুদ্ধ পরবর্তী কালের কিশোর ও তরুণ লেখকপ্রাণ মানুষদের বিরক্ত করছিল, ক্লান্ত করছিল, করে তুলেছিল অতৃপ্ত, অনধর্মী। এ থেকেই কল্লোলের সচেতন কিশোর তরুণ লেখক বুদ্ধিজীবীদের রোমান্টিক বিদ্রোহিতার প্রাথমিক সূত্র ধরতে সহায়ক হয়—যদিও সেইসঙ্গে রবীন্দ্রভাবনার প্রত্যক্ষ একজাতীয় ক্লান্তি তাঁদের মত করেই তাঁদের আচ্ছন্ন করতে থাকে সমান্তরাল। আমাদের মতে, কল্লোলের কালের অব্যবহিত আগের ও মহাযুদ্ধ শেষের প্রেক্ষিতেই বাংলা ছোটগল্পের পালাবদলের মাটি রচিত হচ্ছিল। একদিকে সর্বগ্রাসী, সূর্যসনাথ রবীন্দ্রের মধ্যাহ্নদীপ্ত প্রতিভা, আর একদিকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণ লেখকগোষ্ঠি এই দু'য়ের এক সাহিত্যিক পরিমণ্ডল ছিল প্রকাশ্যে। ভিতরে জমছিল প্রতিক্রিয়াজনিত বিক্ষুব্ধতা। নর-নারীর যৌনজটিলতার দিক, দেহসম্ভোগ বাসনা, যুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্ত জীবনভাবনার বাস্তবতা রবীন্দ্র সাহিত্যের তথাকথিত অতৃপ্তি ধরে যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়ে জন্ম রূপাবয়ব পায় ভিতরে—ভিতরে। তা নতুন, বস্তুত একেবারেই নতুন। যেন বা প্রথম মহাযুদ্ধ সবুজ তৃণ ঢাকা এক শ্মশানে নতুন তান্ত্রিকদের জন্য আসন পাততে থাকে একে একে, নতুন তন্ত্রসাধনায় তান্ত্রিকদের আচার যাতে নবরূপ, নব আশ্বাস পায়। কল্লোল—কালিকলম-প্রগতি সেই রকম ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী পরিবেশে—

প্রভাবে পালিত বাংলা সাহিত্যের প্রবল যুদ্ধ-আতঙ্কিত শ্মশানভূমির তিনটি আসন।

৩. কল্লোলের কাল: কল্লোল-কালিকলম—প্রগতি।

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে গল্পধারার বিবর্তন স্বভাব বিচারে প্রথম যে দিকটি লক্ষ্য করার মত, তা হল, গল্পের স্বাদের বদলাতে শুরু করেছে, কিন্তু আধার থেকে গেছে একই—সেই সাময়িক পত্র। তখন বাংলা গল্পের একমাত্র সোনার শ্রেষ্ঠ মুকুট-পরা রাজা, রবীন্দ্রনাথ, যিনি একদা দু'হাতে গল্প লিখেছেন হিতবাদীর পাতায়, পরেও দু'হাত বাড়িয়ে গল্প রাখার পাত্র হয়েছেন ভারতী, সাধনাকে সবুজপত্রে এসেও রবীন্দ্রনাথ গল্পের আধার করেছেন পত্রিকাই। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হ'ল, যতই নতুন নতুন পত্রিকা ধরে গল্পকার রবীন্দ্রনাথের রম্য ও স্থির ভ্রমণ ঘটেছে, ততই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ, অভ্যর্থনা, আসনগ্রহণ ও রাজ্যশাসন ঘটেছে রাজকীয় ভাবে ও মর্যাদায়। এমন পত্রিকা নির্ভরতা কিন্তু ব্যক্তি নির্দেশিত ও ব্যক্তিত্ব-প্রভাবিত।

অন্যদিকে কল্লোলের কালেও গল্পের বিবর্তনের যে এক একটি মাইলস্টোন, তা পত্রিকা নামেই, কিন্তু গোষ্ঠীগঠনের অমোঘ বিধানেই তার সম্ভাব্যতা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের কথা হল, কল্লোলীয়রা আশ্চর্যজনকভাবে গোষ্ঠীভূক্ত হয়েছিলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্বকে যুদ্ধে আহ্বান করতে। এ যেন অভিমন্যুকে ঘিরে সপ্তরথীর মত বীরদের সমবেত প্রয়াসে অভিমন্যুর বীরত্বকে 'চ্যালেঞ্জ' জানানো—অভিমন্যুর প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রেখেই। আসলে গল্পের বিবর্তনে পত্রিকা নির্ভরতা ছিল বিবর্তনের নিয়তি, কিন্তু গোষ্ঠী রচনায় ছিল যেন সময়ের অন্তরাল-নির্দেশ। কল্লোল, কালিকলম, প্রগতির প্রকাশ এমন গোষ্ঠীর তাগিদেই, ব্যক্তির স্বভাব-লিখনে দেখা যায় নি।

কল্লোলের কালের গল্পকাররা, আমাদের মতে, রবীন্দ্র বিরোধিতার সময়ের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথকে 'অস্বীকার' করতে চাননি, চেয়েছিলেন 'অতিক্রম' করতে। এই অতিক্রম করার মানসিকতা তো সময়ের নির্দেশেই, কারণ আমরা বিশ্বাস করি, সৃজনধর্মী সাহিত্য 'undeniably reflects in some sense the life and thought of its time...' অর্থাৎ কল্লোলের কালের তরুণ লেখকরা মনেপ্রাণে চাইছিলেন স্বাবলম্বী হতে, কারণ আগে 'ভারতী'

গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে অকুণ্ঠ রবীন্দ্র নির্ভরতা ভাবে ভাষায় তাদের মধ্যে ক্রমশ বিরক্তি, অস্বস্তি, ক্লান্তিতে করেছে অনড়। আর এখানে স্বাবলম্বনের বৈশিষ্ট্যই হল রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসা, সচেতনভাবে ও একান্তভাবে নিজেদের স্বভাবের বিশিষ্টতায়। সোচ্চার থেকে কল্লোলে সমবেত হওয়া ও ক্রমে ক্ষণস্থায়ী কালিকলম ও প্রগতিতে সচেতন আশ্রয় প্রার্থনা তারই সমর্থন যোগায়। তাই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যখন বলেন, 'কল্লোলের পথ সহজের পথ নয়, স্বকীয়তার পথ তখন আমাদের মন্তব্য সঠিক প্রমাণিত হয়। প্রমাণ হয় এই পত্রিকাও গোষ্ঠীর পক্ষে সমসময়ের আত্মিক সংকটের গভীর স্পন্দনকে বোঝার ক্ষমতা আছে। অচিন্ত্যকুমার বলেছিলেন, 'কল্লোল' বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।' এসব কিছুর পরিচয় আছে কল্লোলীয় লেখকদের একাধিক রচনায় যদিও বিতর্কের অবকাশ আছে সেসবের মধ্যেও।

কল্লোলের কালের লেখকরা চেয়েছিলেন অসামাজিক স্বাধীনতা ও অনৈতিক নৈতিকতার অকপট স্বাগত স্বীকৃতি। এই স্বাধীনতা ও নৈতিকতার মূলে আছে বিশুদ্ধ আনন্দ। সমাজের নীতি আর শিল্পের নীতিতে থাকে যৌনপ্রত্যয়, সাহিত্যে সমাজকে অসামাজিক করেও জীবনের মঙ্গল সম্ভব। তা মানুষের মনে যে চেতনার স্থিতি আনে, কল্লোলীয় লেখককুল তাকে অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও উপলব্ধিতে রাখতে চেয়েছেন গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, তাই 'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে। কয়লাকুঠিতে খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।' যদিও নিখুঁত শিল্পের বাস্তবতায় যথেষ্ট খাটো, তবু রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্র ইতিপূর্বে বিষয়ভাবনায় মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নাগরিক চেতনা থেকে নীচের তলার মানুষের মাঝে নিশ্চয়ই নেমেছিলেন। 'অভাগীর স্বর্গ', 'মহেশ', 'একাদশী বৈরাগী'র নামগল্প ও বাকি দুটি গল্প ইত্যাদি এমন মন্তব্যের পক্ষে থাকে। কল্লোলের আগে এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের প্রয়াসকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শরৎচন্দ্র যা করেছিলেন তা তাঁর নিজস্ব আবেগবান আদর্শবাদী ভাবনায়, রক্তাক্ত অবকম্পিত সময়ের যথাযথ সদ্ব্যবহারে নয়। কল্লোলীয়রা তা থেকে বিবেকবান শিল্পীর স্বভাবে আসতে চেয়েছেন, আবেগবান মনোভাবে স্থিত

হতে চান নি। এখানেই তাঁদের প্রতিক্রিয়া, তাঁদের যুযুধান স্বভাবের উৎস।

তবু কল্লোলের কালের লেখকদের সক্রিয়তার সীমা খড়ির গণ্ডীর মধ্যে থাকা? লেখকরা ছিলেন মধ্যবিত্ত. নাগরিক এবং শিক্ষিত। সময়ের দাবি ছিল তাঁদের বাঁধা পথ থেকে টেনে নীচে নামানোর, কারণ সে সময় বিশেষ সময়, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর সময়, অবক্ষয়ে, ব্যর্থতায়, গ্লানির কালিমায় মাখামাখি সময়। তাই সত্যই কথাকার-প্রাবন্ধিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ—'চরিত্রধর্মের দিক থেকে 'কল্লোল' ছিল নাগরিক—শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর ব্যর্থতাবোধ এবং গ্লানির সঙ্গে নিরুপায় বিদ্রোহ প্রয়াসেই 'কল্লোলে'র বৃত্তরেখা নির্দিষ্ট।'

আমরা আগেও বলেছি, শুধু 'কল্লোল' পত্রিকা নয়, কালিকলম ও প্রগতিকে নিয়ে এই তিনটি পত্রিকাই একটা সময়কে তুলে ধরে, যাকে আমরা মনে করি বিশেষভাবেই 'কল্লোলের কাল'। তিনটি পত্রিকার মধ্যে কল্লোলের জীবৎকাল সবচেয়ে বেশি, আর তার মধ্যেই কালিকলম ও প্রগতির জন্ম ও মৃত্যুর কোষ্ঠি রচিত হয়ে যায়। কিন্তু এতো সংখ্যাতত্ত্বের মাপা, আসলে এইসময় ও পত্রিকাগুলি কল্লোলের ভাব-ভাবনা, সাধ-সাধনা দিয়েই নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ কল্লোলের নেতৃত্বেই এই বিশেষ সময় ও পত্রিকাগুলি এবং এদের লেখককুল সচল, সরব ছিল। এটা কম কথা নয়। পত্রিকা করেছে গোষ্ঠিরচনা আর সেই গোষ্ঠি দেখিয়েছে বিরোধিতার বৃত্ত, বিদ্রোহের বীরত্ব। 'কল্লোলের' বিরুদ্ধতা শুধু বিষয়েই ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে। ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায়। রীতি ও পদ্ধতির প্রকৃতিতে। ভাষাকে গতি ও ভাবকে দ্যুতি দেবার জন্য ছিল শব্দ-সৃজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনাশৈলীর বিচিত্রতা। এমন কি, বানানের সংস্করণ।'

পৃথকভাবে ও প্রাথমিকভাবে 'কল্লোল' পত্রিকার আবির্ভাবের পশ্চাৎপটে ছিল সমসময়ের দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া ১। স্বদেশীর রাজনীতি ও সমাজভাবনার ফল, ২। প্রথম মহাযুদ্ধের পরোক্ষ বিষক্রিয়া। আগেও বলেছি, স্বদেশী আন্দোলনের সমূহ ব্যর্থতা ও সন্ত্রাসবাদী ভাবনার বদ্ধগলি-স্বভাব দিকভ্রান্ত যুবকপ্রাণে হতাশার কারণ্য স্বাভাবিক করে। এর সঙ্গে সমন্বিত হয় প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে পুষ্ট বুর্জোয়া অর্থনীতির নিষ্পেষ, চাকুরীপ্রাণ মধ্যবিত্তের সহনাতীত দুরবস্থা ও বিপর্যয়, আন্তর্জাতিক মন্দা

যাত্রার, গ্রামীণ মধ্যবিত্ত কৃষক-শ্রমিকের নগরমুখী হওয়ার প্রবল প্রবণতা, নির্জন বেকারী পরিবেশ। যতই সুন্দরের আর্তি থাক, প্রেমের মাঙ্গলিক বোধনবিলাস অভিপ্রেত হোক না কেন, সময় ও সমাজ তাকে পঙ্গু করে। 'কল্লোল' তাই জটিল মন ও সময়ের এক বিদ্রোহী রূপকে সামনে আনে। 'কল্লোল' অর্থে তার আশ্রিত ও সংগঠক গল্পকার লেখককুল—প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, যুবনাশ্ব, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ সান্যাল প্রমুখ। সহযোগিতায় ছিলেন কর্মী দিনেশরঞ্জন দাস, সাহিত্যিক গোকুল নাগ প্রমুখ।

'কালিকলমে'র প্রকাশ বাংলা ১৩৩৩-এর বৈশাখে, ইংরেজি ১৯২৬এ, 'কল্লোল' পত্রিকা চলার বছর চারেকের ব্যবধানে। কালিকলমের আবির্ভাবের পিছনে বাস্তব ঘটনা যা-ই থাক, কল্লোলের থেকে মূল আদর্শে ও উদ্দেশ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। থাকার কথাও নয়, কারণ সে অনুপ্রেরণায়, শিল্পী-আত্মার মহৎ সংকটেও রবীন্দ্রবিরোধিতায় কল্লোলে এসে সমবেত হয়েছিলেন প্রাথমিক পর্বে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ, সেই সমস্যাকে মনের গভীরে বজায় রেখেই এঁরা দুজন 'কালিকলমের সম্পাদক হয়ে যান। এক বছর পরে প্রেমেন্দ্র মিত্র আবার কল্লোলে ফেরেন। শৈলজানন্দও কল্লোলের সম্পর্ক নষ্ট করেননি পরেও। একটি তথ্য প্রসঙ্গত স্মরণীয়। কালিকলমের প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যার তখনকার অন্যতম সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি চিঠির আকারে তাঁর সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আন্তর স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে এইভাবে ভাষারূপ দেন : 'আমরা শয়তানের নিন্দা করব না, ভগবানের প্রশংসাও না। আমরা আমাদের নব উন্মীলিত দৃষ্টি দিয়ে জীবনের যাত্রা দেখব,—আর বলে যাব।' এই আন্তরিক কৈফিয়ৎ কল্লোলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যেরই সমান ও সমান্তরাল। আর সেকথা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন বলেই কল্লোলের আর এক উজ্জ্বলতম লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জানিয়েছেন—'কল্লোল আর কালিকলম একই মুক্ত বিহঙ্গের দীপ্ত পাখা।' আমাদের লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্য হল, বাংলা ছোটগল্পের রবীন্দ্র পরবর্তী ধারায় বিষাদময়, অনিশ্চিত সময়ের একটা বড় গভীর ভয়াল অন্ধকার খাদে কল্লোল—কালিকলম প্রগতি একটা লক্ষণীয় সেতুর যে কাঠামো দেয়, তা অতিক্রম করায় বাংলা ছোটগল্পের সাহসও ব্যাপ্তি, প্রসঙ্গও প্রকরণ নতুন উত্তাপও উদ্দীপনায় বহুপথমুখী হয়ে ওঠে। কালিকলমের মধ্যে ভীড় করেন কল্লোলীয় আর এক গল্পকার জগদীশ গুপ্ত, আসেন প্রবোধ-

কুমার সান্যাল। কালিকলমের সে গল্পরচনার আধার অভাব, সেখানে কল্লোলের কালেরই আদর্শ ও চিন্তাভাবনা, হৃদয় ও বুদ্ধির বেদী। বেপরোয়া রবীন্দ্রবিরোধিতায় মাতাল, অসামাজিকভাবে নৈতিক একদল তরুণের মুখপত্র নিশ্চয়ই 'কালিকলম'।

কালিকলমের ঠিক একবছর পরেই স্বল্পকালের আয়ু নিয়ে বেরোয় 'প্রগতি' ১৩৩৪ এবং আষাঢ়ে, ঢাকা থেকে বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্তের যৌথ সম্পাদনায়। সুকুমার সেন কল্লোলের কালের লেখকদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: 'স্পষ্ট রবীন্দ্র বিদ্বেষ না থাকিলেও রবীন্দ্রবিমুখতা ছিল অনেকেরই।' সেই 'বিমুখতা' থেকে সে প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্র আদর্শ ও ভাবনা—বিরোধী রচনায় প্রকাশ ঘটতে থাকে, তার আধার কল্লোল ও কালিকলম যেমন, তেমনি 'প্রগতি'ও। কিন্তু আমাদের নির্দিষ্ট 'কল্লোলের কাল'—এ প্রগতি হল। এই কালের প্রান্তশায়ী পত্রিকা। এর সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু আক্ষরিক অর্থে কল্লোলের সময়কে অনেকটা পেছনে রেখে এসেছেন। পাঁচটা বছর কিন্তু দুই মেরুগামী ভাব ও ভাবনায়, আদর্শও আদর্শ-অনন্বয়ের উত্তরোলে কম নয়। তাই 'প্রগতি'র ১৩৩৪এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং যখন মন্তব্য করেন, 'রবীন্দ্রনাথের পর থেকে একটি সম্পূর্ণ নতুন যুগ যে বাংলা সাহিত্যে এসে গিয়েছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ করতে ইচ্ছে করে না।' —তখন কল্লোলের কালের সাহিত্যিক ও নব ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতার স্বীকৃতিকে নন্দিত করতে আপত্তি থাকে না। 'প্রগতি' তুলনায় অনেক পরে এসেছে বলেই কিছুটা স্থিত সময়ের প্রভাবে এর মধ্যে রবীন্দ্রবিরোধিতার দিক সাহিত্যে অশ্লীলতাকে মর্যাদাদানের প্রয়াস, অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন। বেশি করে পক্ষে সামগ্রিক কালের সংশয় বিতর্ককে সজাগ রেখে শ্লীল-অশ্লীলের বাধে বস্তি জীবন, ডাস্টবিন, দেহজীবী নারীদের কুঠরী, মদ আর ক্ষুধার দীর্ণ নীচুতলার মানুষজন ব্যাপকভাবে সাহিত্যের সভ্য হতে দেখা দিয়েছে। এক লেখকরা সেই কল্লোল-কালিকলমেরই, আর এঁদের ভাবনা, লক্ষ্য আরো বেশি সংবদ্ধ, আদর্শে স্থিরনিষ্ঠ থাকায় রীতিমত 'purposive'।

কল্লোলের কালের নতুন সাহিত্য তৎপরতা নিয়ে একালের লেখকদের মধ্যেও যে দ্বিধা ছিল তার প্রমাণ আছে কল্লোলের সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্রের ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় লিখিত এক মন্তব্যে: 'দুঃখ হয় ত কোথাও

কোথাও এই আবির্ভাবকে আন্দোলন বলে চালাবার হাস্যকর চেষ্টা দেখি।'
আবার ইনিই পরে আন্দোলনের নতুনত্ব, স্থায়িত্ব, প্রভাব ও গঠনমূলক লক্ষ্যকে কোন না কোন অর্থে স্বাগত জানিয়েছেন নানা ভাষণে। বস্তুত কল্লোলের কাল যেমন সংকটের কাল, অনিশ্চয়তার কাল, তেমনি এর তরুণ লেখকদের পক্ষে দ্বিধার কালও। সেইসঙ্গে আর একটি বড় দিক লক্ষ্য করার মত। তা হল, এইকালে সাহিত্য নিয়ে এমন বাদ-প্রতিবাদের মুখর স্বভাব বাংলা সাহিত্যের ধারায় কমই দেখা গেছে। আমরা বিশ শতকের প্রথমার্ধের কথা মনে রেখেই এই মন্তব্যটি রাখছি। 'শনিবারের চিঠি' ছিল কল্লোলের কালের এক সবল বিরোধী, অন্য-কথায় তিরস্কারী পত্রিকা। কল্লোলীয় সাহিত্য ভাবনাকে লক্ষ্যে রেখে সে বাদ-প্রতিবাদের বাড় ওঠে, তাতে অংশ নেন মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ কল্লোলের পক্ষের. বিপক্ষের ছিলেন সজনীকান্ত দাস থেকে শুরু করে অনেকেই। ডঃ সুকুমার সেনের আসল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে 'শনিবারের চিঠির মত কাগজ প্রকারান্তরে এই ঝোঁকে 'বাস্তব' সাহিত্যেরই বাজার দর বাড়িয়ে দেয়। আমরা মনে করি, এমন বিরোধী পত্রিকার প্রয়োজন সে সময়ে ছিল। ছিল, কারণ, (১) এতে নবোদ্ভূত সাহিত্যধারণার ব্যাখ্যাও বিচারকালের পটে মানানসই হয়, (২) সংগ্রামী তরুণ লেখককুলের আত্মদর্পণ স্বচ্ছ হয়, (৩) আত্ম আবিষ্কারে তাঁদের জটিল অনুসন্ধিৎসার মানসক্রিয়া ও আত্ম সংকটের স্বরূপ সু-নিয়ন্ত্রণে পথ পেতে থাকে। (৪) স্বতস্ফূর্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার এমন এক পরিমণ্ডল আপনা-আপনি দেখা দিতে থাকে সেখানে রবীন্দ্র-উত্তর এক সম্ভাবনাময় সময়জ্ঞান স্বভাবী পাঠকদের সামনে ধরা পড়ে নিশ্চিতভাবেই।

কথা হল, বিশেষকালও বিশেষ পত্রিকা কিভাবে নানা দ্বিধা এনে শেষে জয়ী হয় সে সময়ে তরুণ সতর্ক লেখক বুদ্ধিজীবীর কাছে, অন্যতম কল্লোলপ্রাণ লেখক অচিন্ত্য সেনগুপ্তের অভাবনীয় আত্মোক্তিমূলক স্মৃতিচারণে তার প্রমাণ মেলে। তেরশ তিরিশ সালের আঠারোই ফাল্গুন, শনিবার, অর্থাৎ কল্লোলের প্রকাশকালের কিছু পরেই সেনেট হলের রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত কমলা লেকচার্স শোনার সময় স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র, তখনো কল্লোলের সঙ্গে সম্পর্কিত হননি প্রত্যক্ষভাবে, সেই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত উত্তর স্মৃতিচারণে জানাচ্ছেন তাঁর প্রতিক্রিয়া : 'ভাবতুম রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের শেষ, তাঁর পরে আর পথ নেই, সংকেত নেই। তিনিই সবকিছুর চরম পরিপূর্ণতা। কিন্তু কল্লোলে

প্রসঙ্গ : 'মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ'

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

'পরিচয়' শারদ সংকলনে ১৪০০ সংখ্যায় শ্রীসমীরকুমার দাস মহাশয় 'মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে ১৯৯০-এ প্রকাশিত 'হিন্দু রাষ্ট্রবাদীরা কী চান? আবার কি বর্গির হাঙ্গামা শুরু হবে?' পুস্তিকাটি সম্বন্ধে অনেকগুলি (৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী) মন্তব্য করেছেন। এই সুবাদে তিনি আমার আত্মপ্রচারের যে-সুযোগ দিয়েছেন তার জন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর দেওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্রথমেই জানাই যে 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' (কলকাতা ১৯৯১) গ্রন্থের ভূমিকাতে আমি সাম্প্রদায়িকতা আর মৌলবাদের পার্থক্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি এবং সেসঙ্গে মৌলবাদ বিষয়ক দুখানা বিদেশে প্রকাশিত গ্রন্থের উল্লেখ করেছি। তারপরে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় মৌলবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি—এগুলির মধ্যে জানুয়ারী ১৯৯৩ সংখ্যায় 'সত্যপালন বনাম জনতাতোষণ' প্রবন্ধটিতে রামচন্দ্রের চরিত্রের বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য। এবং সম্প্রতি 'হাওয়া ৪৯' নামক পত্রিকার শারদীয় ১৪০০ সংখ্যায় 'মৌলবাদের রূপ ও স্বরূপ' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশ করেছি—এই প্রবন্ধটিতে মৌলবাদ বোঝার সুবিধে হতে পারে এরকম দুখানি এনসাইক্লোপেডিয়া ও সাতখানি বিদেশী বইয়ের নামোল্লেখ করেছি; ঐসব গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জি বা সূত্রনির্দেশে মৌলবাদ বিষয়ক আরও অনেক গ্রন্থ ও রচনার উল্লেখ পাওয়া যাবে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও R. S. Kinsman সম্পাদিত The Darker Vision of the Renaissance এবং Harry Levin লিখিত The Myth of the Golden Age in the Renaissance আর New Cambridge Modern History vol. II দ্রষ্টব্য। একটা বিশেষ অর্থে 'মৌলবাদ' শব্দটার প্রয়োগ বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার বাংলায় পাওয়া যাবে না, কিন্তু Calvinism-এর সাদৃশ্য-যুক্ত Fundamentalism শব্দটার প্রয়োগ মার্কিন ইংরেজি ভাষায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শুরু হয়। সমীরবাবু বলেছেন, ১৮৯৫-এ 'নায়গ্রা কনফারেন্সে' এক পারিভাষিক অর্থে Fundamen

talism শব্দটার প্রথম প্রয়োগ হয়। তিনি বোধহয় ১৮৭৬ থেকে আরব্ধ নায়গ্রা বাইবল কনফারেন্সের কথা বলতে চেয়েছেন।

আমার পুস্তিকাটি সম্বন্ধে ৪পৃষ্ঠা জুড়ে তিনি যে-আলোচনা করেছেন তাতে আমার মনে হয়েছে, 'অভ্রান্ত' ও 'স্বতঃসিদ্ধ' রূপে অর্থাৎ যুক্তিবাদীর জন্যে কোন সংশয় না রেখে বক্তব্য উপস্থাপনকে তিনি মৌলবাদী মানসিকতার প্রকাশ বলে মনে করেন এবং 'কিছু রাষ্ট্রবাদীরা কী চান? আবার কি বর্গির হাঙ্গামা শুরু হবে?' পুস্তিকাতে আমি রামচন্দ্র সম্বন্ধে যে-বক্তব্য উপস্থাপন করেছি তা আপাত দৃষ্টিতে মৌলবাদের পরিপন্থী বলে মনে হলেও আসলে মৌলবাদের পরিপোষক, কারণ রামচন্দ্র সম্বন্ধে আমার বক্তব্যকে আমি মৌলবাদীর মতই 'অভ্রান্ত' 'স্বতঃসিদ্ধ' রূপে, যুক্তিবাদীর জন্যে সংশয়ের অবকাশ না রেখে উপস্থাপন করেছি।

পুস্তিকাটি এখন আর পাওয়া যায় না। রামচন্দ্র সম্বন্ধে আমি সত্যিই কী লিখেছিলাম তা সমীরবাবুর প্রবন্ধের পাঠক-পাঠিকাদের জানাবার জন্যে ঐ পুস্তিকা থেকে রামচন্দ্র বিষয়ক পুরো অংশটাই এখানে উদ্ধৃত করছি: "লোকপ্রিয় রাম, এবার রামের কথায় আসি। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-জৈন-শিখ-পারসিক নির্বিশেষে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে রাম এক অতিপ্রিয় পৌরাণিক কল্পনা। শত শত বছর এই ভূখণ্ডের মানুষ রামকথার মধ্যে পেয়েছে রূপকথার আর লোককথার বহু বীরত্বের, বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের, বহু ছলচাতুর্যের বহু নায়ক রামের চরিত্রে ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত রূপ। এই রাম এক মহাকবির বিস্ময়কর সৃষ্টি, এবং সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে লোকপ্রিয় কল্পনা।

'আর কী বিস্ময়কর লোকোত্তর কবিপ্রতিভা বাল্মীকি। কিন্তু অজন্তার শিল্পীদের মতো বা ইলোরার ভাস্করদের মতো বাল্মীকির পরিচয় অনেকখানি অস্পষ্ট। কোথায় তাঁর ঘর ছিল, কোথায় তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন, কার কাছে সংস্কৃত ভাষা আর ব্যাকরণ পাঠ করেছিলেন—এসবের কিছুই আমরা জানিনা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা যেমন প্রমাণ করে যে এই ভাষার রচয়িতা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মানুষ, শরৎচন্দ্রের ভাষা যেমন প্রমাণ করে যে এই ভাষার রচয়িতা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মানুষ তেমনই বাল্মীকির ভাষা প্রমাণ করে যে তিনি যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কাছাকাছি সময়ের মানুষ ছিলেন।

'কল্পনাজাত রাম'। বিশ্বহিন্দু পরিষদের পুস্তিকায় দেখছি যে, তাঁরা উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আরও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য হল, "সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।" রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন যে ঘটনার চেয়ে সত্য কবির কল্পনা এবং রামের সত্যতর জন্মস্থান কবির মনোভূমি।

'রামের কল্পনায় ভারতের ঐক্য ও সংহতির আদর্শ ছিল। গুজরাত থেকে আসাম পর্যন্ত সবখানে রামকথা জনপ্রিয়। রামের কল্পনা শুধু ভৌগোলিক একতার ভিত্তি নয়, রামের কল্পনা আমাদের বিভিন্নকালের মধ্যে ঐতিহ্যের বন্ধনসূত্র। এস ওয়াজেদ আলি যে রামায়ণকেই ভারতবর্ষের ট্র্যাডিশনের বা বহমান জীবনের ধারাবাহিকতার প্রমাণ বলে নির্ণয় করেছিলেন, সেকথা কি বিশ্বহিন্দুপরিষদের অভিভাবকরা ভুলে গেলেন?

'রামায়ণ রচনার জন্যে কৃত্তিবাসকে প্রথম সংবর্ধনা কে দিয়েছিলেন? কৃত্তিবাসকে প্রথম সংবর্ধনা দিয়েছিলেন রুকুনুদ্দিন বারবক সাহ। আসলে সুলতান রুকুনুদ্দিন বারবক শাহ ভারতের ঐতিহ্য পরম্পরায় ধারাবাহিকতার ও সংহতির প্রতীকী সাধনাকেই সংবর্ধনা দিয়েছিলেন।

'কিন্তু কল্পনাজাত রামের লোকপ্রিয়তা কিংবা ভারতের লৌকিক সংহতির প্রতীকরূপে রামের কল্পনা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মনঃপূত নয়। তাঁরা রামের ঐতিহাসিকতা ঘোষণায় ব্যাকুল। তাঁদের এই ব্যাকুলতার কারণ কী?

"ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে বাবর, আকবর, ঔরঙ্গজেব প্রমুখ অন্যান্য ঐতিহাসিক ব্যক্তির সঙ্গে রাম একই মানদণ্ডে বিচার্য হন নাকি, রামকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করলে সিংহাসনে বসার আগে রাম এবং সিংহাসনে বসার পরে রাম—এই দুই রামের চরিত্রে যে পার্থক্য দেখা যায় তা উপেক্ষা করার উপায় থাকে না।'

'সিংহাসনে বসার আগে আর পরে রাম চরিত্র'—সিংহাসনে বসার আগে পিতার সত্যপালনের জন্যে রাম অকাতরে রাজ্য ত্যাগ করে বনবাসে গেলেন। রাম তখন নিতান্তই তরুণ। বনবাসী রাম বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে এক অনন্ত কোমলমধুর চরিত্র। সীতার প্রতি প্রেমে, প্রকৃতির প্রতি প্রেমে, চণ্ডাল গুহকের প্রতি প্রেমে অপূর্ব রসঘন। তাঁর স্পর্শমাত্রে পাষাণী অহল্যার প্রাণলাভ এক পবিত্র প্রতীকী।'

'কিন্তু মায়ামৃগের প্রতীক বোধকরি বাল্মীকির কবিপ্রতিভায়, নাটকীয়তায় ও দার্শনিকতায় সবচেয়ে উত্তুঙ্গ শিখর। মায়ামৃগ বা সোনার হরিণ হল পার্থিবতায় গঠিত সেই সাফল্য যার পেছনে ছুটে মানুষ নিজের চরিত্র ও ধর্ম ধ্বংস করে আর সেই সঙ্গে বহুজনের সর্বনাশ করে। মায়ামৃগের প্রতারণা থেকেই রামের চরিত্রে পরিবর্তনের সূচনা। কোমল-সরল রাম হলেন কঠোর-চতুর রাম। একজন সীতাকে উদ্ধারের জন্যে হল শত সহস্র প্রাণবলি। রাম তাহলে কী রকম মহাবলী? তবে শিল্প-সাহিত্যে একটি বাক্যে কোনো কীর্তির বর্ণনা হয় না, সমস্ত বিস্তার কাব্যের রসসৃষ্টির জন্যে একান্তই আবশ্যক।

'অবশেষে রামের প্রত্যাবর্তন ও সিংহাসনে আরোহণ। তারপর যখন প্রশ্ন উঠল, রাজ্য না সীতা—কাকে ত্যাগ করবেন তখন কিন্তু রাম রাজ্যত্যাগে রাজি নন। মিথ্যার মুখ রাখতে তখন তিনি সীতাকেই ত্যাগ করেন নি কি? সিংহাসনের মোহ আর সীতার মর্যাদা—এই দুইয়ের মধ্যে সিংহাসনই বেছে নেননি কি? সীতার যে অপমান রাবণ করেননি, সেই অপমান রাম করেননি কি? যাঁরা বলেন, প্রজারঞ্জনের জন্য তিনি এমনটি করেছিলেন তাঁরা ভেবে দেখুন—রামের অবর্তমানে ভরত প্রজারঞ্জনে মোটেই অক্ষম ছিলেন না।

'সিংহাসনে সমাসীন হবার পরে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে রাম দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে নির্ণয় করলেন, নিম্নবর্ণ-জাত শম্বুক উচ্চজ্ঞান অর্জনে নিরত। রামরাজ্যের মহত্ত্ব কত অদ্ভুত! একজন শ্রমজীবী যদি উচ্চজ্ঞানে আগ্রহী হয়, তাহলে রামরাজ্যেও অভিশাপ নেমে আসে। তাই শম্বুকের মাথা কেটে ফেললেন রাম। মনুর বিধান অনুসারে, ঠিক কাজই করলেন। মনুর বিধান অনুসারে রামের আচরণ প্রমাণ করে নাকি যে মনুসংহিতা রচনার পরবর্তী বা সমসময়ে রামায়ণ রচনা সম্পন্ন হয়েছিল?

'কায়েমি স্বার্থের সুরক্ষা—সীতা আর শম্বুকের প্রতি রামের আচরণ কী প্রমাণ করে সেটা ভেবে দেখেছেন কী? আমার ধারণা, রামের আচরণ যা-যা প্রমাণ করে সেগুলো বিশ্বহিন্দু পরিষদের অভিভাবকগণ ভালোই জানেন, কিন্তু এখন অবোধ সেজে চুপ করে বসে আছেন, একবার সিংহাসনে আরোহণ বা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলে তখন তাঁরা রামের আদর্শ প্রচারে ও প্রয়োগে পুরোপুরি নেমে পড়বেন।

'মনুর সংহিতা অনুসারে নিম্নবর্ণের উচ্চাশা, জ্ঞানপিপাসা, সত্যজিজ্ঞাসা,

অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা—এসবের থেকেই সমাজে সংসারে অশান্তি ও বিপর্যয় আসে। সুতরাং নিম্নবর্ণ তথা শ্রমজীবীকে নিচে রাখাই সুখ-শান্তি বজায় রাখার উপায়। মনু যে-বক্তব্য সূত্রের আকারে বলেছেন, রামরাজ্যের বৃত্তান্ত কি গল্পচ্ছলে সেটাকেই প্রমাণ করছে না?

'রাম ও মনুর ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি সমদৃশ নয়। একজন দৃষ্টান্ত দিয়ে, অন্যজন বিধান দিয়ে সুবিধাভোগী ও শক্তিমানদের কায়েমি স্বার্থ সৃষ্টি ও তার সুরক্ষা করেননি কি?

'সেই কায়েমি স্বার্থকে আজ বিশ্বহিন্দু পরিষদ নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপন্ন করতে উদ্যত হয়েছে কি?

'সম্প্রতি অনুষ্ঠিত লোকসভার নির্বাচনের পরে বুথ দখলের উপর একটি তথ্যচিত্র দূরদর্শনে দেখানো হয়। তাতে বুথ দখলকারীদের এক নেতা গর্ব করে বলেছে, ছোটোলোক আর মেয়েছেলে ভোট দেওয়ার কিছু জানে না বলে ওদের ভোট আমরাই দিয়েছি। সেই শক্তিমান হাতিক লোকটার মানসিকতার সঙ্গে রামের মানসিকতার পার্থক্য কতটা?

'কিছু চতুর বিদ্বান যে অধিকাংশ মূর্খ বলবানদের সহায়তা নিয়ে প্রাচীন ভারতের ভয়ঙ্কর দিনগুলো ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারে এরকম আশঙ্কা কি স্বয়ং বিবেকানন্দই প্রকাশ করেননি? তিনি কি লেখেননি, "মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের 'জিহ্বাচ্ছেদ শরীর ভেদাদি' পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে?"

'দু-রকম মানদণ্ড—এবার রামের অশ্বমেধযজ্ঞের কথায় আসা যাক। রাম কেন অশ্বমেধযজ্ঞ করলেন? সার্বভৌম সম্রাট রূপে ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধি লাভের প্রলোভন ছাড়া আর কোন্ প্রণোদনা ছিল অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের পেছনে?

'সীতার প্রতি রামের আচরণ মনুর বিধানই প্রমাণ করে। নারীর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, নারীর একমাত্র কর্তব্য পুরুষের আজ্ঞাপালন ও পরিচর্যা ও স্ত্রী হল পতির একটি সম্পত্তি, স্বামীর মধুর ইচ্ছাতে স্ত্রী গৃহে আশ্রয় পায় আবার স্বামীর মধুর ইচ্ছাতেই স্ত্রী নির্বাসিতা হয়।

'যজ্ঞের ঘোড়া বিভিন্ন রাজ্য পরিক্রমা করত। যে-রাজ্য পরিক্রমা করত সেই রাজ্য যজ্ঞকারী রাজার অধীন হত। কোনো রাজা নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে নিজের রাজ্যে ওই ঘোড়ার প্রবেশে ও পরিক্রমায় বাধা দিত। তখন স্বাধীনতা রক্ষাকামী রাজার সঙ্গে যজ্ঞকারী রাজার যুদ্ধ হত।

সাধারণত নিজের প্রবল শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েই কেউ অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করতেন। সুতরাং যুদ্ধের পরিণামে সাধারণত যুদ্ধকারীর জয় হত। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কালে অশ্বমেধযজ্ঞ ছিল পররাজ্য গ্রাসের শ্রেষ্ঠ উপায়—একটা প্রক্রিয়া পদ্ধতি শাস্ত্র-অনুমোদিত একটা প্রকরণ।

'পররাজ্যগ্রাস যদি মুহিমের বেলায় অন্যায় হয় তাহলে রামের বেলায় ন্যায্য হবে কেন? বিধর্মীদের ক্ষেত্রে যা অধর্ম, হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা ধর্ম হয় কী করে?

ব্যস, আমার ঐ পুস্তিকায় রাম প্রসঙ্গে আর কোনও কথাই নেই। উদ্ধৃতির মধ্যে যুক্তিবাদীর জন্যে সংশয়ের অবকাশ না রেখে কোন্ কথাটা আমি অভ্রান্ত ও স্বতঃসিদ্ধ রূপে উপস্থাপন করে মৌলবাদের পরিপোষণ করেছি? সমীরবাবুর 'অভ্রান্ত', 'স্বতঃসিদ্ধ', 'যুক্তি', 'সংশয়' ইত্যাদি শব্দ-আশ্রিত মৌলবাদের সংজ্ঞার্থ অনুসারে The History cf all hitherto existing society is the history of class struggles ঘোষণা দিয়ে শুরু Manifesto of the Communist Party পুস্তিকাখানির আত্মনির্ণয় কীভাবে করা হবে?

আমার ধারণা, সমীরবাবু 'মৌলবাদ' শব্দটার অর্থ ঠিক ভাবে অনুধাবন করেননি। 'মৌলবাদ একটি অত্যন্ত সাম্প্রতিক শব্দ। যখন ১৯৭২-এ অধুনালুপ্ত 'আলেখ্য' পত্রিকায় 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' গ্রন্থখানি ধারাবাহিক-ভাবে লেখা শুরু করি তখন 'মৌলবাদ' শব্দটি আমি জানতাম না। গ্রন্থটির ১৯৯১-র সংস্করণে শব্দটি প্রসঙ্গত এসেছে, কারণ আমি ঐ শব্দটির অর্থ যেভাবে বুঝেছি তাতে ভারতের মাটিতে মৌলবাদের বীজ উপ্ত হয়েছে স্বাধীনতা লাভের পরে, অথচ 'ভারতবর্ষ ও ইসলামে'র কাহিনী শেষ হয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরে গান্ধীহত্যায়। 'হাওয়া ৪৯' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় আমি মৌলবাদের সংজ্ঞার্থ নিয়ে প্রথম কিস্তিতে ১৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা করছি; এখানে তা আরও সংক্ষিপ্ত করছি: মৌলবাদ অনুসারে (১) সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের একাংশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্যে ধর্মকে খাস হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে; (২) ইতিহাস ও বিজ্ঞানের তথ্য দিয়ে ধর্মীয় বিশ্বাসের তত্ত্বকে বিচার করার চেষ্টাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে; (৩) এখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের তত্ত্ব বলতে সাধারণ ধর্মবোধকে বোঝায় না, বোঝায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-লোভীদের পছন্দমত কতকগুলি বিশেষ তত্ত্বকে—যেমন স্বয়ং সমীরবাবুই

বলেছেন যে খ্রীস্টান মৌলবাদ বলতে বোঝায় প্রোটেস্টান্ট ধর্মচিন্তার এক 'নবতর রূপ'কে এবং আমি বলি, রাজা রূপে রামের তত্ত্বই হল ভারতীয় মৌলবাদের অবলম্বন; এবং (৪) মৌলবাদীরা নিজেদের পছন্দমত ধর্মতত্ত্বকে public religion হিসেবে একটা ভৌগোলিক অভিব্যক্তির মধ্যে জোরজবরদস্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এবং ধর্মতত্ত্বের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ হিসেবে অর্থ বা শ্রম দাবি করে। বলাবাহুল্য এই সংজ্ঞার্থের বহির্ভূত অঞ্চলে এক এক মৌলবাদের এক এক বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ থাকে। এসব নিবিড়, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিশদ বিশ্লেষণের ব্যাপার। 'ভারতবর্ষ ও ইসলামে'র ভূমিকায় এবং 'চতুরঙ্গ', 'হাওয়া ৪৯' প্রভৃতি পত্রিকায় এ-ব্যাপার শুরু করার চেষ্টা করেছি মাত্র। 'পরিচয়' পত্রিকাও এ-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে এগিয়ে এসেছেন দেখে আশান্বিত ও উৎসাহিত হচ্ছি।

কারণ AIDS-এর মত মৌলবাদ একটা public disease; এই ব্যাধির লক্ষণ কী কী, দেশের শরীরে এই ব্যাধির বীজাণু কীভাবে কাজ করে, কখন ও কীভাবে এই ব্যাধি আক্রমণ করে এসব নিয়ে আলোচনা করতে করতে এই ব্যাধির স্বরূপ ক্রমশ বোঝা যাবে। ব্যাধি নির্ণয় না করে কীভাবে তার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব? মনে রাখা ভাল, পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে মৌলবাদের আত্মপ্রকাশ ও ক্রমবিকাশ সাধারণ ভাবে সমগ্র বিশ্বের পক্ষে এবং বিশেষ ভাবে দক্ষিণ এশিয়ার পক্ষে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ এবং এর পরিণাম সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

'হিন্দু রাষ্ট্রবাদীরা কী চান? আবার কি বর্গির হাঙ্গামা শুরু হবে!' থেকে উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত নির্বাচনটি হল ১৯৮৯-র নির্বাচন এবং তথ্যচিত্রটি হল নলিনী সিং-এর নির্মাণ। পুস্তিকার নামকরণের পেছনে একটা প্রসঙ্গ আছে। ১৯৮৫তে বম্বেতে একজন রাজ্যকর্মচারীর সঙ্গে আমার 'টক্কর' লেগেছিল। তিনি বলেছিলেন যে সব 'বেঙ্গলিজ' আসলে বাংলাদেশী এবং তাঁরা ক্ষমতায় এলে রবীন্দ্রনাথকে 'ভাঁড়ে' ফেলে দেবেন আর হিন্দু মহারাষ্ট্রের পয়লা দুশমন হল মুসলমান। তারপর আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও বহু বামপন্থী নেতাকে এবং 'গণশক্তি' ও 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ঐ 'টক্করের বিবরণ দিয়ে ও আমার উদ্বেগ জানিয়ে বহু চিঠি লিখি। শুধু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও মালিনী ভট্টাচার্য চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। 'হিন্দু রাষ্ট্রবাদীরা কী চান?...' পুস্তিকায় ঐ 'টক্করে'র উল্লেখ করতে চাইলে প্রকাশক আপত্তি করেন, কিন্তু

নামকরণে 'বর্গি'র উল্লেখ রাখতে রাজি হন। সেদিনের বর্গির হাঙ্গাম আর শিবসেনার কথা ও কাজ হিসেবে দেখা দিচ্ছে কিনা তা পাঠকপাঠিক বিচার করুন। এসঙ্গে তাঁরা এটাও লক্ষ করুন যে পোস্টারে ক্যালেণ্ডা স্টিকারে দেওয়াল চিত্রে ফুটপাথের মন্দিরে কোন্ রামকে আজকাল বে দেখা যায়—সত্যপালনকারী বনবাসী রামকে না জনতাতোষণকারী রাজবে রামকে। লোয়ার সার্কুলার রোড ও লোয়ার রডন স্ট্রিটের মোড়ে মসজিদে দেওয়ালে কোন্ রামকে দেখা যাচ্ছে?

চিঠি খুব লম্বা হল। 'পরিচয়ে' ছাপবেন কিনা জানিনে। এক মৌলবাদ সম্বন্ধে প্রচুর চিঠি লিখে সাড়া পাইনি। ফলে উপেক্ষা পেতে অভ্য হয়ে গেছি। শুধু 'পরিচয়ে'র প্রতিষ্ঠাতা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটা কথা মনে পড়ে: 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?'

অথ বৃক্ষ কথা

সমীর সেন

গাছের যে প্রাণ আছে, এটা প্রমাণ করার জন্যই যেন গাছটি আচমকা মরে গেল।

অনেকটা 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল—সে মরে নাই'-এর মতোই।

মরে গেলে শায়িত হয়ে থাকাইতো প্রাণীকুলের জাগতিক রীতি। গাছটি নিশ্চিত কাদম্বিনীর মত প্রাণী নয় বটে, কিন্তু তারওতো প্রাণ ছিল। সেই অর্থে যদি প্রাণী বলা যায়, ক্ষতি কি। বিশেষতঃ জীবদ্দশায় যার গায়ে কোপ পড়লে, রক্তেরই মতো না হোক, যৎকিঞ্চিৎ রসক্ষরণতো হোত। নাইবা হল তার রঙ লাল। রঙে কী-ই বা এসে যায়।

না, কোন রসক্ষরণ বা রক্তের মতো কোন ধারা গাছটা থেকে আদৌ গড়ায়নি। অর্থাৎ বিস্ময় হবার মতো গাছের গায়ে অজ্ঞাতকুলশীল কোন নিষ্ঠুর কাঠুরের কোপের পর কোপ পড়েনি। বাহ্যিক এমন কোন অত্যাচারের চিহ্নও গাছের গায়ে ফুটে নেই যে অবলীলায় অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে—এই কারণেই গাছটির মৃত্যু ঘটেছে।

নির্বিঘ্নে শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেওয়ার সাথে সাথে গাছটির অকস্মাৎ এই পরিণতি, সবারই আপশোসের কারণ হয়ে দাঁড়াল। সবাই একবাক্যে বলল—সত্যি গাছটা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে কেমন সুন্দর সুঠাম ভবিষ্যতে কালাতিপাত করছিল, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই কোথা দিয়ে দিয়ে যে কী হয়ে গেল! এর নামই কি তবে বিনা মেঘে বজ্রপাত? নাকি বজ্রাঘাত?

পথচলতি এক উদাসী পথিকও পত্রপুষ্পহীন বিবর্ণ গাছটির দিকে চোখ পড়তেই, আপন মনে মন্তব্য ছুঁড়ে দিল—আহা, লাল-নীল-হলুদ, রঙবেরঙের কত জাতের পাখিই না গাছটায় এসে বসত, শিস দিত, গান গাইত; অদ্ভুত সুরে রামনাম জপ করত। কিন্তু কী আশ্চর্য—এমন সুন্দর 'ছায়াসুনিবিড়' দুর্লভ প্রজাতির গুণবান গাছ, তারও কিনা অকালে ইন্তেকাল হল?

কিন্তু কী কারণে যে এমনটি হল, তা কেউই বুঝতে পারল না। অবশ্য তাই

বলে গবেষণায়ও কেউ কান্ত দিল না। একে একে সবাই বাস্তব দিকটাই খতিয়ে দেখতে মনোনিবেশ করল।

গাছটার চারপাশে একবার পাক খেয়ে একজন বিজ্ঞমনোচিত মন্তব্য করল—যা কাঁকুরে-পাথুরে মাটি, নির্ঘাৎ এর মূল শেকড়ে বড় গোছের কোন পাথরের চাঙ্ লেগে থাকবে। নাহলে এমনটি হবে কেন?

গাছের গোড়াটা ভাল করে পরখ করে আর একজন অভিজ্ঞতার কথা শোনাল—মূলে উঁইপোকা লাগলেও এমনটি হয়। উঁই লেগে কত কত মহীরুহই না উপ্‌ড়ে পড়ে, তুলনায় এ-তো এক পুঁচকে গাছ।

অন্য একজন সংক্ষেপে একেবারেই অন্য অভিজ্ঞতার কথা বলল—আণ্ডার-গ্রাউণ্ড কেবল্ লে-আউটের সময়ে যে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে, তাতেই নির্ঘাৎ লেগেছে। তাই এই দশা।

অপর একজন গাছটার আগাপাস্তালা একবার দেখে নিয়ে মন্তব্য করল—এই এত উঁচু জায়গায় যে বাজ পড়েনি, তারও বা নিশ্চয়তা কি! কিছুদিন ধরেই আকাশে যা মেঘের ঘনঘটা, তাতে বর্ষণের ছিঁটেফোঁটা না হোক, বিদ্যুৎছোবলের কথাতো আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আশপাশের বাড়িঘর ছাপিয়ে গাছটাতো বেশ উঁচুই ছিল।

তুকতাক-ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাসী অন্য একজন একেবারেই অন্য কথা বলল—ঝাপসা বাণ মারেনিতো কেউ? ভুললে তো চলবে না—পুরো এলাকাটা আদিবাসীদের আদিবাসভূমি। উড়ে এসে জুড়ে বসে, অরণ্যের অধিকার ছিনতাইয়ের জ্বালা কি ওরা অত সহজে ভুলে গেছে মনে কর? বদলা নেবার সুযোগ ভূমিপুত্ররা নানাভাবে দখলদারদের বেগ দেওয়ারতো চেষ্টা করতেই পারে। গাছ দিয়েই যার শুরু, শেষ তার ওদের হয়ত ভেদ অভেদের গণ্ডী আঁকা-কুঁইফোঁড় থাম।

সমবেত সবাইকে সাক্ষী মেনে পক্ককেশ এক বৃদ্ধ একেবারেই একটা অভিনব মন্তব্য করে বসল—সত্যজিতের গণশত্রু দেখেছ হে, গণশত্রু? কে জানে গণমিত্রের বাকল পড়ে গাছটি তলে তলে আক্ষরিক অর্থেই গণশত্রুই হয়ে উঠছিল কিনা? তা নাহলে ধর্মের কল বাতাসে এভাবে নড়বে কেন? জোতদার ধর্মব্যবসায়ীর হাত থেকে বাঁচিয়ে সত্যিকারের 'ধর্মসংস্থাপনার্থেই' হয়ত এমনটি হয়েছে।

মৃত গাছটিকে ঘিরে নিকাটিম্মনিসহ এমনিধারা অনেক মন্তব্য, অনেক

জল্পনা কল্পনাই হল। একের মতের সাথে অন্যের মতের অমিল হলেও, একটা বিষয়ে সবাই কিন্তু একমত হল। আর সে মতটা হল—বাড়ির সামনে মরা গাছ রাখতে নেই। ওটা চোখে পড়া খারাপ। ওটা অমঙ্গল।

এটাকেই আর একটু প্রশস্ত করে সবাই একবাক্যে বলল—শুধু বাড়ি নয়, গোটা পাড়ার পক্ষেই এ-এক অশুভ প্রতীক। অতএব যত দ্রুত ওটাকে সরিয়ে ফেলা যায়, ততই পাড়ার পক্ষে এক সামূহিক স্বস্তি। নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবি।

কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে আগাম কথাও বলল—আর ক'দিন পরেইতো পূজো। লোকে কি মরা গাছ ডিঙিয়ে ঠাকুর দেখতে আসবে? পাড়ার লোককে দুষবে না মনে করেছ? যতদিন গাছ ছিল ছিল, এখনতো গাছের কংকাল বৈ আর কিছু নয়।

প্রকাশ্যে আড়ালে আরো অনেক অনেক কথা আওড়াল আরো অনেকেই। কিন্তু মুশকিল হল, প্রচার যা-ই থাক, গাছটি যেমন গঙ্গা-পুত্র ভীষ্মের মত স্বেচ্ছামৃত্যুবরণের কোন কলাকৌশল জানে না, তেমনি জানে না মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় উৎপাটিত হতেও। কাজেই মরাগাছটি জীবদ্দশাতেও যেমন সদর্পে মাথা উঁচু করে ছিল, মৃত্যুর পরও আকাশমুখী শিরদাঁড়া নিয়ে তেমনই ঠিক ঋজু হয়ে রইল। অশালীনভাবে এই মাথা উঁচিয়ে থাকাটাই গোটা পাড়ার শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

তার মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশী চোখ টাটাল জয়ন্তীর।

কারণ মরাগাছটি একেবারে জয়ন্তীর বাড়ির সামনেই। বলতে গেলে ওর নাকের ডগার উপরেই। ঘুম থেকে উঠে বাইরে চোখ ফেললেই প্রথমেই নজর কাড়বে মরা গাছটি। আর অমনি জয়ন্তীর মাথায় চক্কর মারবে সেই কথাগুলি, যে কথাগুলি দিনরাত শুনে শুনে কান ঝালাপালা হচ্ছে—বাড়ির সামনে মরা গাছ রাখতে নেই। দেখতে তো নেই-ই।

অথচ যেটাকে দেখতে নেই, সেটাকেই রোজ রোজ জয়ন্তীকে দেখতে হচ্ছে। তাও রক্ষে যা—ছেলেমেয়ে দুটি কাছে নেই।

এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত জয়ন্তী জানালা খুলে কী সুন্দর সূর্যোদয় দেখতো, আকাশ দেখতো, আকাশে উড়ন্ত পাখীর ঝাঁক দেখত। দেখতো দূর-অদূরের নানা গাছগাছালিও। তারও আগে জয়ন্তীর মন যাকে দেখে চনমনাত—তাহল ঘন সবুজ পাতায় ঢাকা নাগালছোঁয়া এই জীবন্ত গাছ।

অথচ আজ সে গাছ তার সমস্ত ঐশ্বর্য হারিয়ে নিষ্পত্র, পাণ্ডুর। মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ সর্বাঙ্গে ধারণ করেও তবু সে দাঁড়ানো। গাছটি চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে জয়তী ভোরবেলায় উঠে স্বাভাবিকভাবে জানালাটা পর্যন্ত খুলতে পারে না।

অসহ এই অবস্থা চলাকালেই জয়তী একদিন ভোরবেলায় উঠে শংখের উপরেই তিতিবিরক্ত হল, কিগো তোমার চোখে কি কিছুই পড়ে না? নাকি পড়লেও চোখ বুজে থাক?

শংখ ধরমড়িয়ে উঠে, জয়তীর টান টান শরীরে চোখ বুলিয়ে বলল, কেন, তোমাকে আমি সে কথা আগে বলিনি যে ভোরের আলোতেও তোমাকে দারুণ দেখায়।

—যাও, সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না।

—ঠাট্টা! শংখ জয়তীর রক্তাভ ঠোঁট, পুরুষ্টু বুক আর প্লাক করা ভুরুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। জয়তী এবার সরাসরিই গাছটার প্রতি আঙুল তুলে বলল, বলছিলাম—আর কতদিন এই অনাসৃষ্টিটাকে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখবে? কোন অঘটন ঘটার আগে শিগ্‌গীর আপদটাকে বিদেয় কর।

গাছটার প্রতি এক পলক তাকিয়ে শংখ পরম ঔদাসীন্যে হাসল, ও, এই ব্যাপার? আমি আরও ভাবছিলাম কি না কী?

—ও, তাহলে ব্যাপারটা তোমার কাছে কিছুই নয়? জয়তী রুখিয়ে উঠল।

শংখ আত্মসমর্পণ করল, কিন্তু আমাকে কী করতে হবে, সেটা বলবেতো!

—বলতে হবে কেন? নিজে যেন কিছু জানে না।

—জানিতো অনেক কিছুই, কিন্তু কী করব?

—কী করব মানে?

শংখ বলল, তুমি কি ভেবেছ আমি একেবারেই চুপচাপ আছি। নাকি চুপচাপ থাকলেও কেউ আমাকে চুপচাপ থাকতে দিচ্ছে?

—তার মানে আমিই তোমাকে জ্বালাতন করে মারছি এইতো?

—তা কেন, তুমি ছাড়া কি পাড়ায় জ্বালাবার আর কেউ নেই?

—তার মানে?

শংখ এবার হেসে বলল, তুমিতো জান না, এরমধ্যেই পাঁচ নম্বর ব্লকের

ঝাঁঝালো। চার নম্বর ব্লকের মুকুন্দবাবু। তিন নম্বর ব্লকের উত্তরামাসি আর ছ'নম্বর ব্লকের পাঁচুদা পাঁচ পাঁচবার তাগাদা দিয়ে বলেছে—আর কেন? মরা গাছটাকে এবার শিগগির হটাও। এমন কি বুধন মুর্মুটা পর্যন্ত সেদিন গাছটার দিকে লোভী দৃষ্টি মেলে বলে গেল—ইবার গাছটা-অ হটাও-অ বাবু। বলিসত ফুড়ুলের কোপে কোপে মোরাই সাবাড় করে দিয়ে যাই। আলানির যা আকাল বাবু।

জয়তী বলল, এ আর নতুন কথা কি। সে-ই একই কথাতো তোমার আরও তিনচেলা—নখাই, গোলক, ছিদামও বাড়ি বয়ে এসে বলে গিয়েছিল।

—তা অবশ্য বলেছিল।

—কৈ গাছটা হটিয়েছ কি?

—কিন্তু চেষ্টারতো কসুর করিনি।

—তা করনি বটে, কিন্তু গাছটাতো এখনও হটল না।

শংখ এবার হেসে বলল, অর্থেতো এখন আমাকেই কোমরে গামছা বেঁধে কুড়ুল নিয়ে লেগে পড়তে হয়। শংখের কথায় জয়তীও হেসে উঠল। সদা ছিমছাম ফিটফাট ও ধোপদুরস্ত থাকা শংখকে তেমন একটা ভূমিকায় সত্যি সত্যি দেখতে কেমন লাগবে, সেটা কল্পনা করেই জয়তীর মুখে এমন কৌতুকের হাসি। ঐ হাসি নিয়েই জয়তী বলল, খগ্গাটাও সেদিন বলছিল তাই।

শংখ জয়তীর দিকে তাকাল। জয়তী বলল, বলছিল—মরা গাছটাকে উপড়ে ফেলতে, বরটাকেই না হয় লেলিয়ে দে না। সারা জীবনই কি বরকে কাঁচাকার্তিক বানিয়ে আলমারিতেই তুলে রাখবি? রুচিটুচি এক আধবার পাল্টা। দেখবি ভাল লাগবে।

শংখ হেসে বলল, তা, বলেছে যখন সে চেষ্টা করলেই পার।

জয়তী অনুনয় করল, সত্যি বলছি, এবার যাহোক একটা ব্যবস্থা কর। যে-ই আসছে উঠতে বসতে সে-ই একই কথা বলছে—নাকের উপর নড়্ নড়্। আর কতদিন ঝুলিয়ে রাখবি? যেন রেখে দেবার মালিক আমরাই।

শংখ জয়তীকে বোঝাবার চেষ্টা করল, কোম্পানীর এক্তিয়ারে কোম্পানীর লাগানো গাছ। গাছের ভালমন্দ দেখভাল করার দায়িত্বও যেমন ওদের, তেমনি আবার গাছগুলির কাটাকুটির ব্যাপারটাও ওরা আইনমোতাবেক করে। কাজেই হটাও বা কাট বলেইতো আর তক্ষুনি হটানো বা কাটানো যায় না।

জয়ন্তী তবু চাপাচাপি করল, আরও একবার চেষ্টা করে দেখো না। তেমন করে বললে কি আর ওরা একটা ব্যবস্থা করবে না?

—বলিনি কি? শংখ বলল, কিন্তু ওদের সমস্যাতো ওখানে নয়। ওরা বলে কি জান?

জয়ন্তী শংখের চোখে চোখ রাখল।

শংখ বলল, বলে—মশায় একটি গাছ একটি প্রাণ, প্রাণ দিয়ে সে গাছ বাঁচান।

জয়ন্তী তর্ক জুড়ল, সেতো জীবন্ত গাছের বেলায়, আর এ-তো মরা গাছ। এখানে বাধাটা কোথায়?

—বলেছিতো—বাধা অন্যত্র, শংখ বলল, ওদের কথা শুনলে তুমিতো একেবারে ভিরমি খাবে।

কিছু না বুঝে শংখের দিকে তাকিয়েই রইল। শংখ বলল, ওরা বলে—গাছ আমরা লাগাতে পারি, গোড়ায় জল ঢেলে ঢেলে বড়ও করতে পারি, উপযুক্ত পরিচর্যা-পর্যবেক্ষনে ওর শ্রীবৃদ্ধিও ঘটাতে পারি; কিন্তু পারি না এক কথায় একেবারে কেটে উড়িয়ে দিতে। কাটাকুটির ব্যাপারে প্রশাসনিক অনেক ক্যাচাং মশায়। ওখানে আমাদের হাতপা বাঁধা।

জয়ন্তী টিপ্পনী কাটল, ব্যস্, তাতেই তুমি অমনি দমে গেলে?

—দমিনিতো। কালওতো গেছি ওদের দপ্তরে। চেষ্টাতো চালিয়েই যাচ্ছি।

—চেষ্টা চালাচ্ছ না আরও কিছু। আসলে ওদের তুমুং তাম্বুং-এ তুমিও গলে গেছ।

শংখকে নিশ্চুপ দেখে হতাশ জয়ন্তী আরও বিরক্ত হল, এতদিন হয়ে গেল, তবু এখনও কোন ব্যবস্থা নেই। সত্যি, তোমার এলেম দেখে আমি অবাক মানছি।

—আরও অবাক মানবে যখন আসল ও অবিশ্বাস্য কথাটা শুনবে।

জয়ন্তী শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল।

জয়ন্তীর চোখে চোখ রেখে শংখ আস্তে আস্তে বলল, বুঝলে জয়ন্তী, আগা নয় এবার ওরা একেবারে গাছের গোড়া ধরেই টান দিয়েছে।

জয়ন্তী বলল, বুঝলাম না।

শংখ বলল, গাছটা যে মরেছে, এই আসল কথাটিই যে ওরা মানতে চাইছে না।

শংখের কথায় জয়তী ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, মানতে চাইবে যদি মরা গাছটার ছালচামড়া ডালপালাশুদ্ধ এক গুচ্ছ ওদের ঝকঝকে টেবিলের উপর স্তূপাকার করে রেখে আসতে পার।

শংখ বলল, এটাতো তোমার রাগের কথা হল। আসল কথাতো তা নয়।

—আসল কথাটা তবে কী?

শংখ বলল, ওরা বলছে—সাদা চোখে বা ক্লিনিকাল আই-এ যেটাকে ডেথ্ মনে করছেন, আদতে তা ডেথ্ই নয়।

—ডেথ্ নয়তো কী? জয়তী জানতে চাইল।

শংখ বলল, বুঝলে জয়তী, সব বেঁচে থাকাই যেমন বেঁচে থাকা নয়, তেমনি সব মৃত্যুই মৃত্যু নয়। আর ওটা বুঝতে হলে চাই একটা তৃতীয় নয়ন। সে নয়ন আমাদের নেই ওদের আছে। ঐ নয়নগুণেই ওরা বুঝে ফেলেছে—গাছটা আদৌ মরেইনি।

—মরেনিতো কি? জয়তী বিরক্ত, দিনরাত চোখের সামনেই দেখছি—একে একে সব অঙ্গ খসে পড়ছে—

—পড়বেইতো, শংখ বলল, অঙ্গ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে সাথে দৃশ্যমান পুরুষাঙ্গটি খসে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শংখের কথায় জয়তী একটা উচ্চকিত হাসি হেসে মুখ লুকোবার চেষ্টা করল। কিন্তু শংখ একটুও না হেসে বলল, হাসি নয়। নির্বিকল্পে থাকলে খ্যাতঅখ্যাত সব গাছের ক্ষেত্রেই এরকমটি হয়।

—নির্বিকল্প? সেটা আবার কী? ওটা কি ছুয়াচোরা কোন ব্যাধি?

ব্যাধি হতে যাবে কোন্ দুঃখে? ওটা হল—সর্বরোগহর লেটেষ্ট এক পেটেন্ট। এই দুর্লভ পেটেন্ট-এর গুণে বিচলিত হবার মত সমস্ত ঘটনার পরও অবলীলায় নির্বিকার, নিরুদ্বেগ ও স্পন্দনহীন হয়ে থাকতে পারা যায়। যেমন থাকতে পারছেন 'সীতামাঈ-রিকা মাফিক' অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণকামী অধুনা ভারতবর্ষবাসী দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। এমন কি সেকুলারিজম-এর আত্মশ্রাদ্ধকারী—অযোধ্যা ম্যাসাকার ও হর্ষদ-ভোপ বিস্ফোরিত হওয়া সত্বেও। বুঝলে জয়তী—এই না হলে কি আর নৃ-সিংহ? না-ইবা রইল তার সিংহের কেশর।

জয়তী হা করে সব শুনলো। শংখের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়েও রইল

কিছুক্ষণ। তারপর বলল, দফায় দফায় বনদপ্তরে চুঁ-মেরে আসা সত্ত্বেও মরা গাছটা এক ইঞ্চি হটুক বা না হটুক, অন্ততঃ তোমার মগজটা যে ওখান থেকে ধোলাই হয়ে এসেছে, এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত। নাহলে এমন আগড়ুম বাগড়ুম একনাগাড়ে বকে যাচ্ছটা কী করে?

জয়তীর কথায় শংখ হো হো করে হেসে উঠল।

জয়তী ঐ হাসিতে যোগ না দিয়ে বলল, হাসি নয় আজে। আসলে সবটাই যে ওদের চালাকী আর ধড়িবাজী এটা বুঝেছ তো?

—ধড়িবাজী করে ওদের লাভ?

—নিশ্চয় কোন বদমতলব আছে। দেখ গিয়ে তলে তলে খদ্দের খুঁজছে —ভাল দাও মেরে রাতবিরাতে পাচার করে ঘরে নোট তুলবে বলে। কাঠের যা দাম।

শংখ বলল, এটা কিন্তু তোমার ভুল ধারণা। ওরা তেমন চরিত্রের লোকই নয়। আসলে একটা অবয়রক্ত বিশ্বাসের দরুণই ওদের এই বিলম্ব।

—তবে ওরা ওদের বিশ্বাস নিয়েই হাত-পা গুটিয়ে থাকুক। চাওতো সে দলে তুমিও যোগ দিতে পার। যোগ অবশ্য তুমি-এর মধ্যে দিয়েও দিয়েছ।

শংখ হেসে বলল, ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে। দেখছি—কী করা যায়।

—তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, যা করার আমি একাই করব। আজই আমি ছিদাম লখাইদের খবর দিচ্ছি। ওরা হাসতে হাসতে এসে গোড়াশুদ্ধ কেটে নিয়ে যাবে। তা না হলে শ্মশানঘাটের কাঠগোলাদের মালিকতো মুখিয়েই আছে। খবরটা একবার কানে পৌছে দিতে পারলেই হয়।

শংখ মুখচেপা হাসি নিয়ে বলল, এই চান্সটা অন্ততঃ আমার উপর দিয়ে তুমি ভরসা করতে পার। দেখবে একেবারে তুড়ন্ত এ্যাকসান। তেরাত্র পেরোতে না পেরোতেই দেখবে—এই গাছ-চেরা কাঠেই অজয়ঘাটের চিতা জ্বলছে। তির্যকটা বুঝে জয়তী সবেগে সরে যাবার চেষ্টা করতেই শংখ ওর হাতটা ধরে ফেলল। তারপর কাছে টেনে গাঢ়স্বরে বললও, আর অন্ততঃ একটিবার আমাকে চেষ্টা করতে দাও লক্ষীটি। তার আগে অহেতুক জল ঘোলা করতে যেও না।

কী বুঝে জয়তী শংখের কথা শুনে শংখেরই পাশে চুপ করে বসল।

শংখ হাত বাড়িয়ে ফোনের ডায়াল ঘোরাল। যাকে খুঁজল ফোনে

তাকে পেয়েও গেল। নরমে-গরমে এপক্ষ ওপক্ষ কথাও হল বিস্তর। তার মধ্যে জয়তী বুঝল—কথা কাটাকাটিও হল ঢের। তবু জয়তীর কাছে গোটা ব্যাপারটাই অস্পষ্ট রইল। শংখ অনেকটা রাগতভাবেই ফোনটা রেখে দিতেই জয়তী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শংখের দিকে তাকাল।

শংখ বলল, ওরা ওদের ঐ বিশ্বাসে এখনও অটল।

—অর্থাৎ সে-ই নির্বিকল্প ?

—নয়তো কি ? তা নাহলে কখনও বলে—দেড়মাসটাক আগে ওরা এই নিয়ে কোন ভাবনাচিন্তাই করতে পারছে না।

—তাহলে আবার কি ? তবে মরা আসলে থাক ঐ দেড়টি মাস। আর লোকে ছিঃছিককার করতেই থাকুক, শংখ জয়তীকে আশ্বস্ত করল, ওরা অবশ্য বলেছে, তার আগেই জন্ম-মৃত্যুরহস্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ সমস্ত বিশারদদের নিয়ে একটা বড়ো ডিসকাসসান সেরে নেবে। তারপর ডিসিসান ও প্রয়োজনবোধে অপারেশান, আসলে ওরা ব্রেন বাই ব্রেন নেটওয়ার্কটা আগে সেরে নিতে চায়।

জয়তী বলল, ততদিনে গাছটা বহাল তবিয়তে থাকলে হয়। এর মধ্যেই তো কাঠকুড়োনীর দল ডালপালা মুড়িয়ে নেড়ামুণ্ডী করে রেখে গেছে। তার উপর রও টঙ্ ধুইয়ে যা কেলেভূত হয়ে আছে।

—তা থাকুক, কিন্তু জিভজ হয়ে গোড়াটাতো এখনও আছে। ওটাতো আর সচল কোন প্রাণী নয় যে কোত্তে দেয়ার হাটি হাটি পা পা করে অজয়-ঘাটের দিকে পাড়ি দেবে ? কিংবা স্বয়ং যমরাজ কোমরে দড়ি বেঁধে গোড়াটাকে উপরের দিকে টেনে তুলবে ?

জয়তী বলল, তেমন একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটে গেলে কিন্তু মন্দ হতো না।

—সেই অলৌকিক বিশ্বাসের কথাতো ওরাও বলছে। ওরা বলছে—গাছের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাকে তো আর নস্যাৎ করে দিতে পারি না। বিশেষতঃ এই কলিকালেও ভেল্কী দেখাবার ক্ষমতা যার এখনও বর্তমান। সোজা কথা মশায়—ধর্মে-কর্মে মতিশীল ছা-পোষা মানুষ আমরা। আমাদের সর্বক্ষণের ভয়, তড়িঘড়ি করতে গিয়ে না আবার কোন বড় রকমের ভুল করে বসি এবং তাই গাছটার অন্তিমকৃত্যে যাওয়ার আগে আমাদের এত কিছু ভাবতে হচ্ছে।

—ঠিক আছে, ওরা যত পারে ভাবুক, তার সাথে তুমিও ভিড়ে যাও। দেখা যাক ভাবনার শেষ কোথায় হয়।

জয়ন্তী শংখের পাশ থেকে উঠে গিয়ে ধরাম করে জানালাটা বন্ধ করে দিলো।

শংখ বলল, কী হল, জানালা বন্ধ করে দিলে যে? কী সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া খাচ্ছিলাম।

জয়ন্তী বলল, বেশী হাওয়া খেয়ে আর কাজ নেই। আপাততঃ এই ব্যবস্থাই চলুক।

—তা চলুক, কিন্তু এতে যে দম আটকে মারা পড়ব।

—না, মারা পড়বে না। যাদের তাপ-উত্তাপবোধ আছে, বোধ আছে তাদেরই খালি দম আটকায়।

—তার মানে আমি একটা জড়পদার্থ জীব—এইতো?

—তুমি যে কী, সেটা তুমি নিজেই বুঝে নাও।

শেষ তোপ দেগে জয়ন্তী সবেগে ঘরের বাইরে পা রাখতে গিয়েও, শংখের ছুঁড়ে দেওয়া একটি কথায় হঠাতই ঘুরে দাঁড়াল। যে কথা শংখ আদৌ বলতেই চায়নি, সে কথাই ওর মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল, নাঃ, তোমার মাথায় দেখছি গেছোভূত চেপে আছে। তা না হলে সর্বক্ষণ গাছ গাছ করবে কেন?

—গেছোভূত! জয়ন্তী একেবারে খলখলিয়ে উঠল, ঠিক আছে সেই গেছোভূতই হব। কালকের মধ্যেই দেখবে—ঐ গাছের মগডালে ঝুলে গেছোভূত হয়ে জানালা গলে তোমার ঘাড় মটকাতে আসব। তাতে যদি তোমার শান্তি হয়।

শংখ ছটফট করে বলল, এই জয়ন্তী—শোন শোন।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? শংখের গাঢ় এই আহবানও মাঠে মারা গেল। জয়ন্তী দপদপিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল।

জয়ন্তীর নির্গমন পথের দিকে তাকিয়ে, ঠোটের কোণে এক চিলতে হাসি টেনে শংখ ভাবতে বসল—অতঃপর কিম্ অধুনা বিধেয়ম? মানভঞ্জনের ওষুধী হিসেবেও যে অনতিবিলম্বে গাছটা হটানো দরকার এবং তা নাহলে যে নিজের মানই আর থাকে না, এ বিষয়ে শংখ নিশ্চিত হল। সমস্ত সম্ভাব্য উপায় নিয়েই শংখ অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর হঠাতই গাঝাড়া দিয়ে উঠে, দ্রুত

বেশবাস বদলে, জয়তীকে একটিও কথা না বলে; প্রায় নিঃশব্দেই বাড়ির বাইরে চলে গেল।

শংখের প্রায় পিছু পিছু, টি, ভি সিরিয়ালের পর্দায় অভিনীত-পার্শ্বচরিত্রাভিনেত্রীর মতো, সেই সাতসকালেই ছেলেকোলে স্বপ্না এলো ঘরে। ঢুকতে না ঢুকতেই অনুযোগ—কীরে, গাছের গোড়ায় কর্তাগিন্নী এখনও খুনখুনো দিয়ে চলেছিস? এত সোরগোলেও একটুও হেলবি না? আশ্চর্য বটে তোদের এই শবসাধনা।

জয়তীর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে স্বপ্না মুহূর্তখানেক থামল, তারপর আবার নিজেই বলে গেল, ঠিক আছে বাবা তোমরা দুজনে মিলে মস্তা আঙ্গনে যতদিন পার নাচ-কোঁদ-গাও, চাওতো মস্তা ডালে দোলনা ঝুলিয়ে রাধা-কেষ্টর মত 'দোলে মে দোল' খাও আর ঝুলনযাত্রা কর, এই আমি চল্লাম বাপু। ভুলেও আর এ-মুখোটি হচ্ছি না।

জয়তী পথ আগলাতেই, স্বপ্না হেঁয়ালি ছেড়ে, উৎসাহিত হয়ে কৃত্রিমকোপ প্রকাশ করল, বলিহারী বটে তোর বোধবুদ্ধি। কোন কিছুতেই কোন শোধবোধ নেই।

জয়তী আর চুপ থাকতে না পেরে বলল, কিন্তু করবটা কী?

—কর্তাকে তাতা, তাড়া লাগা।

—লাগাচ্ছি না কি? কিন্তু তাতেও কাজ হচ্ছে কৈ?

—কাজ হবে না মানে? স্বপ্না বিচিত্র হাসি হেসে বলল, যাদের শরের ঘায়ে অহরহঃ মুনিঋষি পর্যন্ত কাত, তাদের মুখে একথা মানায় নারে জয়তী। আসলে তুই নিজেই দিনকে দিন কেমন ম্যাদা মেরে যাচ্ছিস। জয়তী হেসে স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে রইল। একটু দম নিয়ে স্বপ্না আরও উচ্চকিত হল, তোর কর্তার জায়গায় হোত যদি তোর নানভুদা তাহলে দেখতিস মস্তা ক্-খ-ন ভাগাড়ে পৌঁছে গেছে। নাহলে কি ওর রক্ষে ছিল? নাকি ওকে টিকতে দিতাম।

জয়তীর প্রতিক্রিয়া পড়ার জন্য স্বপ্না একটু থামল। তারপর গর্বিণী হাসি হেসে বলল, বুঝলি জয়তী তেজী পুরুষের রকমসকমই আলাদা যে। ওদের নিয়ে ঘর করায় কী যে সুখ—

আধবোজা চোখে কথা অসম্পূর্ণ রেখে, মুখে সেই বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে, স্বপ্না যেমন হনহনিয়ে এসেছিল, তেমনি আবার হুটোপুটি করে চলেও গেল। কিন্তু

মাঝখানে জয়ন্তীর উত্তপ্ত মাথাটাকে আরও উত্তপ্ত করে দিয়ে গেল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে সে উত্তাপ আরও মাত্রা ছাড়াল।

চড়া রোদ্দুরে ঘুরে, এ দোর-সে দোর করে, ঘামজবজবে শরীরে শংখ যখন ঘরে ফিরে এলো, তখন বেলা প্রায় দু'প্রহর, অপেক্ষা করে করে জয়ন্তীর ধৈর্যের বাঁধ তখন একেবারে ভেঙে পড়ার উপক্রম। শংখ এত বেলা অবধি কোথায় ছিল, কী ব্যাপার, কেনই বা এত দেরী, তার কোনটাই জানতে চাইল না জয়ন্তী। শংখও উপযাজক হয়ে একটি কথাও বলল না। স্নানখাওয়া সেরে রুটিনমাফিক পাশাপাশি দুটি খাটে গা এলিয়ে দিয়েও কেউ কারো সাথে কথাতো বলোই না, বরং চোখে ঘুম না নামা পর্যন্ত একে অন্যের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

ঘুম তাড়ানশর জয়ন্তী, উল্টোমুখ করে শোয়া শংখকে দেখে বোঝার চেষ্টা করল—সত্যিসত্যিই নিদ্রা, না কপটনিদ্রা? অনাবশ্যকভাবেই জয়ন্তী হাতের গোছা চুড়ি নাড়ল কয়েকবার। রিঙ্‌টিঙ্‌ শব্দও হল বেশ। কিন্তু তাতেও শংখের না আছে কোন সাড়াশব্দ, না আছে কোন নড়নচড়ন। বরং বলা চলে—মরা গাছটিরই মতো একেবারে নির্বিকল্প সমাধিদশা।

প্রতিপক্ষের মর্মান্তিক এই ঔদাসিন্যে জয়ন্তীর ভারী বুক আরও ভারী হয়। ঠোঁট কামড়ে জয়ন্তী এক ঝটকায় বন্ধ জানালাটি খুলে দেয়। তাতেও শংখের কোন প্রতিক্রিয়া পড়তে পাওয়া যায় না। শংখের আপাদমস্তকে আর একবার চোখ বুলিয়ে, জয়ন্তী ওর জ্বালাধরা দৃষ্টিটাকে বাইরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। বাইরের আলোছায়ায়, ছালচামড়াখসা গাছটির প্রেতকরোটি দেখে জয়ন্তী চমকে ওঠে। কিন্তু তবু নির্ভর আশ্রয়ের খোঁজে শংখের কাছে ছুটে না গিয়ে, সশব্দে আবার জানালাটিই বন্ধ করে দেয়।

সূর্যের তাপে তাপে যে পৃথিবী দিনে ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, রাত নামার সাথে সাথে সে পৃথিবীই ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। শাশ্বত পৃথিবীর এইতো এক চিরন্তন রীতি। কিন্তু শংখ ও জয়ন্তীর বেলায় হল তার অন্যথা। দিনের বেলায় গাছটিকে ঘিরে উভয়ের মধ্যে যে বচসা, বচসা থেকে মতান্তর মনান্তর ও উত্তাপ সন্ধ্যায় মায়কতামর রাত্রির স্বকীয় সম্মোহনী শক্তির প্রভাবেও তার কোন উপশম হল না। তার জন্য অবশ্যই দায়ী জয়ন্তীর একতরফা এক ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা। রাতে অভিন্ন ঘর অভিন্ন শয্যার পরিবর্তে, নির্দিষ্ট কথা

হল পৃথক ঘর পৃথক বিছানা। বলা যায়—আপোসহীন জয়তীর একেবারে সরাসরি রণে আহ্বান।

সাজা পাওয়া আসামীর মত, জয়তীর এই চরম ব্যবস্থাকে চুপচাপ মেনে নিয়ে শংখ নির্দিষ্ট বিছানায় গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল। শুতে না শুতেই নেমে এলো ঘুম। পাশের ঘর থেকে জয়তী নাক ডাকার শব্দ শুনতে পায়। এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে জয়তী উৎকট সে শব্দ শোনে আর মনে মনে রাগে ফোঁসে এবং ফুঁসতে ফুঁসতেই ভাবে—নির্বিকল্প সমাধিতে থাকার কৌশলটাতো লোকটাও বেশ ভালোই রপ্ত করে ফেলেছে। নাহলে রাতারাতি এমন ব্রহ্মচারী বনে গেল কী করে? নাকি পরাক্রমশালী ঐ পেটেন্টেরই প্রভাব এটা।

ঘুমের পরিবর্তে, শংখের চিন্তাতেই জয়তীর বিনিদ্র রাত্রির অনেকটাই কেটে যায়। দেয়াল ঘড়ি ঢং ঢং করে রাত তিনটের ঘোষণা করে চুপ মেরে যায়। মানভঞ্জন হেতু অগত্যা 'পর্বতই মহম্মদের কাছে' যে আসতে বাধ্য হবে—এমন একটি ক্ষীণতম আশা, একেবারে লোপ পেয়ে যেতেই জয়তী নিস্তেজ হয়ে হয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম চোখে জয়তী স্বপ্ন দেখে—সে এক আশ্চর্য স্বপ্ন ··

দেখে—কোন্ এক ছুঁ মন্তরে নির্বিকল্প বৃক্ষটির ত্রিভঙ্গ তিনশাখা রূপান্তরিত হয়ে হয়ে ত্রিমুখী এক ধাতব কলায় পরিণত হয়ে গেল। ত্রিফলাযশুত ঐ চকচকে হাতিয়ার নিয়ে, সরাসরি জয়তীর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল—জটাশ্মশ্রু-ধারী এক কিম্ভূত পুরুষ। ওর চোখে কামাগ্নি, মুখে পাশব হাসি। ওর লোমশ এক হাত একেবারে জয়তীর বুক পর্যন্ত প্রসারিত। ভয়ে-ত্রাসে মূর্ছা যাবার আগে জয়তী জোরে চীৎকার করে ওঠে···

জয়তীর ঘুম ভেঙে যায়। ঘেমে নেয়ে একশা হয়ে বিছানায় উঠে বসে জয়তী। স্বপ্নটা যে স্বপ্নই—এটা বুঝে ধাতস্থ হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় নেয় ও। স্বপ্নে হলেও, বিপদমুক্তির একটা আনন্দ, ওর মনের ভার অনেকখানি লাঘব করে দিয়ে যায়। ব্যগ্র চোখে জয়তী এদিকওদিক তাকায়। আশ্চর্য হয়ে দেখে—এই সাতসকালেই দরজা-জানালা সব হাট করে খোলা। আলোয় আলোয় ভরে গেছে সমস্ত ঘরদুয়ার বিছানা।

খাট থেকে নেমে জয়তী ত্রস্ত পায়ে, এঘর ওঘর বারান্দা ব্যালকনি সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খোঁজে। কিন্তু কোথাও শংখকে দেখতে পায় না। এবার

জয়ন্তী ত্বরিৎপদে খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বহুদিন পর চমৎকৃত হয়ে উদার উন্মুক্ত আকাশ দেখে, সূর্যোদয় দেখে। আর তার সাথে দেখে—যাকে ঘিরে পাড়াময় এত গোলমাল, এত শংকা আর উৎকণ্ঠা, রাগবিরাগ ও উত্তাপ সঞ্চার। সেই অনুক্ষণে গাছটির মরণোত্তর কংকাল মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে আছে মাটিতে। আর তার গায়ে পা দিয়ে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আছে—গোলক, বুধন, নধাই, ছিদাম ও শংখ। ওদের প্রত্যেকের হাতে হাতে তখনও ধরা আছে শক্তপাতে সক্ষম এক একটি কুঠার। এমন কি শংখেরও।

শংখের সর্বশেষ এই ব্যতিক্রমী ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে জয়ন্তী শংখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এবং ঠোটের কোণে সরস হাসি টেনে ভাবল—পাটভাঙা ধুতিপাঞ্জাবী পরা কাঁচা কার্তিকের চেয়ে কিংবা স্যুটবুট-টাইয়ে কিটকাট ফুলটুস বাবুর চেয়েও, কোমরে গামছা-জড়ানো কুঠারধারী শংখকে, অন্ত তাগ্‌ড়া মানুষগুলোর মাঝেতো একটুও বেমানান মনে হচ্ছে না।

অনেকদিন পর জয়ন্তী, একটা ফুরফুরে মন নিয়ে, খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে অধীর আগ্রহে শংখের জন্ত অপেক্ষা করতেই থাকে।

জহুর বখ্‌স

ভীষ্ম সাহনী

[ভীষ্ম সাহনীর জন্ম পাঞ্জাবে—১৯১৫ সালে। জীবনের প্রথম থেকেই বামপন্থী সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় তাঁর সৃষ্টিতে জনজীবনের অব্যক্ত কথা এক গভীর মমতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। ১৯৭৫-এ সাহিত্য একাডেমি তাঁর 'তমস' উপন্যাসের জন্যে তাঁকে একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত করে।

এই গল্পটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এ গল্প সত্য। এই গল্প আমি শ্রীমতী সুভদ্রা যোশীর কাছে শুনেছি।'

দাঙ্গা নিয়ে তিনি যতো গল্প লিখেছেন, এ-গল্পটি তার মধ্যে সাম্প্রতিক। সাম্প্রতিক দাঙ্গাই এই সত্য কাহিনীর জীবন্ত পটভূমি।]

হয়তো তুমি জহুর বখ্‌শের নাম শুনে থাকবে। অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে, কোন্ জহুর বখ্‌শ? এই নামে তো হাজার হাজার মানুষ আছে। না, আমি সেই জহুর বখ্‌শের কথা বলছি না, যাকে নিজের নাম থেকে চেনা যায়। বলছি সেই জহুর বখ্‌শের কথা, যার ওপর দিয়ে কি কি না ঘটে গিয়েছে। তুমি যদি জানো তার ওপর দিয়ে কি ঘটে গিয়েছে, তবে তুমি তাকে ভুলতে পারবে না। সে তোমার বুকের গভীরে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, তুমি যেদিকেই তাকাবে, দেখবে মাঝবয়সী একমুখ ভর্তি দাড়ি একজন মানুষ —জহুর বখ্‌শকে। আর আমার মতো তোমার হৃদয়ও কান্নায় ভরে উঠবে।

এক অদ্ভুত গল্প। যখন জহুর বখ্‌শকে দেখি, তখন আমার মধ্যে সে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তখন তাকে মাঝবয়সী একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। তার গায়ে ছিল কাঁধ-কাটা ময়লা একটা জামা, আর পরণে একটা লুঙ্গি। খালি পা। এলোমেলো চুল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন তাকে হাজার হাজার সাধারণ একজন মানুষের মতোই মনে হয়েছিল। কোনো কথাই তার কানে ঢুকছিল না, কোনো কথাও সে বলছিল না। শুধু ঠায় দাঁড়িয়েছিল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে একটা জড় পদার্থ হয়ে গিয়েছিল।

তার বাড়ির সামনে ছিল একটা মাঠ। সেই সময় সেই মাঠ পুরুষ মহিলা শিশু—নানা বয়সের মানুষের ভিড়ে জমাট হয়ে উঠেছিল। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল, সারা মাঠের এখানে ওখানে যেন ছেঁড়া-ফাঁটা নেকড়া স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। ঘরহারা মানুষকে নেকড়ার চেয় বলে মনে হচ্ছিল। আধপোড়া খাটিয়া টিন ক্যানেস্তারা ছেঁড়া কাপড়—যা তারা পেয়েছে, নিজেদের জলন্ত ঘর থেকে টেনে টেনে বের করে এনেছে। সে-সব জিনিসই এখন খোলা মাঠে পড়ে রয়েছে।

অজয় বখ্‌শ দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কে জানে, সে এ সব দেখছিল, না, দেখছিল না! পাথরের মতো যার চোখ নিথর হয়ে গিয়েছে, সে-চোখ দিয়ে কি কেউ দেখতে পায়। যে-দেয়ালে সে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে দেয়ালও আগুনে ঝলসে-যাওয়া তার ঘরের দেয়াল। তার ঘরের আসবাব-পত্র সামনের মাঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল। আধ-পোড়া কাগজ এখনও হাওয়ায় উড়ছে। এই আধ-পোড়া কাগজগুলি তার পাণ্ডুলিপি। এর থেকে কোনো একটা আধ-পোড়া কাগজ তুলে যদি দেখ, তাহলে অজয় বখ্‌শের হাতের লেখা চিনতে কোনো অসুবিধা হবে না। ঝকঝকে তার লেখা। যেন মুক্তোর মালা। বুকের রক্ত দিয়েই পাণ্ডুলিপি লেখা হয়। এক একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে জীবনের অনেকগুলো বছর চলে গিয়েছে। আধ-পোড়া বইগুলোও এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। শহরে দাঙ্গা হয়েছে। দাঙ্গাতে যা হয় তা-ই হয়েছে—বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, সম্পত্তি লুট করা হয়েছে, মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এ-সব বলায় কি কোনো দরকার আছে? আধ-পোড়া বাড়িঘর আর মাঠের মধ্যে আধ-পোড়া খাটিয়া টিন ক্যানেস্তারা নানা টুকিটাকি জিনিসের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ সবাই বিহ্বল চোখ নিয়ে বসেছিল—আর জ্বলছিল। ওরা জানে দাঙ্গা কাকে বলে।

আগুন লাগানোর আগে ওরা প্রথমে তার ঘরে ঢোকে। অজয় বখ্‌শের ঘরে যা কিছু ছিল সব ওরা লুটপাট করে। ওর বইপত্রে কেউ হাত দেয় না। পরে ওরা সেগুলোতে আগুন লাগায়। অজয় বখ্‌শের ঘরে সে বাক্স-প্যাটরা বাসন-কোসন এবং যে জামা-কাপড় ছিল, তা এমন নয় যে, মন ভরবে। কিন্তু তারই চোখের সামনে, তার সমস্ত জিনিস ওরা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু একটা বইয়েও কেউ হাত দিল না। ঘরে যখন আগুন লাগিয়ে দেয়া

হল, তখন অহর বখ্‌শ নিজেই বই আর পাণ্ডুলিপিগুলোকে উঠিয়ে উঠিয়ে বাইরে নিয়ে আসছিল। যেন জীবন্ত মানুষকে সে বাঁচাচ্ছিল। বেশী বই আর পাণ্ডুলিপিকে সে বাঁচাতে পারেনি। সে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, এমন হাঁফাচ্ছিল যেন এখনই সে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবে। তবু সে আরও আরও বই বাইরে টেনে নিয়ে এল। যারা ঘর থেকে ছুটে পালাচ্ছিল, তাদের ছুটন্ত এলোমেলো পা বইয়ের ওপর পড়ছিল। পায়ের ঠোক্কর খেয়ে কালিদাসের 'শকুন্তলম্' কোথা থেকে কোথায় ছিটকে চলে গেল। প্রেমচন্দর 'গোদান' ছিটকে ধুলোয় পড়ল। পাণ্ডুলিপিগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। অহর বখ্‌শ দেয়ালে ঠেস দিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে,—বড় বড় অশ্রু-সজল চোখে দেখতে লাগল। যেন নিজের মৃত্যু সে নিজের চোখে দেখছিল। প্রলয়ের সময় নরপিশাচের তাণ্ডব বোধ হয় এমনই হয়। সমস্ত কিছু শেষ হয়ে গেল। তিরিশ বছরের সাধনা মাঠের মধ্যে আধ-পোড়া হয়ে হাওয়ায় উড়ছিল। এই বই এই কাগজপত্র এতোদিন ধরে সে তার বুক দিয়ে আগলে রেখেছিল। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পড়ত। কারণ এ-গ্রন্থগুলো তো কোনো না কোনো একজন মানুষেরই সাধনার দান।

চারদিকে যখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল—দরজা ভেঙে দাঙ্গাবাজরা যখন ঘরের মধ্যে ঢুকল, তখন অহর বখ্‌শের নিজের মধ্যে কোনো চেতনা—কোনো হুঁশ ছিল না। একসঙ্গে এতো মানুষ,—লাঠি বর্শা হাতে। আর তার সঙ্গে সমানে চলছিল চিৎকার—লুটতরাজ। ওর স্ত্রী চিৎকার করছিল। 'আমরা কার কি ক্ষতি করেছি! আপনারা কেন এখানে এসেছেন? কি চাইছেন?'

যারা ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল, তাদের মনে হল সে খুব চিৎকার করে কি যেন বলছে। দড়ি জ্বলে গেল, কিন্তু দড়ির যে বাঁকানো ভাব তা তেমনি রয়ে গেল।

তারপর কখন তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর—চিৎকার স্তব্ধ হয়ে গেল, তা সে জানে না। কখন তার মেয়ের কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে গেল, তাও সে জানে না। এই তাণ্ডবের মধ্যে সে কিছুই ভাবতে পারল না। সে তার চোখ কোনো দিকে ঘোরাতে পারছিল না, বুঝতে পারছিল না কি ঘটে চলেছে। তার সামনে যারা দাঁড়িয়েছিল, সে তাদের কাকুতি-মিনতি করে বলছিল, 'ভাই, সবকিছু নিয়ে যাও। আমার যা কিছু আছে, সব নিয়ে যাও। শুধু এই কাগজ এই বই-

গুলো রেখে যাও। এগুলো আমার সারা জীবনের সঞ্চয়। খোদার ওয়াস্তে এ-সব নিও না। আমি তোমাদের পায়ে পড়ছি···'

কিন্তু ওরা ওকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিল। তারপর লুটপাট—হৈ-হল্লোড় শুরু হল। লুটপাটের পরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল।

আমি অহদ বখ্‌শের দিকে তাকালাম। তেমনি ভাবেই সে দাঁড়িয়েছিল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বড় বড় ছবির পাথরের মতো দু' চোখ, যেন ওর ভেতরের কোনো আগুন ওকে আধ-পোড়া করে দিয়েছে। আর সেই মুহূর্তে ওর নাম আমার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল। আরে এ-তো অহদ বখ্‌শ—যার গল্প আমি পড়েছি। অনেক অনুবাদও করেছে। সে-সব অনুবাদও পড়েছি। শেখ সাদীর 'গুলিস্তাঁ' আর 'বোস্তাঁর' অনুবাদ করেছে। সেই অহদ বখ্‌শ? একি চেহারা সে করেছে? খালি পা, লুঙ্গি ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে। দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেন কেউ—পেরেক ঠুকে তাকে দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে।

সেদিন অহদ বখ্‌শ কয়েক পাতা লিখে একদিকে রাখল, একটা বিড়ি ধরিয়ে টান দিল আর আড়মোড়া ভেঙে তক্তপোশ থেকে নামল। এক গভীর আত্মতুষ্টি সে অনুভব করছিল। কলম সমানে চলছিল। আর হৃদয়ের সমস্ত অনুভব—অনুভূতি স্তূপাকার করে কাগজের ওপর নামাচ্ছিল। তখনও সে আত্মমগ্ন, হঠাৎ সেই সময় সে বাইরে ছোটাছুটির শব্দ শুনল। কয়েকদিন ধরে যার জন্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তৈরি হয়েছিল এক ধরণের স্তব্ধতা এবং উদ্বেগ, সেই আতঙ্ক স্তব্ধতা এবং উদ্বেগের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটল। মনে হল, যেন কোনো বাঁধ ভেঙে গিয়েছে, আর খুনের বন্যা চারদিক ভাসিয়ে দিয়েছে।

সেই মুহূর্তেও অহদ বখ্‌শ আশ্বস্ত ছিল। কারণ সে দরজা খোলার জন্যে উঠল। তার স্ত্রী হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, 'বাইরে যেও না, এখান থেকেই দেখ···দরজা খুলো না।'

'না না, কিছু হবে না, চিন্তা ক'র না। আমার বাড়ির সামনে কিছু হবে না।'

'না গো, না, দরজা খুলো না। আমার দিব্যি।'

অহদ বখ্‌শ হেসে বলল, 'পাগল হয়ে গেলে নাকি! এ-শহরে এমন কে

আছে' যে আমাকে চেনে না।' আর জহুর বখ্‌শ এক গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে দরজা খোলার জন্যে এগিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় প্রচণ্ড শব্দ হল। কেউ কি ওদের দরজার ওপর ভারি কিছু ছুঁড়ে মেরেছে? ছুঁড়ে মারেনি, কুড়ুল দিয়ে দরজার ওপর কোপ মেরেছে? একবার নয়, বারবার—এক দুই তিনবার কোপ পড়ল। দরজা মরমর শব্দ তুলে ভেঙে পড়ল।

জহুর বখ্‌শ তখনও ভাবছে, ওদের কিছু একটা ভুল হয়েছে। ওরা ওকে দেখলে চিনতে পারবে। ফিরে যাবে। কিন্তু ওরা ছিল একটা দঙ্গল, প্রত্যেকের হাতে ভালা বর্শা। ভালা বর্শা নিয়ে ওরা ঘরের মধ্যে ঢুকল। ঘটনাটা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। এর আগে শুধু বাইরের স্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে গিয়েছিল. কিন্তু জহুর বখ্‌শ তখন লেখায় এমন নিমগ্ন ছিল যে, কিছুই বুঝতে পারেনি। যখন সে লিখতে বসত, তখন দীন-দুনিয়ার খবর সে রাখত না।

'মা'—বড় মেয়ে চিৎকার করে মাকে জড়িয়ে ধরল। ছোট মেয়ে বইয়ের আলমারির পাশে তেমনি দাঁড়িয়েছিল। সে আর নড়তে-চড়তে পারছিল না। ওর চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, আর ওর চোখ দু'টি ভীত-সন্ত্রস্ত হরিণীর মতো সামনের দিকে তাকিয়েছিল। জহুর বখ্‌শের শুধু এতোটুকু মনে আছে, সে তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর তার ভীত-সন্ত্রস্ত মেয়ে আলমারির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এরপর তার মেয়ে কোথায় গেল, তার স্ত্রীর আর্তচিৎকার কোথায় হারিয়ে গেল, সে কিছুই জানে না। অনেক লোক এসেছিল, সেই লোকের ভিড়ের মধ্যে সে বিশেশ্বরকে দেখল। বিশেশ্বরকে দেখে, থরথর করে কাঁপছিল তার যে দু'পা, সেই দু'পায়ে কিছুটা শক্তি ফিরে এল। বিশেশ্বর পাশের মহল্লায় থাকে। একটা হিন্দি পত্রিকার অফিসে সে কাজ করে। বিশেশ্বর তাকে জানে, তার লেখার সে তারিফ করে। তাকে সে বলত, 'জহুর বখ্‌শ, তুমি মুসলমান হয়েও হিন্দি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে।' তার দু'-একটি লেখা সে তার নিজের পত্রিকায় ছাপিয়েছে।···বিশেশ্বর এখানে কি করছে? সে এদের থামাচ্ছে না কেন? জহুর বখ্‌শ তেমনি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বিশেশ্বরকে বলছিল, 'বিশেশ্বর ভাই, তুমি তো আমাকে জানো···'

কিন্তু পরমুহূর্তে জহুর বখ্‌শ যখন চোখ তুলে চাইল, দেখল, কোথাও

বিশেশ্বরের নাম-ঠিকানা নেই। দেখতে না দেখতে সে মুহূর্তের মধ্যে ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেন ধরিত্রীর অতলে সে তলিয়ে গেল।

লোকজন চিৎকার করছিল, জহুর বখ্‌শের পা থরথর করে কাঁপছিল, আর আতঙ্কের এক শীতল স্রোত তার দেহের মধ্যে প্রবাহিত হল। তোতলাতে তোতলাতে সে বলল, 'জনাবরা, তোমাদের যা দরকার সব নিয়ে যাও··· আমার শুধু ছোট একটা আর্জি আছে···' করজোড়ে সে বলছিল। কেউ কেউ চুপ করল, আর অনেকে আরও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল। যারা 'লেখাপড়া' জানা লোক তারা জানে নম্রতার সঙ্গে ধীরে ধীরে কথা বললে, লোকে তার কথা শুনবে, তার যুক্তিসঙ্গত কথার প্রতি আকৃষ্ট হবে। কিন্তু এখানে যারা এসেছে, তাদের চোখ রক্তবর্ণ।

'জনাবরা, তোমরা সব নিয়ে যাও, শুধু আমার বইপত্র নিও না। আমি পাই পাই জমিয়ে এ-সব বইপত্র কিনেছি।'

তারপর না জানি তার কি হল, সে পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল, এই দেখ নিরালা পন্ত মহাদেবীর কাব্যগ্রন্থ। এ হচ্ছে বৃন্দাবনলাল বর্মার গ্রন্থাবলী। এ হচ্ছে প্রেমচন্দের উপন্যাস। ভগবতীবাবু আমাকে চেনেন। নাগরজী কে আমি চিনি। এই দেখ তাঁর রচনাবলী। আমি অনেক কষ্ট করে, টাকা জমিয়ে এ-সব বই সংগ্রহ করেছি। এ-সব রেখে যাও... এ আমার পাণ্ডুলিপি। আমি 'গুলিস্তাঁর' হিন্দি অনুবাদ করেছি···'

আর ঠিক তখন জহুর বখ্‌শের মুখের ওপর এক জোড় থাঁপড় পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। শুধু এক রুদ্ধ কান্নার গোঙানি—ওর মুখ থেকে বেরল, আর ও চুপ হয়ে গেল। কয়েকটা হাত ওর দিকে এগিয়ে এল, আর জহুর বখ্‌শকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। কে যেন চিৎকার করে বলল, 'ম্লেচ্ছ, হিন্দিতে লেখে।' এ-কথা শোনার পর ওর চেতনাশক্তি লোপ পেয়ে যায়।

লুট চলছিল। ট্রাঙ্ক বিছানাপত্র বাক্স খাট যে যা পেল লুট করে নিয়ে গেল। সেই সময়ে তার ব্যাকুল হৃদয়ে বৌ মেয়ের কথা মনে পড়ল। ওর কণ্ঠ দিয়ে আকাশ-ফাটানো এক চিৎকার বেরুল। কিন্তু আর একটা ধাক্কায় ও ছিটকে সামনের ময়দানে মুখ থুবড়ে পড়ল। আর তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। তার ঘরের জানলা দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগল।

সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা', সুমিত্রানন্দন পন্ত, মহাদেবী বর্মা, অমৃতলাল

'বখ্‌শ তোকে জানে মারলাম না। হারামীর বাচ্চা। মোছলমান কোথাকার।'

এই বলে তারা স্লোগান দিতে দিতে অন্য কোনো শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে গলি ছেড়ে চলে গেল। আর অহয় বখ্‌শ নিজের ঘরের সামনে থরথর কাঁপছিল, নিজের ঘর নিজের গ্রন্থাগার দেখছিল। ওর মন এমন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে, ও ওর ঘরের দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু ওর সারা জীবনের অবস্থা—বিশ্বাস এখন পর্যন্ত শুধু জখমই হয়েছিল—তার মৃত্যু হয়নি। সে-সময় ও আর কিছু ভাবতে পারেনি, পাগলের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকে বই আর পাণ্ডুলিপিগুলো টেনে টেনে বাইরে আনতে লাগল। নিজের চোখের সামনে ও এ-সব কীভাবে পুড়ে যেতে দেবে! ওর হাত জ্বলে না-যাওয়া পর্যন্ত আর যতক্ষণ পর্যন্ত না ওর ফুস ফুস ধোঁয়ায় ভরে উঠল, ততক্ষণ ও হাঁফাতে হাঁফাতে—বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বই আর পাণ্ডুলিপিগুলো সমানে বাইরে এনে স্তূপাকার করতে লাগল। একসময় দু'হাত দিয়ে মাথাটিপে বসে পড়ল।

আর এখন অহয় বখ্‌শ তার ঘরের ঝলসে-যাওয়া দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। আর সামনে—মাঠে গৃহহীন পরিবারগুলো ক্যানেস্তারা থালি কৌটাকাটি, হাওয়ায় ফরফর করে ওড়া কাগজপত্র, পাঁক আর গোবরের মধ্যে নিজেদের ঠাই করে নিয়েছে। অহয় বখ্‌শ উদভ্রান্ত—ভাসা ভাসা চোখ দিয়ে কি যেন দেখছে।

যখন আমরা—সাংবাদিক, নেতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের প্রতি যারা বিশ্বাসী—এইসব ভদ্রলোকেরা গৃহহীন শরণার্থীদের সহমর্মিতা জানানোর জন্যে, সেখানে গেলাম, তখন যে তেমনিভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আর সামনের দিকে তেমনি উদাস তাকিয়ে ছিল। আমি হঠাৎ তাকে চিনতে পারলাম। আর প্রায় একলাফে তার কাছে গেলাম। নোটবুক আর পেন্সিল বের করে তার পাশে দাঁড়ালাম।

'আপনি তো লেখক? হিন্দিতে গল্প লেখেন, তাই না? আপনিই তো শেখশাদীর অনুবাদ করেছেন?'

-নাগর, ভগবতীচরণ বর্মা—এঁরা সবাই হিন্দি সাহিত্যের যশাস্থ কবি এবং কথাশিল্পী।

চোখের পলক তুলে ও আমার দিকে চাইল, তারপর পলক ফেলল, যেন আমার মুখের আদলের মধ্যে ও বিশেষত্বের মুখের আদল দেখতে পেল। ক্ষণিকের জন্যে এক টুকরো হাসি ওর ঠোঁটের তলায় খেলে গেল, 'যা লেখার ছিল, সে-সব গল্প লিখে ফেলেছি। এ-ই হচ্ছে আমার শেষ গল্প।' বোধহয় বিড়বিড় করে এ-কথাই ও বলল।

এক ধরনের গল্প আছে, যে-গল্প লেখক লেখেন। আর এক ধরনের গল্প আছে, যে-গল্প লেখক স্বয়ং জীবন দিয়ে সৃষ্টি করেন,—তিল তিল করে সৃষ্টি করেন। মহেন্দ্র বখ্‌শ কোন্ গল্পের কথা বলছেন?

বাইরের ময়দানে এখনও আধ-পোড়া কাগজগুলো হাওয়ায় উড়ছে। বইগুলো কাদা-মাটি আর পাঁকের মধ্যে এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে।

একজন বয়স্ক মানুষ সামনে এগিয়ে গিয়ে একটা বই সেই পাঁক থেকে তুললেন। পাঁক-ভর্তি বই। না জানি কতো পায়ের নিচে পিষ্ট হয়েছে। তুলসী দাসের লেখা রামায়ন—রামচরিত মানস। সে গ্রন্থের নানা জায়গায় মার্ক করা। এই গ্রন্থ যিনি পড়েছেন, তিনি শুধু এ-গ্রন্থ পড়েননি—পুজো করেছেন।

আগুন থিতিয়ে যাওয়ার অনেকদিন পরেও শহর কাতরাচ্ছিল—নিজের জন্তে হাত বোলাচ্ছিল। তারপর এক এক করে বাড়ি-ঘরের দরজা-জানলা খুলতে লাগল। পেটের আগুন মানুষকে আবার বাড়ির বাইরে টেনে আনল। দোকান-পাট খুলল। যাদের মন ভেঙে গিয়েছিল, তারা মনকে সান্ত্বনা দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল। দেশ তো নিজের, সবাইকে এখানেই থাকতে হবে,—আর কতোদিন কাঁদবে। আবর্জনার ঢের তুলে নিয়ে যাওয়া হল, পাকা ঘর-বাড়ি মেরামত করতে লাগল। দাঙ্গার ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের পাঁচ-পাঁচটি দিন যেমন এসেছিল, তেমনি চলেও গেল। গলি আর বড় রাস্তায় বাচ্চারা আবার খেলাধুলো করতে লাগল। হা হা করে হাসছিল। তাদের হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছে আবার মনের মধ্যে পাক খেয়ে উঠছিল। আশা আর আকাঙ্ক্ষার সবুজ সবুজ অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হচ্ছিল, মাথার ওপর যে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ছেয়ে গিয়েছিল, তা কেটে গিয়েছে। আকাশ পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন। যদিও মানুষ তা অন্তর দিয়ে মেনে নিতে পারছিল না, তবু তারা নিজের মনকে বোঝাচ্ছিল।

কট্টরপন্থীদের হাতে আহত মুসলমান আর হিন্দুরাও। না, এখন আর

এই দাঙ্গা হবে না। মানুষ তাদের লাভ-লোকসান বোঝাবে, এই অভাগা দেশ সেই লাভ-লোকসান বুঝবে।

প্রায় দু' বছর পরের কথা। শহরের রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে আয়োজিত এক সম্মেলনে আমরা অংশ-গ্রহণ করতে এসেছি। আমাকে ভাষণ দিতে হবে। গত কয়েক বছর ধরে যেখানেই দাঙ্গা হয়েছে, সেখানে আমি গিয়েছি। যাচ্ছি। দাঙ্গার কারণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করছি। এমন খুব কম জায়গাই আছে, দাঙ্গা হওয়ার পর,—যাদের ওপর দিয়ে বিপদ গেছে, অথচ আমি যাইনি—জিজ্ঞাসাবাদ করিনি। এতে আমার পরিচিতি বেড়ে গেছে। আর এখন আমি পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এর ওপর কাজ করি। আমার সঙ্গে আরও দু-একজন সমাজসেবী ছিল। একটা জায়গায় আমাদের চারদিকে ভিড় জমে গিয়েছিল। কেউ কেউ কৌতূহলবশতঃ আর কেউ কেউ অভিযোগ নিয়ে হাজির হয়েছিল। আমি আর আমার সাথীরা তাদের আশংকাকে নিরস্ত করছিলাম, তাদের আশ্বাস দিয়ে বললাম, সরকার তাদের সমস্যা নিয়ে ভাবছে। আর ধর্মনিরপেক্ষ যে মনোভাব, তা উপলব্ধি করার জন্যে উপদেশ দিলাম।

যখন আমাদের গাড়ি স্টার্ট দিল, তখন একজন লোক গাড়ির সামনে এগিয়ে এল। গাড়ির বোনেট-এর সঙ্গে প্রায় সেঁটে গাড়ির আগে আগে ছুটতে লাগল। মনে হল, লোকটি গাড়ির সামনে সটান শুয়ে পড়বে। কিন্তু অনেকেই তাকে দেখে ফেলল, আর সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

লোকটি হচ্ছে অহর বখ্‌শ। তাকে চিনতে আমার এতোটুকু দেরি হল না। সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সেই দাড়ি এখন পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। সেই উদাস চোখ এলোমেলো চুল। ইচ্ছে করছিল, গাড়ি দাঁড় করিয়ে তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলি। সেদিন তো একটা কথাও বলা হয়নি, এখন নিশ্চয়ই তার মন কিছুটা শান্ত হয়েছে। আমি উড়ো খবর শুনেছি, অহর বখ্‌শের জন্যে আবার বাসস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু আমি যখন পেছন ফিরে তাকালাম, অহর বখ্‌শকে দেখে নির্বাক হয়ে গেলাম। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে দুলছিল—যেন পথ হারিয়ে গিয়েছে। পথ খুঁজছে। বুঝতে পারছে না সে কোথায়—আর কোথায় যাবে।

'সাহেব, উনি হচ্ছেন অহর বখ্‌শ।' আমার পাশে স্থানীয় যে-ভদ্রলোক

বলেছিলেন, আমাকে বারবার পেছন ফিরে তাকাতে দেখে বললেন, 'অহর বখ্শের মন একেবারে ভেঙে গিয়েছে, পাগলের মতো হয়ে গিয়েছেন।'

অহর বখ্শ কি কিছু বলতে চাইছিল? হয়তো আমাকে কিছু বলতে চাইছিল। আমাকে কি সে চিনতে পেরেছে? এখনও সে আমাদের ছুটন্ত গাড়ির দিকে চেয়ে আছে। তার এলোমেলো চুল,—তার ছেঁড়াফাটা শরণের কাপড়, তার গল্প—তার শেষ গল্প সে নিজেই বলছে।

অহর বখ্শের সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। কিছুদিন পরে জানতে পারলাম, অহর বখ্শ আর এ-দুনিয়াতে নেই।

অনুবাদ: কমলেশ সেন

সম্পর্ক

অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়

উকিলবাঁধের কালভার্টে দাঁড়িয়ে এক গোধূলিবেলায় হঠাৎ অনুভব করল অবনী, এ পৃথিবীতে আপন বলতে তার কেউ নেই। বাঁধের জল ভরা কলসীর মত। পঞ্চায়েতের লাগানো ইউক্যালিপ্‌টাসে উত্তর দিকের পাড়টা যেন বনাকল। সূর্য এখন সিংহাসনে, রক্তের মত লালিমা, বলাকার সারি, বাঁধের জলে পানকৌড়ির ঝাঁক এবং মশার গুঞ্জন ধ্বনি। এইসব অনুষঙ্গে।

কালভার্টটা পুরোনো, ইংরেজ আমলের খুবই মজবুত রেলিং উপরে। নীচে জল বয়ে যাচ্ছে কোলাহলে আর মাটি যেন চুপটি করে কান পেতে তারই শব্দ শুনছে। তিরতির তিরতির। মানুষ খুব দুঃখে থাকলে অনেক শব্দই তার ইন্দ্রিয়মনকে ধরা পড়ে। অবনী সূর্যের রং, বাঁধের জলের খনন, গাছেদের শ্বাস জোনাকীর কথোপকথন সবই শুনতে পাচ্ছিল।

অবনীর মনে পড়ল ঠাকুমার কথাটা। বাঁধের মালিকানা নিয়ে। বাঁধটা আগে অবনীদেরই ছিল। বালিজুড়ি গ্রামের ইংরেজ আমলের জমিদার রামকান্ত মুখুজ্যের। বন্টননামায় বাঁধটা ভাগে পড়েছিল অবনীর ঠাকুর্দার। তিনি ছিলেন ধার্মিক সকালে ফুলবেলপাতা তুলতেন, স্নান করে শিবপূজা করে তবেই চা জল খেতেন। নাটমন্দিরটা ছিল জমিদারের বিচারশালা, মাঝে মাঝে সেখানে বিচারও বসত। অবনীর ঠাকুর্দা যেসব ভাট্-ভিখিরিরা নাটমন্দিরে বসে থাকত তাদের সবাইকে বাড়ীতে এনে খাওয়াতেন।

জমিদারী সবারই জোটে নয়। তাই অন্যসব ভায়েরা এই নিরীহ গোবেচারা ধর্মপ্রাণ মানুষটিকে ঠকিয়েছিল। সেটেলমেন্টের সময় নিজেদের নামে করিয়ে নিয়েছিল বাঁধটা। কেস করেছিল ছেলেরা। হাকিমের প্রশ্নে ঠাকুর্দা বলেছিলেন : হ্যাঁ হুজুর, আমি মাছ ধরি, বাউরি বাগদীরা জাল নামালে মাছের ভাগ নিই।

অন্য ভায়ের উকিলটি তির্যক হাসি তুলে হাকিমকে বলেছিলেন : দেখলেন তো হুজুর, তখনই বলেছিলুম, উনি মাছ ধরেন, খান—কিন্তু মালিক নন।

অবনীর মনে হয়েছিল রবীন্দ্র সৃষ্ট রামকানাই চরিত্রের কথা। অবনী

এখন সব বুঝতে পারে। ছোটবেলা থেকে সে তাবুক। কোমল ঘাসের মত মাটির বুকে সে কান পাততে জানে। তখন এমনি সর্বত্রই ছিল রামকানায়ের দল।

অবনীও এক রামকানাই ছিল। বছর দশেক আগে পর্যন্ত। ধীরে ধীরে কয়েক বছরের মধ্যে সে আমূল বদলে গেল। কেমন করে সে অন্যরকম হয়ে গেল অবনী জানে না—সেই বদলানোর তো বুঝানো হও থাকে না বাইরের অবয়বটা ভিতরের মানুষটার সাক্ষ্য দেয় না। তবু বা বদলাবার বদলে যায়। পাতা ঝরে, ঝরে, আবার নতুন করে গজায়। মানুষও এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থাতে উন্নীত হয়, ভেতরে তুমুল অগ্ন্যুৎপাত হলেও বাহিরেটা মৌসিনরাম

সূর্য ডুবল। পায়ে পায়ে অন্ধকার নামল। আলো জ্বলল। এই গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে বছর পাঁচেক। সরকারের মিটার নেই। গোটা গ্রাম হুক্ করে আনে। অফিসে মাঝে মাঝে টাকা পাঠানো হয়। এখান থেকে একটু দূরে বাঁধরা প্রকল্প। বাশিয়ান কোলাবোরেশনে গড়ে উঠেছে। বালিঝুড়ি কালিপুর গ্রামের বহু ছেলের ল্যাণ্ড লুজারের চাকরি হয়েছে। অনেকে আবার ভুয়োজমির পাট্টা কিনে সর্বস্ব খুইয়েছে।

অবনীর তারাপদর কথা মনে হোল। তারাপদ তার বন্ধু, বাংলায় এম, এ রেজিষ্ট্রি অফিসের দলিললেখক। কলিয়ারীতে চাকরির জন্যে বউয়ের সব গয়না বিক্রী করে বালিঝুড়ির হরদেবের কাছে জমি কিনেছিলে এক একর। পরে দেখা গেল, সে জমি ভুয়ো। অনেক পরে অবনীকে সেকথা বলেছে তারাপদ। অবনী উত্তলা হয়েছে : তুমিও না জেনে হরদেবের পাল্লায় পড়লে। তুমি নিজে জানি জায়গা কেনাবেচার কাজ করছ, কতো লোকের দলিল দস্তাবেজ তৈরী করছ—একবার ভালো করে খবর নিলে না, আমাকেও তো একবার জিজ্ঞাসা করতে পারতে।

তারাপদ ভালো ছেলে। হাসিটিও নিষ্পাপ। হাসি মুখে রেখেই বলেছে : সেই তো, একথাটা কাউকে বলতেও পারিনা। হরদেব তো ফেরার। তখন বলেছিল, চাকরি না হলে টাকা ফেরৎ দেব। শুনেছি এখন নাকি আসানসোল না চিত্তরঞ্জনে বাড়ী করেছে, ওখানেই থাকে, ঘরে আসে না। ঘরে লোক গেলে ছেলেরা বলে : বাবা এখানে থাকে না। এই রকম অনেকে আছে আমার মত। তারা সব অশ্লীল গালি গালাজ করে হরদেবকে। ছেলেগুলো বেহায়া, কারুর কথাতেই কান দেয় না।

অবনী জানে হরদেব জামগড়া গ্রামের কয়েকটি ছেলেকে ঠকিয়েছে। অবনী ছোটবেলা থেকে চেনে হরদেবকে। কালীপুজোয় পাঁঠাবলি করে, বাউরি বাগ্দীদের জানে মারধোর করে খাটাত, এখন পারে না। গ্রামের লোকেরা ওকে বলে রাবন।

অবনী তারাপদকে বলেছিল : পঞ্চায়েত প্রধানকে বলেছিলে নাকি ?

: হ্যাঁ ভাই—বলেছিলাম, সুজয় নাকি নাম যেন। ফর্সা টকটকে চেহারা। অন্য সব কমরেডদের মতন মিয়ানো নয়। তা উনি গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন : আমাকে বলে জমি কিনেছিলেন—এসবের আমি কিছু জানি না। পরক্ষণেই তারাপদ অস্ফুটকণ্ঠে বলেছেন : তা—হ্যাঁ ভাই প্রধানের ভায়ের নাকি বিনা জমিতেই কলিয়ারীতে চাকরি হয়ে গেছে। তুমাদের বন্ধু বাবু —তুমরাই ইসব লীলাখেলা জান। মাঝে মাঝে জন্মভূমি বাঁকুড়ার টান স্বলে আসে তারাপদর কথায়।

সুজয় অবনীর ক্লাসমেট্। স্কুলের। সে এখন দোতলা বাড়ী করেছে। রান্নাঘর, বাথরুম, সিঁড়িঘর, বাউণ্ডারি মোজাইক্ করা মেঝে। বৈঠকখানায় বাহারি চেয়ার। বারান্দায় ফুলের টব, উঠোনে ফলের বাগান। কাজু, কিস্মিস্, ভালমুট, কলা, ডিম দিয়ে প্রাতঃরাশ সারে। অথচ প্রাইমারি স্কুলের মাষ্টার। অবনী একবার বন্ধুসমাগমে ইয়ার্কি করে সুজয়কে বলেছিল : হ্যারে সুজয়, এতসব আয়োজন করলি কেমন করে। আমরা কলেজে মাষ্টারি করেও পারছি না। তুর খুব এলেম আছে—বাহাদুর চটিস্ তুই।

অন্যান্য বন্ধুদের সামনে সুজয়ের মুখে একটুখানি কালো রং ঝলসে ছিল। মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে কথায় কাটান্ দিয়েছিল : তুই তো শহরে বাড়ী করেছিস। আমি তো পাড়াগেঁয়ে। ···দীর্ঘশ্বাসের মত তার কণ্ঠ ছড়িয়েছিল প্রলম্বিত তরঙ্গে : কি করে যে এসব করেছি সে আমিই জানি। দেনাতে মাথার চুল বিক্রী হয়ে আছে।

অবনী প্রশ্ন করেনি আর। তার মনে হয়েছে সরকারের, পার্টির কি কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি বা ভারপ্রাপ্ত লোকজন নেই—তারা কি এসব দেখেনা, না তাদেরও সব টিকি বাঁধা আছে ? অবনী শহর সংলগ্ন যেখানে বাড়ী করেছে সেখানের পঞ্চায়েত প্রধান তার সহকর্মী, তাকে দাদা বলে। কথাপ্রসঙ্গে তাকে এসব বলেছিল অবনী। সে বলেছিল : সেজন্যেই তো অবনীদা, আমি সব চেকে ইস্যু করে দিই। যে কাজের জন্যে দিই, তারা একটা করে বেনি-

কিলিয়ারি কমিটি করে টাকা খরচ করে। আমার বদনামের কোনো ব্যাপার নেই।

অবনীর অনুরোধক্রমে অবনীর বাড়ীর সামনে সরকারী কুয়োটা সংস্কার করার জন্যে পঞ্চায়েত প্রধান দু হাজার টাকার চেক্ দিয়েছিল। অবনীই খরচ করেছিল টাকাটা। বেনিকিলিয়ারি কমিটি ছিল একটা। সে নামেই। প্রায় সাতশো টাকা চেঁচেছিল। ইচ্ছা করলে টাকাটা মেরে দিতে পারত অবনী, মারেনি। তখনই মায়ের কাছে শোনা প্রবাদটা মনে বেজেছিল: নাড়া নাড়লেই গুঁড়ো পড়ে।

অবনী সুহৃদকে আর প্রশ্ন করেনি। তর্ক বিতর্ক সমালোচনার মধ্যে যায়নি। শুধু খুব সংগোপনে সে তার নামটি হৃদয়ের তালিকা থেকে কেটে দিয়েছে। এরকম নাম মাঝে মাঝে সে কেটে দেয়। সেই নাম আর লেখা হয়না। পুরোনো দিনের একটা স্মৃতি মনে এল অবনীর। তাদের তাদের বিনোদ নামের একটা লোক অবনীর বাবাকে খারাপ কথা বলেছিল। অবনী তাসে থাকে না। অবনী সব শুনে তার নামটি হৃদয়ের তালিকা থেকে কেটে দিয়েছিল। পরে তার সঙ্গে বাড়ীর সবার কথাবার্তা, আসা যাওয়া চলু হয়েছিল। অবনী কিন্তু নতুন করে তার নাম আর লেখেনি। এখন তিনি উপরে চলে গেছেন।

অবনীর হৃদয়ে নামের তালিকাটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। নিতান্ত প্রাণের বন্ধু দুএকজন ও বাড়ীর কয়েকজন ছাড়া ঐ তালিকায় আর কারো নাম নেই। একটুখানি থমকাল অবনী। অন্ধকার নেমেছে। মা যেমন ছোটবেলায় মুখ পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে দিত, তখন এই আশ্বিনে অবনী অনুভব করল একটা বড় অন্ধকারের চাদরে তার সর্বাঙ্গ মোড়া। খুব ঘন অন্ধকারেও চোখ দেখতে পায়। অবনীর মনে পড়ল: দি নাইট্ হাজ এ থাউজ্যাণ্ড আইজ অ্যাণ্ড দি ডে বার্ট্ ওয়ান।

কথাগুলোর মর্ম জানে সে। অন্ধকারের বাহুতে হাত রেখে একদিন মাধবীর কানে কানে বলেছিল: মাধু, আমি তোমাকে ভালোবাসি। অবনীর তখন ষোলো, মাধবীর চৌদ্দ। অবনী স্কুলের গণ্ডী পার হয়েছে, মাধবী বাইশে। দুজনেরই তখনও ভালোবাসাবাসির মত বয়স হয়নি। মাধবী অবনীর জেঠুর বন্ধুর মেয়ে, কোলকাতায় বাড়ী। মাধবীই কাছে এসেছিল অবনীর। অবনীর কাছ থেকে সাইকেল কেড়ে নিয়ে বাঁধের এই সংলগ্ন

আমবাগান পরিক্রমা করেছে, আর পিছনে ছুটেছে অবনী। গোপনে অবনীর কবিতার খাতা খুলে কবিতা পড়ে হেসেছে উদ্দাম, বলেছে তার বীণানিন্দিত কণ্ঠে : এগুলো কাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছ অবনীদা ? প্রেয়সীটি কে ?

সেই আমবাগান নেই, বিক্রী হয়ে গেছে। এখন তা ফুটবল খেলার মাঠ। পাশে পঞ্চায়েতের পার্ক। মাধবীর সেইসব আচরণ, ছেলেমানুষির সঙ্গে ভালোবাসা নাকি প্রণয়ের খেলা সবই যেন হিরন্ময় স্মৃতি। মাধবীর একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল, পাকাডিপাতার মত মুখ, ফর্সা প্রুমনবর্ণের ত্বক, স্নিগ্ধ চাহনি, রঙবেরঙের ঢিলেঢালা পোশাক, শরীরের প্রতি ছদ্ম-উদাসীনতা এবং অসম্ভবরকমের স্মার্টনেস্ অবনীকে মোহিত করেছিল। এলোমেলো ও চৌচির করে ভেঙে দিয়েছিল তার মনের বাঁধ। আর এমন হলে যা হয়, ভালোবাসার জলতরঙ্গ কোনো নিয়ম না মেনে যেদিকে যেমন খুশী বইতে শুরু করে।

অবনীর বড়দা, জেঠুর বড় ছেলের বিয়েতে এসেছিল মাধবী। বৌদির গ্রামে মামাবাড়ী এবং ছেলেবেলায় মাতৃহীন হওয়ায় দিদার কাছে মানুষ। গ্রামের স্কুলে অবনীর চেয়ে দুক্লাস নীচুতে পড়ত বৌদি। সেই কয়েকদিন সবসময়ই অবনীর সঙ্গে মাধবী। গ্রাম দেখছে, পাখী দেখছে, পুকুরে স্নান করছে বৌদির সঙ্গে, সাঁতার শিখছে। অবনীরা গরীব না হলেও মধ্যবিত্ত। বাবা একমাত্র চাকুরে। বড় সংসার। অবনীরা অনেক ভাইবোন। জমিদারির জমি ভাগ হতে হতে বাবার ভাগে বিঘে পাঁচেক। অবনী হিসেব করে তাদের ভাগে এক বিঘেও জুটবে না।

এখন বুঝতে পারে অবনী, শুধু রূপ নয়, ঐশ্বর্যও মানুষকে টানে। মাধবীদের ঐশ্বর্য তাকে আলো-আঁধারির খেলার মত প্রাণপনে টেনেছিল, গ্রাস করেছিল একরকম। আর সেই মেয়ের কাছে অবনী তো খেলার পুতুল। বড়লোকের ছেলেমেয়ের যত নীমি সাবালকও আসে, দারিদ্র্য সারাজীবনেও সেই ম্যাচুওরিটি দেয় না। সেই মেয়ের ইচ্ছার সঙ্গে সমানুবর্তী হয়েছে অবনী। অবনী যেন মাধবীর আদেশ প্রতিপালন করার জন্যই ব্যাকুল। পরক্ষণেই ভাবল অবনী, হয়তো তা নয়,—অমূলক এসব ভাবনা।

কতবার একান্তে একটুখানি মাধবীকে স্পর্শ করার কথা ভেবেছে অবনী। পারেনি। সদ্য যৌবনের বয়ঃসন্ধির নানা কৌতূহল, ভাবনা তাকে আলোড়িত

করেছে। কাল্পনিক নানা শরীরী ভাবনায় সে বুঁদ হয়ে থেকেছে—তবুও তার বাক্স্ফুটন হয়নি। লজ্জা, ভয়, সংকোচ ইত্যাদিতে প্রতিহত হয়েছে অবনী। অন্ধকারে একা কাল্পনিক মাধবীর মূর্তিকে কানে কানে বলেছে অবনী : আমি তোমাকে ভালোবাসি।

মাধবীরই জেদে গ্রামের উপান্তে দুজনে বন বেড়াতে গেছে। সেই বন খুবই সাধারণ, শাল পিয়াল মহুয়ার জঙ্গল। মাধবীই হঠাৎ হাত ধরেছে অবনীর। অবনীর করতল ঘেমে উঠেছে। মাধবী বলেছে : অবনীদা, তুমি এতো ঠাণ্ডা কেন, এতো শান্ত। সত্যি, তুমি খুব ভালো ছেলে, খুব বোকা।

অবনী নিরুত্তর। সাতীর মত ভীরু দুটি চোখে নির্নিমেষে দেখেছে মাধবীকে, মৃন্ময়ী মাধবীকে। মাধবীর প্রতিটি ভঙ্গী, হাঁটাচলা, কথাবলা, শাসন, অনুযোগ সবই যেন বীনাসংহিতার মত অবনীর হৃদয়ভূমিতে আঁচড় কেটেছে। শুধুই চেয়ে থেকেছে অবনী।

রাত হয়ে গেছে বন থেকে ফিরতে। চাচাপুকুরের কাছে এসে দেখে জেঠতুতো মেজদা নবীন তাদের খোঁজ করতে আসছে। নবীনের তিরস্কার হেসে উড়িয়ে দিয়েছে মাধবী। নবীন প্রায় দুবছরের বড় অবনীর চেয়ে। তা ছাড়া মাধবী তাদের বাড়ী এসেছে। সুতরাং নবীনকে দূর থেকে দেখেই মাধবীর হাত ছেড়ে দিয়েছে অবনী। সঙ্কোচ, শুধু সঙ্কোচ। তারপর সামান্ত পথ তিনজন নিঃশব্দে ফিরেছে। মাধবী এসে অবনীর ঠাকুরমাকে বলেছে : জানো ঠাকুমা, আজ না অবনীদার সঙ্গে গভীর জঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছিলুম। কি ভয় করছিল আমার।

অবনী এখন আর সামনাসামনি নেই। নতুন বৌদির সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে অন্যরকমের কণ্ঠ। একান্তে ভ্রুকুটি করে বলেছে : ঠাকুরপো তোমাদের দুজনকে খুব মানায়। পরক্ষণেই শ্বাস দীর্ঘ হয়েছে বৌদির : কিন্তু খুকুরা তো ব্রাহ্মণ নয়, কাকাবাবু কাকীমা কিছুতেই মেনে নেবেন না।

অবনীর তবুও চৈতন্ত হয়নি। ফুলশয্যা হয়েছে উপরের কোঠায়। দুপাশে দুটি উপরকোঠা। মাঝে সিঁড়ি। দেয়ালের আবরু না থাকায় সবারই বিছানা নীচের বারান্দায়। মেয়ে পুরুষ আলাদাভাবে। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখে জেঠতুতো ভায়ের বদলে মাধবী তার পাশে শুয়ে। গায়ে শুধু সাদা টেপ, জামা নেই। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে মাধবী। রমণী

হয়ে উঠেছে মাধবী লক্ষ্য করেছে অবনী, ইচ্ছে করেছে খুব আলতোভাবে মাধবীকে স্পর্শ করতে। পারেনি—যদি ঘুম ভেঙে যায়। অবনী বিনিদ্র চেয়ে থেকেছে মাধবীর দিকে। ভোরের বেলায় মিষ্টি হেসে বলেছে মাধবী : সারারাত ঘুমোলে না তো!

অবনী কৌতূহলের দৃষ্টি মেলেছে। বলতে পারেনি : তাহলে তুমিও ঘুমোওনি? সেই মেয়ে রাতের বেলা একা অবনীর কাছে এসেছে তাদের পশ্চিম দিকের উপর কোঠায়। বলেছে নীচুস্বরে : আমরা কাল চলে যাচ্ছি। কিছু সময়ের নীরবতা। একটু পরেই প্রগলভ কণ্ঠে বলেছে : দেখো, তুমি যেন কলেজে গিয়ে প্রেম কোরো না কারুর সঙ্গে। আর চিঠি দেবে, কেমন? বলেই তার মরালীগ্রীবা আন্দোলিত করেছে।

সংকোচের পাহাড় সরিয়ে এবার দুরুদুরু বুকে অবনী হাত ধরেছে মাধবীর। প্রথম রমণী স্পর্শের মত শিহরণ জেগেছে তার শরীরে। মাধবীর হাতের সবুজ কাচের চুড়ি নাড়াচাড়া করেছে। ভিতরের জমাট বাষ্প শীতল হয়ে জলকণার রূপ নিয়েছে, উত্তরের জানালা দিয়ে প্রতিফলিত জ্যোৎস্না এসে ভিজিয়ে দিয়েছে তাদের শরীর। অবনীর গলায় আর শব্দ বাজেনি। তুমুল চেষ্টার পর স্বরভঙ্গ কণ্ঠে কোনোরকমে উচ্চারণ করেছে সে : তুমি আগে চিঠি দিও আমার হোস্টেলের ঠিকানায়। তারপর আমি। মাধবী ঘাড় নেড়েছে, বলেছে : বেশ, তাই।

মাধবীরা চলে যাওয়ার পর থেকে অবনী চুপচাপ। নৈঃশব্দই হয়ে উঠেছে তার মূলধন। পুকুর পাড়ে বুনো ঘাসলতায় নীলনীল ফুল দেখেছে, পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে তরঙ্গ তুলেছে, লাল ভেলভেট পোকাদের হাঁটা লক্ষ্য করেছে অনেক সময় ধরে। সঙ্গোপনে খুব কষ্ট করে মাধবীর মুখ মনে করার চেষ্টা করেছে—পারেনি। দুএকটা মুখ, খুব প্রিয়মুখ কেন যে মনে পড়ে না, সারাজীবনের মত অদৃশ্য হয়ে যায়।

…হাওয়া দিচ্ছে। হিমের পরশ। অবনী ভাবল, এখন তার বয়স চল্লিশ, দুই পুত্রকন্যার জনক, এখন সে মাধবীর কথা ভাবছে কেন? মাধবী হয়তো স্বামীপুত্রকন্যা নিয়ে সুখে দিনাতিপাত করছে, তার কথা মাধবীর আর মনে নেই, তবু অবনীর স্মৃতিতে মাধবী এখনও সেই কিশোরী। স্মৃতি এমনই যে সে সময়কে হাত বন্ধ করে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে দেয়—পাতা

ঝরে, ফুল ফোটে, ভ্রমর গুণগুনোয়। কোকিলের পঞ্চম স্বর অন্তঃস্থল পর্যন্ত ব্যাপ্ত করে আর স্মৃতি প্রহরীর মত জীবনকে আগলায়।

মাধবীই কথা রেখেছিল। সেইসব বানান ভুলের চিঠি এখনও পর্যন্ত ডায়েরীর পাতায় রেখে দিয়েছে অবনী। মোট তিনটি চিঠি। শেষ চিঠিতে মাধবী লিখেছিল : জানো, আমার এক বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে। আচ্ছা বলোতো, ফুলশয্যার রাত্রে কি হয়? কেন্নীওয়ালার চেয়ে চুড়িওয়ালা ভাগ্যবান কেন? কোন রাত সবচেয়ে ছোট? ইত্যাদি নানাকথার পর লিখেছিল : আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমার ভালোবাসা নিও··· আরও পরে শেষের দিকে লিখেছিল : তুমি আর বাবার নামে চিঠি দিও না। মা বলে, হ্যারে, অবনী কি লিখেছে চিঠিতে? চিঠিতে বান্ধবীর ঠিকানা দিলাম। তুমি ঐ ঠিকানাতে উত্তর দিও। ইতি তোমার মাধু।

অবনীর ভিতরে তুমুল শব্দ। ট্রেনের শব্দ। ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ তুলে দুরন্ত গতিতে পাহাড়ী আঁকাবাঁকা পথে চলেছে সেই শতচক্রের রুতযান। দিগন্ত কাঁপিয়ে সূর্য্যকে পিছনে ফেলে ক্রমশঃ অন্ধকারের দিকে ছুটে চলেছে ট্রেন। কোথায় এ ট্রেন থামবে অবনী জানে না। ভালোবাসার ট্রেন তো কোনো সিগন্যাল মানে না।

অবনীই ভুল করেছিল। নির্দেশ না মেনে বাবারই প্রযত্নে চিঠি দিয়েছিল অবনী। খামে। তার মনে হয়েছিল বান্ধবী যদি মাধুকে চিঠিটা না দেয়। তারপরই জেঠুর কাছে এল চিঠি। জেঠু বাবাকে বললেন, বাবা মাকে। মায়ের সঙ্গে মাঠে জলতুলতে গিয়েছিল অবনী। ব্রাহ্মণ ছাড়া সে কুয়োতে তখনও জল তোলা যায় না। তখনও অবনীদের নিজস্ব আলাদা বাড়ী, কুয়ো কিছুই হয়নি। মাঠ থেকে মাঠে জল নিয়ে আসতে হোত ভাইবোন ঘরের লোকজনদের মাঝে মা একা পাচ্ছিল না অবনীকে। মঠে যেতে যেতে মা বলল : হ্যারে তুই মাধবীকে চিঠিতে কি লিখেছিস? অবনী সঙ্কুচিত, ভীত। তার কণ্ঠ কেমন জড়ানো। মাকে বরাবর ভয় করে অবনী। আড়ষ্ট হয়ে বলেছিল : কই, কিছু নাতো! কিছু লিখিনি তো!

মায়ের স্বর গম্ভীর। বলল : তাহলে জেঠা তোর বাবাকে বলল কেন, অবনী খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কলেজে খারাপ ছেলের সঙ্গে মিশছে। মাধবীকে খারাপ চিঠি লিখেছে।

অবনী খারাপ ভালো জানে না। সে তো মাধবীর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

মায়ের কথায় কোনো জবাব দেয়নি সে। মায়ের মন তাতেই সব পড়ে নিয়েছে। মা বলেছে: এখন তোর লেখাপড়া শিখে বড় হওয়ার বয়স। দেখছিস তো লেখাপড়া না শিখে তোর বাবার কত কষ্ট। এসময় মনটাকে নষ্ট করিস না—তাছাড়া বাবা, মাধবীরা তো বামুন নয়, ওদের সঙ্গে করণ কারণ করে আমরা কি একঘরে হব। বোনগুলোর বিয়ে হবে না, তুই বড়—তুই যদি না বুঝিস তাহলে তো সর্বনাশ।

মায়ের কথাই যেন বেদবাক্য। মাধবীও আর কোনো জবাব দেয়নি। তবুও শেষ চেষ্টার মত মাধবীর বান্ধবীর ঠিকানায় গোপনে চিঠি দিয়েছিল অবনী। কিছুদিন পর আরো একখানা। নিরুত্তর।

বিপদ তারপর থেকে ঠাঁই নিয়েছে অবনীর মনের প্রকোষ্ঠ জুড়ে। বৌদির করুণ হাসি, জেঠতুতো দাদা রবীনের ঠাট্টা: ওরা কতো বড়োলোক জানিস? অবনী গাছের মত নীরব। নিষ্ঠুর জীবনযাপনের মধ্যে দিনাতিপাত করেছে সে। ভালোবাসা নেই। বুঝি ভালোবাসা শেষ হয়ে গেল তার জীবন থেকে। আর কোনোদিন চম্পক ফুল ফুটবে না তার ভালোবাসার নন্দন-কাননে।

বাঁধের পাড়ে গাছগাছালিতে জোনাকীরা জলছিল এতক্ষণ, এবার বোধহয় ঘুমোতে গেল। অবনী ভাবল, সত্যি সেকি মাধবীকে ভালোবাসত অথবা মাধবী তাকে? ভালোবাসা কেমন করে হয়? দুদিনের দেখা, কথাবলা, ভালোলাগা ইত্যাদিতে কি প্রণয় জমে? সে প্রণয় কতদিন থাকে? দেহজ কামনাকে ছাড়িয়ে কেউ কি ভালোবেসেছে? তাহলে কুরূপাকে কেন কেউ ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেয় না? রূপসীকে পাত্রপক্ষ সহজেই পছন্দ করে, কালো মেয়ের বিয়ে হয় না। অবনীকেই তার বড় বোনের বিয়ের জন্যে কত মানুষের কাছে যেতে হয়েছে। সেই শ্যামলা বোনটিকে পাত্রস্থ করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। অথচ সুন্দরী শ্যালিকার বিনাপণে বিয়ে হয়ে গেছে। অবনী বা মাধবী যদি এত কতই পরস্পরকে ভালোবাসত তাহলে তাদের আলাদা ছেলেমেয়ের সঙ্গে বিয়ে হোল কেমন করে। শিরী ফরহাদ, লায়লা মজনুর দৃষ্টান্তও তো আছে। কিন্তু তারা তো কেউ কারুর জন্যে অপেক্ষা করেনি।

অবনী মনে মনে বলল, আমি করেছি। মাধবীই তার কথা রাখেনি।

পরক্ষণেই তার কবির কথা মনে পড়ল : দি মাইণ্ড হ্যাজ এ থাউজ্যাণ্ড আইজ, বাট দি হার্ট হ্যাজ ওয়ান।

অবনী ভাবল, আসলে সে একটা দরিদ্র, ভীতু এবং অন্তর্মনস্ক প্রকৃতির মানুষ। সে কাউকে জোর করে ভালোবাসতে জানে না, ভালোবাসলেও দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারে না : আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না।

মাধবীর অসামান্য রূপ তাকে ভুলিয়েছিল। অবনীর সেই বয়স ছিল রূপে ভুলে যাওয়ার বয়স। এমন হলে বুঝতে পারত কেন কবি বলেছিলেন : রূপে তোমায় ভোলাবো না, ভালোবাসায় ভোলাবো। এখন অবনী বোঝে, সৌন্দর্য দূর থেকে উপভোগ করাই ভালো। 'সুন্দরের কাছে যেতে নেই। কিছু কিছু খুঁত ধরা পড়ে।' কাছে গেলে কালের নিয়মে সেই সৌন্দর্য কম পেতে থাকে, মলিন, হতশ্রী হয় তখনই আসে অনাকর্ষণ।

অবনী ভাবল, যখন তার বিয়ে হয়—ফুলশয্যা হয়নি, নববধূর সঙ্গে কোনো শারীরিক সম্পর্ক হয়নি, তখন কি মনে হয়নি তার—এক দুর্লভ, মনোরম ও আশ্চর্য জগতের উন্মোচন করবে সে। কিন্তু সেও তাৎক্ষণিক। প্রত্যেক বিবাহিত মানুষ মানুষীর জীবনে এমনই এক গোপন সুন্দর মুহূর্ত আসে—বুদ্‌বুদের মত, ক্ষণকালের। আবার কেউ কেউ সেই সুন্দর মুহূর্তটিকে শাশ্বত পরমায়ু দিয়ে বেঁধে রাখতে জানে। এও এক শৈলী।

সিগারেট জ্বালাল অবনী। সেই লাল আগুনের দিকে নত দৃষ্টিপাত করে ভাবতে লাগল, যদি মাধবীকে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করত সে, অথবা মাধবী স্বরূপে তার জীবনে আসত তাহলে সে কি এখনও অবনীর মনের গোপনে স্বপ্নের মত শিহরণ জাগাতে পারত। চকিতে ভাবল, মাধবী কি কোনো শূন্য মুহূর্তে তার কথা ভাবে ?

অবনীর এক বন্ধু সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী। যুবক বয়সে ভালোবাসত একটি মেয়েকে। টিউশনীর ছাত্রী। অবনী দেখেছে তাকে, সত্যি সুন্দরী। বন্ধুটি বা মেয়েটি বিয়ের আগে ভালোবাসার কথা বলেনি বাবা মাকে। বাড়ীর লোকেরা ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল তার। মেয়ে হল। তারপর বাবার বাড়ীতে এসে মেয়ে আর শ্বশুর বাড়ীতে যেতে চায় না। স্বামী ভালোবাসত, অনেক চেষ্টার পর সে হাল ছাড়ল। ডিভোর্স নিল মেয়েটি, তখন তার মেয়েরই বছর পাঁচেক বয়স। মেয়েকে নিয়ে গেল পিতা। বিয়ে

হল অবনীর বন্ধুর সঙ্গে। এদিকে দুঃখে ও বেদনায় পূর্বতন স্বামী ও কন্যা বিষ খেল। মেয়ে মারা গেল, বাবা বাঁচল। তারপর বিয়ে করলেন ভদ্রলোক। তাপর বিপর্যয়ে স্কুটার অ্যাকসিডেন্টে পা গেল ভদ্রলোকের। সেই দ্বিতীয় স্ত্রী স্বামীর চাকরি পেল। সেই স্ত্রী এখন হুইল চেয়ারে বসে থাকা স্বামীর সেবা করে।

বন্ধুটি স্ত্রী নিয়ে ভালোই ছিল। মেয়ে হল। ঘটা করে অন্নপ্রাশন হোল মেয়ের। বন্ধুটি মানুষ হিসেবে খুবই ভালো। পরোপকারী, বন্ধুবৎসল, হৃদয়বান। অবনীর বাড়ী তৈরীর সময় কিছু টাকা ধার দিয়েছিল, কোনোদিন চায়নি। প্রায় আটবছর পর টাকাটা শোধ দিতে গিয়েছিল অবনী। দেখল, ঘরে কেমন ঠাণ্ডা পরিবেশ, বুঝল সেই দাম্পত্য। তবু বলল: কি ব্যাপার মিলন, তোরা সব এমন চুপচাপ!

অবনী উত্তর পেল না। বুঝল, মিলন ভালো নেই। ভালোবাসার আলো নেই মিলনের চোখেমুখে। এমন হলেই মানুষ আর ঠিক থাকে না। মিলনের শরীরও খুব খারাপ হয়ে গেছে। বন্ধুর মত আন্তরিক কণ্ঠে বলল: এভাবে থাকলে জীবনটা কাটবে কেমন করে! ভালোবাসা না থাকার মত দীর্ঘ জীবন তো আর নেই!

মিলনের নিরুত্তাপ উত্তর বাজল: পূর্ণিমা ভালো নয় জানিস। এইজন্যেই ওর আগের স্বামীর সঙ্গে অ্যাডজাষ্ট হয়নি।

এমনই ভয়াবহ উচ্চারণ রীতিবিরুদ্ধ প্রসঙ্গ যে কোনোমতেই ভিতরে অনুপ্রবেশ করা যায় না। বন্ধু হলেও। তড়িতাহত হোল অবনী। স্বপ্নের ভাবনায় ভাবল, তাহলে যে সনাতন রীতিনীতি, সামাজিকতা মেনে, মা-বাবার সম্মতিতে গড়া দাম্পত্যসম্পর্ক—সেই কি নির্দিষ্ট, অপরিহার্য? অন্য পথে গেলেই কি পদস্খলনের সম্ভাবনা? অবনী জানে, মিলন ভিতরে ও বাইরে নিপাট ভালোমানুষ। রাজনৈতিক ভাবেও সে খুব অকপট।

অবনীর জীবনে বিপর্যয় নিত্যসঙ্গী। বারো বছর একটা কারখানায় চাকরী করল অবনী, তারপর সে কারখানায় তালা ঝুলল। অবনী বেকার। ততদিনে অবনীর উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা আরো তিনজন। স্ত্রী পুত্রকন্যা। সবাই সয়ে গিয়েছিল সেই সময়। মিলন সয়েনি। বরং বলেছে: টাকাকড়ি লাগবে তো. নিয়ে যা। কোনো সংকোচ করিস না। ধার হিসেবেই নিবি।

সেখায় নেয়নি অবনী। বাড়ী করার সময় ধার করেছে। মনে করেছিল মিলনকে বলবে : তোর ঋণ শোধ করার মত স্পর্ধা আমার নেই। স্ত্রী মুক্তার সঙ্গে কতদিন আলোচনা করেছে অবনী. মিলনের এ টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখলে প্রায় তিনগুণ হয়ে যেত। মিলনও সেটা ভালোভাবেই জানে। অথচ অবনী যখন টাকাটা দিল, মিলন সেটাকে কেমন অগোছালো ভাবে টেবিলের উপর ফেলে রাখল। অবনী কিছু বলার চেষ্টা করতে মিলন ধমকে উঠল : নে, তুই আর ফর্মালিটি করিস না। সামান্য টাকা নিয়েছিস তো, এত সংকোচ করছিস কেন? অবনী খুব গভীরভাবে অনুভব করেছে মিলনের উদাস দৃষ্টি, তার অনুভব এখন অন্ত কেন্দ্রে স্থির। প্রিজমে বর্ণালীর মত।

পাতাগুলো কাঁপছে। এখন আশ্বিন মাস। ঠাকুমার সেই প্রবাদটা মনে জাগল : আশ্বিন মাসের শিশির / বাইরে কোরো না শিয়র। 'হিমের কাঁপন লাগল বুঝি আমলকির ঐ ডালে ডালে'। অবনী এসব কিছুই গ্রাহ্য করল না। সে এই কালভার্টের সিংহাসনে বসে একা এই রাতে বাঁধের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে নিজেই নিজের নিবেদন শুনতে চায়। নিজেরই জয় পরাজয় আনন্দ বেদনার কথা।

মুক্তা খুবই ভালো। কবির কথায় : এ ভার্চুয়াস উয়োম্যান ইজ্ এ ক্রাউন্ টু হার হাজ্ব্যাণ্ড। এমন এক ভালোবাসার ঈশ্বরীকে অবনী যথাযথ প্রত্যর্পণে অপারগ। মনের আকাশ জুড়ে অসংখ্য স্মৃতির রূপালী মেঘেরা—এতো বিষাদ, এতো সব যে অবনী নিজেই বেসামাল।

সুখ সহজ, শান্তি দুর্লভ। এক সন্ন্যাসী বলেছিলেন : সুখ আত্মপর, শান্তি পরম পাওয়া। সবাই সুখে না থাকলে শান্তি আসবে কেমন করে! অবনীর জীবনে সুখের তুমুল ভাণ্ডার না থাকলেও যা আছে তাই পর্যাপ্ত। ···তোমার খিদে পেয়েছে, ভালো ভালো খাবার খেলেই সুখ, ভালো পোষাক পরলে সুখ, বাসগৃহটি পরিচ্ছন্ন, শয্যা পরিপাটি তাহলেই সুখের ভাণ্ডার পূর্ণ। শয্যার পরিধি পূর্ণ হয় সুন্দরী স্ত্রীর মর্ম সাহচর্যে।

তবু সুখ নেই। বাঁধের জলের দিকে চেয়ে অবনী বলল : আমি সুখী নই।

বাঁধের জল আয়না হোল। চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করে উঠল তার জলকণা। বলল : তোমার কিসের দুঃখ? দুঃখ কোনখানে? কোনো গোপন বেদনার ভার বইছ নাকি এখনও?

: না। দুঃখ নেই। আসলে আমার কি আছে, আমি জানিনা।

: এতো কোনো উত্তর হোল না অবনী। দায়িত্ববানের মত কথা বলছ না তুমি। তুমি এখন চল্লিশ পেরিয়েছ। এতদিন তুমি অন্যের সুখ দুঃখের কারণ হয়েছ, এবার তুমিই তাদের সুখদুঃখের ভাগী হবে। এখন তোমার উত্তরদায় পালনের সময় এসেছে। একে অস্বীকার করার উপায় নেই তোমার। পলায়নী মনোবৃত্তি তোমাকে মানায় না।

অবনী কোনো উত্তর করল না একথায়। একটা শামকল উড়ে গেল অবনীর মাথার উপর। ডানার বাতাস লাগল যেন। সম্মোহিতের মত পাজামা পাঞ্জাবী পরিহিত সুদর্শন অবনী যেন উর্ধ্বে আকাশপানে মুখ রেখে গানের কলি গুনগুনোল : কেন চেয়ে আছো গো মা, মুখপানে ?

ঋত্বিক ঘটকের মুখে সেই গান, অভিনয়ে, চিত্রাংশে সেই ছায়াছবির মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল অবনী। দৃশ্যপটের মধ্যে অবনী যেন জীবন্ত নয়, এক চেষ্টিত চরিত্র। রক্তে চলাচল বাড়ল দ্রুত, বাতাসে কাঁপন লাগল, শিরশির করে উঠল অবনীর শরীর। কাছেই বাউরিপাড়া। মাদল বাজছে। 'বাউরিরা ভালো জাত, মাদল বাজায় সারারাত'। অবনী ভাবল, পৃথিবীতে যে যত মূর্খ, সে তত সুখী। সেই মুহূর্তে বনস্থলী, বাঁধের জল, চাঁদের ক্ষীণ আলো তার মনোভুবন জুড়ে এক তুমুল তরঙ্গের আন্দোলন তুলতে লাগল।

জলে নামল অবনী। ঠাণ্ডা। হঠাৎ মনে হোল তার, সান্ধ্যকৃত্য করার জন্যই সে বাঁধে এসেছে। বাড়ী এসেছে বিকেলের বাসে। অবনী এখন গ্রামের বাড়ীতে থাকে না। খড়ের ঘরের উপরের দুটি কোঠায় দুভাই, বৈঠকখানায় অন্যভাই। সে এবং ছোট বাইরে। কর্মসূত্রে। কালীপুজো তাদের গ্রামে খুব নামকরা। সে সময় সবার সঙ্গে ভরমিটরীতে তারা চারজন। অবশ্য ভাইয়ের ছেলেমেয়েরাও থাকে তাদের সাথে। বারান্দায়।

কর্মস্থলের শহরসংলগ্ন গ্রামে বাড়ী করেছে অবনী। চৌদ্দ বছর রামচন্দ্রের বনবাসের মত ভাড়াবাড়ীতে কেটেছে তার। তবু বনবাসে রামের সুখ ছিল, অন্ততঃ প্রাক্‌-সীতাহরণ পর্ব পর্যন্ত। অবনীর কোনোদিনই সে সুখ জোটেনি। এক একটি ভাড়াদার যেন এক একটি দশানন। তাদের পছন্দ, চাহিদার বহরও বহুমুখী সুতরাং তা পালন করা সমূহ সংকট ও শঙ্কার।

সুতরাং বাংলাভাটার ইঁট, কাদার গাঁথনি। ইঁট কিনতে বেসমাল হয়ে

গিয়েছিল সে। শেষে এক ভাই তখন ই. সি. এলে কণ্ট্রাকটারি করত, বলেছিল: আমি ইটের ব্যবস্থা করে দেব। তুমি পরে দাম দিয়ে দিও। ব্যবস্থাটা করেওছিল। কিন্তু সেই ইট কণ্ট্রাক্টারির রিজেক্ট ইট। অবনী পরে বুঝেছে, ভাইও তার সঙ্গে ব্যবসা করেছে। বর্ষায় বাইরেটা প্লাষ্টার না করালে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। বাবাও তখন চাকরি করতেন ই. সি. এলে। বলেছিলেন বাড়ী দেখে ঠিক আছে, আমি পাঁচ হাজার টাকা এরিয়ার পাব, তুই একহাজার নিবি। বাকীটা যোগাড় করে প্লাষ্টার করিয়ে নিস।

অবনী সেবার সবাইকে নিয়ে এসেছিল। ক'দিন থাকবে বলে। যাওয়ার সময় টাকাটা নিয়ে যাবে। মিস্ত্রীকে সেইরকম বলা আছে। মিস্ত্রীটা ভালো, নিজে একহাজার টাকা ধার রেখে প্লাষ্টার করে দিয়েছে। অথচ অবনী বাড়ী আসার পর থেকে দেখছে মায়ের ও ভাইদের মুখ কেমন থমথমে। অবনী ভেবেছে, তাহলে কি টাকার গন্ধে এরা অন্যরকম হয়ে গেছে? বাবা মায়ের চোখে কেমন ঘোর লাগা টান। সেই সরল স্নেহভরা মুখগুলি অন্তর্হিত। অবনী ভাবল, কেন এমন হয়? জায়গাটা কেনার আগে অবনী বলেছিল মা, তোমার নামেই জায়গাটা কিনব। মা খুশী হয়েছিলেন। অবনীর এক বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেছিল অমন কাজও করিস না, তোর মায়ের নামে জায়গা হলে তোর ভাইবোনেদের ন্যায্য দাবী এসে যাবে। তোরও ছেলে হয়েছে, তার ভবিষ্যত নেই? তুই বরং ছেলে বা বউয়ের নামে কিনবি।

অবনীর এমন কথা শুনে কষ্ট হয়েছে। সে তখনও খারাপ হয়নি। তবু কারখানা বন্ধের সময় ছ'মাস বাড়ীতে থাকার সূক্ষ্ম আত্মনিগ্রহের মধ্যে অবনী বুঝতে পেরেছে, যার টাকা নেই, সে এ সংসারে একেবারে মূল্যহীন। ভাইবোন, প্রতিবেশী, ই. সি. এলে চাকরি করা গ্রামের বন্ধুবান্ধবরা কেমন করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছে। অথচ অবনী সবার চেয়ে ভালো ছাত্র, কোয়ালিফায়েড। তাদের জিজ্ঞাসায় কেমন ছদ্ম-মমতা তোদের কারখানা কবে খুলবে?

ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ছিল অবনীর—সেই টাকা মা, ভাইরা কৌশলে ঘরের প্রয়োজন দেখিয়ে আদায় করে নিয়েছে। সরল অবনী তুলে দিয়েছে যথাসর্বস্ব। ধার বলেই নিয়েছে—ফেরৎ দেয়নি। নার্সিং হোমে বোনের বাচ্চা হয়েছে, সব খরচ মিটিয়েছে অবনী। ট্যাক্সিভাড়া করে বাড়ী নিয়ে গেছে। তারপর কানে এসেছে অবনীর মায়ের কথা ছিঃ ছিঃ। একটা

নতুন জামাও কিনে দেয়নি মামা, বাচ্চাটাকে এমনি নিয়ে এসেছে। ওর আর কোনো দায় নেই। এসব কথায় অবনীর কান ভারী হয়ে পাথর জমেছে। 'ফুল জমতে জমতে যেমন পাথর হয়'—সেইরকম।

ভাড়াবাড়ীতে ফিরে এসেছে অবনী। স্কুল শিক্ষক বন্ধুদের সাহায্যে টিউশনী ধরেছে। এভাবে খুব কষ্ট করেও অবনী বুঝেছে, আত্মনির্ভরতার অপর নামই সুখ। কারুর কাছে হাত পাতার গ্লানি তো নেই। দিনে একবার ডাল ভাত, রাতে ডালরুটি এভাবেই দিনযাপন করেছে অবনী। স্ত্রী মুক্তা অবনীর সামনেই মাঝে মাঝে গোপন অশ্রু প্রতিফলিত করে ফেলেছে এভাবে কতদিন বাঁচা যায়···কতবছর!

টিউশনী ছাত্রের এক পিতা, তিনি মহানুভব, তিনিই এ চাকরিটা করে দিয়েছেন। তারপর চাকরি টিউশনী এবং অসম্ভব মনের জোর নিয়ে বাড়ী তৈরী করতে নেমেছে অবনী। বুক দমদম্ করেছে। লজ্জা মাঝপথে যদি থেমে যেতে হয়। তবু বন্ধু সাহচর্যে পরিবারের বিনাসহায়তায় বাড়ীটা হয়েছে। খারাপ ইঁটের বাড়ী, প্লাষ্টারের খরচ, বাবার প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি নানা ভাবনা।

বাউরিরা মাদল বাজানো বন্ধ করেছে এখন। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। অবনীর মনে একটা গান বাজল: ঝরা পাতা গো তোমারই দলে, ঝরাপাতানো পরক্ষণেই ভাবল সে, না সে এখন ঝরাপাতা নয় বরং পাতা ঝরে যাওয়ার পর সে এখন সতেজ সবুজ। ভিতরে ভিতরে তার প্রেরণার এক অলজ জোয়ার। এই তুর্য তূরীয় গতি নিয়ে সে এবার জীবনকে পরিক্রমা করবে, গড়ে তুলবে জীবনের প্রকৃত নির্মানভূমি।

অবনী, তুমিও তো আর ভালোমানুষটি নেই। এ যাবৎ সংসারের কোনো কাজে মনোযোগ দিয়েছ তুমি? আগে তুমিই উদ্যোগ নিয়ে জেঠার সঙ্গে ভাগের ঘরের ফায়সালা করেছ। নিজেদের মত মাটির হলেও স্বাধীন একখানা ঘর তুলেছ। বৌয়ের গয়না বন্ধক রেখে একবার কুয়ো করিয়েছ, আরেকবার বৈঠকখানা। এখন তুমি তো আর ঘরের কোনো কাজেই হাত দাও না। তুমি স্বার্থপর হয়ে গেছ অবনী। নিজের ঘর করার পর সেদিকেই যত তোমার দৃষ্টিপাত।

হয়তো তাই। কিন্তু সংসার আমাকে কি দিয়েছে? আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েকে তেমন করে কেউ কি ভালোবেসেছে? কোলে তুলে আদর

করেছে কেউ? কারখানা বন্ধ হওয়ার পর ব্যাঙ্কে আমার টাকাকড়ি ফুরোনোর পর প্রতিদিন সংসারে অশান্তি হয়েছে। বাবার সঙ্গে পর্যন্ত তর্ক হয়েছে, মা ভাত না খেয়ে বাড়ীর বাইরে চলে গেছেন, আমিই মায়ের পায়ে ধরে ফিরিয়ে এনেছি। তারপর বাধ্য হয়ে চোখের জলে পুরোনো ভাড়াঘরে ফিরে এসেছি। টিউশনী করে সংসার চালিয়েছি। বাড়ী তৈরীর সময় বারবার অনুরোধ চিঠি লেখার পরও কোনো ভাই একটা টাকা দিয়ে সাহায্য করেনি। একভাই টাকাকড়ি নিয়ে সাহায্যের নামে আমার সঙ্গে বাণিজ্য করেছে। তাহলে বল, আমি কেন স্বার্থপর হব না সেটা কি আমার অপরাধ?

অবনীর দুই সত্তা বিবাদ করে। পরস্পর। তুমুল তর্কবিতর্ক দুই ব্যক্তিকে। মনের মধ্যে অজস্র প্রশ্নোত্তরের রক্তপাত ঘটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রথম সত্তাই জিতে যায়। বলে দেখব, বাড়ী করার সময় তো কেউ সাহায্য করেনি, বুঝলাম হয়তো তাদের তখন সমর্থ্য ছিল না। এখন যদি বাবা টাকাটা দেন তাহলে বুঝব সংসার আমাকে ভালোবাসে।

রাত নেমে এল চরাচরে। কোনো কথা হোল না। পরের দিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পুরোনো দিনের মত জাঁকজমক করে কাটল। বন্ধুরা কেউ কেউ বলল তুই এলেম্ আছে বাবু। আজকালকার দিনে শহরের কাছে জায়গা কিনে বাড়ী করে ফেললি, আমরা কিছু পারলুম নাইখো।

অবনী সুকদের এবং আরও অনেকের উদাহরণ দিতে পারত দিল না। সে টলল না, ভাঙল না, বিব্রত হল না। মনে মনে বলল: যদি জানতিস, কেমন করে বাড়ীটা করেছি। ডোবা জায়গা কিনেছি কম দামে, তাদের কৃপাধন্য দিয়েছি ইট আর মা বসুন্ধরার শরীর জলে মাখামাখি করে দেওয়াল উঠেছে। এ ঘর কতদিন টিকবে কে জানে। তবু তোরা মনে মনে ভাবছিস, আমি বড়লোক হয়েছি, তাতেই সুখ। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল মিলনের মত শহরের বন্ধুদের যারা কোনো পূর্বশর্ত ছাড়াই ঋণ দিয়েছে।

বন্ধুদের কথা শুনে কাল্পনিক সুখে হাসল অবনী, ভাবল, কাঁপল খুব গোপনপথে। বলতে পারল না কাউকে: তোরা সবাই মিলে আমাকে কিছু টাকা ধার দিবি? বাড়ীটা প্রাচীর করিয়েছি—মিস্ত্রীর দেনা শোধ করব।

বাড়ী ফিরে রাতে একান্ত হতে মুক্তা বলল তুমি জেনে রাখ, টাকা তুমি পাচ্ছ না।

অবনী কটাক্ষ করল, বিরক্তি ও সন্দেহের কণ্ঠে বলল: তুমি জানলে কি-করে? তুমি কি অন্তর্যামী হয়েছ নাকি?

মুক্তার মুক্তো ঝরল না। ঠাণ্ডা গলায় বলল: বেশ, তাহলে দেখো।

অবনী কোনো কিছুই প্রকাশ করে না। ভেতরের কষ্ট, যন্ত্রণা, অন্তঃক্ষরণ সব সে কষ্ট করে ভেতরেই রেখে দেয়। বাইরে তার উন্মোচন ঘটতে দেয় না। কাউকে জানতে দেয় না তার মনোবেদনা এমনকি স্ত্রীকেও। সেই কষ্টে নিশীথে নীল হতে লাগল অবনী। বিশ্বাসই করতে পারছে না। এমন কি হতে পারে। বাবা তাকে নিজেই প্রস্তাব দিয়েছেন। মিস্ত্রীকে কথা দেওয়া আছে। কর্মস্থল, বন্ধু-বান্ধব সবার কাছেই বলা নেওয়া আছে। কি করবে অবনী?

পরের দিন সকালে যাওয়ার প্রস্তুতি। অবনীর বুক কাঁপছে। এক একবার মনে হচ্ছে তার, মুক্তাকে জিজ্ঞাসা করি—কেমন করে সে জানল যে টাকা দেবে না বাবা। পরমুহূর্তে মনে হোল, বৌয়েরা অহংকার বশবর্তী হয়ে এমন কথা বলে ঘর ভাঙে। বাবা তো এমন নয়। চা খেতে খেতে দেখল, বাবার মুখখানি বিবর্ণ, কালিমাপূর্ণ, মায়ের মুখ গম্ভীর, ভায়েরা কেউ সামনা-সামনি নেই। বিদায়মুহূর্তে তো এমন হয়না কোনোদিন।

বাবা জামাকাপড় ছাড়লেন। অফিসে যাবেন। দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন। ডাকলেন: অবু, শোন।

তখনও অবনী তার বিশ্বাসে স্থির। বলল বল, কি বলছ?

বাবা বুকপকেট থেকে একটা একশ টাকার নোট বের করলেন। বললেন: তোকে টাকাটা দিতে পারলাম নারে। নীরবতা। একটু পরে দুর্বলগলায় বললেন: দেখি, কি করা যায়। আমি চেষ্টা করছি। নে, এটা রাখ।

অবনী নিরুত্তর, হতবাক। সে কোনো প্রশ্ন তোলে না এখন। অবনীর দ্বিতীয় সত্তাটা বলল কি হোল, দেখলে? টাকা পেলে?

মুক্তার কাল্পনিক মুখ। তার দৃঢ় উচ্চারণ কাল রাতে তোমাকে কি বলেছিলুম। তখন তুমি বিশ্বাস করলে না আমার কথা, বিরক্ত হলে আমার উপর।

বাবা অফিসে যাবেন। অপেক্ষমান। অবনীর উত্তর ও টাকাটি গ্রহণের জন্যই যেন প্রতীক্ষমান। অথবা অবনী শহরের কর্মস্থলে যাওয়ার আগে যেমন বাবাকে প্রণাম করে, সেই প্রণামটুকু গ্রহণ করে যাবেন এমন ভাবনায়।

অবনী নোটখানি বাবার পায়ের সামনে রেখে প্রণাম করে বলল এটাও তুমি রেখে যাও বাবা। তোমাদের সংসারে কাজে লাগবে।

…কিছু না। অবনী চিরকালের অবনী। অবনীর অপর নামই তো ধরিত্রী। সর্বংসহা। সে প্রণাম করল বাবার পা ছুঁয়ে। কোনো কথা বলল না। টাকাটা নিল। বোধ হয় বাবার পায়ে হাত দিয়ে মনে মনে সে এমন কথাই বলতে চেয়েছিল। বলেনি। অবনীরা কোনোদিন এমন বলে না। শুধু মুহূর্তের জন্য ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল তার চোখ দুটি।

সংসারে এমন ঘটনা তো ঘটে থাকেই। অন্যের মত তার কোনো দাগ থাকে না। অবনী ফিরে এল, মিস্ত্রির অপমান গায়ে মাখল, কাঁদল গোপনে। খুব মিনতি করে মিস্ত্রীকে সত্য বলল। বলল আমার কারখানার পি. এফের টাকাটা বেরোলেই তোমার টাকাটা দিয়ে দেব। সত্যি এখন আমি খুব অসুবিধায় পড়েছি।

মিস্ত্রী ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলল টাকা দেবার মুরোদ নেই আপনার তবে ঘর করার এত সখ কেন? আমাকেও তো কুলি কামিনকে পয়সা দিতে হবে। বললাম আপনাকে, আমাদের গরব আছে, এখন টাকাটা দিলে বাথরুমটা বাকীতে করে দেব। আপনার কোনো কথার ঠিক নেই। ভদ্রলোকরা শুধু নামেই ভদ্রলোক। তা শুনুন, আমার কিন্তু তিনদিনের মধ্যে টাকা চাই। গয়নাগাঁটি বিক্রী করে, যেনা করে হোক আমার টাকাটা দিয়ে দিন। আর আমি আপনার কাজ করব না। কথার ঠিক নেই—এমন লোকের সঙ্গে কি কাজ করা যায়?

একটুখানি বিচলিত অবনী বলেছে: ঠিক আছে, পরশুদিনই তুমি টাকা নিয়ে যেও।

অবনী নিজের বিয়ের আংটি ছেলের দুধবালা বিক্রী করে মিস্ত্রীর দেনা শোধ করল। অন্যান্য অলংকার আগেই বলে গেছে। ঠিক তার দশদিনের মাথায় পি. এফের আঠার হাজার টাকার চেক এল অবনীর। টাকা তুলে সব বন্ধুদের দেনা শোধ করল। খবর পেয়ে কণ্ট্রাকটার ভাই এল বাড়ী থেকে। বলল বড়দা, তুমি যদি তিন হাজার টাকা দাও, তাহলে আমার চাকরিটা হয়। বাবার ভলান্টিয়ার রিটায়ারমেন্ট করে। আমি মাস-খানেকের মধ্যে বিল পেলেই টাকাটি ফেরৎ দিয়ে দেব।

অবনী বলল কেন, তোর কণ্ট্রাকটারির টাকা নেই? সামান্য এক

বাবার টাকাও তোমরা সবাই মিলে শলাপরামর্শ করে বাবাকে দিতে দিলনি। আমি জানি, বাবা অমন নয়।

…না,' অবনী মুখে কখনও এসব বলতে পারে। মনে মনে বলেছে। চারহাজার টাকা কিস্তি ছিল দেনা শোধ করার পর। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করে কিস্তি ভেঙে টাকাটা দিল অবনী। তারপর অনন্ত সময় কাটল, টাকা ফেরৎ এল না। তাদের চাকরি হল, বিয়ে হল, অবনীর নিজের তৈরী করা ঘরের নির্দিষ্ট রুমটি অধিকার করল তারা। এখন অবনী বাড়ী গেলে তার স্থান বারান্দায়।

অবনী মাসিক একবেলার বরাদ্দ নিয়ে বাড়ী আসে এখন। আজ এসেছে। অবনীর তালিকায় ছেলে খুবই অসুস্থ, তাকে কোলকাতার ডাক্তার দেখানো হয়েছে, ফল হয়নি। ভেলোর নিয়ে যেতে হবে। অবনীর ভায়েরা অবনীর কাছে একহাজার টাকা চেয়েছে। কিন্তু সার্বিত অবনী এখন নিঃস্ব। কিছুদিন আগে মায়ের গলব্লাডার অপারেশন হয়েছে সেই ঋণ শোধ হয়নি কর্মক্ষেত্রে। তাছাড়া আর বন্ধুবান্ধবের কাছে হাত পাততে ইচ্ছে করে না। বাবা পি. এফ গ্রাচুইটি মিলিয়ে প্রায় দুলক্ষ টাকা পেয়েছেন। তার কিছুটা ছোট বোনের বিয়ে দিতে খরচ হয়েছে, বাকীটা কন্ট্রাকটাদিতে। ভায়েদেরই।

…বাঁধের কালভার্টে এসবই ভাবছে অবনী। এই বাঁধটি তার খুব প্রিয়। ভালোবাসার ঠাঁই। গ্রামের বাড়ীতে এলেই বাঁধ তাকে টানে। দিগন্ত পর্যন্ত ছুঁয়ে থাকা মেঘের সারি, বকেদের উড়ে যাওয়া, সূর্যাস্ত, ইত্যাদি দেখতে দেখতে কখন রাত নেমে আসে অবনীর কল্পনা, সিদ্ধান্ত সে বাঁধের শিয়রে বসেই করে নেয়।

এখন আর বাবার হাতে টাকা নেই। মুক্তা বলেছে তোর নিজের পাওনা টাকাটা চাইবে না? ব্যাঙ্কে থাকলে ঐ টাকাটা ডবল্ হোত। আমাদের কাছে পাওয়ার সময় সবাই আছে, হাত উপুড় করতে কেউ পারে না।

কয়েকদিন আগে নিজের কাজে মেজো ভাই এসেছিল কলেজে। অবনী বলেছে আমিও বহু টাকা পাব। আমাদের কেস নিয়ে কায়দাদা হলেই। তখন তোদেরও প্রয়োজন হবে আমাকে। অবশ্য ভাবিস না, ঘরে টাকাটা না দিলে টাকা জোগাড় হবে না। চাইলেই পেতে পারি, ইচ্ছে হয় না। সম্মানের ব্যাপার আছে একটা।

মেজো ভাইটি আপাতদৃষ্টিতে ভালো। সে ফুটায়ের চাবি বোঝাে বোঝাতে বলেছে এসব সেন্টিমেন্ট তুলছিস কেন? তুই বাড়ীতে আয় না দেখি, কি করা যায়।

অবনী ভাবছে। সংসার, মানুষ, লোকজন, বন্ধুবান্ধব। সবই যেন স্নে মুখায় হিরন্ময় সূত্রে বাঁধা। পারাপার নেই। যদি এবারও না দেয়? তাহলে অবনী আর কোনো কম্প্রোমাইজ করবে না, সম্পর্ক শেষ।

এই মুহূর্তে অবনী বড় একা, নিঃস্ব, তুমুল ভাবনায় ক্ষতবিক্ষত। বইছে। কোলাহল তুলছে রক্তনদীতে। মনে হচ্ছে জোয়ারের টান।

··· : প্রত্যাখ্যাত, নির্লজ্জ অবনী, তুমি আবার এসেছ? চলে যাও।

: কিন্তু আমার যে উপায় নেই। গয়নাগাঁটিও নেই যে বিক্রী করব বন্ধুদের কাছে অনেক হাত পেতেছি। তারা জানে আমার আর্থিক অবস্থা ভালো। আর পারব না। গতবছরও মায়ের অপারেশনের সময় ধা করেছি।

: তাহলে তুমি জাহান্নামে যাও।

অবনীর প্রথম সত্তা : এই শেষবার। আর নয়।

অবনীর দ্বিতীয় সত্তা : তুমি নির্লজ্জ। তুমি আবার চাইবে।

সারারাত বিনিদ্র কাটল অবনীর। বলতে পারল না নয়, বলল না স্মৃতি হিরন্ময়, সেই স্মৃতি আবার লজ্জায়···লজ্জায়।

সকালে যাওয়ার সময় বাবা মাকে যথারীতি প্রণাম করল অবনী। বলল আমি যাচ্ছি। মা অপারেশান করার পর এখন স্নেহময়ী। বলল হঠাৎ এসেছিলি, কেন, বললি নাতো।

উদাস উত্তর করল অবনী : এমনিই।

অবনী ফিরে এল। মুক্তা আর প্রশ্ন করল না। ঘরের ভিতর শীতল হতে হতে অবনী শুনল, একটা কুকুর কাঁদছে। অবিকল মানুষের বাচ্চার মত

মুক্তাকে জিজ্ঞাসা করায় মুক্তা বলল অসময়ে বাচ্চা হয়েছিল, সেগুলো মারা গেছে, তাই।

অবনী শুনতে লাগল সেই শব্দ। একই কথাকে। একটু একটু করে সময় পার হল, সূর্য উঠল চাঁদ ফুটল, জোনাকী জ্বলল, তারারা মিট মিট করতে লাগল অবনীর অস্থির আকাশে। মানুষজনের মুখচ্ছবি, যৌবনের অস্থির গতি শুরু হল না।

শুধু অবনী ভিতরে ভিতরে রূপান্তরিত হয়ে গেল অন্য এক অবনীতে। হৃদয়ের আলো ফেলে ফেলে সে দূর দূরান্ত পর্যন্ত খুঁজতে লাগল সারা মনোভুবন—যদি একজনের গায়েও সেই আলো ঠিকরে আসে।

…না, এসব অবনীর দ্বিতীয় সত্তার কল্পনা। না চাইতেই বাবা তার হাতে এবার এক হাজার তুলে দিয়েছেন। মা ও ভাইদের সামনেই। নিঃশব্দে।

তখনই অবনী এক অন্য মানুষ 'আম-আদমী'। তার পৃথিবীতে সব আছে, সবাই আছে—কষ্ট করে খুঁজে নিতে হয় শুধু। না পেলেও বিশ্বাস হারাতে নেই।

রক্তের সম্পর্ককে তো অবনী কোনোদিন মুছে ফেলতে পারবে না। রক্তের ঋণও যে অপরিশোধ্য।

সূর্যের ভাগ

সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠ্য মাসের তাপে ঝিমিয়ে নিঃশব্দ হয়ে আছে চারিদিক। তিনতলা স্কুলবাড়ির কাছাকাছি কেবল মৃদু গুঞ্জন হচ্ছে। নির্জন রাস্তার পাশে, অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বসে অনাদি ভাণ্ডারীর ঝিমুনি আসছিল। চুপচাপ চারপাশের মধ্যে, স্কুলের মৃদু গুঞ্জন ও অশ্বত্থ পাতার ঝিরঝির শব্দ যেহেমনে ক্লান্তির আমেজকে কেমন গাঢ় করে তোলে। যেমো শরীরে ছায়া ও বাতাস চোখে ঘুম আসে।

টিফিনের সময় হয়ে আসছে। সতর্ক থাকার চেষ্টা করে ভাণ্ডারী। আগে দু'একদিন ঘুমিয়ে পড়েছিল। চানাওয়ালারা ডুলে দেয়নি। মেয়েরা এসে ডাকতে ঘুম ভেঙেছিল। হাতে ঠেলা আইসক্রিমের গাড়ি দাঁড় করানো সামনে। ফোঁটা ফোঁটা রঙীন জল পড়ছে।

ব্যানার্জি বুক স্টলের ছেলেটা এসেছে কয়েক মিনিট আগে। অনাদি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কত হল ঘড়িতে?

একটা পঁচিশ। এখনও বিশ মিনিট ব'লো।

অনাদি আবার পিঠে গামছা দিয়ে পাঁচিলে হেলান দেয়। বিরাট একটি বাগান বাড়ির পাঁচিল এইটি। রাস্তার অন্যপাশের একটি পুকুরকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে এ পাশের পাঁচিল দক্ষিণ দিকে কয়েক হাত এগিয়ে বাঁক নিয়েছে। ব্যানার্জী বুক স্টল বাঁকের ঠিক মাথায়। স্কুলের গেটের পাশে। উত্তর দিকে পাওয়া দ' দেড়শ' হাত লম্বা। রাস্তার দিকের অংশে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক ও সরকারের তুমুল বিরোধ।

জায়গাটি একান্ত বিচ্ছিন্ন ধরনের ও নির্জন। বাগানের ভিতরের অশ্বত্থ গাছটি রাস্তায় ছায়া দিয়ে স্কুলের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে। স্বল্প পাতা কাঁপান ঈষৎ চঞ্চল নম্যতা, এই নীরব রাস্তাটির নিবিড় অভিমানের সঙ্গে কোথায় যেন মিশে গিয়েছে। যেন গরম পিচের অঙ্গে. আলোছায়ার চিক্‌রি কাটা দাগগুলি অস্থির।

রাস্তার উত্তর দিকের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটি ছেলে। পাশে সাইকেল।

স্কুলের ছুই বা তিনতলার দিকে তাকিয়ে হাসছে। রুমাল মুখে বুলিয়ে হাত তুলে নাড়ছে।

চোখে ঘুমের টানকে অনাদি মাথা ঝাঁকিয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। উভয়ে কটাক্ষ পাত করে মনে মনে বলে, এই দুপুরেও পেয়েছে।

অনাদি মনে মনে কেমন রেগে ওঠে। দুনিয়ার অধিকাংশ জিনিসেই যেন অশ্লীলতার ছাপ মারা; সন্দেহজনক।

মুখে চড়া রোদ পাতা ঠিকরে আসছে। অনাদি একপাশে গাছ ছায়ার সরে বসে। ঝিমুতে থাকে চোখ বুজে। নৈমিত্তিক সকালে সেই সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে ওঠা। বস্তির ঘিঞ্জি গাদাগাদি করা ঘরগুলি পেরিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় আসা। ডিমের কুসুমের মতো হলুদ নরম সূর্যের দিকে তাকিয়ে একবার নমস্কার। তারপর চোখ বুজে এক মিনিট বন্দনা। এরপরই সংসারে ঝাঁপিয়ে পড়া। দোকান বাজার ও টুকিটাকি কয়েকটি কাজ সেরে, আইসক্রীম কারখানায় ছোটা।

প্রতিটি দিনের গহ্বরে ঢেলে দিতে হয় প্রচুর পরিশ্রম। হাত পা এবং গলায় পেশীগুলি তাপ বিকিরণে ক্লান্ত হয়ে পড়লে স্কুলের টিফিনের আগে একটু শক্তি সঞ্চয়।

সবার অলক্ষ্যে পাঁচিলের পাশে একটি থান ইটও আছে বসবার।

ও এরা আইসক্রীমবালা।

অনাদি ধড় ক'রে চোখ খুলে খুলে দেখে, সেই ছেলেছুটো। পিঠে লাগান গামছা কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়ায় সটান। বাক্সর উপরে কাঠের ফলকে বিজ্ঞাপনের নমুনা দেখছে ওরা। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে কোনটা নেওয়া যায়।

ভ্যানিলা কাপ দোব। এক টাকা চার আনা করে। বাটিও নিতে পারেন। আড়াই থেকে চার টাকা পর্যন্ত আছে।

অনাদি বাক্সর ছোট চৌকো ঢাকনা খোলে। মুখে এসে আদরের মতো লাগে ঠাণ্ডা বাষ্প। ছুটো আইসক্রীম বের করে দেয় অনাদি।

ছেলেছুটি দাঁড়িয়ে আইসক্রীম খাচ্ছে। আর ছুই তিনতলার দিকে তাকিয়ে দেখছে। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। একজন চানাওয়ালা মাথায় বোড়া, হাতে বয়ৌনি নিয়ে চলে গেল। অনাদি চানাওয়ালার

খোড়ার দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে। পয়সা বুঝে নিয়ে স্কুলের গেটের দিকে এগিয়ে যায়।

আজ শুরুটা ভালই হ'ল। ব্যানার্জী বুক স্টলের তপন বলল হেসে।

ভাল! হ্যাঁ, ভালই বটে। অনাদি গেটের কাছে তার আইসক্রীমের গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। হাত কাটা খাঁকি জামা আর প্যান্ট পরে আছে সে। জামায় গোটা চার ঢাকা আঢাকা বড় বড় পকেট। একটা বিড়ি দাঁতে চেপে ধরে, দেশলাই জ্বালাল অনাদি। চোখ তুলে একবার আকাশের দিকে তাকাল।

গনগনে উঁটার মতো অগ্নিশিশুর জন্তে চকচকে নীলচে ইস্পাতের মতো লাগছে আকাশ। হাওয়া বড় ক্লান্ত, কোনো টান নেই।

না থাক। বড় বৃষ্টি হলে বিকেলের দিকে যেন হয়। সবের গোড়াগুড়ি। সকালে জ্বলতে জ্বলতে উঠুক অগ্নিশিশুটা। অনাদিরও রোদ লাগে। অন্তদের মতো না। খুব রোদে ঘামতে ঘামতে শরীরে যেমন একরকম কাঁপুনি আসে, শিরশির করে ওঠে গা, অনাদির তেমন আনন্দ হয়। আগুন যত ছড়িয়ে যায় পৃথিবীতে তত খুশী হয়ে ওঠে ওর মন। মানুষগুলো যেন বাইরে বের হ'লে কুকুরের মতো হাঁপায়। এই চড়া রোদে বরফের সওদা করে। বরফের গাড়ি ঠেলা জীবন অনাদির। মৃত্যুর চেয়েও হিম ঠাণ্ডা ওর মাল। সূর্য তাই ওর দেবতা। নিচু নিচু মেঘলা আকাশে থাকে ওর বিরহ আর সংশয়। ঠাণ্ডা হাওয়া বইলে ওর গরম লাগে। বুকের ভিতর গরম নিঃশ্বাসের পুঞ্জীভূত চাপে আইটাই করে মন।

অনাদি ঠাণ্ডার কারবারী। মৃত্যুকে ও ঘেন্না করে। মাথার চাঁদির ওপর যখন গলে পড়ে আগুন, শরীর যেন ঝলসে যায়, শক্তিক্ষয়ের নিদারুণ ক্লান্তির মধ্যে অদ্ভুত রকম উত্তেজনা আসে। আনন্দ জাগে।

ভ্রু'ছুটি তার ঘামে বিজবিজ করছিল। গামছা দিয়ে মুছে নিল। আর এই সময় টুকরি মাথায় বাঁক পার হয়ে এগিয়ে এল একটি ছেলে। একটু চেঙা ধরনের একহারা। পুরু দুই ঠোঁটো মাঝখানে উঁচু দাঁত বেরিয়ে আছে। চেক লুঙ্গির উপর ময়লা একটি ফুল শার্ট। পায়ে সবুজ রঙের হাওয়াই। মোটা করে তেল লাগান চুল চেপে বসে আছে মাথায়।

স্কুল বাড়িটার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিল ও। আগড়পাড়া বালিকা বিদ্যালয়। তারপর একটু সংশয় মেশানো অপ্রস্তুত চোখে, একবার

বইয়ের দোকানের সাইনবোর্ড আর একবার অনাদির দিকে তাকাল। যেন একটু হাসারও চেষ্টা করল। কিন্তু অনাদির ভাব-ভঙ্গিতে চুঁইয়ে পুড়ে গেল যেন পা।

অনাদি আপাদমস্তক ছেলেটিকে দেখল বিরক্তি আর সন্দেহে। চোখ কুঁচকে অল্পক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করল। তারপর তপনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, দেখেছ। দেখো এনাকে।

বলে আগন্তুকের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, কোথায় বাড়ি ভাই! তাচ্ছিল্যের বাঁকা হাসিতে দাঁত দু'পাটি চকচক করছে ওর।

লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে।

লাইনে। তাও আবার লক্ষ্মীপুরে নয়। একেবারে লাইনে। তাচ্ছিল্যের বাঁকা হাসি এখন ওর লাগচে চোখদুটিতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখানে তো মাল বেচা চলবে না।

অনাদি ওর কাঠের টুকরির দিকে আগেই তাকিয়ে নিয়েছে। ছোট বড় আচারের সোম।

ছেলেটি কোনো উত্তর করল না। কথার সত্যাসত্য যাচাই ক'রে নিচ্ছে যেন নীরবে। যেন আর সব ভুলে গিয়েছে, এ মনভাবে তাকিয়েই থাকল।

ইতিমধ্যে চানাওয়ালা এসেছে আরও একজন; ঘুগনির হাঁড়ি মাথায় একটি আধবুড়ো, শশা নিয়ে মাঝবয়সী একটি পশ্চিমী বউ। অনাদির আশেপাশে তারা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। মাথায় সওদা নিয়ে। ব্যানার্জী বুক স্টলের তপনও দরজার কাছে এগিয়ে এসেছে।

মাল কেনা-বেচা এখানে হবে না। এদের জিজ্ঞেস ক'রে দেখতে পার। রোদে দাঁড়ান চারপাশের মানুষগুলিকে সে সাক্ষী মানল। এবং এমনভাবে জিজ্ঞেস করলে,—যার তেমন প্রয়োজনও নেই, ঐ একই উত্তর পাবে আগন্তুক।

তাছাড়া খোলা ঐসব আচার আজকাল বিক্রী হচ্ছে না। ওতে ভ্রাগ মেশান থাকে। তপন বলল খানিকটা উত্তেজিত গলায়। এখ সত্যি যেন বলছে সে, গলায় সেই নিবিড় বিশ্বাসের জোর ও জেদ।

রঙটি কালো হ'লেও তপন বইয়ের দোকানে কাজ করে। পেটে খানিকটা বিদ্যে আছে। চানাওয়ালা আইসক্রীমওয়ালা বা শশাওয়ালীরা নিজেদের মূর্খ বলে জানে। তপন ব্যানার্জী বুক স্টলের কর্মচারী মাত্র। কিন্তু 'লিখেপড়ে'

বাবু। পার্ট শার্ট গায় বা হাতের কালো ব্যাণ্ডের ঘড়িটি যেমন, মাথার টেরিটিতে পর্যন্ত পাতলা ছিমছাম পুরুষের শ্রী আছে। অনাদি তাই তপনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। সেই হাসিটিই, একটু বাড়িয়ে ঘুরিয়ে দেখায় আগন্তুককে। যেন আত্মপ্রসাদ জিঘাংসা এবং আত্মসমর্থন ও জিগীষা মিশে থাকে হাসিতে।

অনধাদ্যের কারণে আচার বিক্রী কোথাও হচ্ছে না। শহর এবং শহরতলির কোথাও না। সরকার সেই রকম সার্কুলার জারি করেছে। তপন বুঝিয়ে বলছে সেই কথা। কথার একরকম জোর আছে। আশপাশের চারটি প্রাণী তপনকে অযথা আগন্তুককে দেখছে। মাথায় ঝোড়ার ছায়া পশ্চিমী বউটির মুখে। এক হাতে ধরে আছে ঝোড়াটি। চোখ দুটি তার নশ্বির হলেও ও যেন চোখে আগন্তুককে নিয়ে কী ভাবছে। মাঝবয়সী ঘুগনি ওয়ালার নাকের পাশ দিয়ে দুটি গভীর ভাঁজ আছে। সামান্য হেরফেরে মুখে হাসি ও বিরক্ততা আসে। সহজ পার্থক্যের উপায় নেই। ঘামে চকচক করছে কুচকুচে কালো রবি; সেও চানার ঝুপড়ি নামিয়ে দু'এক কথা বলেছে। কিন্তু অনাদির কোনো তুলনা নেই। অনাদি যখন কথা বলে, পাশের বিক্রেতা সহকর্মীদের সমর্থনের চাওর যেন বাচনভঙ্গী দিয়ে ছুঁড়ে যাবে। হাসে যখন, সবাইকার ক্রুর তাচ্ছিল্য যেন মিশিত হয়ে ফেটে পড়ে।

আগন্তুক সবচেয়ে ঘাবড়ে যায় অনাদিকে দেখে। ওর রোদের ধরণে। তবুও ও হাতের বয়োনিটি নামায় মাটিতে। তার উপর মাথায় কাঠের টুকরি মুখের ঘাম মুছতে মুছতে দেখে, আর একজন এল।

এক কাঁধে ঝুলে আছে একটি চকচকে টিন। অন্য কাঁধে কাগজের ব্যাগ। মুড়িওয়ালা গলন্ত রোদের নীচে দাঁড়ান এই ছোট্ট ভিড় দেখে নেয়। একবার নবাগতর দিকে তাকায়। তপনের দিকে ঘুরে বলে, কী ব্যাপার!

যারা যারা এসেছে, আগন্তুকও তাদের মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছে চোখ কুঁচকে। অন্তরা চেহারায় পোশাকে তার মতো। মুড়িওয়ালাই যেন মুড়ির মতো—একটু সৌম্য।

তপন উত্তর দিতে শুরু করেছিল; এক হাত তুলে আগন্তুককে দেখিয়ে:— অনাদি ওর গলা ছাপিয়ে বলতে শুরু করে। ট্রেনে যাকে তাকে মাল বেঁচতে দেয়? হাটে গেলে বসতে পারব আমি। রাস্তায় কোনো মালিকানা নেই। পথে পথে ফেরী করোগে যাও। কোনো লাইসেন্স লাগবে না।

আমরা এখানে করে খাই। এখানে চলবে না। তুমি রাস্তা দেখ।

আগন্তুক হাতের গামছাটি কাঁধে ফেলে আনমনে। সে দাঁড়িয়ে আছে একদিকে। পিছনে আর কেউ নেই। ওপাশে তার সামনে আইসক্রীম-ওয়ালা। তাকে ঘিরে গেছে কয়েকজন। আর একেবারে ওপ্রান্তে এক-থাক্ ইটপাতা একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তপন।

সহসা ধাক্কায় এক ধরনের সংশয় ফুটে আছে আগন্তুকের মুখে। আর মনের গভীরে নিঃশব্দে ফুঁসছে এক রকম রাগ। অদ্ভুত রকমের অসহমর্মি রাগ। কিন্তু প্রকাশের কোনো উপায় নেই। তাই কথা না বলে চুপ করে আছে।

একজন চানাওয়ালা হাসছে; নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে। আর একজনের চোখের কোলে সুরমা লাগান। মাথায় বিরাট বোঝা নামিয়েছে সে। নীলচে প্লাসটিকের ঢাকা সরিয়ে সিদ্ধ আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে। কাজের ব্যস্ততা সেরে দিচ্ছে অভ্যাস। তপন হাত পা নেড়ে কথা বলছে। পশ্চিমী বউটি পশার ঝুড়ি নামিয়ে মাটিতেই উবু হয়ে বসেছে। ঘোমটা টেনে ঠিক করে, রঙীন শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে সহবত করে নিচ্ছে। পশা ছাড়ানো লম্বা বিনুকের চেয়েও কপালের টিপটি ওর উজ্জ্বল। মধ্যে মধ্যে ঝিলিক উঠছে।

কী হ'ল ভাই। বলতে বলতে অনাদি দু' পা এগিয়ে আসে। এতক্ষণ ওর মধ্যে ছিল ক্রুদ্ধ উদ্দামতা। সেইটিকে কঠিন ও ভারী করে, ধীর ও অহংকার করে নিয়েছে যেন। খারাপ কথা দু'টো শুনলে ভাল লাগবে? না, ঝামেলা হোক—সেটা চাও! চলো না, হটো হটো।

অপমানের অবরুদ্ধ জ্বালা পাকিয়ে উঠছে মনে। কিন্তু জীবন ভারী নিষ্ঠুর। জীবন যাপন যেন অহংকার শত্রুর সঙ্গে পাঞ্জা। আর অপমান! পাথর দিয়ে জীবন ওর অপমান আর মনকে থেঁতলে দিয়েছে বারবার। ঐ জ্বালার একরকম যন্ত্রণাহীন উপলব্ধি আছে। মান এত সহজলভ্য না যে অপমানিত হবে সহজে। অনাদির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আগন্তুক একবার উপরের দিকে তাকায়। টুকরো টুকরো দু' একটা কথা তার কানে আসছিল। রাস্তার দিকের জানলায় গরাদে গরাদে ঠেসে আছে কিছু উজ্জ্বল মুখ। ঐ তো খরিদ্দারের দল। মেয়েরা টক-মিষ্টি-ঝাল চাটনি খায় বেশী। জিভে ওদের দরকার পড়ে চড়া স্বাদের। বিশেষত কম বয়সে। আগন্তুকের

এইটি জানা। ছেলেদের স্কুলে চাটনি কাটে কম। টুকরির দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে তাবেও, সব শেষ হয়ে যাবে না তো।

অনাদি কখন ওর কাছে চলে এসেছে, ও খেয়াল করেনি। চিবুক কঠিন হাতে ধ'রে বলে, লাইন মেরো না যেন বাবা। কচি সুন্দরীদের গোলি খেওনা যেন। কেটে টুকরো টুকরো ক'রে দোব। বলে, ওর চিবুক নেড়ে দিতেই ও দিনকে সরিয়ে দের অনাদির হাতখানা।

হাতের ধাক্কায় একটা কাচের বয়াম মাটিতে পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

ওদিকে খুব দ্রুত তালে লোহার পাত পেটার আওয়াজ হয়। ঠিক ঢং ঢং করে না। যেন একটার গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর একটা। নিরবচ্ছিন্ন একটানা যান্ত্রিক আওয়াজ। অনাদি তার মধ্যে খিক খিক ক'রে হাসে। শশাওয়ালী আক্ষেপের পিচ কেটে হায় হায় করে। চোখে সুরমা লাগান চানাওয়ালা. যে এতক্ষণ আলু ছাড়াচ্ছিল, অনাদির দিকে কট কট ক'রে তাকিয়ে বলে, লেকিন কেঁও দিয়া কিঁউ। ইয়ে আচ্ছা নেহি হোতা। ইয়ে আচ্ছা কাম নেহি হ্যায়। আর বিড়বিড় করতে করতে ঢুকে যায় স্কুল কম্পাউণ্ডে।

অনাদির হাসি শব্দহীন হয়ে যায়। খোলা গেট দিয়ে মুড়িওয়ালা, শশাওয়ালী, একজন চানাওয়ালী ঢুকে পড়েছে স্কুলে। অনাদি যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে এমনভাবে বলে, কী করব। খুটমুট ঝামেলা করছে সেই থেকে।

মাথায় ছোট্ট ঝুড়িতে বিলিতি আমড়া ও পিয়ারা, কোলে ছেলে নিয়ে আসে এদেশী একটি বউ। একটু দেরী হয়ে গিয়েছে আজ। তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে আগন্তুকের কাছে এসে বলে, কী হ'ল ভাই, ভেঙে গেল!

মুখে একরকম ক্রুদ্ধ বেজার ভাব ক'রে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি। খুঁটিয়ে মুখ দেখার, দাঁড়িয়ে একটা কথা বলার সময় নেই এখন। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে একবার হাসে বউটি।

নিজের নিজের সওদা নিয়ে সবাই ঢুকে পড়ছে স্কুল কম্পাউণ্ডে। অনাদি আস্তে আস্তে স্কুলের গেটের কাছে আসে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে একবার। বউটি এই সময় অনাদিকে পেরিয়ে যায়। কাচের টুকরোগুলো রোদে চকচক করছে। কিন্তু অনেক বেশী চকচকে লাগছে গাঢ় খয়েরী রঙের আচার। ওতে যেন জীবন্ত চোখের মতো জেল্লা আছে। নিজের কাঠের

টুকরির উপর একহাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি। উঁচু দাঁত বার হয়ে নিচের পুরু ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। তার আশাময় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অনাদির দিকে।

রাগ দেখিয়ে চলে যাও না। অনাদি চেষ্টা করে একটু হাসার। তারপর ঘুরে এক পা বাড়াতে গিয়ে, তপনের দিকে ফিরে তাকায়। আজ আমরা গেট বন্ধ করে রাখব। আমি নরোত্তমকে বলছি। তোমাকে একটু মেনে নিতে হবে।

ব'লে ও দ্রুত নিজের গাড়ি ঠেলে ঢুকে যায় ভিতরে। চানাওয়ালারা মাল বেচতে শুরু করে দিয়েছে।

শোন শোন। দোকানের মধ্যে থেকে তপন ওকে ডাকে। অনাদি কিন্তু ফিরে তাকায়ও না।

বই খাতা কাগজ পেন পেনের রিফিল বেচে এখানে দোকান চলে না। দোকানের ভিতরে নিচু মোড়ায় বসে থাকলে একসার প্লাসটিকের জারের আড়ালে তপনের কালো চুলও চাপা পড়ে থাকে। পাড়ার লোকের দোকানে বড় কম। একপাশে স্কুল ও স্কুলের মাঠ, অন্য পাশে বিরাট বাগান বাড়ির পাঁচিল, তার একপাশে পুকুর। এরই মধ্যে উত্তর দক্ষিণে সংকীর্ণ রাস্তাটি একটু জায়গা পেয়েছে। পাড়ার জনবসতি থেকে দোকানটি বিচ্ছিন্ন। একখানা ইঁটের পাঁচিল দেওয়া টিনের একচালা ঘর। বেশ নিচু। ঘামে জামা গেঞ্জি ভিজে যায়। বুকের দু'টো বোতাম খুলে, ঘামে সিদ্ধ হতে হতে তপন তবু বসে থাকে। আসার সময় প্লাসটিকের জাগে জল আনে। সেটাও গরমের দিনে এমন গরম হয়ে যায়, খেয়ে কোনো তৃপ্তি আসে না।

টিফিনের পর অনাদি এসে বলে, মরবে গরমে। আরে ভাই, আমি ওতে বাঁচি। আগে একটা আইসক্রীম ফেলে রাখ। একটু পরে জলটা খেও। না হয় চুষে খাও একটা। নাও ধরো এইটে।

সিদ্ধ হলেও তপন বসে থাকে। প্লাসটিকের জারগুলোয় আছে বিভিন্ন রকমের বিস্কুট, হরেক রকমের লজেন্স, চ্যাপ্টা কাঠির মাথায় আঁট ক'রে লাগান সেলোফেনের মোড়ক দেওয়া সস্তা আচার, কম দামী টক-মিষ্টি-ঝাল 'গুলি' আচার। প্লাসটিকের কাগজে মোড়া 'বন' রুটি। বইয়ের মরশুম ছাড়া দোকান চলে এই সবে।

গেট বন্ধ ক'রে দিলে বাইরে আসতে পারবে না মেয়েরা। তপন দীর্ঘশ্বাস ফেলে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। আগন্তুকের কাছে এসে বলে, কী চাও তুমি! তোমার জন্যে যে আমারও ক্ষতি হচ্ছে সেটা দেখবে কে!

আমি রাস্তায় আছি।

রাস্তায় আছ! অন্য দিকে যাও; অন্য রাস্তায়।

কেন! এই রাস্তার আপনি মালিক আছেন!

হ্যাঁ আছি, মালিক আছি। আর কোনো কথা আছে?

আগন্তুক টুকরির দিকে চোখ নামিয়ে বলে, আমার এক শিশি আচার ও ভাঙল কেন?

বেশ করেছে ভেঙেছে। আরও ভাঙবে। তুমি যাবে কিনা বল। না হ'লে তোমার মাল সব ঐ পুকুরের জলে ফেলে দোব।

গলার শিরা ফুলে ফুলে উঠছে। মারমুখী হয়ে তপন একটা ঘুঁষি তোলে।

স্কুলের গেট সাধারণত রোজ খোলা থাকে। আজ এখনও আছে। দু' চারটি মেয়ে তপনের দোকানে এসেছে। কয়েকজন আচারের লোভে এসে দাঁড়িয়ে ঝগড়া দেখছে।

এই বিলীতি আমড়ার আচার আছে।

কুলের আচার না যে ওইটা!

ঈশ! আমের আচারের বয়ামটা কেমন ভেঙে গেছে দেখ!

মেয়েগুলি পায়ের দিকে তাকায়। তপন তো ভাঙা কাচের টুকরোর মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। কাচের টুকরোর কাছ থেকে অন্য পাশে সরে যায় ওরা। একজন বলে, ও আচারওয়ালা, আট আনার ঐ আচারটা দাও তো।

আচারওয়ালা অদ্ভুতভাবে তাকায়। আট আনায়। বিশ পঁচিশ তিরিশ পয়সায়, বেশী হ'লে আট আনায়, এইভাবে থলির মধ্যে বিশ পঁচিশ তিরিশ অথবা চল্লিশ টাকা জমে। আর ঐ স্বল্প লভ্যাংশের মধ্যে দাবি নিয়ে উঁকি দেয় মা সহ তিনটি মুখ।

তপন খুব রাগের সঙ্গে মেয়েগুলির দিকে তাকায়। আচারের কি বিশ্রী লোভ ওদের! আগন্তুক বয়ামের পাশ থেকে বর্গাকার কাগজের টুকরো বার করে। বয়ামের কাচের ঢাকনায় হাত দিলে, তপন চীৎকার ক'রে বলে, কী বলেছি, মনে নেই!

আগন্তুক মুহূর্তের জন্তে যেন একটু থতমত খায়।

অস্পষ্টভাবে না, তপন নিশ্চিন্তভাবে জানে, আচারওয়ালা বসলে তার বিক্রী কমে যাবে। এমনিতেই খুব বেশী টাকার বিক্রী হয় না। কিন্তু মেয়েগুলির সামনে ওকে গালাগালি করতে নিজেরই সম্মানে লাগে।

মেয়েগুলি তপনের দিকে কেমনভাবে যেন তাকিয়েছিল। যেন—আহা! আমরা আচার খাব, তাতে তোমার কী! এবারে আচার নিয়ে তপনের দিকে তাকিয়ে মুখের একরকম বাঁকা ভঙ্গী করে।

মেয়েগুলির হাতে আচার দিয়ে, আগন্তুক তপনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। তপন ভেতরে ভেতরে আরও জ্বলে ওঠে। ইচ্ছে হয় একটা কংক্রীটের স্ল্যাব ছুঁড়ে মারতে ওকে।

পায়ের নিচের কয়েকটা কাচের টুকরোয় লাথি মেরে বলে, তুমি যাবে কি না!

আগন্তুক তাকিয়ে দেখে, তপনের মুখ রাগে কঠিন। কালো রঙ ফাটিয়ে থমথম করছে রাস্তাটা। কিন্তু যাবার জন্তে আচারওয়ালা আসে নি। জীবন একটি অতি পিচ্ছিল গতিশীল রোলারের মতো। হাল্কাভাবে পা ফেললে ছিটকে গিয়ে পড়তে হবে। আত্মীয়তার বন্ধন সহজ নয়। তাছাড়া ও দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। যাবে কেন!

তপন ছাড়বে না। নিজের এলাকায় ওর দোকান। বিক্রীর পরিমাণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার সুনাম। সুনাম শুধু না। সেইটি না হলেও চলে।

বিক্রী যদি খুব কমে যায়! তার সামান্ত টাকার কাজটাও যদি না থাকে। প্রায় বেকার থাকার সামিলই তো তার চাকরি। নিজেকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিতে তপন চাইবে কেন!

রুখে এসে ও দাঁড়ায় একেবারে আচারওয়ালার মুখের কাছে। দু' চারটে মেয়ে যে ওকে ডাকছে দোকানে, সে খেয়াল নেই। যাও, চলে যাও তুমি।

আগন্তুকের গলায় আক্ষেপের একটু ধ্বনি ও সামান্ত কোলাহলে তপন পিছন ফিরে তাকায়।

নরোত্তম স্কুলের গেট বন্ধ ক'রে দিচ্ছে।

তপন ছুটে গিয়ে আটকায় ওকে। ও সব চলবে না। সবাইকে বাইরে বের ক'রে দাও। আমি গায়ে আল দেওয়ার জন্তে দোকান খুলিনি।

কী! নরোত্তম চোখ কুঁচকে তাকায়।

তখন বোবে ভাণ্ডারী ভিতরে গিয়ে ঘোঁট পাকিয়েছে। গেট খোলা-না-খোলাটা যেন ওর মর্জি।

ওদের মাল বেচতে বারণ করো। সবাইকে বাইরে পাঠিয়ে দাও।

নরোত্তম বিরক্ত হয়। ভাণ্ডারীরা ওকে গেট বন্ধ করে দিতে বলেছিল। তখন বলছে ওদের বাইরে বার করে দিতে। গেট বন্ধ করা চলবে না। নতুন আচারওয়ালাকে একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে নেয় ও। বলে, তোমরা বোস। গেট খোলা রইল।

না। বাইরে পাঠিয়ে দাও ওদের আগে। তারপর গেট বন্ধ হবে। মাল বেচা কারুর চলবে না।

কী। নরোত্তম যেন কোনো কথাই শুনতে পায়নি এমনভাবে বলে।

তখন মৃদু ধাক্কায় ওকে ঠেলে ভিতরে যায়।

আচারওয়ালার কাছে মেয়েরা যাচ্ছে। ওর মাল বিক্রি শুরু হয়েছে যাত্রাতেই। কারুর মাল বেচা চলবে না। সবাই বাইরে আসবে। স্কুলের গেট বন্ধ থাকবে। বিক্রেতাদের ধর্মঘট করতে হবে।

তখন আগোছালোভাবে চীৎকার করে কথাগুলি বলে। প্রত্যেকের চারপাশে হুমড়ি খাওয়া ভীড়। বিক্রীর একটা চরম মুহূর্ত চলছে। ভীড় করে জিনিস কেনার সমস্ত স্বাভাবিক নিয়ম, এই সাময়িক বিশৃঙ্খলায় ছত্রাখান হয়ে যায়।

যেমন ক্রুদ্ধ আবেগের সঙ্গে চীৎকার করেছে, সেই একইভাবে তাড়াতাড়ি ওঠার তাগাদা দেয় সে।

আস্তে আস্তে বাইরে আসে সকলে।

চানাওয়ালাদের হাতে সিদ্ধ আলুর টুকরো ও লঙ্কাগুঁড়ো লেগে আছে। ঘুগনিওয়ালার হাতে ঘুগনির হলুদ দাগ। এদেশী বউটির কোলের বাচ্চাটি দুধের দাবিতে চেঁচায়।

তখন ও অনাদির মুখ রাগে থমথম করছে। যেন কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না এটা। ঘুগনিওয়ালা চুপচাপ। একজন চানাওয়ালা বিরক্তিতেও হাসছে। অন্যজনের,—যেন সুরমার সোহাগে,—কুঁচকে আছে চোখে। কী কারণে বলা যায় না। পশ্চিমী বউটির চোখদুটিতে কাতরতা। মুড়িওয়ালার টিনের ঝনঝন শব্দ ওঠে।

সবমিলিয়ে একটা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মতো জটলাটি গেটের এ'পারে আসে। গেটে চাবি দেয় নরোত্তম। তারপর চাবির মোটা গোছা দোলানো ঝনাৎকার আগিয়ে মেয়েদের ভীড় কাটিয়ে ও চলে যায়। গেটের উপর এসে পড়ে মেয়েদের ভীড়। চীৎকার করে তারা ডাকে। গেটের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে—কেউ কেউ আচার শশা চানা চায়।

মাত্র মিনিট দশেক টিফিন হয়েছে। আরও প্রায় কুড়ি মিনিট চলত বিক্রী। সেই কারণে কেউই সন্তুষ্ট নয়।

অনাদি পাড়ি করিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবটিকে বিসর্জন দিয়ে প্রশ্বাস নেয় অম্বিকেন না, দেখ। তারপর উচু গলায় চীৎকার ক'রে ওঠে চলে যাও তুমি।

এবেশী বউটির কোলে দুধ খাচ্ছিল বাচ্চাটি। অনাদির চীৎকারে চমকে যায়। ককিয়ে ওঠার ভূমিকা করে। মুখ থেকে স্তন বার করে দিয়েছে। চোখে অজানা আশঙ্কার ভয়। স্তন ছেড়েও মুখটা যাতে বুজে যায়নি। বউটি মাথায় আলতো চাপড় মেরে শান্ত করে ওকে। ঘাড় উচু করে প্রায় সমান উচ্চগ্রামে বলে, থাম। তুমি কতদিন এখানে মাল বেচছো।

সকলের উত্তেজিত অসন্তোষ হঠাৎ থেমে যায়। বউটির গলার শান্ত একরকম স্পর্ধা যেন আগের আকাশের উপর জলভরা মেঘ বিছিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ রোগা অস্বচ্ছল শরীর ওর। পরনের কাপড়টি ময়লা।

অনাদি থমকে প্রশ্নার্ত সন্দেহে তাকায় বউটির দিকে। স্কুলের উত্তাল হৈ-হল্লা নিস্তব্ধ এই ঘটনার উপর এসে কয়েক মুহূর্ত যেন আছড়ে আছড়ে পড়ে।

অনাদি থেমে থেমে বলে, কী বলতে চাও তুমি?

অন্য সকলে যেন নিজেদের বক্তব্যকে গোপন ক'রে শুনছে। তখন কী ভাবে কি করবে ঠিক করে রেখেছে। নিজে ঘটনার সামনে আসবে না আর। এদের উম্মাকে চাগিয়ে তুলবে কেবল। অনাদির উত্তেজনাকে যদি সকলের মধ্যে চারিয়ে দেওয়া যায়—যথেষ্ট। এক থাক ইঁটপাতা উচু জায়গা থেকে পায়ে পায়ে নেমে আসে সে। কয়েক হাত তফাতে আগন্তুক একই-ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে বয়োনির উপর কাঠের টুকরি। রোদ্দ পিছলিয়ে কাচের বয়ামগুলোর বাঁকা জায়গায় সাদা আগুন ধরে আছে যেন। মূর্তি আগের চেয়ে অনেক স্থির। কালো মুখটি রোদে ও দুশ্চিন্তায় আরও কালো লাগছে।

বউটি এক হাত ছেলের এলোমেলো রুক্ষ চুলে বুলিয়ে দেয়। অন্য হাত তুলে বলে, আইসক্রীমবালা কতদিন এসেছে? পাঁচ ছ' বছর—তার বেশী তো নয়। আট ন' মাস আগে এসেছে ঘুগনিবালা। বলে, যেন স্বীকৃতির স্মিত হাসি ফুটিয়ে তুলতে গিলোল কটাক্ষ করে। কেক বলে, দাদু ঠিক বলেছি?

আমি শুরুতে এসেই বলেছিলাম, ঘুগনিওয়ালা নীচু গলায় বলতে শুরু করে। ভলেনটারী রিটায়ারমেন্ট করিয়ে দিল কোম্পানী। চটকলের অবস্থা কী তোমরা জানো। আরও পাঁচ-সাত সাল কাম ছিল আমার। আমি সে কথা কাকে বলিনি। এখানে বসার আগে তোমাদের বলেছিলাম।

হ্যাঁ, বলেছিলে তো। অনাদি বলে, আমরা পারমিশান দিয়েছিলাম।

ঘুগনিওয়ালা যেন অকারণে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আরে ভাই, আমি ফেরিওয়ালা ছিলাম না। আরও পাঁচ-সাত বছর কাজ ছিল আমার। তুমি পারমিশান দেখাচ্ছ কাকে। বলে, পাকা চুল ভর্তি মাথাটা ও অস্থির ভাবে নাড়ায়।

আমি······

না। তুমি থাম। তুমি সরকার যে লাইসেন্স দেখাচ্ছ।

অনাদি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। এদেশী বউটি কোলের বাচ্চাটিকে মাটিতে নামায়। আহা। দাদু রেগে যাচ্ছ কেন? আমি বলতে চাইছি আমরা একসাথে আসিনি। একজন চানাওয়ালাকে দেখিয়ে বলে, তুমি আড়াই-তিন বছর আসছ।

সুরমাটানা এই চানাওয়ালা বিহারী মুসলিম। বদলি মজুর হিসেবে জুট মিলে ডিউটি দেয়। রোজ দিন কাজ থাকে না। 'নাইট সিফটি' থাকলেও দিনের বেলা চানা বেচে। এদেশীয়দের গণ্ডগোলে পশ্চিমী অনেকের মতো নির্লিপ্ত থাকে ও। পরিচিত বউটির দিকে তাকিয়ে বলে, বাত সহি হ্যায়। হাম তিন সাল চার মাহিনা আ রাহা হুঁ।

অনাদি চীৎকার ক'রে ওঠে, কী বলতে চাও তুমি? তোমার খুপরী ঠিক আছে কি না! কে কবে থেকে আসছে, সে কথায় দরকার নেই। চাটনি বেচা চলবে না এখানে।

এদেশী বউটির দিকে জলন্ত দৃষ্টিপাত করে অনাদি। মেয়ে মানুষ না হ'লে যেন পেটাত।

তখন নিজের উত্তেজনা কমিয়ে কাঁপছিল ভিতরে ভিতরে। সে বলে, চাটনিওয়ালা যদি বসে, আমি কাল থেকে রোজ একজন করে নিয়ে আসব।

পশ্চিমী বউটি ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, কেন, কেন রোজ একজন করে নিয়ে আসবে। বিক্রী না করতে দেবে,—সকলের মুখ দেখে একবার ও,—ঠিক আছে। আচারের শিশি তাজা আ ছা না। দাম দিয়ে দেওয়া দরকার।

তোমরা ঝগড়া শুরু করলে। একেশী বউটি বলে শিরা ফোলা হাত তুলে, সবাই আমরা একসাথে আসিনি। ঘুগনি চানা আইসক্রীম তখন ইস্কুলে বেচত না কেউ। তা হ'লে ও বলবে না কেন।

টিফিনের সময় হু হু ক'রে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ উশখুশ করে। অনাদিও জানে, আজকের মোট মাল বিক্রী করে যাবে। মাল হয়তো ফেরত দিয়ে দিতে হবে অনেকটা। আজ দিনটি অতি উজ্জল। আকাশে কোথাও এক চিলতে মেঘও নেই। এমন সুন্দর রোদের দিন কম পাওয়া যায়। এই ভরদুর তাপে কি আজ মাল বিক্রী বেশী হত না।

গেটের দিকে তাকায় অনাদি। উচ্ছ্বসিত চাহিদা যেন ভয়ঙ্ক থেকে ঢেউ হয়ে আছড়াচ্ছে। ভীড় করে চীৎকারে তাকেই কি ডাকছে সবাই। রোদে আজ মেয়েগুলি যেন বেশী ঘেমেছে। অন্যদিন তো এত ঘামে না। কেউ যেন আইসক্রীমওয়ালা বলে ডাকল। অনেকে।

অনাদি আজ বিশ বছরেও বেশী শুনে আসছে ডাকটি। ঐ ডাকের তীব্রতা তাতে কমেনি। প্রতিবার শোনার সঙ্গে মনে জেগে ওঠে শিহরণ। নতুন লাগে ডাক। প্রতিবার ডাকের ধরণ। শব্দ যেন মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি তোলে অনেক।

খুব খুশী থাকলে, বউ যখন চুপি চুপি ডাকে, আইসক্রীমওয়ালা, আর যেন পৃথিবীর কাছ থেকে গোপন ক'রে লজ্জায় হাসে মুখ টিপে, তখন অনাদির চোখেও ছড়িয়ে পড়ে মৃদু হাসি। একটু চুপ করে থেকে অনাদি বলে, আইসক্রীম খাবে। মুখ বাড়িয়ে দাও। পুরনো বউ পুরনো লজ্জাকে যেন নতুন ক'রে দেখায় তখুনি।

এক একদিন পরাজিত সেনার মতো বাড়ি ফেরে অনাদি। খাঁকি হাফ প্যান্ট, খাঁকি জামা না খুলে বসে থাকে। বউ নিঃশব্দে এসে ডাকে, ও আইসক্রীমওয়ালা। তখন অনাদির মধ্যে কোনো পুলক জাগে না। সে যে সত্যিই একজন আইসক্রীমওয়ালা, এই বিস্তৃত সত্যের উপলব্ধিতে তার পেশা-

গত যেন তখন জেগে ওঠে। হাসে না অনাদি। নিষ্পলক তাকিয়ে বলে, চা পাতা আছে কি না দেখ না। এক কাপ চা যদি হয়।

বউ একটা বাড়ীর কাজ করে। বিরক্ত হয় না এই সময়।

হয়তো আরও একটা বাড়ির কাজ ধরতে বলতে হবে বউকে।

সদি বাত, সদি বাত।

অনাদি ঘুরে চানাওয়ালার দিকে তাকায়। শালা, সবই তোমায়সদি বাত।

ভাল বাংলা বলতে না পারার আক্ষেপে ও বারবার সদিবাত বলে কি না কে জানে। অনাদি বলে, কী সদিবাত।

ওর এক বোতল আচারের দাম তোমাকে দিতে হবে। পশ্চিমী টানে, যেন মধা-ধরা দাঁতে-কেলা হাসি হেসে বলে চানাওয়ালা।

কেন?

কেন! এদেশী বউটি বলে, তুমি শিশি ভেঙেছ বলে।

তা হ'লে ও চলে যাবে? অনাদি আগন্তুকের দিকে তাকায়।

আগন্তুক চুপ ক'রে এদের বিতণ্ডা শুনছিল। শুরু থেকে ঝামেলা এতখানি এগোবে সে বুঝতে পারেনি। রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করলেও মাল কাটে। এক জায়গায় অনেক খদ্দের পাওয়ার দাম আলাদা। সকলে বাধা দিলে সে বলতে পারবে না। সকলে অবশ্য বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু বিশ্রী একরকমের গ্লানিতে ভরে গিয়েছে ওর মনটা। চুরির দায়ে ধরা পড়ার অপরাধ যেন তার।

হ্যাঁ, চলে যাব। অন্য ইস্কুলে যাব। আগন্তুক শান্ত গলায় বলে।

অনাদি চাপা স্বরে বলে, না। তুমি ব'সো।

কেউ হয়তো বিক্রীর বিরোধিতা করত। কেউ করত না। হাতে ধরে কেউ বিক্রী করতে বলত না। এদেশী বউটিও না। সকলে অনাদির কথায় আশ্চর্য হয়। চুপ ক'রে গিয়ে তাকায় ওর দিকে। ছিপছিপে শক্ত শরীর। মুখে ঘন ছোট ছোট দাড়ি। ঘাম চিকমিক করছে কপালে।

জনবসতি থাকলেও, অনাদি জানে, এটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট। যে দেড়-দু' মাইলে তার ঘোরাঘুরি, জনবসতির মাঝে মাঝে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোট বড় কারখানার শেড। আকাশে মাথা তুলে আছে অগুনতি কালো চিমনি। কারখানা এক একটা বন্ধ হয়, আর জীবিকার সংকীর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে ভীড় করে আসে নতুন নতুন মরীয়া মুখ।

অনাদি একে ঠেকাতে পারবে না। লড়তে! লড়তে তো পারে অনাদি। ভোর থেকে রাতের গভীর পর্যন্ত। সকালে সূর্যটা যদি আরও তাপ নিয়ে জ্বলতে জ্বলতে ওঠে।

অসহযোগিতার মনোভাব কাটিয়ে বিদীর্ণ করে পেশাগত জেদে স্থির হয়ে যায় অনাদি।

তুমি যদি পার, ক'রে খাও। তোমার সঙ্গে হেরে যাব না আমি। কিছুতেই না। একটু থেমে বলে, আচারের দাম কত? আজ না, পরে,- পাঁচ সাত দিন পরে পেয়ে যাবে।

কারোর কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু হাসেও না কেউ। শুধু ঘুগনি বুড়োর গালের গভীর ভাঁজ একটু কমে আসে। যেন হাসি ওঠা।

আগন্তুক অদ্ভুত দৃষ্টিতে অনাদির দিকে তাকায়। অবিশ্বাস গিয়ে বিশ্বাস আসেনি এখনও। অথচ যেন বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনোটাই নেই চোখে। পুরু অধর টেনে সামনের উঁচু দাঁতগুলিকে ও ঢেকে নেয় কেবল।

এদেশী বউটি বলে, দাম তুমি পেয়ে যাবে আচারের।

না। ও দাম আমি আর চাই না।

অনাদি ওর কাছাকাছি এসে বলে, কেন ভাই। দাম দিয়ে দোব তো বললাম।

তপন সশব্দে এক দলা থুতু ফেলে মাটিতে। দোকানে ঢুকে যায়। তাকেও এই প্রতিযোগিতায় বাধ্য হয়ে থাকতে হবে। ভাবতে হবে নতুন কি কি রেখে দোকানের সেল বাড়ানো যায়। প্লাসটিকের বয়ামগুলির দিকে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবে তপন।

শোভা কখন এসেছে কেউ দেখেনি। এসে ও সব বুঝেছে। আগন্তুকের কাছে এসে বলে, পয়লা দিন এসেছ! এক ভাঁড় দাও এক রুপিয়া।

স্কুলের ঝাড়ুদারণী শোভা। মাস মাহিনা ছাড়াও ফেরিওয়ালাদের ময়লা পরিষ্কারের জন্যে দু' টাকা করে পায়। এই বাড়তি আয়টুকুর ব্যবস্থা করে দিয়েছে নরোত্তম। এঁটো শালপাতা ঠোঙা না হলে ও ফেলতে চায় না।

অনাদি রেগে বলে, দূর হ' হারামজাদি! আজ মাসের ক' তারিখ!

আগন্তুক শোভাকে দেখছিল। মাথায় কিছু কিছু চুল পেকেছে। বেঁটে খাটো শরীর। কটা গায়ের রঙ। ছোপধরা হলুদ দাঁত। সস্তা কিন্তু অত্যন্ত

রঙ চড়ে শাড়ি পরে আছে। উঁকিয় দাগের উপরে হাতে কাচের চুড়ি একগোছা। গাঢ় এবং তীব্র রঙের।

ঘুরে চীৎকার করে ও বলে, গালি দিবে না। তোমার আইসক্রীমের কাঠি প্যান্টের তলায় ঢুকিয়ে দিবে। সাফা হাসি করবে—ও শালা গালি দিবে।

আগন্তুককে আবার বলে, হামাকে মালে দো রুপিয়া দিতে হোবে। কটা চোখের তারায় কাতর ভাব এনে বলে, এত্তভাল কিছু দিবে না!

নোংরা দাঁত বের করে হাসে ও।

আগন্তুক ওকে একটা আধুলি দেয়।

কপালে ঠেকায় পোতা আধুলিটা। তারপর সবে মাত্র খোলা গেটের মধ্যে মেয়েদের ভীড়ে হারিয়ে যায়।

সময়ের মাপে অল্প হলেও, বিক্রী সেই তুলনায় হয়েছে। পয়সার থলির ভারও অনাদির শরীর চেনে। ও যখন গাড়ী ঠেলে চলে যাচ্ছে, স্কুলবাড়ীটা নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সাময়িক হৈ হল্লার পরে বলে নৈঃশব্দ বেশী লাগে? রাস্তার ধারে, অশ্বত্থ গাছের ছায়ায়, ফেরীওয়ালাদের ভীড়ে পোতা চেঁচাচ্ছে। আগন্তুকের কাছে আরও আট আনায় না হোক, চার আনার নাছোড় দাবি নিয়ে।

চমৎকার শোনে। কিন্তু কিছু না বলে; চুপচাপ গাড়ি ঠেলে চলে যায় অনাদি। আজকের ছুটো ক্ষতি তাকে পূরণ করতে হবে।

সন্ধ্যের পর বাড়িতে এসে চুপচাপ বসে দাওয়ায়। অনেক রকম চিন্তা মাথার ভিতরে জট পাকিয়ে উঠেছে। অস্পষ্ট হলেও তারে অনেক ভারী। অসহ চিন্তার ভারে মানুষ এক এক সময় চিন্তাশূন্য হয়ে পড়ে। মনের ওপর তখন চেপে থাকে শুধুই ভার।

অনাদি যেন সেই রকম অবসণ্ণবে পরিণত হয়েছে। ব্যাথা যেন আর ব্যথা না। যন্ত্রণা যেন হয়ে গিয়েছে নিরুচ্ছ্বাস অনুভব।

বউ কাছে এসে এক সময় বলে, ও আইসক্রীমওয়ালা!

অনাদি ফিরে তাকিয়ে সজোরে একটা চড় মারে।

বউটি আর্তনাদ করে দাওয়ার নীচে উঠোনে গিয়ে পড়ে। কেমন এক

ধরণের বিহ্বলতায় মুখ তুলে ভয়ে ভয়ে তাকায়। অনাদির চোখে যেন আগুন জলছে। দেখে বউটি ঘাড় গুঁজে পড়ে আস্তে আস্তে কাঁদতে শুরু করে।

সূর্য ডুবে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগে। এই খিজি বস্তির বদ্ধ গুমোটে ম খোঁজে বাতাস আসছে যেন ভয়ে ভয়ে, লুকিয়ে। তার তাপ সংগ্রহ করে যেন চুপি চুপি চলে যাচ্ছে।

গরম তাপ বার হচ্ছে ঘর থেকে।

অনাদি হঠাৎ মুখে দুই হাতের তালু চেপে কেঁদে ওঠে। গুমরানো চাপা কান্নায় তার শরীরখানি কেঁপে কেঁপে যায়।

কয়েক মিনিট কাঁদে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। টেঁক থেকে পয়সার থলিটা ছুঁড়ে দেয় মেঝেতে। বউয়ের দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে যায়।

পরিচিত একজন মাষ্টারের বাড়িতে এসে ডাকে, মাষ্টার বাবু।

মাষ্টার বেরিয়ে এসে বলে, একটা কথা ছিল।

কী কথা। বলো। বলো।

অনাদি সিঁড়িতে পা রেখে পাকা দুয়ারে বসে। দু'এক মিনিট কি যেন ভাবে। তারপর বলে, আচ্ছা মাষ্টার···

বলো।

সূর্যটা কত বড়ো?

কেন।

বলো না, জরুরী দরকার আছে।

পৃথিবীর তের লক্ষ গুণ।

তের লক্ষ গুণ। প্রায় স্বগতোক্তিতে গলা বুজে আসে তার। মনে মনে কী যেন হিসেব করে।

মাষ্টার কৌতূহলী হয়ে বলে, কেন বলো তো।

সূর্যের তেজ কী কমে যাচ্ছে, না বাড়ছে? কিছুক্ষণ থেমে ফের জিজ্ঞেস করে, গরম্ কী বছর বছর কমছে? বিশ বছরে কমেছে?

পৃথিবীর ধ্বংসের সঙ্গে জড়িয়ে শিক্ষিত মহলেও দেখা দেয় প্রশ্নটা। মাষ্টার হেসে বলে, আর কী গরম দেখেছো। সূর্যে যে অনেক আগুন অনাদি। কী একটা পদ্ধতি আছে—তাতে সূর্য নাকি আগুন ফিরে পায়। পনের কোটি

কিলোমিটার পেরিয়ে আসে সূর্যের আগুন। তাও কত... আচ্ছা, তোমার দরকার কী বলো তো ওর একটা টুকরো পৃথিবীকে পুড়িয়ে দিতে পারে।

অনাদি বিস্মিত চোখে তাকায় মাষ্টারের দিকে। তারপর কিছু না বলে বেরিয়ে আসে।

বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে বসে। কোথা থেকে কাঠালী চাঁপার গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। আকাশ তারায় ভর্তি। ওপরে তাকিয়ে মনে হয়, আকাশ যেন আরও উঁচুতে উঠে গিয়েছে।

একটু বেশী রাতে অনাদি বাড়ি ফিরে আসে। প্রতিবেশীরা শুয়ে পড়েছে।

তেরান দরজা খুলে দেখে, অহুজ্জল কুপী জলছে এক পাশে বউ মেঝের আঁচল পেতে শুয়ে আছে। ছেলে দু'টো দুই কোণে দলা পাকান কুণ্ডলীর মতো ঘুমুচ্ছে।

অনাদি নিঃশব্দে বউয়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। চুপ চাপ কাত হয়ে পড়ে আছে। আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়ে অনাদি। মুখের দিকে কুপীটা রাখে। হাত দিয়ে চোখের পাতা টেনে দেখে, টকটকে লাল।

জোর ক'রে চোখ টানলে, চোখ কখনও স্বাভাবিক দেখায় না। ছেড়ে দিতে বউ নিজে চোখ খুলে বলে, তুমি।

না। আমি না। আইসক্রীমওয়ালা।

বউ অবাক হয়ে তাকায়। কত রূপ হয় পুরুষের।

বসে পড়ে অনাদি। মনে মনে ভাবে, সূর্যের তাপ কমেনি। কমবে না। আগুনের শিশুটা কাল যেন আরও আগুন নিয়ে ওঠে। কারখানা যত বন্ধ হচ্ছে, বেকারী বাড়ছে যত, চলতি জীবিকার ক্ষেত্রগুলিতে মাথা গুঁজে দিচ্ছে মানুষ। কাকে তাড়াবে অনাদি। কীভাবে।

ওর শুধু অনন্ত আকাশ চাই। বরফের সওদা তাতে বেঁচে থাকবে। জীবনে যতটুকু প্রত্যয়ের বিনিময় আছে, সূর্য ও সম্পর্ক দিয়ে বানিয়ে নেবে অনাদি।

বউয়ের দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি বলে, আইসক্রীমওয়ালা বললে না। কাল তা হ'লে সূর্য উঠবে না।

বউ চোখ বুজে, মৃদু গাঢ় গলায় টেনে বলে, আ-ই-স-ক্রী-ম-ও-য়া-লা।

বিচারের দরজায়

ফ্রান্‌ৎস কাফকা

মূল থেকে অনুবাদ : নীহার ভট্টাচার্য

বিচারশালার দরজায় এক প্রহরী দাঁড়িয়ে। দূর গ্রাম থেকে একজন এল এই প্রহরীর কাছে। অনুমতি চাইল বিচারের দরবারে যাওয়ার। প্রহরী কিন্তু বলল, তখন নাকি তাকে ঢুকতে দিতে পারবে না। গ্রামের লোকটি ভেবেচিন্তে জানতে চাইল, তাহলে সে পরে ঢুকতে পারবে কিনা। "হয়তো পারবে", বলল প্রহরী, "এখন কিন্তু নয়।" যেহেতু বিচারের দরজা সবসময়েই খোলা থাকার কথা, প্রহরী একপাশে সরে দাঁড়াল। লোকটি তখন উঁকি দিল, দরজার ভেতর দিয়ে অন্দরমহল দেখার চেষ্টায়। প্রহরী তা লক্ষ করে হেসে বলল, অতই যদি ইচ্ছা, দেখনা একবার চেষ্টা করে, আমার বারণ সত্ত্বেও ভেতরে যাওয়ার। তবে খেয়াল রেখ—আমার ক্ষমতা অনেক। আর এই আমি হলাম গিয়ে সবচেয়ে ছোট প্রহরী। মহলের পর মহলে প্রহরী রয়েছে, একের পর আর—তেমনি তাদের ক্ষমতাও ক্রমশ বেশী। তৃতীয় জনের দিকে মুখ তুলে তাকাতে আমারই সাহস হয় না, গ্রামের সেই লোকটি এতসব ঝঞ্ঝাটের কথা ভাবতেও পারেনি। "বিচারের দরজা তো সকলের জন্য সবসময়ে খোলা থাকার কথা", ভাবল লোকটি। তাই একবার এই কার কোট গায়ে প্রহরীকে খুঁটিয়ে লক্ষ করে দেখল তার লম্বা টিকোলো নাক, হাল্কা-কালো তাতারীয় দাড়ি। অপেক্ষা করাই বরং ভাল, ঠিক করল। অনুমতি পেলেই বরং ভেতরে যাবে। প্রহরী তাকে একটা টুল এগিয়ে দিল, দুয়ারের একপাশে বসবার জন্য। সেখানে লোকটি বসে রইল—দিন গেল, বছরও গেল বেশ কয়েকটা। অনেক চেষ্টা করল, যদি ভেতরে যেতে দেয়, তার অনুরোধে প্রহরী অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। প্রহরী মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে। জিজ্ঞেস করে তার গ্রামের কথা, তাছাড়াও আরো

অনেক কথা ; তবে সেসবই বলে, তাকে নাকি ভেতরে যেতে দিতে পারবে না। এতটা পথ যাতায়াত করতে হবে ভেবে লোকটি বেশ কিছু জিনিস সঙ্গে করে এনেছিল। ওসবই গেল প্রহরীকে ঘুষ দিতে, সেখানে মূল্যের কোনো বাছবিচার ছিল না। প্রহরী নিল সবই, তবে নেবার সময় বলল, "এসব আমি নিচ্ছি, যাতে তুমি না ভাব, তুমি কিছুই করে উঠতে পারছ না।" এত বছর ধরে লোকটি প্রহরীকে প্রায় সারাক্ষণই লক্ষ করছে। সে আর সব প্রহরীর কথা ভুলে গেছে, তার ধারণা, এই প্রথম প্রহরীই বিচারের দরবারে পৌঁছবার একমাত্র বাধা। এই পোড়া কপালকে সে শাপ-শাপান্তি করে। প্রথম কয়েক বছর বেপরোয়া গলা তুলে, তারপর বয়স বাড়লে আপন মনে বিড-বিড় ক'রে। ছেলেমানুষের মত হয়ে গেল, আর এতদিন ধরে প্রহরীকে দেখতে দেখতে তার ফার-কোটের কলার-এর পোকাগুলোও তার চেনা হয়ে গেছে। সে ঐ পোকাগুলোর কাছেও মিনতি করে, প্রহরীকে বলে ওকে সাহায্য করতে। তারপর সে চোখে কম দেখতে শুরু করল। বুঝতে পারে না, সত্যি সত্যিই অন্ধকার নেমে আসে, নাকি ওটা তার চোখের ভুল। তবে সেই অন্ধকারের মধ্যেও সে একটা আলোর ঝলক দেখতে পায়, সেটা ঐ বিচারের দরজা দিয়ে বাইরে এসে পড়ে, ওটা তেমনি ঝকঝকে হয়ে গেছে। এখন আর বেশীদিন সে বাঁচবে না। মরার আগে তার মাথায় ভিড় করে আসে এতদিনের সব অভিজ্ঞতার ফল—একটি মাত্র প্রশ্ন। এই প্রশ্ন এখন অবধি প্রহরীকে করা হয়নি। প্রহরীকে ইশারায় কাছে ডাকল, কারণ তার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গেছে, নিজে উঠতে পারছে না। প্রহরীকেই নীচু হতে হয় সেই গ্রামের লোকটার কাছে, দুজনের মধ্যে উচ্চতার তফাৎ অনেকটা বেড়ে গেছে, প্রহরী অসুবিধায় পড়েছে। "এখন আবার কী জানতে চাও?" জিজ্ঞেস করল প্রহরী, "তোমার আশ আর মিটবে না।" "সবাইতো সুবিচার চায়", বলে লোকটি, তাহলে এটা কেমন হল, এই এত বছর কেটে গেল অথচ আমি ছাড়া আর কেউ এই দরজা দিয়ে ভেতরে যেতে চাইল না?" প্রহরী বুঝল, লোকটির সময় ফুরিয়ে এসেছে, আর কানেও কম শোনে। তাই গলা বেশ তুলে বলল। "এখানে অন্য কারো অনুমতি চাইবার কথা নয়, কারণ এই দরজা শুধুই তোমার জন্য। এবার আমি যাব, এই দরজায় তালা লাগাচ্ছি।"

প'ড়ে তোলায় আগেই যদি

শান্তিকুমার ঘোষ

ভয়গুলো সব পেরিয়ে এলাম—একটা কেবল বাকী,
এক-পা দু'পা এক-পা এগিয়ে যাই
সেই তোরণের দিকে।
শৈশবের আতঙ্ক নয়—না-চেনাকে-ত্রাস ;
মনের মতন যতন ক'রে
ভেঙে আবার গ'ড়ে-তোলায় আগেই যদি
নামে সর্বনাশ,
তখনই কি বিঁধবে বুকে
আমার আসল ভয় ;
—ফাঁকা শূন্যময়।
কিন্তু শঙ্কা দ্বিগুণ ভারী হবে
দেখবো যখন বেরিয়ে যাবার
পথ জানা নেই···ব্যূহের ভেতর
ঘুরছি শুধু ঘুরছি পাকে-পাকে।

যা দিয়ে

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

সাদা যদি কালো হয়
কালো কেন সাদাই হবে না

ভালো চিরদিনই ভালো
মন্দ-ওকি হবে না একদিন

তালোর মতই
অথবা তালোই
তার ভালোত্বের মত্ত অহমিকা
আর শুচীতার বায়োস্কোপ থেকে
মুক্ত হ'তে-হ'তে
মুক্ত হ'তে-হ'তে
আরেকটি সকাল অথবা সন্ধ্যা
অথবা রাত্রি
অথবা দিন
যা দিয়ে কাউকেই
কোনো দিনই প্রতারণা করা যাবে না।

সনেট

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

পেছনে কবন্ধ মূর্তি গড়াচ্ছে ধুলোয়, এতদিন
প্রার্থনায় শব্দে থাকতো অবিরাম জয়ধ্বনি তার
ছিল স্নায়ুতে বয়ে চাপ, হাহাকার অসহ্য কঠিন
তবুও ছিল না শেষ সারাদিন প্রসঙ্গ পূজার,
ক্রমশই বদলে গেল ব্যবহার, প্রতিশ্রুতি। সব মূর্খ
বিবাদের ছায়া মেখে মুছে ফেলল ঘোরের সত্তার
সব হাত স্মৃতিহীন, শিরোধার্য গোপন অসুখ
মেধাকে বাতিল ক'রে নিয়ে এল অতল আঁধার,
বাধ্যতামূলক ছিল মিছিলের সারিবদ্ধ চলা
একই স্বর একই সুর উঠবোস শেকলে জড়ানো—
পতাকায় ঢাকা থাকত কাহুড়ের ক্ষিপ্ত ছলাকলা।
এখন দিগন্ত জল, ভেসে যাচ্ছে যা-কিছু সাজানো
রাজ্যপাট শেষ হল, মুক্ত হাওয়া বুকের ভেতরে—
আবার নতুন ক'রে শুরু হল: জল পড়ে, পাতারাও নড়ে।

শব্দ সন্ধানে

সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুমোতে যাচ্ছি।
এখনো তো ঘুমোতে পারি দিব্যি আলো নিভিয়ে।
শূন্য থেকে পাথার হাওয়ার সাথে
ঘুরতে ঘুরতে নেমে আসছে বাস্তব সংলাপ।
একটা শব্দের ঘাড়ে অন্য শব্দ
ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে সাজানো টেবিল—রাইটিং-প্যাড, জানলার পর্দা
আধো অন্ধকারে শিশির পড়ছে ঘাসে।
ভিজে পায়ে হেঁটে আসছো কে ?
হাতভর্তি তরল আঁধার—বিষ—একাকীত্বের
আধখানা ঘর—রঙিন পাজল্—বাসের দামী
টিকিট—নাগরিক অধিকার—সবুজ ঊর্মি—
খোলা ঝুপড়ি কাঁপানো সন্ধানী চোখ···

গাছগুলো সব সিল্যুয়েট হয়ে গেছে।
তোমার ক্লান্ত পা জমে জমে কঠিন জীবাশ্ম।
আর এতরাতে মুখোমুখি হয়ে পড়া তোমার উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি
শূন্য থেকে নেমে আসছে ছায়াছায়া ভালবাসা
নেমে আসছে
গলার ফাঁস—
রাত কাটে নি
বাতাসের অশ্বারোহণ ঘুমভাঙা বিছানায়

আগুন

কালোবরণ পাড়ুই

আগুনে পেয়েছে, জল আজ সাময়িক
পলাশ তলায় বলা যাচ্ছে না, লাল
চাঁদের দিকে তাকানো যায় না, এতোই হলুদ
জল—ছুবি বোনের চিতা জ্বলছে হু হু···

ওদিক থেকে ভেসে আসছে কালো
অহংকার পোড়া দাগ সর্বাঙ্গে
আলের ধারে মাটি ফেটে চৌচির
কার কথা ভাববো ? জলের কথাই ভাবছি
পেট্রলের গন্ধে নাক ঠেঁসে আসছে······

চুল্লির পাশে জমে উঠছে অস্থির স্তূপ, শাদা
ছবিগুলো কথা হওয়ার আগে আগুন আগুন চীৎকার
জানলায় হাত বাড়াচ্ছে চড়াইয়ের মুখ
স্বপ্ন শেষ হয় না
ঘর জুড়ে বেজে ওঠে দেশলাই।

কবিতার মুহূর্ত

কানাইলাল জানা

ছন্দ যখন পাড়াগাঁয় ডোবায় পানিফল
কল্পনা যখন পচাপাঁকের ওপরে পোয়াতি
উচ্ছ্বাস যখন মাদি হাঁসের পালকে কচুরিপানা
কথা যখন কাদাখোঁচায় ধ্যানে গাঁই গাঁই জল,
মমতায় দুলে ওঠে কোনো ছন্দবতী কবিতা······

গর্ত-হাড় যখন শূন্যহাটের আজান
মজ্জা যখন শুড় শুড়িটানা ফেড়ী
অনুভূতি যখন গেরস্ত হাওয়ার সাঁকো
রক্ত যখন ঝাঁ ঝাঁ শৈশবের চিটেগুড়
হৃদয়ে পাশড়ি মেলে কোনো নদীমাতৃক কবিতা…

সত্তা যখন ঘর-খাওয়া গাভের গোঙানি
স্মৃতি যখন উচ্ছি ধানের বুক চোষা ভুঁই
অস্তিত্ব যখন বক্‌না বাছুরের লেজ চাখা মাছি
মন যখন নাড়ায় গোড়ায় মাথা গোঁজা গেঁড়ি
নিজে-ই ফুটে উঠি কোনো চন্দ্রমুখী কবিতা…

এখন এ জন্ম ও এক চারনী

পলি রায়

আজ তবে এইটুকু দাও শুধু
এতটুকু শোধ
আমি অন্যের মত চলে যাব
নিশ্চিত চলে যাব এই সব কথা ভুলে

সে এক চর আর সঙ্গমে নানা পানকের রঙে
পর্যটক চারণী আমি 'নিহত উষ্ণীব হতে' বোঝার ঘরে
মাবরাতে দেখেছি শৌর্য বদল হতে আরাধ্য দেবতার
কতোশতো,
আমি আর শিখব না কিছু
পোড়াব না অপ্রিয় ঘর ও আকাশ

তবু ও নীল যন্ত্রণা
ও শিলাভূমি তুমি আর এসো না এখানে
এই নিথর অথর্ব অস্থ
এখন নিজের ভেতরে আমি বোধিসত্ত্ব খুব।

মানুষী ভাষায় কিছু বলি

শুচিস্মিতা মিত্র

১.

একদিন সবকটা স্বপ্ন দেখার অধিকার ছিল
একদিন তোমাকে স্বপ্ন দেখানোর ইচ্ছে প্রবল ছিল
আজ স্বপ্নরা আমাদের ছেঁড়া মশারি তুলে দেখে
দুটো ক্রোধোন্মত্ত বাঘ শিকার ছিঁড়ে খায়।

২.

অদ্ভুত দিগন্ত থেকে ছুটে এসেছিল পাখিরা
ডানায় বিস্মিত কতগুলো বছর
পক্ষে জমে উঠেছে বর্তুল সময়
পাখিরা ঝাঁপ দেবে সমুদ্রের নিঃশব্দ ঐশ্বর্যে
আজ বছর ঘুরে গেলে আবার পাখিরা
আমাদের কথা শোনে, কথা বলে মানুষী ভাষায়
তাদের চিত্ররেখা ক্রমশ বুঝতে পারি
মানুষই আজ অব্যক্ত জ্যামিতিক রেখা।

৩.

তোমার হাতের আগুন আজ আমার মুখে
তোমার ভাষা ক্রমশ আমার
তোমার অস্তিত্বের সবকটা চোরা দেয়াল আমার
আমি আর তুমি ক্রমশ পেশা বদলে নিই।

৪.

আমরা সীমান্ত জুড়ে খেলা করেছিলাম
আজ কাঁটাতারে হাত লাগে
নিঃশব্দ রক্ত ঝরে ভোরবেলা
বিকেলের রোদে পরিপার্শ্ব ক্ষতমুখ
আমাদের জীবনযাপন
সূচীভেদ্য ছিদ্রপথে ক্রমশ রক্তিমান

৫.

এখানের সব নদী মরে গেছে
বলে গেছে তাবাবহুল ব্যথাদীর্ণ হাওয়া
আর নয় প্রতিশ্রুতি, নয় পারাপার।

৬.

অজস্র কথায় ফেনা ছড়িয়েছিলাম তাই
কোন ভাবাই আমাদের মাতৃভাষা নয়
রক্ত স্বেদ আর অনেক খেদ অধ্যায়
যে শরীর তৈরী হল গূঢ় ও গভীর
সে শরীর দাবী করি—অধিকার কই?

৭.

একটা অনুভূতির পেছনে সহস্র গাছ
গাছের আড়ালে প্রাণিত কুঠার
একটা ক্রোধ, অক্ষম ঈর্ষা
শিকড় জানুক কোনদিন মন নয়
সর্বাঙ্গে বিষ ঢেলেছিল এতদিন
তাই মানুষ ভাবায় জন্মীতে
চিত্রার্পিত নয়
নয় নশ্বর বর্ণমালা—সাযুজ্যের সেতু।

কালাহান্ডিতে মৃত্যু

জয়ন্ত মহাপাত্র

অনুবাদ : মঞ্জুভাষ মিত্র

বৃক্ষবাকলের মুখ এবং বিষাদ
ঝুলে থাকে পৃথিবীতে অসহায়
ঈশ্বরের হাত পারে না সাহায্য করতে কোনো
রমণীগণের দু'চোখের কিনারায়
সূর্যোদয় দুঃখযামময় হয়ে ভেঙে যায়
শুধু ধরিত্রীর মাঠ প্রান্তর ধূ ধূ

খাদ্যের জন্যে যাওয়া শরীরেরা পড়ে আছে শুধু
নীচু চোখগুলিতে কেবল ক্লীবদের ছায়া
শিশু সৌভাগ্যবতীর গলা খিদের শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল
মা তার কস্তুরী হরিমন

নিজে সুখী হোত গলা টিপে মারত যদি তাকে
শুধু বিশীর্ণ বিক্ত রমণীগণের ক্রন্দন শোনা যায়
মানুষের মত হিংস্র বেদীমূলে মাথা কুটে মরে,
শুধু ভয়ের মুহূর্ত কাঁপে হায়
এখন এমন এক দেবতার প্রয়োজনে যে পারত উপকার করতে তাদের কিছু

আঃ আমি এক কবি কুকুরের মত রব করি
জানলাটা খুলে দাও আমি বলি নিঃশ্বাস নিতে পারি যাতে
আমার শক্তিরা যেন শুভপাতা বাঘের মতন না হয় এ রজনীতে
কিন্তু রয়েছে এই ভয়ানক জীবন্ত শরীর
এবং লাঠি বা ছুরি একমাত্র পারে তাকে ছিন্ন করে দিতে

কাকতাড়ুয়া

অমল ভট্টাচার্য

হেমন্তের বাতাসে সোনালী তুষ ওড়াতে ওড়াতে তুমি চলে গেলে ;
যেমন অশ্বমেধের ঘোড়া যায় পরাজিত মানুষের কাছে ।
তেমনি রূপালি বর্শার মত তুমি আছড়ে পড়ো শহরে বন্দরে
শক্তিমান মানুষ মুঠো মুঠো সংগ্রহ করে সেইসব
রূপালি সোনার দানা, আর বারে পাল্টে যায় মানব সমাজ ;
জঠরের তীব্র ব্যাকুলতা তোমাকে করেছে ঢের অস্থির ।

হেমন্তের বাতাসে সোনালী তুষ ওড়াতে ওড়াতে তুমি চলে গেলে
পরিত্যক্ত মাঠে পড়ে আছে গন্ধহীন বাতাস, মেঘ ও জল ।
আর আমি গুলতি হাতে কতবার লক্ষ করেছি নীল পাখি ;
কচ্ছপের পিঠ রৌদ্র কাতর হলে তোমার বুকের তুষ অকালে গাঢ় হয়,
আমি নতজানু হয়ে মেঘের কাছে প্রার্থনা করেছি বৃষ্টির ।

সেই তুমি আমার থেকেও দুঃখী মানুষের খুলিতে,
ভাবতে ভাবতে বিষণ্ণ সন্ধ্যায় খুন হয়ে গেলো ।

তসলিমা নাসরিন বনাম মৌলবাদ

রঞ্জন ধর

১৯৯২ সালের আনন্দ পুরস্কার পাওয়ার আগে পর্যন্ত তসলিমা নাসরিন নামটি এপার বাংলায় প্রায় অপরিচিত ছিল। এ যেন হঠাৎ বিস্ফোরণ,— রাতারাতি তসলিমা নাসরিনের নাম ও তাঁর বই 'নির্বাচিত কলাম' পৌঁছে গেল বাঙালির ঘরে ঘরে। পরে একের পর এক বাকি সব বই, নির্বাচিত কবিতা, নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য, লজ্জা এবং বাংলা দেশে প্রকাশিত অন্যান্য বই। তাঁর লেখার বিষয়বস্তু সত্যিই বিস্ফোরক, কারণ তাঁকে নিয়ে দুই বাংলায় ইতিমধ্যেই যে বিতর্ক ও ঝড় উঠেছে, বোধহয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আর কোন লেখকের ভাগ্যে তেমন ঘটেনি। এর কারণ অনুসন্ধান করাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

তসলিমা নাসরিনের লেখার বিষয়বস্তু যে একেবারে নতুন, তা নয়। এ সব বিষয় নিয়ে আগেও অনেকে লিখেছেন। নারীমুক্তি, পুরুষতান্ত্রিকতা, ধর্ম ও শাস্ত্রের একদর্শিতা ও পক্ষপাত, মৌলবাদ ইত্যাদি পাঠকের কাছে নতুন বিষয় নয়। তবু দেখা যায় তাঁর লেখা পড়ে, বাংলা দেশে মুসলিম মৌলবাদীরা এতই ক্ষিপ্ত যে, তাঁর কাটা 'মুণ্ডু' হাতে না পেলে এবং তাঁর বইগুলো আগুনে পুড়িয়ে না দিলে তারা শান্ত হতে প্রস্তুত নয়। এই দাবি নিয়ে তারা মিছিল করছে প্রকাশ্যে। রুশদীকে নিয়েও তারা তাই করেছিল, অতএব ওদের আচরণে বিস্ময়ের কিছু নেই। বিস্মিত হতে হয় বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক অংশের প্রতিক্রিয়া দেখে। তাঁরা অবশ্য লেখকের 'মুণ্ডু' দাবি করছেন না, তবে সমালোচনায় মুণ্ডপাত করতে বাকি রাখছেন না।

এ মানতেই হবে, তসলিমার লেখা জ্যা-মুক্ত তীরের মত সামাজিক মানুষের আজীবন লালিত অনেক অন্ধ বিশ্বাস ধ্যানধারণা ও সংস্কারের মূলে অব্যর্থ আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে, যা অন্য লেখকদের লেখা পারেনি। এর ফলেই আজ নানা প্রতিক্রিয়া। এখানেই তসলিমা নাসরিনের বৈশিষ্ট্য ও শক্তি। তাঁর কোন দল নেই। তাঁর কথায়—"আমি কোন দল করি না,

আমি একা। আমার কোন সংগঠন নেই, সংস্থা নেই, সমিতি নেই, পরিষদ নেই, আমি যা লিখি নিজ দায়িত্বে লিখি। একা লিখি।" তিনি আরো বলেছেন—"সমাজের পীড়িত, নিগৃহীত, দলিত, দংশিত নারীর জন্য লিখি। নরম কথায় এ যাবৎ কিছু হয়নি বলে আমি কড়া কথা বলি। নিন্দুকেরা এর নাম দিয়েছে 'পুরুষ-বিদ্বেষ'।" অতএব এটা পরিষ্কার যে নিছক লেখার জন্যই তিনি লেখেন না। টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত কবির হোসেনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আরো পরিষ্কার করে তিনি বলেছেন, "The disparity between men and women has always pained me. I found it in my family; now I find it in society. Women are humiliated. Are being subjected to injustices and unfairness. The social system, the state and religion—all are against women. I want to change this system. I believe I can achieve this through my writing." তিনি সমাজের প্রতি ক্রুদ্ধ কিনা এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, "I am angry because this society regards women not as human beings, but as commodities. All the restrictions are against women. If you are a man yon are free to do anything you like. The same is not with the women." পুরুষ-বিদ্বেষের অপবাদের কথা মনে রেখেই বোধ হয় তিনি যোগ করেছেন। "I am not fighting against any individual…… There still may be some good men. But my fight is against the male attitude that does not hold women with respect."।

রাজনীতিবিদদের প্রতি তসলিমা নাসরিন খুব শ্রদ্ধা পোষণ করেন বলে মনে হয় না, কারণ তাঁদের প্রধান কাম্য 'ক্ষমতা'; তাঁরা ক্ষমতা লাভের জন্য, অর্থাৎ ভোট পাওয়ার জন্য, মৌলবাদ ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু বলা তো দূরের কথা, বরং বেশিরভাগ সময় আপস করে চলেন। তবু রাজনীতি সম্পর্কে তিনি উদাসীন নন। "Socialism, secularism, democracy and nationalism"—রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এগুলোকেই তিনি আদর্শ বলে মনে করেন।

একজন লেখকের লেখা বুঝতে হলে তাঁর জীবন দর্শন অবশ্যই জানা দরকার, বিশেষত লেখক যদি হন তসলিমা নাসরিনের মত একজন বিতর্কিত

ব্যক্তি। তাই নিজের সম্পর্কে তাঁর আরো কিছু মন্তব্য উল্লেখ করতে হচ্ছে। প্রগতিশীল সমাজ গড়ার পথে ধর্মীয় মৌলবাদই প্রধানতম বাধা, এই ধারণা থেকেই বোধহয় তাঁর সবচেয়ে বড় regret কী, এই প্রশ্নের জবাবে বলেন, "That I've not yet been able to sweep the Mullah out from the society." এই সঙ্গে তিনি এ-ও বলতে দ্বিধা করেন না যে তাঁর স্বপ্ন হল—"A world without religion." এ বাংলায় হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনার গণতান্ত্রিক অধিকার ও ঐতিহ্য আছে, কিন্তু উভয় বাংলায় মুসলিম সমাজেই ধর্মের সমালোচনায় অধিকার বা ঐতিহ্য নেই, তাই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তসলিমা নাসরিনের সমালোচনা সাধারণভাবে মুসলিম সমাজকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে, আর মৌলবাদীদের তো কথাই নেই। তারা সরাসরি পথে নেমে এসেছে লেখকের ফাঁসির দাবি নিয়ে। একবিংশ শতাব্দীর মুখে এসে এ যুক্ত ভাবা যায় না। একে বর্বরতা বললেও কম বলা হয়। তবে বিস্মিত হতে হয় সমাজের একটা বড় অংশ এখনো এই স্তরে রয়ে গেছে। বাংলা দেশের কথা উল্লেখ করে তসলিমা নাসরিন খেদ প্রকাশ করেছেন—"এ দেশের রাষ্ট্রধর্ম করা হয়েছে ইসলাম। ধর্ম এক ধরণের বিশ্বাস। অলৌকিক বিশ্বাস। মানুষের অধিকার আছে এটিকে বিশ্বাস করবার বা না করবার।" তিনি নিজে ধর্মে বিশ্বাস করেন না। এ সম্পর্কে তাঁর যুক্তি—"মানবসভ্যতার অতি অপ্রসর চেতনায় নাস্তিকতার উদ্ভব। প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে নিয়ান ডার্থাল মানুষেরা আত্মা, ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদি কল্পনার বীজ বুনেছিল, সেই বীজ হাজার হাজার বছর ধরে বিশাল মহীরূপে পরিণত হয়েছে। তারপর মানুষের জ্ঞান, বোধ ও যুক্তি বিকশিত হতে মাত্র আড়াই হাজার বছর আগে নাস্তিকতাবোধের আলোকে মানুষ প্রথম আলোকিত করে নিজেকে। কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, মিথ্যা বিশ্বাস, যুক্তিহীনতা থেকে মুক্ত হয়ে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ আজ নাস্তিক্যবাদী।"

কিন্তু বাস্তবে আজ বিজ্ঞান-চেতনার প্রসারতার বদলে যেন মৌলবাদী ধর্মান্ধতা দানা বাঁধছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। একটা উল্টো স্রোত বইছে—সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে শুধু অশিক্ষিতরা নয়, শিক্ষিত যুবসমাজও। তসলিমা নাসরিন মনে করেন এর কারণ নৈরাশ্য—"চারদিকে নৈরাশ্য এখন। রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে। সমাজের সর্বত্র দুর্নীতি, সমাজের সর্বত্র অব্যবস্থা, বেকারত্বের জাল পাতা—এই জালে আটকা পড়েছে অসংখ্য নির্দোষ তরুণ,

দেশের প্রকৃত সম্পদ।······এই দোষ তাদের নয়, এই দোষ আমাদের অসৎ, লোভী ও মূর্খ রাজনীতিবিদদের, এই দোষ অথর্ব রাষ্ট্র কাঠামোর, সমাজ-ব্যবস্থার।" অতএব তসলিমা নাসরিনের কলমের আক্রমণ থেকে ধর্ম, সমাজ, রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্র—কেউই রেহাই পায়নি।

তসলিমা নাসরিন ঈশ্বর-বিশ্বাসী বা ধর্ম বিশ্বাসী না হলেও তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের ঈশ্বরত্বে উত্তরণে, মনুষ্যত্বের সীমাহীন উদারতায়, সমবেদনা ও ভালবাসায় এবং সুসংস্কৃত সুন্দর জীবনের আদর্শে। এই জন্যই শান্তিনিকেতনের উদার পরিমণ্ডলে এসে তিনি বলতে পারেন : "রবীন্দ্রনাথকে আমি ঈশ্বর বলে মানি। আমার চোখের সামনে ঈশ্বরের যে ছবিটি হঠাৎ হঠাৎ ভেসে ওঠে, সে তার রক্ত মাংস শিরা ধমনীসহ কেবলই রবীন্দ্রনাথ। এই আমার ধর্ম,' আমি এই এক ঈশ্বরের কাছে পরাজিত। আর কোন ঈশ্বর দোষ, আর কোনও লৌকিক বা পারলৌকিক মোহ আমার নেই। জগতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সামনে কোনও দেওয়াল রাখিনি, আর কোনও গন্তব্য নেই আমার যাবার।" এই রবীন্দ্র-উপলব্ধির মধ্যে তসলিমা নাসরিনের মানস-জগতটি আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে ওঠে। তাঁর কলম যে সমস্ত অসুন্দর, কুরুচি অন্যায় অবিচার ও কুআচারের বিপক্ষে লিখবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

(২)

সন্দেহ নেই, তসলিমা নাসরিন প্রধানত একজন নারীবাদী লেখক। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে লেখা 'নির্বাচিত কলাম' ও 'নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য' তাঁকে যেমন খ্যাতি দিয়েছে তেমনি বিতর্কিতও করে তুলেছে। তসলিমা নাসরিনের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অসাধারণ, সমাজের নানা স্তরের নর-নারীর সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছেন তাঁর ডাক্তারি পেশার কারণে, সেইসব অভিজ্ঞতাই তাঁর অধিকাংশ লেখার মাল-মশলা জুগিয়েছে, তিনি সেইসব প্রকাশ করেছেন তাঁর একান্ত নিজস্ব অনন্যকরণীয় ঋজু ভাষায় ও সূচিমুখ তীরের ফলার মত তীক্ষ্ণ ও অব্যর্থ শব্দ চয়নের মাধ্যমে। তসলিমা নাসরিন সমস্ত ধর্মশাস্ত্র থেকে অজস্র উদ্ধৃতি তুলে ধরে দেখিয়েছেন, সেই প্রাচীন-কাল থেকে পুরুষের কর্তৃত্বাধীন ধর্ম, শাস্ত্র ও সমাজ সচেতনভাবে নারীর প্রতি বৈষম্য দেখিয়ে আসছে এবং সভ্যতার অগ্রগতি সত্বেও আজও তার অবসান ঘটেনি, শুধু রকমফের হয়েছে মাত্র আধুনিকতার

সঙ্গে তাল রেখে। দৃষ্টান্ত হিসেবে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম থেকে তাঁর কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে দেওয়া হল :

"সেই নারীকেই উত্তম বলে যে নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, পুত্র-সন্তানের জন্ম দেয় এবং স্বামীর কথার ওপর কথা বলে না।" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩।২৪।২৭)।

"নারী কখনো একটির বেশি স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না। এক স্বামীর বহু স্ত্রী থাকলেও একটি স্বামীই তাদের জন্য যথেষ্ট।" (ঐ, ৩।৫।৫।২।৪৭)।

"নিঃসন্তান বধূকে বিয়ের দশ বছর পর ত্যাগ করা যায়, যে স্ত্রী শুধু কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় তাকে বারো বছর পর, মৃতবৎসাকে পনেরো বছর পর এবং কলহ পরায়নাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা যায়।" (বৌধায়ন ধর্মসূত্র ২।৪।৬)।

"স্ত্রী যদি স্বামীর সম্ভোগ কামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হয় তবে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে কিনতে চেষ্টা করবে, আর তাতেও কাজ না হলে হাত বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে বশে আনবে।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৬।৪।৭)।

"নারী অশুভ।" (মৈত্রায়ণী সংহিতা, ৩।৮।৩)।

"যজ্ঞকালে কুকুর, শূদ্র ও নারীর দিকে তাকাবে না।" (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩।২।৪।৬)।

"কন্যা অভিশাপ।" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৬।৩।৭।১৩)।

"সর্বগুণান্বিতা শ্রেষ্ঠ নারীও তাই অধমতম পুরুষের চেয়ে হীন।" (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৬।৫।৮।২)।

"কালো পাখি, শকুনি, নেউল, ছুঁচো ও কুকুর হত্যা করলে যে প্রায়শ্চিত্ত, নারীহত্যা ও শূদ্রহত্যায় সেই একই প্রায়শ্চিত্ত।" (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ১।৭।২৩।৪৫)।

"তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করিতে পার।" (সূরা বাকারা আয়াত, ২২৩)।

"নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেতখামারের প্রতি আসক্তি মনোরম করা হইয়াছে। এইসব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু।" (সূরা আল ইমরান আয়াত ১৪)।

"স্বামী তার স্ত্রীকে চারটি কারণে প্রহার করতে পারেন। এর মধ্যে একটি

কারণ হচ্ছে সঙ্গমের উদ্দেশ্যে স্বামী যদি স্ত্রীকে আহ্বান করে এবং স্ত্রী সেই আহ্বানে সাড়া না দেয়।" (তিরমিজী হাদিস)।

আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে য়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে বিবাহ করিবে নারীদের মধ্যে যাহাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার, আর যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করিতে পারিবে না তবে একজনকে এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে।' (সুরা নিসাত আয়াত ১ রুকু)।

"গৃহের নিভৃত প্রকোষ্ঠ হল নারীর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মসজিদ।" (মসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৭)।

"পুরুষেরা যখনই নারীর আনুগত্য করেছে তখনই ধ্বংস হয়েছে।" (বুখারি)

"পুরুষই নারীর তত্ত্বাবধায়ক শাসক, কারণ আল্লাহ তাদের একেকে অপরের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন।" (সুরা নিসার আয়াত ৩০)

উপরের উক্তিগুলিই প্রমাণ করে নারীর প্রতি ধর্ম ও শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি। এই বৈষম্যকে ধর্মের নামে নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যেহেতু নারী ঘরে আবদ্ধ ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, তাদের ধর্মভীরু মন এসবকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করা সহজ নয়, একদিন বুঝতে পারলেও তার পক্ষে সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করা সম্ভব হয় না। নারীর প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ ও অমর্যাদার জন্যই তসলিমা নাসরিন ধর্ম ও সমাজকে দায়ি করেছেন। মৌলবাদীদের তাঁর প্রতি ক্রোধের কারণ এটাই—নারীর চেতনা বাড়লে ধর্মের প্রতি তাদের বিশ্বাস কমবে।

ধর্মীয় শাসনের সেই আদি যুগের তুলনায় অবশ্য এই শতাব্দীতে শিক্ষার সুযোগ, বিজ্ঞানের উন্নতি ও জীবনের তাগিদে অবস্থার কিছু কিছু উন্নতি ঘটেছে কম-বেশি সব দেশেই। নারীর অনেক অধিকারও আইনগতভাবে স্বীকৃত। নারী এখন সম্পূর্ণভাবে গৃহবন্দী নয়। তারা বাইরে বেরয়, অফিসে কাজ করে, রাস্তায় পুরুষদের সঙ্গে চলে। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে তাদের সঙ্গে পুরুষদের কোন বৈষম্য নেই। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কি সত্যিই তাই? আইনের পরিবর্তন আর সমাজ-মানসিকতার পরিবর্তন এক নয়। প্রায় শতাব্দী আগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ও কঠিন সংগ্রামের ফলে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়েছিল। কিন্তু আজও কি সমাজ স্বাভাবিক-

ভাবে ও মানসিকভাবে বিধবা বিবাহকে মেনে নিয়েছে? পাত্রী খুঁজতে গিয়ে সব পাত্রপক্ষই কুমারী মেয়ে খোঁজে, বিধবা খোঁজে না, এবং যোগাযোগ মাধ্যমে বিধবা বিবাহ শতকরা একটিও হয় কিনা সন্দেহ। তেমনি নারীর অধিকার সংক্রান্ত যতগুলি আইন পাশ হয়েছে, পুরুষ সমাজের কত শতাংশ সেগুলিকে মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছে, এটা অনুসন্ধানের বিষয় বৈকি। তসলিমা নাসরিনের অনুসন্ধান বা পর্যবেক্ষণ থেকে এর কিছু উত্তর পাওয়া যেতে পারে সত্যি সত্যি সমাজে নারীর আজ কিরকম অবস্থান।

হিন্দু ও মুসলিম সমাজ, অনেক প্রশ্নে, এই বিংশশতাব্দীর সমাপ্তি-প্রান্তে এসেও নারীর কতটুকু অধিকার কার্যত মেনে নিয়েছে তার অজস্র ব্যক্তিগত উদাহরণ তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে তো নয়ই, এমন কি শিক্ষিত নারীর মধ্যেও নারী-মুক্তির ধারণা বা বোধ জাগে নি। একদিন একা পেয়ে যে-ছেলেটি তসলিমার বাহুতে জলন্ত সিগারেট চেপে ধরেছিল, সেই পরিস্থিতি কি খুব বদলেছে? এখনো কি মেয়েদের একা-একা রাস্তায় চলা পুরুষদের মত নিরাপদ? ইভ্-টিজিংয়ের ঘটনা ঢাকা শহরে এত বেশি যে মেয়েরা সন্ধ্যার পর একা রাস্তায় বেরয় না। কলকাতা শহরেও কি ইভ-টিজিংয়ের উপদ্রব খুব কম? দিল্লি বা বোম্বের কথা না হয় বাদ দিলাম।

অভিধানে পুরুষ-এর সমার্থ শব্দ 'মানুষ', অথচ নারীর সমার্থ শব্দ হিসেবে কোথাও 'মানুষ' বা 'মনুষ্য' লেখা নেই। "বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসগুলো সন্ধ্যায় বন্ধ হয়ে যায়, হাঁস-মুরগীর খোঁয়াড় যেমন বন্ধ হয়।" কিন্তু ছাত্র নিবাসগুলোর ক্ষেত্রে এই নিয়ম নেই। পুরুষ ছাড়া কোন মেয়ের একা দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া সমাজ ভাল চোখে দেখে না। তসলিমা নাসরিনের গদ্যের প্রশংসা করতে গিয়ে একজন ঔপন্যাসিক মেয়ে লেখকদের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর লেখা 'ভাল' বললেন, কারণ তাঁর চোখে "মেয়েরা তো আলাদা"। মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে লেখক হিসেবে তাঁকে বিচার করার মত সংস্কারমুক্ত মন একজন শিক্ষিত ঔপন্যাসিকেরও নেই। "বাঙালি মেয়ের জন্য 'সতীত্ব রক্ষা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ একগামিতা শুধু নারীর জন্য অবশ্য পালনীয়, পুরুষের জন্য নয়।" তসলিমা মনে করেন 'সতীত্ব' এবং 'নষ্ট' শব্দ দু'টি শুধু নারীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে কেন? পুরুষদের বেলা 'সতীত্বের' প্রতিশব্দ নেই বা পুরুষ বহুগামিতার জন্য 'নষ্ট' হবে না কেন? বাংলাদেশে এবং ভারতেও

বহু রাজ্যে এখনো অবাধে মেয়েদের বাল্যবিবাহ প্রচলিত, অথচ বাল্যবিবাহ আইনত অপরাধ। তসলিমা নাসরিনের প্রশ্ন—"অনেকে বলে যুগ বদলেছে, যুগ কতটুকু বদলেছে? ক'টা মেয়ে খাতা কলম নিয়ে স্কুলে যায়, ক'জন মেয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে, আর যারা আসে তারাই বা সামাজিক সংস্কার কতটুকু অতিক্রম করে সঠিক শিক্ষিত হয়?" বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত অনেক মেয়ে স্বামীকে বলে 'সাহেব' বা 'কর্তা'। প্রকৃতপক্ষে পরিবারে স্বামীদের ভূমিকা এই রকমই। 'সাহেব' বা 'কর্তার' আদেশ ছাড়া কোন কিছু কার্যকর হয় না। শেষ কথা বলার মালিক তিনি। অনেক স্বামী স্ত্রীর বাইরে গিয়ে চাকরি করা পছন্দ করেন না বলে স্ত্রী যোগ্যতা সত্ত্বেও অনিচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বামীকে খুশি করতে রান্না ঘরে ঢোকেন। বাংলাদেশের যুদ্ধের পর পুরুষেরা ঘরে ফিরেছে, শুধু পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষিতা নারীদের ফিরে আসাটা সমাজ ও পরিবার মেনে নিতে পারেনি, যার জন্য অপমানে ও লজ্জায় লেখকের একুশ বছরের এক খালাকে ঘরের কড়ি কাঠে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়েছিল। চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত একটি মেয়ে, তার গান শুনেই একটি ছেলে তার প্রেমে পড়ে এবং তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের প্রথম শর্ত ছিল মেয়েটি বাইরে আর গাইতে পারবে না। "প্রসব কক্ষের বাইরে অপেক্ষমান শতকরা একভাগ পুরুষও চায় না তার সন্তান কন্যা হোক।" স্বামী স্ত্রী দু'জনই উচ্চশিক্ষিত, সুন্দর সাজানো সংসার। এই সংসারে আধুনিক জীবনের উপভোগ্য সব কিছুই আছে, নেই শুধু বই আর বই পড়ার রেওয়াজ। "মেয়েদের লেখাপড়া আমি এখনো যা দেখি অধিকাংশই ভাল বিয়ে হবার জন্য।" বিবাহে ছেলেদের প্রথম দাবি—ফর্সা মেয়ে চাই। "একটি মেয়ের সৌন্দর্য বিচার হয় তার ব্যক্তিত্বে নয়, তার ত্বকের উজ্জ্বলতায়, তার নাক চোখ ঠোঁটের আকার আকৃতিতে। খুব ক্ষুদ্র পরিসরেও বর্ণবাদ চলে। শুধু আফ্রিকা নয়, তৃতীয় বিশ্বের প্রতিটি ঘরে ঘরেই গোপনে বর্ণবাদ চলছে।" বাংলাদেশের বর্তমান সমাজে পীরদের প্রচণ্ড দাপট, অবশ্য আমাদের দেশেও কিছু কিছু গুরুজীর দাপট কম নয়। "শুনেছি আটরশির পীরের অনুমতি মিললে দেশের মন্ত্রী হওয়া যায়। পীর বলতে এখন আর মুসলমান সিদ্ধ সাধু পুরুষের ভাবমূর্তি মনে আসে না—পীর মাত্রই দুশ্চরিত্র, লম্পট, পীর মাত্রই ঝাঁক ঝাঁক যুবতী বেষ্টিত প্রচণ্ড কামুক পুরুষ। শিমুলিয়ার পীর মতিউর রহমানের চতুর্থ স্ত্রীর বয়স তেরো। লাম্পট্যের জন্য সমাজের

সকল পথ খোলা, নারী নিয়ে যথেচ্ছাচার এদেশে নিন্দনীয় নয়।" এ যুগের শিক্ষিত ছেলেরাও স্ত্রীকে শারিরীক পীড়ন করে, বেত দিয়ে নিয়মিত পেটায়, তেমন একটি ঘটনার উল্লেখ করেন তসলিমা নাসরিন। স্ত্রীর অপরাধ, স্বামীর যথেচ্ছ শারিরিক মিলনের দাবি সে মেটাতে পারে না তার যৌনাঙ্গে তীব্র যন্ত্রণার দরুণ, এই জন্য তাকে স্বামীর প্রহার সহ্য করতে হয়। মেয়েটির স্বামীর সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা হলে সে লেখকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তার স্ত্রীকে 'ভুল শিক্ষা' দেবার জন্য এবং সে তৎক্ষণাৎ মুসলিম 'হাদিস' খুলে দেখিয়ে দেয় স্ত্রীকে মেরে সে ভুল করেনি। কারণ তাতে লেখা আছে, স্বামীর সঙ্গমের ইচ্ছা পূরণ করতে অক্ষমতা জানালে স্বামী তাকে মারপিট করতে পারবে।

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের একটি পবিত্র দিন। বাংলা একাডেমিতে বিকেলে খুব ভিড় হয়। সেই ভিড়ের মধ্যে কী ঘটে? "ভিড়ের মধ্যে কোনো মেয়ে পড়লে, আমার বলতে বাধে না যে সেই মেয়ের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসে অসংখ্য হাত এবং মেয়ের স্তন, তলপেট, উরু ও নিতম্বে যে থাবা পড়ে তা তাকে শারিরীকভাবে তো অসুস্থ করেই, মানসিকভাবেও আর সুস্থ রাখে না।"

ইদানিং হঠাৎ যেন ধর্মের বাতিক দেখা দিয়েছে, বয়স্কদের তো বটেই, যুবসমাজের মধ্যেও। এ দেশ এবং ও দেশ, দু'দেশেই। ফলে ধর্মীয় বিরোধ ও বৈষম্য বাড়ছে। "বৈষম্য বাড়ছে কারণ ধর্মে বৈষম্য আছে, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এই বৈষম্যের বিপরীত কোন কথা বলে না। অন্যায়ের গোড়ায় জল ঢাললে অন্যায়ের কোন শক্তি নেই মরে যাবার।" এই ধর্মোন্মাদনার সুযোগ নিয়ে মৌলবাদীরা সমাজকে পিছনের দিকে টানতে চেষ্টা করছে। শরিয়তের শাসন মানেই নারীসমাজকে গৃহবন্দী করা। অন্যদিকে ভারতীয় সাধু মহাসভাও নারীর জন্য গৃহই আদর্শ স্থান বলে নির্দেশ জারি করেছিল। কাজেই তসলিমা নাসরিন যদি বলেন—"মানুষ হিসেবে পুরুষ ও নারীতে অসাম্য ও বিভেদ সবচেয়ে বেশি সৃষ্টি করেছে ধর্ম।"—তাহলে কি তাঁকে নিছক ধর্মবিরোধী বলে বাতিল করে দেওয়া যায়?

"স্বামী অর্থ প্রভু।" যে কোন শ্রেণীর নারীর জন্য স্বামী তার প্রভু। সে তার অর্ধাঙ্গিনী হলেও স্বামী তার অর্ধাঙ্গ নয়। অভিধানে 'অর্ধাঙ্গিনী', 'সহধর্মিনী' শব্দগুলোর কোন পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ নেই।" তসলিমা নাসরিনের এই উক্তি

কি বাস্তব ঘটনায় বিচারে অস্বীকার করা যায়? যায় না যে, তিনি নিজেই তার দৃষ্টান্ত। বস্তির একটি মেয়ে স্বামীর ঘাড় ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। তসলিমা নাসরিন সেই সাধারণ মেয়েটির সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করতে গিয়ে তফাৎ খুঁজে পাননি—"আমি একজন চিকিৎসক, দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক, আমিও কি এভাবে অত্যাচারিত হই না? আমারও ঘাড় ধাক্কা দেওয়া হয়, আমিও উপুড় হয়ে পড়ি দেয়ালে, আমারও কপাল ফেটে রক্ত বেরোয়। সরকারী কাগজপত্রে আমি একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা তাতে কী, আমি তো মেয়ে।"

আজকাল এ দেশে হিন্দু কন্যা পিতার সম্পত্তির ওপর পুত্রের সম অধিকারী। দেশ স্বাধীন হবার পরও বেশ কয়েক বছর পিতার বা স্বামীর সম্পত্তির ওপর তার কোন অধিকার ছিল না। বাংলা দেশে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী একটি মেয়ে পৈত্রিক সম্পত্তির যে অংশ পায় তা একটি ছেলের অর্ধেক। কিন্তু ওখানে হিন্দু নারীর অবস্থা পূর্বের ন্যায়, অর্থাৎ সম্পত্তির ওপর তার অধিকার নেই, পুরনো হিন্দু আইন অনুযায়ী।

তসলিমা নাসরিন মনে করেন, আমাদের অভিধানে শব্দ ব্যবহারে নারীকে নীচু করবার প্রবণতা প্রচলিত। বিয়ে বিষয়টি পুরুষ ও নারী দু'জনের জীবনেই ঘটে। দু' জনই একটি নতুন জীবনে প্রবেশ করে। কিন্তু ঘটনাটিতে দু'জনের জন্য ক্রিয়াপদের ব্যবহার ভিন্ন। মেয়ে 'বিয়ে বসে,' ছেলে 'বিয়ে করে'। অর্থাৎ যে বসে সে নিষ্ক্রিয়। যে করে সে কর্তা। তাই গৃহকর্তা শব্দটি পুরুষের। নারী জ্ঞানে-বিদ্যায়-ব্যক্তিত্বে পুরুষের চেয়ে অগ্রসর হোক —তবু। তেমনি, 'স্ত্রৈণ শব্দটির অর্থ স্ত্রীর অতিশয় বাধ্য।' 'পতিপরায়না' শব্দটির অর্থ পতির প্রতি একান্ত অনুরক্তা। কিন্তু পতিপরায়না হিসেবে একটি মেয়ে যতটুকু মর্যাদা পায় স্ত্রৈণ হিসেবে একটি ছেলে এই সমাজে ততটুকুই অমর্যাদা পায়। তসলিমা নাসরিন নিজের জন্য সারা শহরে একটি বাড়ি পান না, কারণ বাড়ির মালিকরা তাঁকে বাড়ি ভাড়া দিতে রাজি নয় সঙ্গে পুরুষ মানুষ কেউ থাকবে না বলে। কি কি কাজ মেয়েদের জন্য নিষেধ, এবং কি কি নিষেধ নয়, তার নির্ধারক কখনো মেয়ে নয়। সামাজিক নীতিবাক্যে মেয়েদের জন্য যত 'নিষেধ' বিদ্যমান, তুলনায় পুরুষের জন্য শতকরা একভাগ নিষেধও নেই। ধর্মে মেয়েদের জন্য যত নিষেধের বাণী উচ্চারিত হয়েছে, কোন পুরুষের জন্য তার সহস্র ভাগের এক ভাগও উচ্চারিত হয়নি। ছেলে ও

মেয়ে যদি আবেগে ঘনিষ্ঠ হয়, অর্থাৎ মেয়েটি গর্ভবতী হয়, তবে দু'জনের একই কর্মে ভিন্ন ফলাফল। দুর্নাম হয় মেয়ের একার, ছেলের নয়। নারীর জন্ম ব্যবহৃত কিছু শব্দেও তসলিমা নাসরিনের আপত্তি। যেমন 'অসূর্যম্পশ্যা',—পুরুষ কখনো অসূর্যম্পশ্যা হয় না। নারীর তত বেশি, যত বেশি সে ঘরের খিল এঁটে, অন্ধকারে মুখ বুজে পড়ে থাকবে। 'অনাঘ্রাতা' শব্দটিও তেমনি। পুরুষের বেলা এই শব্দটি ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠে না। পুরুষ ভোগের জিনিস নয়, ভোগের জিনিস নারী। 'ভাঙা বাসনে নাকি বেশিদিন মানুষ ভাত খেতে চায় না'—এই প্রবাদ বাক্যটি বাসন এবং ভাতের চেয়ে নারী এবং তার সতীত্বের দিকে বেশি ইঙ্গিত করে। তাই পুরুষের খাবার-দাবারে মজা যোগাবার জন্য নারীকে ঝকঝকে, মসৃণ ও অভঙ্গুর পাত্রের মত হতে হয়। শ্লীলতাহানি শব্দটি নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ পুরুষের শ্লীলতা, অর্থাৎ ভদ্রতা, শিষ্টতা ইত্যাদি নষ্ট হবার নয়। শুধু নারীর জন্য দরকার শিষ্টতা, ভদ্রতা, সতীত্ব, সৌন্দর্য ইত্যাদি। সতীত্ব, মমতা, বাৎসল্য প্রভৃতি গুণকে 'নারীধর্ম' বলে। 'পুরুষধর্ম' বলতে অভিধানে কোন শব্দ নেই। তসলিমা নাসরিন মনে করেন—"আসলে যে ধর্মটি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য দরকার তা কোন নারী বা পুরুষধর্ম নয়—তা 'মানবধর্ম'। যাদের 'মানবধর্ম' নেই তারাই নারী ও পুরুষের মধ্যে ধর্ম ভাগাভাগি করে।" তাঁর মতে, "যেদিন এই সমাজ নারীর শরীর নয়—শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়—নারীর মেধা ও শ্রমের মূল্য দিতে শিখবে, কেবল সেদিনই নারী 'মানুষ' বলে স্বীকৃত হবে।"

সকলে জানে 'সতী' শব্দের যেমন কোন পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ নেই, তেমন 'বন্ধ্যা' শব্দেরও নেই। নারীকে একাই মাথা পেতে নিতে হয় 'বন্ধ্যা' শব্দের যাবতীয় কলঙ্ক। অথচ পুরুষরাও 'বন্ধ্যা' হয়। কিন্তু প্রচলিত ধারণা ভিন্ন রকম বলে খুব সহজে পুরুষেরা সন্তান না হবার ছুতোয় বউ-তালাক এবং নতুন বিবাহের সুযোগ গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রের কর্তা মহল থেকে নিচুস্তর পর্যন্ত যে-সব পুরুষ কর্তৃক অসংখ্য নারীকে ব্যবহার করা হয়েছে ভোগের বস্তু হিসাবে, এরশাদ আমলের পর তাদের অনেকের নামের পাশে 'দেহপসারিনী', 'রক্ষিতা' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে তাদের নাম কাগজে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই মেয়েদের কী দোষ? "বিকৃত রাষ্ট্রনায়ক সারাদেশে দেহপসারিনী ছড়িয়েছে সহযোগী কামুকদের ভোগের জন্য, নিজেও যথেচ্ছ ভোগ করেছে। তার অনুগত মন্ত্রীদের, ক্ষমতাসীন

আমলাদের নানাবিধ যৌনসমস্যা ছিল, প্যাকারের যৌনবিকৃতির গল্প জানেন না এমন লোক কমই আছেন। এই কিন্তার আমরা নারীকে দেব কেন, দেব তাদের—যারা নারীকে তুচ্ছ সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে ব্যবহার করে। চিহ্নিত করবো তাদের, নারীকে আমূল গ্রাস করে যারা তুড়ি বাজিয়ে রাজ্যের সং লোক সাজে। যারা দুর্নীতির পাহাড় গড়ে সেই পাহাড়ের চূড়োর বসে দেশকে ডুবিয়ে দেয় অতল জলে।"

তসলিমা তাঁর 'নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্যে', দুঃখ করে বলেন—"একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমাকে এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, আমি কেন সমাজের নিয়ম নীতির বাইরে অন্য কথা বলি, প্রচলিত জীবনের বাইরে অন্য জীবনের ডাক দিই।" কিন্তু এই দুঃসাহসী নারী দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেন—"আমাকে যদি মৌলবাদীরা ধর্মহীনতার দোষে ফাঁসি দেয়, দেবে; যদি মৌলবাদী এই নতুন প্রজন্ম আমার লেখার হাতকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়, কেড়ে নিতে চায় কলম এবং বিবস্ত্র করতে চায় শরীর, তবে করুক। এই আমি দাঁড়ালাম সকল অপশক্তির বিপক্ষে। এই আমি নারীর ওপর ধর্মের, সমাজের, রাষ্ট্রের নির্যাতনের বিপক্ষে দাঁড়ালাম। কেউ আমাকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইলে করুক।"

একজন লেখকের আপন বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা অনুযায়ী লেখার মৌলিক অধিকারের ওপর এমনি আক্রমণের বিরুদ্ধে যাঁদের সবার আগে এগিয়ে আসার কথা, সেই বুদ্ধিজীবী সমাজের বড় বুদ্ধিমানদের অনেকেই গা বাঁচিয়ে চলার পথ ধরেছেন। অথবা ঝুঁকি না নেওয়ার সুবিধাবাদী পথ বেছে নেওয়ার মধ্যেই তাঁদের বুদ্ধির খেলা। বরং উল্টো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তসলিমা নাসরিনকে—'লেখালেখি তো আরো অনেকেই করে, কই তাদের বিরুদ্ধে তো মিছিল বেরোয় না?' তাদের মনে থাকে না গ্যালিলিও গ্যালিলি, জিয়োর্দানো ব্রুনো, সক্রেটিস, জোন অব আর্ক, মেরি ওলস্টোনক্রাফট, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মোল্লা এবং সাম্প্রতিক কালের সালমান রুশদির কথা। এমন কি যাঁরা প্রগতিশীল বলে নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁরাও মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লেখকের সমর্থনে কথা বলতে সাহস পান না। তসলিমা নাসরিনের ক্ষোভ, রিজিয়া রহমান বা সেলিনা হোসেনের মত নারী লেখকরাও লেখেন প্রচলিত সংস্কার মেনে সামাজিক বৃত্তের মাঝখানে থেকে। তাঁরা—"এতকালের অবদমন, অবদমন, এতকালের দাসত্ব, শৃংখল'

সর্বনাশ কিছুই প্রকাশ করেন না, তাঁদের লেখায় কোন ক্রোধ, কোনও প্রতিবাদ ফুটে ওঠে না। তাঁরা যে সমাজের ভোগ্য বস্তু, তাঁরা যে ধর্মের এবং সমাজের উপাদেয় সামগ্রী, তাঁরা যে দাসী, তাঁরা যে পুতুল, তাঁদের সারা শরীরে যে অত্যাচারের কালো দাগ, শৃংখলের দাগ,—কোথায় এর প্রকাশ ?"

তসলিমা নাসরিন একদিন 'টয়োটা স্প্রিন্টার' নিজে চালিয়ে একা চলে এসেছিলেন ধলেশ্বরী নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে। তাঁকে ঘিরে নানা বয়সের দর্শক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। তাদের কৌতুহলী প্রশ্ন তিনি মেয়েমানুষ হয়ে বাইরে এসেছেন কেন ? তাঁর চুল ছোট কেন ? তিনি একা কেন ? তিনি গাড়ি চালাচ্ছেন কেন ? তাঁর চলে আসার সময় তারা গাড়িতে কেউ ঢিল ছুঁড়েছে, কেউ চড় দিয়েছে, কেউ কিল দিয়েছে। একজন মেয়ের পুরুষালি চং তাদের পছন্দ নয়। সমাজ এখনো কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, অন্তত বাংলাদেশে।

উপনিষদের চরিত্র জবালার পুত্র সত্যকাম মায়ের অবৈধ সন্তান। তেমনি ঋষিরমের পুত্র বীত। গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম, কুন্তিপুত্র কর্ণ, ঘৃতাচী পুত্র দ্রোণও তাই। তাঁরা সকলেই কীর্তিমান ও বিশ্বপূজ্য জারজ পুত্র। সেকালে জারজ ও অজারজে কোন পার্থক্য ছিল না। পরে জারজ ও অজারজে পার্থক্য ও বৈষম্য তৈরি করেছে পৃথিবীর মানুষেরা। বৈষম্য নির্মাণ করেছে 'শ্রেণীর, উচ্চবিত্তে নিম্নবিত্তে, বড় জাতে ছোট জাতে' এবং পুরুষে ও নারীতে। তসলিমা নাসরিন ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন—"ঈশ্বর মানুষকে অসমান করেননি, কিন্তু মানুষ করেছে। তারা কি ঈশ্বরকে ছাড়িয়ে যেতে চায় প্রভুত্বে এবং কর্তৃত্বে ?" 'জারজ' শব্দটিকে ঘৃণা করা হয়, ঘৃণা করা হয় 'জারজ'-সন্তান ধারক নারীকে, ঘৃণা কিন্তু পুরুষকে করা হয় না, অথচ পুরুষের ব্যভিচার বা ধর্ষণে আক্রান্ত নারীকেই জারজের দায় বহন করতে হয়। পুরুষের গায়ে আঁচ লাগে না। তসলিমা নাসরিনের সিদ্ধান্ত—"পুরুষের নিয়ম ও নীতির জালে কেবল নারীর আটকা পড়বার ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত করা হয়েছে।" তিনি মনে করেন, 'অসতী' ও 'জারজ' এই দুটি শব্দই বিলুপ্ত হওয়া উচিত।

পুরুষরা চায় নারী দেখতে সুন্দর হোক। বিয়ের সময় তারা খোঁজে সুন্দর পাত্রী। অথচ পুরুষের কিন্তু হরেক রকম খুঁত। পুরুষেরা নখে ময়লা, দাঁতে ময়লা, গায়ের রং ময়লা, মুখে গন্ধ, গালে ব্রণ নিয়েও নিখুঁত

সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ফুটফুটে মেয়ে দাবি করে অনায়াসে। নারীর কি অধিকার নেই স্বামী হিসেবে সুন্দর পুরুষ পাওয়ার ?

খেলাধুলার ব্যাপারেও বৈষম্য। ছেলেদের খেলা বাইরে মাঠে, আর মেয়েদের খেলা ঘর বা ঘরের আঙিনায়। অথচ মুসলিম দেশগুলো ছাড়া মেয়েরা যে বাইরের খেলায়ও পারদর্শী তার বহু নজীর তৈরি হয়েছে। তাই তসলিমা নাসরিনের আহ্বান—"নারী তার ঘর এবং ঘরের আঙিনা ছেড়ে খেলবার জন্য বিশাল মাঠ খুঁজে নেবে, দেশের মাঠ ছেড়ে বিদেশের মাঠ। গণ্ডিবদ্ধ জীবন ছেড়ে ক্রমশ বিশালতার দিকে তাকে যেতেই হবে যদি সে শক্তিমান মানুষ হিসেবে দাঁড়াতে চায়।"

আজকাল কালো টাকার মালিকগণ অনেক পত্রিকা বার করেন। পত্রিকায় রাজনীতি যেমন থাকে তেমনি থাকে যৌনতা। বিজ্ঞাপন ছাড়া পত্রিকা চলে না। আর বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করার জন্য নিয়োগ করা হয় নারী। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক মেয়েকে বড় বড় বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে চরম মূল্য দিয়ে ফিরতে হয়। কেউ অস্বীকার করলে তাকে শুনতে হয়—'তবে এই লাইনে এলে কেন ?' এরকমই তাদের ধারণা বিজ্ঞাপন সংগ্রহের এই পেশা সম্পর্কে। মালিকেরও একই ধারণা বলেই হয়ত মেয়েদের নিয়োগ করেন। "আসলে মেয়েরা যে কাজেই এগিয়ে আসে, একেবারে বড় কর্তার পদ বাদ দিলে বাকি প্রায় সব পেশাকেই নিচু চোখে দেখা হয়। সব পেশায় শরীর শরীর গন্ধ ছড়ানো থাকে।"

একজন মহিলা নিজে রোজগার করে সাত বছর তার পঙ্গু শয্যাগত স্বামীকে খাওয়াচ্ছে। এই সময় মহিলার যৌনজীবন বলতে কিছু ছিল না। স্ত্রীর এই অবস্থা হলে তার স্বামী সাত বছর যৌন অবদমন করে থাকত কি ? যৌন অবদমন নারীর জন্য বাধ্যতামূলক হলেও পুরুষের জন্য নয়। এ অবস্থায় হয় সে আবার বিয়ে করে অথবা বেশ্যা বাড়ি যায়। কিন্তু নারীকে 'সতী' হয়ে থাকতে হয়। এটাই সমাজের বিধান। নৈতিকতার প্রশ্ন শুধু নারীর ক্ষেত্রে কেন ?

লাইগেশন নারীর জন্য, পুরুষের জন্য ভ্যাসেকটমি। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি সহজ এবং নিরাপদ। ভ্যাসেকটমি করাতে পুরুষ পাওয়া যায় না। পুরুষ মেয়েদের বাধ্য করে লাইগেশন করাতে। নারীর ওপর ঝামেলা

চাপানো বোধহয় সহজ। একজন ডাক্তার হিসেবে এরকমই দেখেছেন তসলিমা নাসরিন।

পুরুষের ক্ষেত্রে অভিভাবক হন পিতা, মাতা নয়। বিবাহিত নারীর অভিভাবক তার স্বামী। স্বামী ও স্ত্রী যদি একে অপরের পরিপূরক, তবে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অভিভাবক হতে আপত্তি উঠবে কেন? তা না হলে উভয়ে তাদের পিতা বা মাতাকে জীবনবৃত্তান্তে অভিভাবক দেখাবে। তসলিমা নাসরিন সব ক্ষেত্রে চান নারী ও পুরুষের সমমর্যাদা। 'পুরুষ আবেদনকারী' পরীক্ষকের সামনে উপস্থিত হলে সে 'ম্যারেড' কিনা প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে ওঠে কেন? নারীর নিজস্ব গুণ ও ব্যক্তিত্বকেও সব ক্ষেত্রে তার 'যোগ্যতা' বলে ধরা হয় না, অনেক ক্ষেত্রে তার সৌন্দর্য ও স্বামীর স্ট্যাটাস তার যোগ্যতার মাপকাঠি। কাজের ক্ষেত্রেও বৈষম্য। পৃথিবীর নানাদেশে মেয়েরা প্রমাণ করেছে তারা পুরুষের মত প্রায় সব ধরণের কাজের যোগ্য, কিন্তু সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা লেখা থাকলেও কাজের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেওয়া হয় না। 'মেয়েলি' এবং 'পুরুষালি' বলে আলাদা কিছু দোষ-গুণ যেমন নির্ধারণ করেছে পুরুষসমাজ, তেমনি 'মেয়েদের কাজ' এবং 'ছেলেদের কাজ' বলেও ভাগাভাগির খেলা চালাচ্ছে তারা। কবরস্থানে 'জীবিত অবস্থায়' মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু জামালপুরের কৌতি কবরস্থানে 'মৃত' মালতীকেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি, কারণ সে ছিল 'পতিতা'। সৎকারের অভাবে দু'দিন পড়ে ছিল লাশ। শেষ পর্যন্ত কবরস্থানের বাইরে একখণ্ড মাটির তলায় তার আশ্রয় জোটে। তসলিমা নাসরিন লিখেছেন, 'একজন প্রধানমন্ত্রীকে আমি যে শ্রদ্ধা করি, একজন পতিতাকে তার চেয়ে কম করি না।...কেউ পতিতা হয়ে জন্মায় না। সমাজ কাউকে মহামণীষী করে, কাউকে মস্তান করে, কাউকে পুরোহিত করে, কাউকে পতিতা করে। সমাজের 'সবলেরা' সকল সুযোগ সুবিধা নিয়ে দুর্বলকে ঠেলে দেয় অন্ধকারে, পাঁকে। পতিতা দুর্বল বলে তারা তাকে ভোগ করবে আর তাদের প্রাপ্য অধিকার কেড়ে নেবে—এই যদি তাদের সমাজ হয় তবে আমি যে এই সমাজের মানুষ—একথা ভাবতে নিজের প্রতিই আমার লজ্জা হয় খুব। ঘৃণাও কিছু কম হয় না।" 'সহমরণ প্রথার' উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন—"আমাদের পূর্বপুরুষের হাতে এখনো বিধবার শাড়ি, চুল, হাত বা ঠ্যাং ধরে টেনেহিঁচড়ে চিতায় তুলবার দাগ, আমাদের পূর্বপুরুষের হাতে বাঁশ দিয়ে

"বিধবা মেয়েকে চেপে ধরবার দাগ, এখনো পূর্বপুরুষের হাতে আমি আগুনের, ভস্মের গন্ধ পাই। এখনো পূর্বপুরুষের রক্ত থেকে নারীকে অপদস্থ করবার, আগুনে পোড়াবার প্রবণতা দূর হয়নি।" দূর যে হয়নি, প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা খুললে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গৃহবধূ নির্যাতন, গৃহবধূ হত্যা বর্তমান সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ক'টা ক্ষেত্রে অপরাধী শাস্তি পায়?

স্বামী-স্ত্রী দু জনেই চাকরি করেন। একই সঙ্গে অফিসে যান, একই সঙ্গে বাড়ি ফেরেন। "কিন্তু বাড়ি ফিরেই স্বামীটি পা এলিয়ে দেয় বিছানায়, নয়ত বেড়াতে বেরোন, ক্লাবে যান, তাস পেটান, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডায় মাতেন কিন্তু স্ত্রীটি রান্নাঘরে বাসন মাজেন, ভাত রান্না করেন, তরকারি কোটেন, মশলা তৈরি করেন, রান্না করেন এবং পরিবেশন করেন। তারপর এই রান্না করা জিনিসপত্র খান কিন্তু একজন নয়, দু'জন। স্বামীর থালায় ওঠে মাছ বা মাংসের বড় টুকরোটি।" আধুনিক জীবনে এ দৃশ্য এদেশের ঘরে-ঘরে। অথচ আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনে ঘরের কাজেও পুরুষরা অংশ গ্রহণ করে। এদেশে নিজের জামার একটা বোতাম লাগাতেও পুরুষের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। এই সংস্কার শিক্ষিত সমাজেই আরো বেশি।

নারীমুক্তির সঙ্গে অনেক সমস্যা জড়িত। ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্তি, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন, পুরুষতন্ত্রের অবসান, যৌনমুক্তি, সমাজকাঠামোর পরিবর্তন ইত্যাদি কত কি। কেউ এটার ওপর জোর দেয় তো আর একজন অন্যটার ওপর। "যে কোনও অন্যায় এবং বৈষম্যের প্রতিবাদ করতে হবে, সমস্যা কোনওটি ছোট, কোনওটি বড়, কিন্তু কোনওটিই তুচ্ছ নয়। যেহেতু তুচ্ছ নয়, প্রতিবাদ করতেই হবে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত। ছোট-বড় সকল বৈষম্যের প্রতিবাদ।"

মৌলানা মান্নানের আদেশে কমলগঞ্জের ছাতকছড়া গ্রামের মানুষেরা নূরজাহানকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলেছে। মৌলানার ফতোয়া পেয়ে ইসমাইলের বাড়িতে গর্ত খুঁড়েছে, গর্তের মধ্যে নূরজাহানকে দাঁড় করিয়ে পাথর ছুঁড়েছে। কেউ বাধা দেয়নি এই শরিয়তি ফতোয়ার বিরুদ্ধে। নূরজাহানের অপরাধ? তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। মৌলানা মান্নান তাকে নিজের ভোগের জন্য কামনা করে ব্যর্থ হয়ে তার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে এই ফতোয়া জারি করেছে। তসলিমা নাসরিন তাঁর সাক্ষাৎকারে মন্তব্য

করেছিলেন. নারীসমাজ তীব্রভাবে নির্যাতিত বলেই তাঁকে এত বেশি কড়া কথা বলতে হয়। নূরজাহানের নৃশংস হত্যা উপলক্ষেও তাঁর কলম আবার ঝলসে উঠল—"হিংস্র জন্তুও এত হিংস্র নয়, পুরুষ যত হিংস্র। পুরুষেরা নারীকে শাস্তি দেবার জন্য নানারকম আইন ফতোয়া তৈরি করেছে। এসব আরোপ করে তারা নারীর দুঃসহ যন্ত্রণা দেখে আনন্দ অর্জন করে।…এরা সমাজের বড় একটি গদিতে বসে নারীর দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে অবহেলা, অসম্মান, অন্যায়, অত্যাচার, অকথ্য নির্যাতন।"

তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ তিনি 'পুরুষবিদ্বেষী'। উপরোক্ত সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মন্তব্যকে কি কোন বিবেকবান মানুষ পুরুষবিদ্বেষ বলবেন? অভাগিনী নূরজাহানের মত আরো লক্ষ কোটি নূরজাহান যুগ যুগ ধরে সমাজে পুরুষের দ্বারা কত রকমে নির্যাতিত নিপীড়িত হয়ে আসছে, এ সত্য কি অস্বীকার করা যায়? একজন নারী হিসেবে সেই যন্ত্রণার অংশীদার হয়ে পুরুষ সমাজকে তো তিনি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেই পারেন। বিবেকহীন মনুষ্যত্বহীন পুরুষদের গায়ে তাঁর মন্তব্যে জ্বালা ধরতে পারে, কিন্তু যারা নারী-পুরুষে বৈষম্যের বদলে সম-অধিকারে বিশ্বাসী এবং মনুষ্যত্বকে সর্বোচ্চে স্থান দেয়, তাদের তো উচিত এই স্পষ্টবাদী সাহসী লেখকের প্রতি সমর্থন জানানো। হতে পারে, 'নির্বাচিত কলাম' ও 'নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্যে' তিনি যে-সব প্রশ্ন তুলেছেন, তার সবগুলোর সঙ্গে সবাই একমত হবে না, বা কোন কোন প্রশ্নে তাঁর মত অতি অবাস্তব এবং একটু বেশি বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে। তাতে কিছু এসে যায় না। রাতারাতি নারীমুক্তির বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে না, এটা তিনি যেমন বোঝেন, পাঠকও বোঝে। তবু এ না মেনে উপায় নেই, তসলিমা নাসরিনই দুই বাংলায়, এমন কি সারা ভারত উপমহাদেশে একমাত্র লেখক ও ব্যক্তিত্ব, যিনি নারীমুক্তির বিষয়টিকে অত্যন্ত গভীরভাবে তলিয়ে দেখেছেন এবং সমস্যার কারণগুলি মোটামুটি ঠিকভাবে দেখাতে পেরেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবাধীন অনেক 'মহিলা সমিতি' রয়েছে, তাদের বার্ষিক সম্মেলনগুলিতে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি বিষয়ক অনেক প্রস্তাব পাশ হয়, বক্তৃতা হয়, সেসবের তুলনায় নারীমুক্তি বা নারী সমস্যা বিষয়ক আলোচনার স্থান নগণ্য। বিশেষত বাম রাজনীতির মহলে একটা ধারণা বরাবরই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে যে, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীমুক্তি সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়

সংগ্রামকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সেটা তো দেওয়া হয়েই থাকে, পার্টির প্ল্যাটফর্ম থেকে। কিন্তু মহিলা সমিতিগুলির কি কাজ নয় বিশেষভাবে মহিলাদের অধিকার, সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলা? তসলিমা নাসরিন তাঁর লেখায় অত্যন্ত স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন কেমন করে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সমাজপরিচালকদের মধ্যযুগীয় সংস্কার নারীমুক্তির পথে সবচেয়ে বড় বাধা এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব মানুষের মন কম-বেশি সেইসব সংস্কারে আচ্ছন্ন। সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সমান্তরালে সেইসব সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না চালালে সমাজতন্ত্র এসে গেলেই কি রাতারাতি ধর্মান্ধ সংস্কারবদ্ধ মানুষের মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা বদলে যাবে? অত সহজে বদলায় না। বর্তমান রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ তার প্রমাণ। মানুষের মানসিক পরিবর্তন আনার জন্য নিরন্তর প্রচার ও সংগ্রাম দরকার। তসলিমা নাসরিন তাঁর লেখনির সাহায্যে মানুষের চেতনা বিকাশের কাজে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রেখেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে তাঁর নারীমুক্তির আদর্শ পৌঁছে গেছে। আর এই জন্যই মৌলবাদীর দল এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, আর কোন কারণ নয়। আমি সম্প্রতি খুলনা থেকে লিখিত একজন মুসলিম মহিলার চিঠি থেকে জানতে পারলাম, তসলিমা নাসরিনের বই পড়ে সেখানকার নারীরা বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করছেন। দুই দেশের প্রগতিশীল দলগুলি ও মহিলা সমিতিগুলি আজ পর্যন্ত যা করতে পারেনি, তসলিমা নাসরিনের কলম তা পেরেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, নারীমুক্তি ইত্যাদি নিয়ে সুস্থ সমাজজীবন ও রাষ্ট্রনীতির পথে আজ প্রধানতম বাধা ধর্মীয় মৌলবাদ; শুধু বাংলা দেশে নয়, এ দেশেও। অথচ এর বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে তসলিমা নাসরিনের জীবন যখন মৌলবাদীদের হাতে বিপন্ন হতে চলেছে, তখন তথাকথিত প্রগতিবাদীরা ও বুদ্ধিজীবীগণ মামুলিভাবে কাগজে বিবৃতি দিয়েই তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়েছে মনে করছেন। এ তাঁদের বোধ, বুদ্ধি ও আদর্শনিষ্ঠার দৈন্যই প্রকাশ করছে। আজ মৌলবাদ ও নানা রকম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে গণআন্দোলনের রূপ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন, নইলে প্রগতির অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। সুস্থ ও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনায় প্রভাবিত মানুষই প্রগতি-আন্দোলনের শক্তির উৎস, তথাকথিত প্রগতিশীল দলগুলি এই দিকটা উপেক্ষা করলে দেখবেন শেষ পর্যন্ত একদিন তাঁদের ভোট ব্যাঙ্কের জমার অংকও 'শূন্য' হয়ে গেছে।

প্রগতিশীল বাঙা কাঁধে-নেওয়া মানুষের সংখ্যা দিয়ে 'আসল প্রগতিশীলতার' পরিমাণ করা যায় না। গত ডিসেম্বরের দাঙ্গায় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মুখে তারা বেশির ভাগ জায়গায় প্রতিরোধের ভূমিকা পালন করার পরিবর্তে দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে—এটা বাস্তব সত্য। তাই মানুষের চেতনায় প্রসার ঘটানোর কাজটা সবচেয়ে বেশি জরুরি। আর এটা সত্যিকার প্রগতিবাদী কর্মীদের দৈনন্দিন কাজের অঙ্গ না হলে সম্ভব নয়।

। ৩ ।

তসলিমা নাসরিনের পক্ষে বিপক্ষে নানা মতের সঙ্গে নতুন আর একটি বিরুদ্ধ মন্তব্য যুক্ত হয়েছে। তিনি নাকি দুই বাংলার সংযুক্তি চান। তিনি বাঙালির ভাষা সংস্কৃতি কৃষ্টি ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক অবস্থানের পটভূমিতে যুক্ত বঙ্গের বিভাজন হয়ত মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেননি, যেমন পারেনি জার্মানরা, কোরিয়ানরা এবং পৃথিবীর আরও অনেক জাতির মানুষ। রাজনৈতিক কারণে এমনি কৃত্রিম বিভাজন ঘটে, ভারত বিভাগও এমনি ভাবেই ঘটেছে, কিন্তু সেই ঘটাকে কি সব মানুষের মন চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী বলে মেনে নেয়? তা যদি নেবে তবে 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দটা ইতিহাস থেকে মুছে গিয়ে আজ 'বাংলা দেশ' হল কেন? পূর্ব জার্মানি এবং পশ্চিম জার্মানিই বা এক হল কোন্ আবেগের প্রেরণায়? যারা দুই জার্মানিকে এক করা বা পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার 'স্বপ্ন' দেখেছিল গোড়ায়, তাদেরও তখন সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল বৈকি। সন্দেহ নেই, দুই বাংলার মধ্যে চলাচল, সংস্কৃতিক, আত্মিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সম্পর্কগুলিকে আরও নিবিড় ও অবাধ করার স্বপ্ন দেখেন তসলিমা নাসরিন। প্রকাশ না করলেও এই স্বপ্ন কিন্তু আরও অনেক অনেক মানুষ দেখেন—দুই বাংলায়ই তাঁরা রয়েছেন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার 'ক্ষমতা' তাঁর হাতে নেই, অতএব যাঁরা তাঁর এ ধরনের 'স্বপ্ন' দেখা পছন্দ করেন না, তাঁদের এত আতঙ্কগ্রস্ত হবার দরকার আছে কি? তা বলে কেউ তার আশা, ভাবনা বা স্বপ্ন ব্যক্ত করতে পারবে না, কোন লেখক বা চিন্তাবিদ সম্পর্কে এ ধরনের বাধা-নিষেধ-আপত্তির মধ্যে এক রকমের মৌলবাদী বা ফ্যাসিবাদী মানসিকতারই প্রকাশ ঘটে। আর এটা খুব বেশি করে ঘটেছে তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে। সারা বাংলা দেশ জুড়ে প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঝড় বয়ে চলেছে তাঁর 'লজ্জা' নামক

উপন্যাসটি নিয়ে। বাংলাদেশ সরকার বইটিকে নিষিদ্ধ করেছেন প্রতিবাদীদের দাবি মেনে নিয়ে। শুধু ওপার বাংলা কেন, এপার বাংলারও অনেক লোক আছেন যাঁরা মনে করেন, তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে তাদের প্রতি ওখানে অবিচার ও নিপীড়নের যে ছবি এঁকেছেন, তাতে ওখানেই যে তাদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে তা নয়, ভারতেও এর প্রতিক্রিয়া হবে। 'লজ্জা' শুধু মৌলবাদীদের হাত শক্ত করবে—দু'দেশেই। এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। যেন 'লজ্জা' লেখার আগে দু'দেশের মৌলবাদীরা দুর্বল ছিল, যেন ভারতে অসংখ্য দাঙ্গা ও বাংলাদেশে অসংখ্য মন্দির ভাঙচুর-লুটপাট-ধর্ষণের খবর কেউ জানত না। অবশ্য দু'দেশের সরকার ও প্রশাসন এসব খবরে অস্বস্তি বোধ করবে এটাই স্বাভাবিক এবং তারা এসব খবর চেপে রাখার চেষ্টাই করে থাকে। কিন্তু এসব কি চেপে রাখা যায় শেষপর্যন্ত? তারচেয়ে, মৌলবাদের সঠিক চরিত্র এবং তাদের কার্যকলাপের সঠিক চিত্রটি মানুষের সামনে তুলে ধরে একজন সাহসী ও মানবতাবাদী লেখক হিসেবে তসলিমা নাসরিন তাঁর মহৎ সামাজিক দায় পালন করেছেন। মানুষ পরিচিত হোক প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে, ভাবুক মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। যে ঘা দগদগে হয়ে উঠেছে, তাকে চেপে রেখে বা হাতুড়ে ডাক্তারের মলম লাগিয়ে লাভ হবে কি? দরকার বড় রকমের চিকিৎসা। জাতির দেহে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষতে যখন পচন ধরে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে দু'দেশেই, তখন যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব রয়েছে, তাদেরই ভাবতে হবে এই ব্যাধির চিকিৎসার কথা। আর এ-ও সত্যি, ধর্মীয় বিদ্বেষ ও মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন এই ব্যাধির চিকিৎসা হতে পারে না।

'লজ্জা' উপন্যাসের রীতি-প্রকরণ সম্পূর্ণ মেনে সঠিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে কিনা, তা আমার কাছে গৌণ। সেভাবে দেখলে বাংলা সাহিত্যের ক'টি উপন্যাসই বা 'উপন্যাস' বলে দাবি করতে পারে? আমার কাছে বিবেচ্য 'লজ্জা'র বিষয়বস্তু ও কিছু চরিত্র।

প্রথম কথা, মানুষ সহজে কি. তার জন্মভূমি ও বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে নিঃস্ব হয়ে অন্য দেশে পাড়ি দিতে চায়? অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা ও অধিকারবোধের অভাব থেকে মানুষ তা করতে বাধ্য হয়। দেশ বিভাগের পর, নেতাদের নানা মৌখিক আশ্বাস সত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে দলে দলে হিন্দুদের এ বাংলায় আসার যে স্রোত শুরু

হয়েছিল, ছেচল্লিশ বছর বাদেও তা শেষ হয়নি, এটা ঘটনা। দাঙ্গার সংখ্যা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলা দেশে ভারতের চেয়ে অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা কেন ওখানে থাকতে পারেনি ? হিন্দুদের এ দেশে চলে আসা চায়নি, এমন প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি ও-দেশে আগেও অনেক ছিল, এখনও রয়েছে ; তারাও পারেনি এ-মুখি স্রোত আটকাতে। এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই 'লজ্জা'-র কাহিনীর বিস্তার কয়েকটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে, বাবরি মসজিদ ভাঙার পটভূমিতে।

সুধাময় পেশায় ডাক্তার, যদিও প্রশাসনের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের দরুণ তিনি তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য প্রমোশন থেকে বঞ্চিত, এবং তাঁর চেয়ে জুনিয়র ও অযোগ্য লোক প্রমোশন পাওয়ায় তার অধীনে কাজ করে একদিন তাঁকে অবসর নিতে হয়েছে। এ ঘটনা অবাস্তব নয়। আমার আত্মীয় একজন বিজ্ঞানীর ভাগ্যেও ওখানে একই ব্যাপার ঘটেছে এবং তাঁর কাছে শুনেছি, এ ধরণের ঘটনা সংখ্যালঘু চাকুরেদের কাছে অপ্রত্যাশিত নয়।

সুধাময় মনে-প্রাণে দেশপ্রেমিক এবং ওখানকার সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রাবস্থা থেকেই যুক্ত ছিলেন। তিনি কোন অবস্থায় জন্মভূমি ছেড়ে ভারতে আসার কথা ভাবেননি। তবে এ-ও সত্যি, ধর্মীয় ভিত্তিতে দ্বিজাতিতত্ত্বে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে 'স্বাধীন বাংলা দেশ' গড়ার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে তাঁর দ্বিধা ছিলনা, কিন্তু পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে অমানুষিক নির্যাতন সইতে হয় তাঁকে, ওরা তাঁর পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলে। তবুও নিজের বিশ্বাসে তিনি ছিলেন অটল। তাঁর স্বপ্নের বাংলা দেশ করায়ত্ত করল, কিন্তু মুজিব-হত্যার মধ্য দিয়ে আবার ফিরে এল মিলিটারি শাসন, আধা সামরিক শাসন এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামকে করা হল রাষ্ট্রধর্ম। বইতে লাগল ভারতবিদ্বেষ তথা হিন্দু-বিদ্বেষের জোয়ার। সুধাময়ের মত নাস্তিক মানুষও মনে-মনে দুর্বল হতে লাগলেন, বিশেষ করে তাঁর মেয়ে মায়া যখন স্কুল থেকে ফেরার পথে কিডন্যাপ হয়ে যায় এবং দু'দিন বাদে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ ধরণের ঘটনার আরও খবর আসছে চারদিক থেকে। পুলিশ নিষ্ক্রিয়। শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তার কথা ভেবে সুধাময় তাঁর দু'বিঘা জমির ওপর অবস্থিত বিশাল বাড়িটি, যার বাজারমূল্য দশ লাখ টাকা, বিক্রি করতে বাধ্য হলেন মাত্র দু'লাখ টাকায়। এ ঘটনা অতিরঞ্জিত নয়। হিন্দুরা যে ওদেশে বিষয়সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে

ন্যায্য দামে বিক্রির সুযোগ পায় না, এ তো সবাই জানে। বাড়ি বিক্রি করে সুধাময় ঢাকা শহরে এসে ভাড়া বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। তখনও তিনি বিশ্বাসে অটল। হয়ত অবস্থায় একদিন পরিবর্তন ঘটবে।

সুধাময়ের ছেলে সুরঞ্জনও পিতার আদর্শে বিশ্বাসী। তারও ধর্ম বা ঈশ্বর নিয়ে মাথাব্যথা নেই। সে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। যদিও দলের উল্লেখ নেই, মনে হয় সে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন। সম্প্রদায়ের ভেদ তার কাছে নেই। নেই তার বন্ধুদেরও, যাদের অধিকাংশই মুসলমান। সুরঞ্জন বিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রি পেয়েও বেকার। কোন চাকরি জোটেনি তার। সুধাময় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার মুসলমান বন্ধুরাই ছোটাছুটি করে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেছে। চিকিৎসার খরচ প্রায় পুরোটাই দিয়েছে রবিউল। সে টেবিলের ওপর পাঁচ হাজার টাকার একটি খাম রেখে বলেছিল, 'এত পর ভাবিস না বন্ধুদের।' হ্যাঁ, এমনি উদারমনা মানুষ আরও অনেক আছে, তবু তারা কত শতাংশ বাংলা দেশে? উন আশির পর থেকে এসব প্রশ্ন দেখা দিতে থাকে সুরঞ্জনের মনে। একটা পত্রিকার সাংবাদিকতা বিভাগে কিছুদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে সে জেনেছে সারা বাংলার বিভিন্ন জেলায় সংঘটিত হিন্দু-পীড়নের অজস্র ঘটনার খবর। বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, জোর করে সম্পত্তি আত্মসাৎ, ভয় দেখিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা, মন্দির ভাঙা, নারী ধর্ষণ, ধর্মান্তরিত করা ইত্যাদি কত রকমের পীড়ন। সবাই এসবের সঙ্গে যুক্ত নয়, হয়ত তারা সমর্থনও করে না, কিন্তু এ ধরনের কাজে বাধা দেবার শক্তি বা ইচ্ছাও নেই তাদের। তাই বাবরি মসজিদ বা অন্য কোন কারণে যখনই ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ওখানে। যেন বাংলা দেশের হিন্দুরাই ভারতের ঘটনার জন্য দায়ী। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে সুরঞ্জনদের বাড়ির সবাইকে মুসলিম বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে গোপনে আশ্রয় নিতে হয়েছে কয়েকবার। সুরঞ্জনের মা কিরণময়ী হিন্দু পরিচয় ঢাকবার জন্য মাথায় সিঁদুর পরা ছেড়ে দিয়েছেন। মায়াকে মুসলিম নাম ব্যবহার করতে হয়, নিজের নামের বদলে। সুধাময় ধুতি ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি ধরেছেন। বাবরি মসজিদ ভাঙার দৃশ্য টি-ভি-তে দেখার পর আবার শুরু হয় মৌলবাদীদের তাণ্ডব ও নিপীড়ন। কয়েক হাজার বাড়ি-ঘর ও মন্দির ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আক্রমনের ভয়ে আবার মুসলমান বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের প্রশ্ন দেখা দিলে, এই প্রথম,

সুরঞ্জন বাধা দেয়। তবু আতঙ্কে মায়া নিজে থেকেই চলে যায় তার এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে তাকে মুসলিম আত্মীয়া বলে পরিচয় দেওয়া হয় বাইরের মানুষের কাছে। এ সব ঘটনায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হিসেবে সুরঞ্জনের চিন্তার ভারসাম্য নষ্ট হতে থাকে। নানাভাবে বিশ্লেষণ করে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে, সে এই দেশের একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মাত্র। এদেশে তার কোন অধিকার নেই, দাবি নেই। এখানে কোন সুবিচার পাওয়ার আশা করা বৃথা। এতদিন সে বৃথাই এ দেশকে নিজের দেশ ভেবে এসেছে। সুরঞ্জন যখন ভীষণভাবে বিপর্যস্ত নিজের স্বপ্ন-ভঙ্গের যন্ত্রণায়, তখনই একদিন তার অনুপস্থিতিতে একদল যুবক মায়াকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। তার বন্ধু হায়দার সারা শহর পাতিপাতি করে খুঁজেও মায়ার সন্ধান পায়নি। এই আঘাত সুরঞ্জনের সমস্ত মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়, তার আদর্শবোধ চাপা পড়ে যায় সাময়িক ভাবে। একটা ভীষণ প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে ওঠে তার মধ্যে। কিন্তু সে জানে প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা তার নেই, তাতে তার ভিতরের অসহায় জ্বালা ও আক্রোশ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সে বেপরোয়া হয়ে মদ খায়, একটি মুসলিম বেশ্যাকে ধরে এনে নিজের ঘরে তাকে ধর্ষণ করে। সুরঞ্জনের মত আদর্শবাদী মানুষের পক্ষে এ-ধরণের কাজ খুব অস্বাভাবিক। এর পক্ষে একটাই যুক্তি দেওয়া যেতে পারে—অন্ধ ক্রোধ মানুষকে দিয়ে অনেক অস্বাভাবিক কাজ করাতে পারে। যেমন সে বারবার নিজের মনে উচ্চারণ করেছে—"শালা শুয়োরের বাচ্চা বাংলা দেশ।" স্পষ্টই বোঝা যায় তার ক্রোধের মাত্রা। সে অনুভব করছে, এই বাংলা দেশ আর তার নয়, কারণ—'হিন্দু হয়ে এই বাংলা দেশে বেঁচে থাকবার কোনও অর্থ হয় না।' কিন্তু যে সুরঞ্জন আজ শামিমা নামে দেহোপজীবিনী মেয়েটির ওপর পশুর মত আচরণ করেছে, সে তো আসল সুরঞ্জন নয়, তার বিকৃতিমাত্র। তাই সাময়িকভাবে পশুতে রূপান্তরিত সুরঞ্জনের মধ্যে তার প্রকৃত সত্তা জেগে ওঠে—"সারারাত কাটে প্রচণ্ড অস্থিরতায়। সারারাত কাটে ঘোরে বেঘোরে। ...সে আজ তুচ্ছ একটি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, পারেনি। প্রতিশোধ সে নিতে পারে না। সারারাত শামিমা মেয়েটির জন্য সুরঞ্জন অবাক হয়ে লক্ষ করে তার মায়া হচ্ছে। করুণা হচ্ছে। হিংসে হয় না। রাগ হয় না। যদি না-ই হয় তবে আর প্রতিশোধ কিসের। তবে তো এ এক ধরণের পরাজয়। ...সুরঞ্জন কুঁকড়ে যেতে থাকে বিছানায়; যন্ত্রণায়

লজ্জায়। ...মেয়েটিকে কি আবার কখনো পাওয়া যাবে, বার কাউন্সিলের মোড়ে দাঁড়ালে মেয়েটিকে যদি পাওয়া যায়, সুরঞ্জন ক্ষমা চেয়ে নেবে।"

হতাশ, মানসিক বিপর্যস্ত সুরঞ্জন স্বপ্ন দেখে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার একটি মাত্র পথই যেন তাদের সামনে খোলা—ভারতে চলে যাওয়া। সুধাময় তাঁর হাত ধরেন। "সুধাময়ের বলতে লজ্জা হয়, তাঁর কণ্ঠ কাঁপে, তবু তিনি চলে যাবার কথা বলেন; কারণ তাঁর ভেতরে গড়ে তোলা শক্ত পাহাড়টিও দিনে দিনে ধ্বসে পড়েছে।"

"লজ্জা" উপন্যাসটিকে ইতিহাস ভিত্তিক বলা চলে। তার পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা উঠেছে, আমি সে-সবের মধ্যে যাচ্ছি না। বাংলাদেশ সম্পর্কে ইদানীং যে-সব তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে একথা বলা চলবে না যে, উপন্যাসটি নিছক বিদ্বেষ প্রসূত রচনা। তসলিমা নাসরিন অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে বাংলাদেশের পট পরিবর্তন, রাজনীতির উত্থান-পতন, দলগুলির ভূমিকা ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, তাঁর দেওয়া সংখ্যাতত্ত্বগুলিও মোটামুটিভাবে প্রামানিক। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক অমলেন্দু দে কর্তৃক সম্প্রতিকালে বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর লিখিত কিছু প্রবন্ধের তথ্যের সঙ্গে তসলিমা নাসরিনের প্রদত্ত তথ্যগুলির আশ্চর্য মিল রয়েছে। তাছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর বাবরি মসজিদ ভাঙার আগে-পরে সংঘটিত নিপীড়নের ঘটনাগুলিকে তসলিমা নাসরিন তাঁর চরিত্রগুলির মাধ্যমে তারিখ-স্থান ও নিপীড়িত নর-নারীর নামধাম সহ উল্লেখ করেছেন, ঠিক সংবাদপত্রের বিবরণের মত করে। অতএব মূল চরিত্রগুলির নাম-ধাম কাল্পনিক হলেও এদের বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সেই হিসেবে সব মিলিয়ে এটিকে ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস বলতে বাধা নেই।

প্রশ্ন ওঠে—'লজ্জা' কার? নিঃসন্দেহে, লজ্জা রাষ্ট্রের ও জাতির। যে রাষ্ট্রের ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব এবং শাসন ব্যবস্থায় দু'কোটির ওপর মানুষ তাদের জন্মভূমি ছেড়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে অন্য রাষ্ট্রে চলে আসতে বাধ্য হয়, সেটা কি সেই রাষ্ট্রের লজ্জা নয়? সে-দেশের মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ রাষ্ট্রনেতাদের, দোষ পরধর্মবিদ্বেষী রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দের। সাধারণ অশিক্ষিত সরল মানুষের মনে তারাই বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে তোলে। এরা সব দেশেই রয়েছে। ভারতেও আছে। এই জন্যই

বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছে। এর বিরুদ্ধেও তসলিমা নাসরিনের কলমের কালি ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্মবিদ্বেষ যে ধরণেরই হোক, মনুষ্যত্বের অপমান যাদের দ্বারাই সংঘটিত হোক না কেন, এব্যাপারে তাঁর কলম নির্ভয়। 'লজ্জা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর মানবিক দায়ই পালন করেছেন। ঘটনাক্রমে যেহেতু তিনি বাংলাদেশের নাগরিক, অতএব স্বাভাবিক কারণেই তাঁর গল্পের পটভূমি ও চরিত্রগুলি বাংলাদেশী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, ওখানকার গণতান্ত্রিক আদর্শ ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে শক্তি দুর্বল, তাই তাদের পক্ষে অনেকগুণ শক্তিশালী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। কিন্তু ভারত তার মহান ও দীর্ঘ গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য নিয়েই কি পেরেছে বাবরি মসজিদের ধ্বংস ঠেকাতে? পেরেছে কি বছরের পর বছর বহুরাজ্যে সংঘটিত দাঙ্গাগুলো রুখতে? পারেনি, তাই 'লজ্জা' আমাদেরও। আসলে আজ কম-বেশি দুই দেশেই মানুষের শুভবুদ্ধি বিভ্রান্ত। তবু আমরা শুধু একটা বিষয় নিয়ে গর্ব করতে পারি। বাংলাদেশ থেকে যেমন ভারতমুখী জনস্রোত বিরামহীনভাবে ধাবিত, এখানে তা নয়। এদেশে গণতান্ত্রিক অধিকারে বৈষম্য নেই। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সামনে রেখেই মূল রাজনীতির বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে। এখানে-ওখানে দাঙ্গা হলেও সাধারণভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়নি। সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী এদেশে সংখ্যালঘু মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। বরং ইদানীং প্রধান আলোচ্য বিষয়, বাংলাদেশ থেকে অগণিত হিন্দুর মত কয়েকলক্ষ মুসলমানও এদেশে চলে এসেছে এবং প্রতিদিন সীমান্ত পার হয়ে দলে দলে আরও চলে আসছে। এ লেখার উদ্দেশ্য নয়, ভারতে হিন্দু মৌলবাদের শক্তিকে ছোট করে দেখানো। কিন্তু এখানে মৌলবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম সেখানে অনুপস্থিত। এর প্রধান কারণ মৌলবাদের প্রতি সরকারী আনুকূল্য। সেই চিত্র তসলিমা নাসরিন তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তিনি আঘাত হেনেছেন উৎসমূখে। কঠিন সত্যকে সহ্য করার শক্তি বা ঐতিহ্য ওদের নেই বলেই 'লজ্জা' উপন্যাস বাংলাদেশে নিষিদ্ধ।

প্রসঙ্গ তসলিমা নাসরিন

বাসব সরকার

তসলিমা নাসরিন জীবনদর্শনে নারীবাদী। একজন নারীবাদী অনিবার্য-ভাবেই পুরুষ-বিদ্বেষী হবে, এটা কোন স্বতঃসিদ্ধ নয়। কিন্তু তসলিমা সম্পর্কে বহু লেখায়, আলোচনায় এই ধারণাটা অনেকেই বেশ জোরের সঙ্গে বলতে চান। নারীবাদ সমাজ দর্শনের একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা। তার তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে, যুক্তি পরম্পরা আছে। কিন্তু তসলিমার বক্তব্যে নারীবাদের জোরালো আলোচনা, অন্ততঃ তার যে সব গ্রন্থাদি পাওয়া যায়, সেখানে তেমন পাওয়া যায়নি। তাহলে তসলিমা নাসরিনের বক্তব্য কোন শ্রেণীতে ফেলা হবে ?

এদেশে তসলিমা নাসরিনের তাত্ত্বিক বক্তব্য নিয়ে যে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়, তার উৎস দু'টি গদ্যগ্রন্থ 'নির্বাচিত কলাম' এবং 'নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য'। দু'টি গ্রন্থই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তসলিমার লেখা নিয়মিত কলাম থেকে সংকলিত। যে কোন কলামিস্ট চলমান জীবনের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। ঘটনা বাছাই করার মধ্যে, অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ কাজ করে। সেটা লেখকের সচেতন পক্ষপাত। কলামিস্টের মন্তব্যের দার্শনিক ভিত্তি তার মধ্যেই পাওয়া যায়। বিশ্ব সংসারের যে কোন ধরণের ঘটনা বা তথ্য নিয়ে কোন কলামিস্ট লেখেন না, হাল্কা ভাবেও না। তসলিমার বক্তব্যকে কেউ যদি 'ইয়ার্কি' বলে মনে করেন, তা হলে শুধু এটা বলাই যথেষ্ট, রসিকতা করে কেউ নিজের নিরাপত্তা বিপন্ন করে না। অন্ততঃ এদেশে যাঁরা নিয়মিত লেখিয়ে তাঁরা কেউ নিজের মতামতের দায়ে খুন হয়ে যাওয়ার কিম্বা ফাঁসির দড়ি গলায় পরার মতো ঝুঁকি নিয়ে সাহিত্যে কিম্বা সাংবাদিকতায় বহু আলোচিত ব্যক্তিত্ব হয়েছেন বলে শোনা যায়নি। সুতরাং একথা মানতেই হবে একত্রিশ বছরের এই নারী, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায়, সমাজে একটা বড়ো অংশের মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মিতায়, তাদের দুঃখ ও বেদনায় ক্লিষ্ট চৈতন্য থেকে এমন কিছু বলেছেন, যা সেই সমাজেরই নানা অংশে নানাজনকে, নানাভাবে আঘাত করেছে। তসলিমার

বক্তব্য সম্পর্কে সামান্য যা কিছু এখানে স্বল্পপরিসরে বলার চেষ্টা হবে, তা মূলতঃ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই একটা মূল্যায়ণ প্রচেষ্টা মাত্র।

প্রথমেই বলা দরকার তসলিমার গদ্য রচনার মূল সুর প্রতিবাদী। তিনি প্রতিবাদকে এমনই সজোরে উপস্থিত করতে চান, যার ভাষা ও ভঙ্গিতে যুক্তি ও আবেগ একাত্মভাবে মিশে যায়। তসলিমা পাঠককে ভাবাতে, নাড়া দিতে চান। পাঠকের একটা অবস্থান ঠিক করে নেওয়ার তাগিদ এসে যায়। মনে হয় তসলিমার উদ্দেশ্য হলো পাঠককে প্রায় একটা চ্যালেঞ্জ জানানো, হয় তার কথা মানতে হবে, তার সঙ্গে তর্ক করতে হবে, নয়তো সরাসরি বিরোধিতা করতে হবে। বোধহয় তাকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। দ্বিতীয়তঃ তসলিমা তার বক্তব্যে আপোষের কোন জায়গা ছাড়তে রাজী নন। নারী প্রসঙ্গে এমন আপোষহীন মনোভাব নিয়ে কিছু বলা আমাদের অভিজ্ঞতায় বিরল ঘটনা। গভীর একটা প্রত্যয় মনে কাজ না করলে এমন স্পষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। যেমন পুরুষ চিরকাল নারীকে 'ভোগ' করে এসেছে, নারীকে 'রক্ষিতা' রেখেছে। এখন নারী যদি পুরুষকে 'ভোগ' করে, তাকে 'রক্ষিত' রাখতে চায়, তাহলে আপত্তির কি আছে? বলা বাহুল্য অন্যদেশের কথা জানিনা, এদেশের পুরুষ সমাজ এমন কথা জীবনে শোনেনি, তাও আবার একজন নারীর মুখে, তার লেখায়।

সভ্যতার যে ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘনিষ্ঠ সেখানে নারীর ভাবমূর্তি একান্তভাবেই পুরুষ-নির্ভর একটা অবলা সত্তার। নর-নারী সম্পর্কে সে সব সময়ই একটা receiving end যে রয়েছে, যার জীবনের গড়নে ক্রিয়া নয়, প্রতিক্রিয়াই মুখ্য। নারী জীবনের এই পুরুষ-কেন্দ্রিকতা তসলিমার আক্রমণের লক্ষ্য। কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে নারীর চিরকালীন গোলামীর পথ পাকা করে। বহু শত বছরের একটানা বিরামহীন আচরণ, এই বোধটাকেই নারীর প্রকৃতিগত, স্বাভাবিক করে তুলেছে। নারী যেদিন থেকে তার নারীত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, সেদিন থেকেই পুরুষের চোখে পর্দার মতো করে নিজেকে তৈরী করে নেওয়ার চাপ অনুভব করে। সেটা যেমন বাইরে থেকে, সমাজের মধ্য থেকে আসে, তেমনই তার নিজের মধ্য থেকেও আসে।

পুরুষ আর প্রকৃতি, বিপরীত মুখি কিন্তু পরিপূরক দুটি শক্তি। তাদের টান-ভালোবাসার টানাপোড়েনেই সমাজ সচল থেকেছে, এবং ভবিষ্যতেও

থাকবে। মানব প্রজন্মেরও অস্তিত্বই নইলে বিপন্ন হয়। তসলিমা বিজ্ঞান তথা সমাজ মনস্ক মানুষ। সৃষ্টিকর্মের যৌনবিধির বিরোধিতা করার মতো নির্বুদ্ধিতা তিনি কোথাও দেখাননি। বরং এই পরিপূরক সম্পর্কের উপর জোর দিয়েই তিনি বলতে চেয়েছেন, প্রকৃতির নিয়মে নারী ও পুরুষ যখন পরস্পর নির্ভর, তখন সামাজিক বাস্তবতা নারীকে পুরুষের ভোগ্য, অনুগৃহীত, স্বাতন্ত্র্য-বর্জিত প্রাণী হিসেবে তুলে ধরেছে কি করে, যাতে সে মানুষ হওয়ার বদলে 'মেয়েমানুষ' হয়ে পড়েছে। তসলিমার আক্রমণ এই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত। তসলিমার মতে এই মেয়েমানুষে পরিণত হওয়া থেকে নারীকে মুক্তি পাওয়ার জন্য লড়তে হবে। এই লড়াই যেমন পুরুষ-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে, তেমনই তার নিজেরও বিরুদ্ধে। একটু পিছনের দিকে তাকালেই দেখা যাবে বঙ্গদেশে একথা তসলিমার ভাবে ভঙ্গিতে না হলেও বক্তব্যের গভীরতায় সমমাত্রিক হিসেবে বলেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রায় সত্তর বছর আগে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের "নারীর মূল্য" গ্রন্থে এমন অনেক কিছু বলা হয়েছে যার সঙ্গে তসলিমার কথার অনেক মিল আছে। শরৎসাহিত্য সংগ্রহে, (নবম সম্ভার, এম. সি সরকার) নারীর মূল্যের যে প্রবন্ধরূপ পাওয়া যায় সেখানে দেখা যাবে তিনি মনে করেন: পুরুষের প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকেই নারীর সামাজিক অবস্থান, গুরুত্ব ও মূল্য নির্ণয়, এটাই হলো প্রচলিত রীতি। নারীর অবস্থা বিশেষের মূল্য আর নারীত্বের মূল্য, দুটোই পুরুষের প্রয়োজন ও রুচির উপর নির্ভর করে। নারীর সতীত্বের গুণগান দুনিয়ার সব দেশের পুরুষ সমাজ করে, কারণ সতীত্ব পুরুষের কাছে "উপাদেয় সামগ্রী"। সতীত্বের আবেক পিঠে রয়েছে পুরুষের, অর্থাৎ স্বামীর বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করা। পুরুষের ক্ষেত্রে সতীত্বের কোন প্রতিশব্দ নেই, অর্থাৎ তার দরকার হয় না। যেমন পুরুষ যদি জোর জবরদস্তি নারীকে ভোগ করে কেবল বিয়ের একটা ভণ্ডামি করে, শাস্ত্রকাররা "পৈশাচ বিবাহ" নামে তাকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। ব্যাপারটা উল্টো ঘটার সম্ভাবনা এদেশে নেই, কিন্তু ঘটলে শাস্ত্রকারদের স্বীকৃতি মিলবে কি? এই প্রশ্ন শরৎচন্দ্র তুলে ছিলেন, এখন এতোদিন পরে তসলিমাও তুলেছেন। দেশ ও কাল এর মধ্যে অনেক এগিয়ে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু নারীর অবস্থান?

শরৎচন্দ্র বলেছেন দেশে অতিথি সৎকারের যে চিরায়ত প্রথা ছিল সেখানে অতিথির পরিতৃপ্তির জন্য গৃহকর্তার শ্রেষ্ঠ গুণাবলী থেকে শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ,দের ছিল।

তাই বিখ্যাত ঋষিপ্রবর নিজের তরুণী স্ত্রীকে দিয়েছিলেন অতিথির সেবায়। অর্থাৎ নারীর নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছা কোন বিষয় নয়। সে পুরুষের সম্পত্তি, স্থাবর বা অস্থাবর দুটোই হতে পারে। পুরুষ কর্তৃক তার যথেচ্ছ ব্যবহার শাস্ত্রানুমোদিত। অতিথি নারায়ণ, তাঁর পরিতৃপ্তির অভাব হলে গৃহকর্তার পাপ হবে। শরৎচন্দ্র বলেছেন পুরুষের মনে এই আমিত্বের ধারণাই নারীর লাঞ্ছনার মূল কারণ। পুরুষের কাছে নারীর কেবল তাই usevalue রয়েছে —বংশরক্ষা, পুত্র প্রসব আর দৈহিক তাগিদ পূরণের জন্য—সেটা তার instrumental value, নারী হিসেবে তার নিজস্ব কোন মূল্য নেই। মধ্যযুগের ইউরোপে নারীকে peculiar representative of sexuality বলে মনে করা হতো। তার হাজার বছর পরেও সমাজ বেশিদূর এগিয়েছে বলে শরৎচন্দ্র মনে করতে পারেননি। তসলিমার রচনাতে সেটাই দেখা যায়।

তসলিমা "নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য"য়ে নারীর মূল্য থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য নারী সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যে চিন্তা শুরু করতে চেয়েছিলেন, তাকে আরো এগিয়ে দেওয়া। তবে পার্থক্যও একটা আছে। শরৎচন্দ্রের "নারীর মূল্য" গ্রন্থে বক্তব্য নানা তথ্য, যুক্তি দিয়ে সাজিয়ে মানুষকে বোঝানোর একটা ব্যাপক আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। তসলিমা যেহেতু তার সত্তর বছর পরে লিখেছেন, তাই তাঁর বক্তব্য অনেক পরিণত, আধুনিক, সাহসী, নিঃসংকোচ এবং প্রবল প্রতিবাদী। তিনি মনে করিয়ে দিতে চান বোঝানোর দিন শেষ। যে আত্মমগ্নতায় বাঙালি সমাজ আচ্ছন্ন তাকে নারীর দুরবস্থা ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে নতুন করে বোঝানোর কিছু নেই। দরকার তাকে আঘাত করে ক্রিয়াশীল করে এমন একটা সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা যাতে নারীর অবস্থা বদলের লড়াই একটা সামাজিক দায়ে পরিণত হয়। বিবেকী মানুষ নিজেকে তার প্রতি দায়বদ্ধ বলে ঘোষণা করতে পারে।

'নারীর মূল্য" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন" উপন্যাস প্রকাশিত হয়। শেষপ্রশ্নের অনন্যা নারী 'কমল'। সে প্রবল প্রতিবাদী। যুক্তি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ আবার সহমর্মিতার মোড়কে কমলের কথা এমন এক মাত্রা, ব্যঞ্জনা লাভ করেছে, যা তসলিমার প্রতিবাদী চরিত্রের প্রথম ঔপন্যাসিক খসড়া বলা যায়। কমল বলে নারীর বিশেষতঃ বিধবাদের ক্ষেত্রে সমাজ যে অসংখ্য বিধিনিষেধ তৈরী করেছে, তার সংযম, পবিত্রতার কথা, সেগুলি সবই আরোপিত ধারণা। তারা স্বতঃসিদ্ধ নয়, এবং

তাদের কোন সার্বিক গ্রহণযোগ্যতাও নেই। নারীকে নিত্যদিন এসব কথা শোনানোর মধ্যে তার জীবনের জয়বাদ্য নয়, বিসর্জনের বাজনা বাজে। অনেকের মনে হয়েছে এবং এখনও হতে পারে যে নারীর মুখে "উদ্দাম যৌবনের এই নির্লজ্জ স্তবগানে" সমাজে যা কিছু করা সম্ভব, যা কিছু করণীয়, তার সবটাই বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা প্রচুর থাকে। কিন্তু কমলের ভাবনা ভিন্ন রকম। কমল মনে করে জীবনে যা স্বাভাবিক তা নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। পুরুষ নানাভাবে এই স্বাভাবিকতাকে এক পেশে করে কেবল নিজের পক্ষেই বেপরোয়া হওয়ার ছাড়-পত্রে সমাজের, শাস্ত্রের সীলমোহর আদায় করে নিয়েছে। কমল এখানেই জানিয়েছে প্রবল আপত্তি, তসলিমা জানিয়েছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

কমল বলেছিল : "অর্থহীন সংযম আত্মপীড়নেরই নামান্তর। যে সেটা করে সে কেবল নিজেকে নয় পৃথিবীকেও ঠকায়।" সমাজের অসংখ্য ঘটনায় দেখানো যায় মৃতা স্ত্রীর শবদাহ করে ফেরার পথেই সদ্য বিপত্নীক পুরুষটিকে আত্মীয় স্বজন পরামর্শ দেয় কিছুদিন যাক্ এবার দেখেশুনে একটা বিয়ে কর। বিপত্নীকদের দুঃসহ জ্বালা দূর করতে এই পরামর্শ দেশাচার, হয়তো সদাচার সম্মত ছিল। সদ্য বিধবার ক্ষেত্রে তার আপনজন, দারুণ প্রগতিবাদীরাও এমন কথা বলতে সাহস করে না। কারণ সেটা দেশাচার সম্মত নয়। তাই 'অভাগার গরু ঘোড়া মরে আর ভাগ্যবানের বউ মরে'। কমল বলছে পুরুষ নিজের পছন্দ মতো সমাজ ও সংস্কারের একটা ঘেরাটোপ বানিয়ে নারীকে তার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে কতগুলি ফাঁকাবুলি দিয়ে, যার নাম আদর্শ। সেগুলি কেবল নারীর পক্ষেই আচরণীয়। কর্মভোগের নেশায় পুরুষেরা আমাদের মাতাল করে রাখে। তাদের ব্যবহার কড়া মদ খেয়ে চোখে আমাদের ঘোর লাগে। ভাবি এই বুঝি নারী জীবনের সার্থকতা।... শুধু মেয়েমানুষরাই জানে এতবড় দুর্ভোগ এতবড় ফাঁকি আর নেই, কিন্তু একদিন এ বিড়ম্বনা যখন ধরা পড়ে, তখন প্রতিকারের সময় বয়ে যায়।" কমল দাবী করেছিল "নারীজীবনের সত্যাসত্য নির্দেশের ভার নারীর পরেই থাক্। সে দায়িত্ব পুরুষের নিয়ে কাজ নেই।......এমনি করেই সংসারে চিরদিন ন্যায় বিড়ম্বিত, নারী অসম্মানিত এবং পুরুষের চিত্ত সংকীর্ণ কলুষিত হয়ে গেছে।"

তসলিমার নানা লেখা পড়ে মনে হয় 'শেষপ্রশ্নে' কমল যেখানে শেষ

করেছে, তসলিমা শুরু করতে চেয়েছেন সেখান থেকেই। কমল বিবাহ নামক সামাজিক অনুষ্ঠানকে অস্বীকার করতে চেয়েছে, যেহেতু এই অনুষ্ঠানে পুরুষের প্রাধান্যই আগাগোড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। তসলিমা পুরুষের সঙ্গে নারীর সমকক্ষতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন নারীর সামাজিক ভূমিকা ও অবস্থান বদলের কথা বলে। তিনি দাবি করেছেন "জরায়ুর অধিকার।" বাঙালির কানে একথা চমকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। স্বামী নামক পুরুষ কেবল তাকে ব্যবহার করবে সম্ভোগের জন্যে,'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'প্রবচনে বিশ্বাসী হয়ে পুত্র সন্তান কামনায় তাকে ক্রমাগত গর্ভবতী করবে, নিজের খেয়াল খুশি মতো তাকে শয্যাসঙ্গিনী করবে, পুরুষের এই সীমাহীন যৌন স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদেই তসলিমা দাবি করেছেন 'জরায়ুর অধিকার'। সন্তান ধারণ করাটা কেবল পুরুষের মর্জিতে না হয়ে নারীর ইচ্ছাতেই হোক, সমাজের কাছে নারীত্বের স্বীকৃতি আদায় করার জন্যই এই দাবি। ক্ষণিক সোহাগ, নারীর প্রতি প্রবল আকর্ষণ, অকৃত্রিম প্রেম যে এযাবৎ নারীকে পুরুষের সমান করেনি, এই সত্যকে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্যই তসলিমার জরায়ুর অধিকার দাবি।

তসলিমা পুরুষ-প্রাধান্যের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নানারীতি নীতি, সামাজিক অনুশাসনের বিরোধিতা করার সময়, যে সব নারী পুরুষের পায়ে আত্মসমর্পণ করাকেই জীবনের চরম সার্থকতা বলে মনে করে, তাদের সমানভাবে ধিক্কার দিয়েছেন, ঘৃণ্য, বর্জ্য বলে মনে করেছেন। সুন্দরী অভিনেত্রী ডলি আনোয়ার। ইব্রাহিম যখন স্বামী তালাক দিতে চলেছে শুনে বিষ খেয়ে মরে, তখন স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম যে তার স্বামীর তালাক দেওয়ার মানসিকতায় সামান্য রেখাপাত করে না, এই ঘটনাকে নারীত্বের অপমান বলেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। পুরুষ নির্ভরতার এহেন দৃষ্টান্ত যে নারীর পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের পরিপন্থী, তার জন্যই তসলিমা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এটা হলো 'পুরুষ-কাতরতা' যা নারীকে মুক্তবুদ্ধি, যুক্তিবাদী হতে দেয় না। তসলিমার বক্তব্য সম্ভোগের ইচ্ছা প্রবল না হলে পুরুষ তো নারী-কাতর হয় না। তাহলে নারীর 'পুরুষ-কাতরতা' কেন প্রকাশ পাবে তসলিমার সেটাই প্রশ্ন।

তসলিমা যে সামাজিক পরিমণ্ডলে আবাল্য লালিত সেখানে বাঙালিয়ানা

যতোই বিস্মিত, বিপর্যস্ত হয়েছে ততোই তার নারীবাদী চেতনার প্রাচুর্য বেড়েছে। তার চেতনায় সেকুলারত্ব ততোই নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। ইসলামী মৌলবাদ সব ধর্মের মৌলবাদের মতোই নারীত্বকে যেভাবে ক্ষুণ্ন করে, তাকে আঘাত করার জন্যই তসলিমা ক্রমাগত আঘাত করে চলেছেন। তার বক্তব্যের জন্য তাকে কখনো নাস্তিক, কখনো নিরীশ্বরবাদী মনে হয়েছে। তসলিমার প্রত্যয়সিদ্ধ ধারণা মানব ধর্মে যারা বিশ্বাসী তাদের "ঈশ্বর বোধ" নেই। পান দোষ, পরচৌর্য, মদ্যপান যেমন বর্জ্য, "ঈশ্বর বোধ"ও সেইরকমই ঘৃণ্য, বর্জ্য। ঈশ্বরের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা এই বোধকে গুণে পরিণত করে না।

এহেন বক্তব্যকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তসলিমার বক্তব্যকে যারা যৌন অতৃপ্ত নারীর বিলাপ বলে মনে করেন, কেউ না কেউ তাদের রক্ষা করুক। তসলিমার চেতনায় এরূপ শত্রুদের ডাক শোনা যাচ্ছে কিনা জানি না, তবে তিনি যে আমাদের চেনা জগতে প্রতিষ্ঠিতা, সেকথা মানতেই হবে।

খাদের সামনে দাঁড়িয়ে

সেরিনা জাহান

মাত্র বিশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে গিয়েছিলেন হায়দরাবাদের ষোড়শী কানিজ বেগম। বিক্রেতা তাঁর মা-বাবা। খদ্দের একজন আরব। পঁয়ত্রিশ বছরের মহম্মদ আলি ইলাওসি। দিল্লির নিজামউদ্দিন এলাকায় কানিজকে নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখে সকৌসএ ইলাওসিকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। কানিজ এখন খবরের কাগজের শিরোনাম। দেশের সবকটা দৈনিকই বিয়ের মুখোশ পরিয়ে মেয়ে বিক্রির এই খবর চাউর করেছে। বছর খানেক আগে, প্রায় একই ধরণের আরেকটি খবর আমরা কাগজে পড়েছি। খবরের কেন্দ্রে ছিল হায়দরাবাদেরই বছর দশেকের আমিনা। ছ'হাজার টাকার বিনিময়ে এক বৃদ্ধ সৌদি শেখের কাছে আমিনাকে বিক্রি করে দেয় তার মা-বাবা। আরবগামী এক বিমানে ওই বৃদ্ধ 'স্বামী'র পাশে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, তখন অমৃতা আলুওয়ালিয়া নামের এক দুঃসাহসি বিমানসেবিকা তাকে উদ্ধার করেন।

মেয়ে বিক্রি আমাদের দেশে নতুন নয়। বহু দরিদ্র, অনগ্রসর ও তপসিলি সমাজে টাকার অভাবে 'কন্যাসম্পদ'কে বিক্রি করে দেন মা-বাবারা। মেয়ে বলেই বাজারে তাদের বিশেষ 'মূল্য'। তেল, সাবান বা আসবাবপত্রের মতই নিছক ভোগ্যপণ্য বা ব্যবহারযোগ্য বস্তু হিসেবেই তাদের ভাবা হয়। সেইজন্য অনায়াসে বিক্রিও হয়ে যায় মেয়ের দল।

আদিবাসী সমাজ অবশ্য তথাকথিত উন্নত সমাজের মত মেয়েদের পণ্যবস্তু ভাবে না। মেয়েরা সেখানে পরিবারের সর্বময় কর্ত্রী। সেখানে পরিবারের আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখেন গৃহবধূ, সেখানে পাত্র কেনার জন্যই টাকা খরচ করতে হয় কন্যাপক্ষকে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অনেক লক্ষণই আদিবাসীদের নানা রীতিনীতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এঁরাও আর্য প্রভাব ও কুসংস্কার দাপটে পুরুষতান্ত্রিক মনোবৃত্তির অনেক ছলচাতুরি শিখে ফেলছেন। মেঘালয়ের খাসিয়ারা এখনও মা-কেই পরিবারের নেত্রী বলে মেনে নিলেও ইংরেজি শিক্ষার প্রবেশ পরিবারে মায়ের প্রভাবকে খাটো করছে। ভালোমন্দের বিচারে এর দুটি দিক

আছে। মেয়েরা কাজ করে। সন্তানও দেখে মেয়েরাই। ছেলেমেয়েকে পিঠে চাপিয়ে বাজার যায়, চাষবাস করে। আর তার পুরুষ বাড়িতে বসে আলস্য পোহায়। সকাল-সন্ধ্যা মদ গেলে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু কিরাত জনগোষ্ঠিতে এই একই হাবভাব। এসব সমাজে শিক্ষার প্রবেশ পুরুষকে সচল করছে। পুরুষ তার চিরাচরিত আলস্য কাটিয়ে অন্যদের দেখাদেখি কাজের খোঁজে ও সুযোগে বাইরে পা রাখছে। এটি অবশ্যই ভালো লক্ষণ। কিন্তু এর ভয়ংকর দিকটি হচ্ছে, তার মাথায়ও দ্রুত প্রবেশ করছে পুরুষতন্ত্রের দেমাক। শিক্ষিত খাসিয়ার আর মাতৃতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। তথাকথিত শিক্ষার আলোয় সে আড়াল করে দিচ্ছে পরিবারে মায়ের গুরুত্ব। কালক্রমে, প্রতিটি কিরাত জনগোষ্ঠিতেই মায়ের প্রভাব নির্মূল হয়ে যাবে। আবদ্ধ হয় পুরুষের দাপটে, অহংকারের তার অনাচারে শিক্ষিত মেয়েরা বন্দীজীবন মেনে নিতে বাধ্য হবে।

মাতৃতান্ত্রিক বলেই আদিবাসী সমাজে মহিলা নির্যাতন বিরল। ধর্ষণ রোজকার ব্যাপার নয়। মেয়ে বিক্রির সংখ্যাও কম। আদিবাসীরা মেয়েদের পণ্যবস্তু ভাবে না। ভাবার অবকাশ পায় না। একপেশে শিক্ষাব্যবস্থা এবং সেমিটিক ও আর্য ধর্মের চোরাগলি দিয়েই তাঁদের মধ্যেও ক্রমশ পুরুষদূষণ ঢুকছে। এ-এক ভয়ংকর সংক্রামণ। আধুনিক শিক্ষা এবং চিরাচরিত অভ্যাসের মধ্যে সমন্বয় গড়ে উঠলে বাড়-বাড়ন্ত পুরুষ-সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে আদিবাসী সমাজ রক্ষা পাবে। না হলে, তার মায়ের গুরুত্ব আমাদের চারপাশের সমাজের মতই কবরচাপা পড়ে যাবে। নৃতাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানী ও আদিবাসী প্রেমীরা এই 'বংকিকিং' বিষয়টির দিকে গুরুত্ব দিলে ভালো হয়। এখনই না ভাবলে বাড়তি এই কুফল নিয়ে তাঁদের অদূর ভবিষ্যতে চিন্তিত হতে হবে।

প্রতিটি সংগঠিত ধর্মই পুরুষের তৈরি। তাদের পয়গম্বর পুরুষ, অবতার ও পুরুষ, ঈশ্বর লিঙ্গহীন হয়েও পুরুষ। ধর্মগ্রন্থগুলিতে পুরুষের দম্ভ এবং ইচ্ছা অনিচ্ছার বিস্তার। সেমিটিক বিশ্বাসে পুরুষ 'আদমে'র বাঁ উরু থেকেই নারী 'ইভের' সৃষ্টি। সৃষ্টির আদিতেই মানুষ হিসেবে ইভের গুরুত্বকে খাটো করে দেওয়া হয়েছে। তার জন্মের ওপর প্রকৃতির হাত নেই। হাত পুরুষের। পুরুষের অঙ্গ থেকেই তার উৎপত্তি। তার মানে আগে পুরুষ আদমের জন্ম না হলে নারী ইভের জন্মই হত না। তাছাড়া, যৌন-

অনুভূতির জন্যও দায়ী করা হল নারীকে। ঈশ্বর ঝুলিয়ে রাখলেন নিষিদ্ধ ফল। সেই ফল চেখে দেখল নারী। তার সঙ্গীকেও প্ররোচিত করল ফলটি খেতে। দু'জনের মধ্যেই ধীরে ধীরে জেগে উঠল যৌন ইচ্ছে। সেমিটিক পুরাণের এই গল্পটি রূপকধর্মী, রূপকে নারী পাপিষ্ঠা, নিজে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ এবং অন্যকে তা ভক্ষণ করানোর দায়ে সে অভিযুক্ত। ধর্ম এবং লোক-সমাজে নারীকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সে আগুনের তাপে পুরুষ গলে যায়। এখানেও যৌনক্রিয়ার সাবতীয় দায় নারীর। যৌনতার মত স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তিকে ধর্ম নোংরা চোখে দেখেছে। আর এ নোংরামির সমস্ত দায় চাপিয়েছে মূলত নারীর ঘাড়েই।

তথাকথিত সভ্য সমাজ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে এড়িয়ে বেশিদূর এগোতে পারে নি। যে পরিবেশে ধর্মের প্রভাব কিছু ম্লান সেখানেও, অবচেতন মনে, মজ্জায় মজ্জায় নারী অবরোধ যোগিনী। ধর্মকে অস্বীকার করেও এমনকি নিশ্চিত নাস্তিকও নিজের অজান্তেই ধর্মের চোখ দিয়েই জরিপ করেন একজন মহিলাকে। এই মূল্যবোধ ইউরোপ এশিয়া বা পৃথিবীর যে কোনও মহাদেশেই বহাল। তফাৎ কিছু থাকলেও তা শুধুই পরিমাণগত। এই রূঢ় বাস্তবতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব সেদিনই, যেদিন একজন পুরুষ একজন মহিলাকে নয়, একজন মানুষ আরেকজন মানুষকেই তার সঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে। সেদিন বিয়ের নামে একজন চাপিয়ে দেবে না প্রভুত্ব এবং অন্যজন মেনে নেবে না দাসত্ব। সেদিন পারস্পরিক সম্মানের মধ্য দিয়ে দুই সত্তা অনুভব করবে, একে অন্যের সুষমা। প্রজ্ঞার সঙ্গে সাড়া দেবে শরীরের প্রার্থিত আলাপে। আলোকিত নদীর মত জেগে উঠবে সমান্তরাল এবং মিলোন্মুখ দুটি মন। সেদিন কত দূরে জানি না। কিন্তু এমনটি কখনও হলে বিয়ের বাহ্যিকতা, বিয়ের নামে নারীর দেহ দখলের চেষ্টা, ভোগ্যবস্তু হিসেবে তার অমর্যাদা এবং দেহবিক্রির বাজারটি বন্ধ হয়ে যাবে। সেদিন গরিব মা-বাবারা মেয়েকে আর বোঝা ভাববেন না। টাকার অভাবে, তাকে তুলে দেবেন না দেহলোভী, ব্যবসায়ী, দালালদের হাতে।

মেয়েদের পণ্য ভাবেন কেউ সজ্ঞানে। কেউ কেউ না ভাবলেও পণ্যবস্তুর মতই ব্যবহার করেন তাঁদের। মেয়েরাও জেনে এবং না জেনে পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হন। ব্যবহৃত হতে ভালবাসেন। পণ্য হিসেবে নিজেকে কত আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, পুরুষের মনে কত বেশি লালসা জাগানো যায়,

কত রকম বিজ্ঞাপিত করা যায় নিজেকে, তার এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা হাটে-বাজারে, রাস্তায়, বাড়ির অন্দরমহলে আকছার আমাদের চোখে পড়ে। অবরুদ্ধ মানসিকতা, একধরণের দাসত্ব, ব্যক্তিত্বহীনতা মেয়েদের এই ধরণের মনোভাবের মূল দায়ী। যে সমাজ যত বেশি অবরুদ্ধ, সেই সমাজের মেয়েরা তত বেশি গয়নাবিলাসী, তত বেশি অধিকার প্রবণ। আর সে যখন বাড়ির চারদেয়ালের বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন লাগামছাড়া উগ্র প্রসাধনে নিজেকে রাঙিয়ে, এক অদ্ভুত ভারসাম্যহীনতায় ভুগতে থাকে। মুসলিম দেশগুলিতে যেসব মেয়েরা পর্দা ডিঙিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন, স্কুল-কলেজে পড়েন, চাকরি করেন, তাঁদের পোশাক-আশাকে, চাল-চলনে বিজ্ঞাপিত হওয়া এবং নিজেকে বিজ্ঞাপিত করার ঝোঁকটা বড্ড চোখে পড়ে। নিজেদের যথেষ্ট আলোকিত বলে মনে করেন, এমন অনেক উচ্চ-শিক্ষিতা আরব যুবতীর মধ্যে একটা 'অবাক করা' প্রবণতা চোখে পড়েছে। ঠোঁটে সিগারেট গোঁজা এবং পরনের স্কার্টটির দৈর্ঘ্য হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর করার মধ্যেই কেবল তাঁরা আধুনিকতার গন্ধ খুঁজে পান। আর তাঁদের চুনকাম করা মুখাবয়ব ও টকটকে ঠোঁটের আড়াল থেকে আসল মানুষটিকে খুঁজে পেতে অনেক পরিশ্রম করেও সবসময় সফল হওয়া যায় না।

প্রসঙ্গত, রুশ সমাজে মেয়েদের অবস্থার কথা বলা যেতে পারে। পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সোভিয়েতরা যাতে সবদিক থেকে পরিপূর্ণ ও সুন্দর একটি জীবনের অধিকারী হন, সেজন্য লেনিন বহু চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। রুশি নারীরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁরা শুধু মেয়ে নয়, ভোগ্য পণ্য নয়, স্রেফ সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রও নন তাঁরা, মা এবং মানুষ —তাঁদের মধ্যে এই মহৎ স্বাধিকার বোধের জন্ম দিয়েছিল লেনিনের নারী-চেতনা। পুরুষরাও তাদের সহজাত সামন্তবোধ ডিঙিয়ে, মেনে নিয়েছিল সমাজতন্ত্রের এ শিক্ষা। ফলে, মেয়েরা অনেক স্বাবলম্বী হলো। বুঝলেন, পুরুষ তাঁর স্বামী নয়, প্রভু নয়। সে তাঁর বন্ধু, সহগামী এবং জীবন-কমরেড।

নারী পুরুষের সহযাত্রায় এই খোলামেলা হাওয়াটাই চাইতেন লেনিন। সোভিয়েত রাশিয়া ঘরে ঘরে তৈরি করেছিল 'মানুষ-মহিলা'। সোভিয়েত নারীর মানুষ হয়ে ওঠার, তাঁকে মানুষ বানানোর স্বাভাবিক কৌশলই খতম করেছিল পতিতা বৃত্তিকে, যৌন বিকৃতির মৃত্যুঘণ্টাও বাজিয়েছিল এই শুভবুদ্ধি। রুশিয়া প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, ধর্ষণ কী বস্তু। সমাজতান্ত্রিক

সোভিয়েতের সত্তর বছরের ইতিহাসে কখনও, কোথাও নারীদেহ বিজ্ঞাপনের অশ্রাব্য ভাষা হয় নি। কিন্তু আজকের রাশিয়া অতীতের সবকিছুকে এক 'ফুঁ'-তে অস্বীকার করতে বড় ব্যস্ত। চূড়ান্ত আর্থিক দুরবস্থা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা গোটা সমাজটার ভিতটাকেই করে তুলেছে নড়বড়ে। ভোগবিলাসী আত্মসর্বস্ব দুনিয়ার ভেসে আসা গন্ধে আজকের রুশি তরুণীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোলার চেষ্টা করছে কেতাবি বুলি আর পূর্বজদের বড় বড় 'আদর্শে'র কথা'। পশ্চিমি দুনিয়ার 'ক্যাবারে ড্যান্সার' বা 'ফটো মডেল' হিসেবে রুশি মেয়েদের এখন দারুণ চাহিদা। জমানা বদল নারীকে পণ্য বিক্রির সামগ্রী করে তাঁর মুখে শাদা হাসিটাই শুধু ছড়িয়ে দিচ্ছে না, তার ভেতরে এবং বাইরে ভারসাম্যহীন রুচি বিকৃতি, ভণ্ড ও অহং-এরও জন্ম দিচ্ছে। এইভাবেই রুশি নারীরা আবার ধীরে ধীরে মানুষ থেকে মহিলায় রূপান্তরিত হচ্ছেন। বাজারি বস্তুর মত হোটেল, রেস্তোরাঁয় তাঁর বিক্রি বাড়ছে। অভাব ও স্বভাবের টানে তাঁর দেহবিক্রির বাজার হচ্ছে প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর।

পরিবেশ ও ধর্মের বেড়াজাল নারীকে কীভাবে পণ্যে পরিণত করে তার আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মুসলিম সমাজে 'দেনমহর' বলে একটি প্রথা চালু আছে। শাস্ত্রীয় নির্দেশে, নগদ কিংবা বাকি কিছু টাকা কনের জন্য গচ্ছিত রাখতে হয় বরকে। 'মহর' শব্দটি আরবি। এর অর্থ সিল। বাংলাদেশে সম্ভবত বিয়ের প্রশ্নে, মহর-এর আগে 'দেন' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। বাংলা 'দেন' এবং আরবি 'মহর' মিলে, ব্যবহারিক অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'দেনা পাওনা'। তার মানে, টাকা দিচ্ছেন বর। নিচ্ছেন কনে। দেনাপাওনার ধর্মীয় তাৎপর্য যাই হোক না কেন, বাস্তবে বর খদ্দের এবং কনেটি বিয়ের শুরুতেই বিক্রিত সামগ্রী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছেন। ধর্মের এই নির্দেশে যাঁরা মুক্তি খুঁজে পান, তাঁরা অবশ্য বলে থাকেন, দেনমহর ব্যাপারটি আসলে আমানত। স্ত্রীর নিরাপত্তার জন্যই তাঁর বর টাকা জমা রাখছেন। সে বিয়ে এবং সম্পর্কের শুরুতেই অর্থ একটি বিষয় হয়ে ওঠে, সেখানে ভালোবাসা নিঃস্বার্থ ভাবে ফুটে ওঠার সুযোগ পায় কি? স্বামী এবং তার মা-বাবার মনে কি কখনও প্রশ্ন জাগে না, জাগবে না, অমুকের জন্য আমাদের এত টাকা খরচ হয়েছে। স্ত্রী-ও কি হেয় হন না ক্রেতা ও বিক্রেতা সুলভ সম্পর্কের চাপে? দেনমহর কি বাড়িয়ে তোলে তাঁর ইজ্জত বা নিরাপত্তাবোধ? নাকি, সবসময় বিক্রিত পণ্য হিসেবে তাঁর ভেতরে বাইরে

জন্ম দেয় হীনমন্যতা? যে গৃহবধূ শাশুড়ি-গঞ্জনার শিকার, স্বামীর দাপটে যিনি সবসময় অবনত, তাঁকে কি শুনতে হয় না, তোমার জন্য আমাদের এত খরচ হয়েছে? যে নারীর আত্মমর্যাদা আছে, যিনি বিয়েকে নিছক স্বীকৃত একটি 'পেশা' হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত নন, তাঁর কাছে দেনমহর গ্রহণ করা এবং টাকার জন্য দেহ বিক্রি—দুটোই সমান। বিয়ের নামে, পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে ওঠার আগেই অনুশাসনের 'মহর' সরল ও সংস্কারাচ্ছন্ন বিবিদের কেনা গোলাম বানিয়ে দেয়। বিবিরা, বিবিদের মা-বাবারাও কাবিন নামার (চুক্তিপত্র) সই করে কেনা বেচার এই বন্দোবস্ত মেনে নেন। দাম্পত্যের এই অসম্মান জনক শর্ত নিয়ে কেউই তেমন প্রশ্ন তোলেন না। প্রশ্ন তোলার দরকার আছে। নগদ কিংবা বাকি টাকায় পুরুষ বউ কিনল। বউটিও নিজের অজান্তেই বিক্রি হয়ে গেল। একজন নিজেকে খদ্দের ভাবতে শিখল। অন্যজনও সামাজিক অভ্যাসে কেনা বিবির মর্যাদা নিয়ে দেহ এবং মন খাটাতে শুরু করল। কানিজ এবং আমিনা, আমরা জানি, দুজনেই দুই আরবের কাছে নগদ টাকায় বিক্রি হয়ে গিয়েছিলেন। পুলিসের হাতে ধরা পড়ার পর তাঁদের বিক্রি হয়ে যাবার খবর ফাঁস হয়ে যায়। আমাদের চোখের সামনে আমাদের অলক্ষ্যে, প্রতিদিন লাখ লাখ কানিজ বা আমিনা যে বিয়ের নামে, 'আইনসম্মত' ভাবে বরের কাছে বিক্রি হচ্ছে, তার খবর কে রাখে? কানিজ ও আমিনাকে বিক্রি করেছেন তাঁদের মা-বাবারা। বিয়ের নামে, দেনমহর চাপিয়ে এই মা বাবারাই তো আকছার বিক্রি করেছেন মেয়েদের। অতএব কানিজের মা-বাবারা অপরাধী হলে, অন্যরাই বা রেহাই পাবেন কেন? ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক সম্মতি আছে বলেই কি মহারাক্ষিত চিরস্থায়ী এই বন্দোবস্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলি না আমরা? কিংবা প্রশ্ন তুলতে ভয় পাই?

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচন ঃ একটি মূল্যায়ন

অজেয়া সরকার

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নির্বাচনী রাজনীতির গতিপথ নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে এসে আজ যেখানে দাঁড়িয়েছে, তাকে আমরা এক বিশেষ ধরণের অস্থিরতার পর্ব বলতে পারি। বলতে পারি, এ হ'লো আপাত-স্থিতিশীলতার আবরণে এক জটিল ভাঙাগড়ার টানাপোড়েন। নির্বাচনী যুদ্ধের হাল-হকিকৎ প্রতি নির্বাচনেই কিছুটা বদলায়; চরিত্রে এবং ফলাফলে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রথম দু'দশকের নির্বাচনী ইতিহাসকে এতদসত্ত্বেও আমরা বহুলাংশেই একমাত্রিক বলতে পারি। একটি কঠিন এককেন্দ্রিক শাসনে বাঁধা আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্নিহিত টেনশন তখনও কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলে রেখাপাত করতে পারেনি। ষাটের দশকের শেষ থেকে এই আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের যে জটিলতা প্রথম তীব্র ভাবে অনুভূত হ'লো, নির্বাচনী রাজনীতিতেও তার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল। শুরু হ'লো জোটবদ্ধতার এবং আঁতাতের রাজনীতি। সঙ্গে এল দলত্যাগের প্রবণতা, বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে যার বিষময় ফল কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

জরুরী অবস্থার আগে পর্যন্ত এদেশের নির্বাচনী যুদ্ধের তৎপরতাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তা ছিল মূলতঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতির লড়াই—যে নীতির মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শ ও প্রায়োগিক ক্ষেত্র মিলেমিশে থাকত। ১৯৭৭ সালেই প্রথম ভারতবর্ষের মানুষ, কি সংসদ কি বিধানসভা নির্বাচনে, বিশেষ একটি ব্যবস্থাকে খারিজ করার পক্ষে রায় দিয়েছিল।

সুতরাং বলা যায় ১৯৭৭ সাল থেকেই কোন একটি 'ইস্যু' নির্বাচনী যুদ্ধের কেন্দ্র হয়ে ওঠার মত পরিস্থিতি তৈরি হল। এই 'ইস্যু' কখনো জরুরী অবস্থার বিরোধিতা, কখনো প্রধানমন্ত্রীর হত্যাকাণ্ড, কখনো বা ধর্মীয় সংহতির আহ্বান। অর্থাৎ রাজনৈতিক আদর্শ এবং কর্মসূচী ভিত্তিক রাজনীতির পরিবর্তে আমরা দেখতে পেলাম কোন তাৎক্ষণিক ভাবাবেগ বা সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ কিংবা কোনো হঠকারী রাজনৈতিক লাভের হিসেব,

নির্বাচনী রাজনীতিকে গ্রাস করে নিচ্ছে। এবং এই জটিল অস্বচ্ছ রাজনৈতিক পরিবেশেই ধর্ম এবং জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতির চাল তার নিজস্ব বাসভূমি খুঁজে নিতে তৎপর হয়ে উঠল।

কিন্তু একথাটাও সমান জোরের সঙ্গে বলা দরকার যে এই ধর্ম বা জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতি যে কোন স্থায়ী মজবুত আসন তৈরি করে নিতে পেরেছে এমন নয়। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে এখনও বহু পরস্পরবিরোধী শক্তি ও প্রবণতা নিত্য জায়মান অবস্থাতে রয়েছে। তাদের মধ্যে বামপন্থী ও চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দুটিকে দুটি ভিন্ন মেরুর অবস্থানে চিহ্নিত করা গেলেও, মধ্যবর্তী রণক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলির মধ্যে কার সঙ্গে কার সেতুবন্ধন অথবা সংঘর্ষ হবে, তা সুনিশ্চিত বা চূড়ান্ত নয়। এই কারণেই বর্তমানকে অস্থিরতার পর্ব বলা চলে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এমনটি হওয়ার কারণ কি? যে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলে ভারতবর্ষের গর্ব, সেখানে এই 'স্থিতিশীলতা' থেকে 'অস্থিরতা'র দিকে রাজনীতির গতিমুখ ঘুরে যাওয়ার কারণ কি?

কারণটা সম্ভবতঃ এখানেই যে, সদ্যস্বাধীন তৃতীয় দুনিয়ার অনগ্রসর একটি দেশে আধা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর একটি পঙ্গু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করে যেভাবে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছিল, তা কোনদিনই প্রকৃত সামাজিক প্রগতি ও স্থিতিশীলতা আনতে পারে না। অচিরেই রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ডালপালা ছড়িয়ে সজোরে নিজের অস্তিত্বকে জানান দিল। এই দ্বন্দ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাত অতি তীব্র। একদিকে কায়েমী স্বার্থের জাতি-গোষ্ঠী অন্যদিকে পরিবর্তনকামী শক্তির অস্তিত্ব রক্ষা ও বৃদ্ধি—আবার উভয়েরই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং পরস্পরকে প্রতিহত করার আকাঙ্খা—এসবেরই প্রেক্ষিত কিন্তু ওই রাষ্ট্রকাঠামোর সামগ্রিক সংকট। নির্বাচনী ফলাফলে এই দ্বন্দ্বের বিশেষ একটি আভাস খুঁজে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি যে ছ'টি প্রদেশে—উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, রাজস্থান, মিজোরাম ও দিল্লী—বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেল, তার ফলাফলকে এই সামগ্রিক প্রেক্ষিতেই আমরা বিচার করব। উত্তরপ্রদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতাকে আমরা এক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বকে বোঝার একটা মডেল হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। জাতপাত ও ধর্মীয় সংস্কার দীর্ণ এই প্রদেশের

রাজনীতিতে কিন্তু একটা বিভাজন খুব স্পষ্ট। এখানকার হিন্দু উচ্চবর্ণের মানুষেরা শুধু রাজ্যে নয় কেন্দ্রেও এযাবৎকাল ক্ষমতার ভাগ পেয়ে এসেছেন। দলীয় রাজনীতির বিন্যাস যেমনই হোক না কেন, ক্ষমতায় যে দলই এসেছে, উচ্চবর্ণের মানুষেরাই সে ক্ষমতার অধীশ্বর হয়েছেন। তারি মধ্যে আবার যে নেতা সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছেন, তাঁর স্ববর্ণের মানুষেরাই ক্ষমতার ক্ষীরটুকু ভোগ করেছেন। পরিণামে ক্ষমতার চৌহদ্দির বাইরে রয়ে গেছেন যাঁরা, তাঁরাই সামাজিক নিরিখে অনগ্রসর শ্রেণী। তবে এই অনগ্রসরতারও আবার মাত্রাগত তারতম্য ও দ্বন্দ্ব আছে। যেমন হরিজনদের সঙ্গে কুর্মিদের বা যাদবদের সংঘর্ষ। শাসকশ্রেণী এতদিন তাদের ব্যবহার করেছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে, কখনো বা রক্ষাকর্তা, কখনো বা ত্রাণকর্তা, কখনো বা সহৃদয় পালকের ছদ্মবেশে।

এছাড়াও আছে একটি বিরাট অংশ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। সাধারণভাবে বলা যায়, ভারতীয় রাষ্ট্রকাঠামোর ক্ষমতা বিন্যাসের মধ্যে এঁদের তেমন কোন ভূমিকা নেই, উল্লেখযোগ্য দু'একজন ব্যতিক্রম ছাড়া। অথচ উত্তরপ্রদেশের ভোটযুদ্ধে এঁরা অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন কারণ নিছক সংখ্যার বিচারে এঁদের সমর্থন ছাড়া ক্ষমতা দখল করা প্রায় দুঃসাধ্য। পাশাপাশি এটাও ঘটনা যে, ভারতের শাসকশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ সংকট ও সংহতির ক্রমবিনাশ একদিকে যেমন মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথকে প্রশস্ত করেছে, ঠিক তেমনি এটাও বুঝিয়েছে যে, হিন্দু সমাজের শোষিত অনগ্রসর অংশের সঙ্গে যদি ধর্মীয় সংখ্যালঘুর সমর্থনকে মেলানো যায়, তাহলে নির্বাচনে উচ্চবর্ণের রাজনৈতিক আধিপত্যকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানো সম্ভব।

মুলায়ম সিং যাদবের নেতৃত্বে এবার সপা-বসপা জোটের জয়, সম্ভবতঃ এই বিষয়টির যাথার্থকেই তুলে ধরছে। শিল্পপতি-জমিদার-ব্রাহ্মণ জোটের শাসন নয়; বেনিয়া-ঠিকাদার-পুরোহিত ভেক সন্ন্যাসীর কট্টরপন্থী জুলুম নয়; এমনকি সম্পন্ন কৃষকের রক্ষণশীলতাও নয়—মুলায়ম-কাঁসিরামের বিজয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের এক শক্তির উত্থানকে চিহ্নিত করছে। যে শক্তিকে এতকাল ভারতীয় রাজনীতিতে প্রায় নিষ্ক্রিয় ঘুমন্ত অবস্থাতেই দেখা যেত। মুলায়ম সিং যাদব কি টেকনিক নিয়েছিলেন, ভি পি সিংকে ছাড়া জনতাদল যে কার্যত অচল, ভাজপা-র নির্বাচনী প্রচারে আর-এস-এস কে নামানো কাজে দিল কি না,

অথবা নরসিংহ রাও আসলে চাননি উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের গোষ্ঠি দ্বন্দ্ব মিটে যাক—এসব নির্বাচনোত্তর বিশ্লেষণ চলুক। কিন্তু এসব কিছুকে ছাপিয়ে উত্তর প্রদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচন যে মূল বিষয়টিকে উন্মোচিত করেছে, রাজনীতির অঙ্গনে যে নতুন শক্তির উত্থানকে চিহ্নিত করেছে, তা আগামী দিনে রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশের কেন্দ্রে থাকবে। তবে প্রশ্ন উঠবে, উচ্চবর্ণের মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতার অন্দর মহল থেকে এই প্রস্থান কতটা স্থায়ী হবে? অথবা, এই পিছিয়ে পড়া মানুষের এই রাজনৈতিক উত্থান সামাজিক প্রগতিকে কতটা ত্বরান্বিত করবে? অথবা আরো সরাসরি বলা যায়, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কোন মৌলিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে অনগ্রসর শ্রেণীর, বিশেষ করে হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের এই রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশভাগী হয়ে ওঠার ঘটনাটি কি সমাজ পরিবর্তনের বৈপ্লবিক বক্তব্যটিকে নস্যাৎ করছে? যদি তা না করে, তবে এক্ষেত্রে বামপন্থীদের ভূমিকা কেমন হবে?

উত্তরে বলা যায়, একেবারে গাণিতিক হিসাবে সপা-বসপা জোট সরাসরি কংগ্রেস ও জনতাদলের ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসিয়েছে। যে হরিজন ও মুসলমান সম্প্রদায়ের কাঁধে ভর দিয়ে উচ্চবর্ণের কংগ্রেস নেতৃত্ব এতদিন শাসনক্ষমতা কব্জা করে রেখেছিলেন, ভি পি সিংহের মণ্ডল হাওয়ায় তাতে প্রথম ধাক্কা লাগে। সেই হাওয়াতেই মুলায়ম প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তির আক্রমণে প্রথম পর্যায়ে ক্ষমতা হারালেও এবারে আঁতাতের রাজনীতির কৌশলী চালে তিনি বাজীমাত করেছেন। এবং এই বাজীমাতই উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পালাবদলের সূচনা করেছে। তবে এটাও স্মর্তব্য যে, হিন্দু মৌলবাদী শক্তি সরকার গঠন করতে না পারলেও তাদের প্রভাব এখনও যথেষ্ট। এবং যে রাজনৈতিক ভাষায় ও আচরণে মুলায়ম মৌলবাদকে প্রাথমিক ভাবে প্রতিহত করতে পেরেছেন, যেভাবে তিনি কট্টরপন্থী উগ্র হিন্দুদের বিরোধী হিসাবে সনাতনী পরধর্মসহিষ্ণু হিন্দুর ইমেজকে তুলে ধরেছেন, সেই একই ভাষায় মৌলবাদকে নির্মূল করা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। আবার বামপন্থীরা যেভাবে আদর্শ ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে সরাসরি মৌলবাদের বিরোধীতা করেছেন, শিক্ষায় ও চেতনায় পিছিয়ে থাকা মানুষের কাছে সেই আবেদন সরাসরি পৌঁছতে পারছে না। উত্তরপ্রদেশের হরিজন ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, নিজেদের

অভিজ্ঞতায় যেভাবে মৌলবাদ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুর শোষণকে টের পেয়েছে— সেইভাবেই তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ভাষায় সপা-বসপা জোটকে সমর্থন করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষণে এই ভাষা যথেষ্ট ধারালো নয়, যথেষ্ট উন্নত নয়। আর জাতপাতের রাজনীতি কখনই শোষণ কাঠামোর মূলে আঘাত করতে পারে না। তারা এই কাঠামোয় যত বেশি করে প্রবিষ্ট হবে তাদের নিজের গোষ্ঠিতেও এক নতুন রকমের স্তরভেদ অবশ্যম্ভাবী। কারণ কোন শোষণ ভিত্তিক ক্ষমতা কাঠামোতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জায়গা হওয়া সম্ভব নয়। তাই শেষ পরীক্ষা এখানে বামপন্থীদেরই। পিছিয়ে থাকা ও সংখ্যালঘু মানুষের এই সংহতি ও জাগরণকে তাঁরা সমাজ বদলের পথে এনে সামিল করতে পারবেন কি না, আগামী দিনে তারই পরীক্ষা হবে।

হিমাচল, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের চিত্রটা আবার ভিন্ন ধরণের। বাবরি মসজিদ মৌলবাদী শক্তির আক্রমণে ধূলিসাৎ হওয়ার পরে দেশজোড়া প্রতিক্রিয়ায় এই তিন প্রদেশের ভাজপা সরকারকে বরখাস্ত করা হয় উত্তর-প্রদেশের মতই। রাষ্ট্রপতি শাসনে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার পরে দেখা গেল বরখাস্ত হওয়া সরকারের প্রতি সাধারণ ভাবে জনগণের কোনই বিশেষ দুর্বলতা তো নেই-ই বরং ভাজপা সরকারের অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতি সম্পর্কেও মানুষ যথেষ্ট সচেতন। কিছু পুরোনো মন্দির সংস্কার করাটাই যে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের নমুনা নয় সেটা এখানে প্রমাণ হয়ে গেছে। বিধানসভা নির্বাচনের অব্যবহিত আগে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘোরার সুযোগ এই প্রতিবেদকের হয়েছিল। বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশে ভাজপা-র নির্বাচনী কর্মী হিসাবে ছিলেন মূখ্যত বজরং দলের সুপ্তোনা যুবক-গোষ্ঠী। 'জয় শ্রীরাম' ছাড়া এইসব অঞ্চলে ভাজপার কোন রাজনৈতিক শ্লোগান ছিল না। রাজনীতিহীনতার এই মৌলবাদী রাজনীতি মানুষ প্রত্যাখান করেছে। এই পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের বিরাট জয় মূলতঃ ভাজপা'র 'রাজনীতিহীন' ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ। ধর্মবিশ্বাস নয়, ধর্মনিরপেক্ষতাও নয়, ভাজপার রাজনীতিহীনতাই এখানে ছিল নির্বাচনী 'ইস্যু'। বরং কংগ্রেসের তো রাজনীতি আছে। উচ্চবর্ণের আধিপত্য সত্ত্বেও নির্বাচনী মঞ্চে সামাজিক ন্যায়ের কথা আছে, রুটি-রুজির কথা আছে। আর নিম্নবর্গের জাগরণের আঁচ এড়াতেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পারেন নি। ফলতঃ অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতিনিধিদের কথাও কংগ্রেসি মঞ্চ—

থেকে শোনা গেছে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিস্বার্থের লড়াই সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বর্তমান শাসকশ্রেণী এখনও যে সংকট মুহূর্ত সামাল দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের জয় তার ইঙ্গিত দিয়েছে। সমস্ত মধ্যপ্রদেশে বামপন্থী বা সপা-বসপা'র মত কোন বিকল্প শক্তি জোট না থাকায় মানুষ কংগ্রেসকেই ভোট দিয়েছে।

রাজস্থানের চিত্রটির আবার স্বাতন্ত্র আছে। রাজস্থানে কংগ্রেস ও বাজপা, উভয়েরই আসন বেড়েছে। কমেছে জনতার। বস্তুত রাজস্থানে ভোট হয়েছে একেবারে সরকার গঠনের শক্তির নিরিখে। জনতা দলের একক শক্তিতে সরকার গঠনের ক্ষমতা ছিল না রাজস্থানে। আর জনতা দলও এখানে ছত্রভঙ্গ। তুলনায় রাষ্ট্রপতি শাসনের জমানায় কংগ্রেস এখানে নিজেকে অনেকটাই গুছিয়ে নিতে পেরেছে। যদিও এবারের নির্বাচনে রাজস্থানে কংগ্রেস ও বাজপা উভয়েই ভোট পেয়েছে প্রায় সমান, ৩৮ শতাংশ করে। অথচ সামান্য ০·৩১ শতাংশ ভোট বেশি পাওয়ায় সুবাদে বাজপা ১৯টি আসন কংগ্রেসের চেয়ে বেশি পেয়ে গেছে। উভয় দলই জনতার ভোট কেটেছে। এবং উভয় দলই দাবি করেছে যে, দলীয় টিকিট না পাওয়া দলত্যাগী বিদ্রোহী প্রার্থী হিসাবে না দাঁড়ালে উভয়েরই আসন সংখ্যা বাড়ত। আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল উভয় দলেরই বেশ কিছু হেভিওয়েট প্রার্থী হেরেছেন। এবং নির্বাচনোত্তর পর্বে নির্দল প্রার্থী কেনাবেচা জোরকদমে চলেছে।

রাজস্থানের ভোটপর্ব মূলতঃ যে প্রবণতার দিকে আঙুলি নির্দেশ করে, তা হলো, কোন আদর্শের লড়াই নয়, কোন কর্মসূচী কেন্দ্র করে বিতর্ক নয়, কোন দাবীকে পেশ করা নয়, নির্বাচন হ'লো সুবিধা ভোগী বিভিন্ন গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের লড়াই। শুধু তাই নয়, এই প্রতিবেদকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হ'লো অনেকক্ষেত্রেই রাজস্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের নাম ভোটার তালিকায় নেই। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, জয়সলমেয়র-এ এমনকি কংগ্রেসের প্রার্থী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, বিরাট সংখ্যক সংখ্যালঘু শ্রেণীর মানুষ সেখানে ভোটাধিকার বঞ্চিত। নির্বাচনী রাজনীতির চৌহদ্দির বাইরে তাদের জীবন সংগ্রাম—মরুভূমির আশেপাশে তাদের বসতি —উটের পিঠে চড়ে তারা ৪৫ কিমি দূরে শহরে আসে সবজি কিনতে—জয়সলমেয়র-র উট চালক এরা, ট্যুরিস্টদের উটের পিঠে চড়িয়ে মরুভূমি

যেখানেই এদের পেশা। এদের ইউনিয়ন আছে, দাবির আছে, কিন্তু ভোট নেই।

কুমায়ুন হিমালয়ের রাজনীতি আবার সমতলের থেকে আলাদা। হিমাচলের পাহাড়ী মানুষ কংগ্রেসেরই ভোট ব্যাঙ্ক ছিল। বর্ণহিন্দুর উগ্রতা আর বুর্জোয়ার শ্রেণীশোষণ কখনই খুব প্রকটভাবে এখানে নিজেকে জাহির করেনি। শান্তাপ্রসাদের ভাজপা সরকার ১৯৯০ ক্ষমতা দখল করলেও ধর্মীয় জিগিরের চেয়েও পাহাড়ী মানুষ উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। স্থানীয় সমস্যাগুলি মোকাবিলায় অক্ষমতা এবং উন্নয়নমূলক কাজ কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হিমাচলপ্রদেশে ভাজপা সরকারের সমর্থন ক্ষীয়মান হয়ে এসেছিল। তারপরে সরকারী কর্মচারীদের উপরে 'নো ওয়ার্ক নো পে' নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া এবং আপেল-চাষীদের সরকারি অনুদান দেওয়া বন্ধ করার ফলে ভাজপা সরকারের জনসমর্থন শূন্যের কোঠায় ঠেকেছিল। পরিণতিতে কংগ্রেস তার হারানো ভূমি ফিরে পেয়েছে। তবে এবারে হিমাচলের বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থীরাও নজর কেড়েছেন। কংগ্রেসের পুরানো দুর্গ ভাজপা-র হাত থেকে ফিরে এলেও খোদ সিমলা শহরে বামপন্থীরা আসন জিতেছেন। কিছুদিন আগে হিমাচলপ্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে বামপন্থী প্রার্থীদের জয়লাভের মধ্যে দিয়েই এর পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল।

মিজোরামেও কংগ্রেস জিতেছে। তবে উত্তরপূর্ব ভারতের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি হিন্দিবলয়ের বিপরীত মেরুর বললে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। ভাজপা মিজো রাজনীতিতে ঢোকার চেষ্টা করেও স্বাভাবিক ভাবেই ব্যর্থ। উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্লোগান মিজোরামের পাহাড়ে কোনই প্রতিধ্বনি তুলতে পারেনি। কিন্তু এক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ, সে-রাজ্যের উগ্রপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রকৃত অর্থে কতটা দুর্বল করতে পেরেছে, তা এত সহজে বলা যায় না। কারণ মিজোরামের কংগ্রেসও হিন্দিবলয়ের কংগ্রেস নয়। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের চেয়ে স্থানীয় রাজনীতির বোঝাপড়াই এখানে প্রতিফলিত। তবে এটুকু বলা যায় যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির দাপট অন্তত কিছুটা স্তিমিত হয়েছে। এবারে মিজোরামকে দেশের পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ বা উত্তরের সঙ্গে কতটা মেলানো যাবে আগামীদিনে তার পরিচয় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনের স্রোতে ব্যতিক্রম শুধু দিল্লী। ভাজপা এখানে জিতেছে প্রত্যাশার অতিরিক্ত আসনে। যেকথা অনাস্থিকে স্বীকার করেছেন দলের নেতারাও। দিল্লীর এই নির্বাচন ছিল বস্তুত একটি লক্ষ্যহীন নির্বাচন। মূলতঃ দলীয় সাংগঠনিক শক্তি প্রকাশ করা ছাড়া এই নির্বাচনে কোন দলেরই তেমন কোন ঝাঁপিয়ে পড়ার মত ইস্যু ছিল না। সেক্ষেত্রে বিগত লোকসভা নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সঙ্গে এবারে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত ভোট তুলনা করলে দেখা যাবে, ভাজপা-র দিল্লী ভোট ব্যাঙ্ক অক্ষত আছে, এবার তারা পেয়েছে ৪০ শতাংশ ভোট। ভোট কমেছে কংগ্রেসের, গতবারের ৪০ শতাংশের জায়গায় এবার ৩৩ শতাংশ। আর জনতা দল বাস্তবিক এবারই প্রথম কংগ্রেসের দিল্লী ভোট ব্যাঙ্কে ভাগ বসিয়ে দখল করেছে ১৩ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ নিছক গাণিতিক কারিকুরিতেই (একে অবশ্য রাজনৈতিক কৌশলও বলা যায়) ভাজপা অনেক আসনে কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে দিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেছে। অঙ্কের এই হিসেব দেখলেই, দিল্লীর নির্বাচনী ফলাফলকে ভাজপার পক্ষ থেকে সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে উপস্থাপনার অপচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায়। বলা বাহুল্য এও সেই অস্থিরতারই প্রকাশ, দিশাহীনতারই চিহ্ন। কারণ বিধানসভা আসনগুলির ভোটার তালিকা এবং ভোটদানের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হবে যে, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত অঞ্চলে ভোট পড়েছে ৬০ শতাংশের বেশি, যেখানে ভাজপা জিতেছে। কিন্তু দিল্লীর বুপড়িবাসী নিম্নবিত্ত এলাকাগুলিতে ভোটদানের হার কম, ভোট এখানে ভাগ হয়েছেও বেশি। মূলত এইসব অঞ্চলেই জনতা দল কংগ্রেসের ভোট কেটেছে প্রায় ২০টি আসনে। দিল্লীর নিম্নবিত্ত মানুষকে ভোটযুদ্ধে আরো বেশি সংখ্যায় টেনে আনা গেলে (যেটা উত্তরপ্রদেশে সপা-বসপা জোট পেরেছে) এবং কংগ্রেস ও জনতার মধ্যে ভোট ভাগ এড়ানো গেলে ভাজপার জয় কিছুতেই দিল্লী শহরেও নিশ্চিত হতো না।

পরিশেষে এটুকুই বলা যায় যে, এই সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল এ-দেশের রাজনীতিতে কোন সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে পারছে না। মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির অগ্রগতি রোধ করা গেলেও তাকে নির্মূল করার প্রসঙ্গটি এখনও অধরাই থাকছে। বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংকট, গণতান্ত্রিক বিকাশের আকাঙ্খার পাশাপাশি

সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীলতা ও ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তির উত্থান, এতদিনের শক্তি ভারসাম্যকে বিচলিত করেছে। তারি সঙ্গে, খুব জোরালো না হলেও অনগ্রসর ও দলিত মানুষের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ পুরোনো ক্ষমতা কাঠামোর দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে। সর্বভারতীয় অর্থে কোন বামপন্থী বিকল্পও নেই। কংগ্রেস নির্বাচনে কিছুটা ভালো ফল করলেও এই সংকটকে সম্পূর্ণ নিজস্ব শক্তিতে কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা তার আর নেই। প্রকৃতই কোন গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তি জোট তৈরি না হলে আগামীদিনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে দুর্যোগ অবধারিত।

মৌলবাদ বনাম যুক্তিবাদরূপ মৌলবাদবিরোধিতা: 'মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ' প্রবন্ধের সংযোজনে

অমিতাভ চন্দ্র

'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয় ১৪০০ (বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ১-৩, আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৯৩, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪০০) সংখ্যায় প্রকাশিত বন্ধুবর অধ্যাপক সমীর কুমার দাসের লেখা 'মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ' (পৃঃ ৮৫-১০৩) নামক প্রবন্ধটি নতুনত্বের আস্বাদ দেয় এবং চিন্তার খোরাক যোগায়। সাবলীল ভাষায় এবং তত্ত্ব-তথ্যের সমন্বয়ে সুলিখিত এই প্রবন্ধে সমীর মূলত মৌলবাদ কি—তাই নিয়ে ও কিছুটা পরিমাণে মৌলবাদ কেন—সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং যুক্তিসিদ্ধ মৌলবাদবিরোধিতার প্রচলিত পথে না হেঁটে অন্য পথে হাঁটাচলা করেছেন। সে জন্য তাঁর অবশ্যই অভিনন্দন প্রাপ্য। সমীরের এই প্রবন্ধটিকে যদি দুটি অংশে বিভক্ত করা যায়, তবে দেখা যায় প্রথম অংশে সমীর আলোচনা করেছেন প্রচলিত মৌলবাদ নিয়ে, বিশ্লেষণ করেছেন তার স্বরূপ, প্রয়োজনমত সমালোচনার ও বিরোধিতার শরে বিদ্ধও করেছেন এই মৌলবাদকে। তাঁর আলোচনার এই অংশটির সঙ্গে আমি মোটামুটি সহমত পোষণ করি এবং সেই কারণেই এই অংশটি সম্পর্কে আমার অন্তত কোনও বক্তব্য নেই। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে সমীর আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন প্রচলিত যুক্তিসিদ্ধ মৌলবাদবিরোধিতার স্বরূপ, যা তাঁর চোখে 'যুক্তিসিদ্ধ তথাকথিত মৌলবাদবিরোধী আর এক মৌলবাদ' (পৃ ৮৫), এবং সেই কারণেই তাঁর কলমে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে এই ধরণের মৌলবাদ-বিরোধিতা, যা তাঁর মতে বিশেষ কার্যকর নয়। অবশ্য ঠিক কি ধরণের মৌলবাদবিরোধিতা কার্যকর, তার কোনও সন্ধান তিনি অন্তত এই প্রবন্ধে কোথাও দেন নি। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মৌলবাদ নিজেকে একটি বিশেষ পর্যায়ে উত্তীর্ণ করতে পারলে, তিনি তাকে মৌলবাদবিরোধিতার তুলনায় শ্রেয়ঃ বলেই মনে করেছেন (পৃ ৯৯)। অবশ্যই প্রবন্ধে সমীর তাঁর নিজের অভিমতেরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে মৌলবাদ নিজেকে বিশেষ একটি পর্যায়ে উত্তীর্ণ করতে পারলে তিনি তাকে মৌলবাদবিরোধিতার চেয়ে

ধেয়: বলে মনে করতেই পারেন, সেটা তাঁর ব্যাপার। তবে প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশে প্রকাশিত সমীরের 'যুক্তিসিদ্ধ তথাকথিত মৌলবাদবিরোধী আর এক মৌলবাদ'—এর স্বরূপ বিশ্লেষণ ও সমালোচনা প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আর সেই কারণেই তাঁর প্রবন্ধটির এই সামান্য সংযোজন।[১]

প্রবন্ধের শেষে সমীর জানিয়েছেন মৌলবাদীর সঙ্গে যুক্তিবাদী মৌলবাদ-বিরোধীর কথোপকথনের (ডায়ালগ) ব্যর্থতা তাঁকে 'অফুরন্ত হাসির খোরাক যোগায়' (পৃ ১০০), তাঁর 'অকারণ হাসির উদ্রেক করে' (পৃ ১০২)। মৌলবাদীর সঙ্গে যুক্তিবাদী মৌলবাদবিরোধীর কোনও প্রকৃত কথোপকথন (ডায়ালগ) যে সম্ভবপর হচ্ছে না, এবং তার ফলে 'অদ্ভুত বর্বরতার আক্রান্ত' (পৃ ১০২) হয়ে আছে সমাজ, সে সম্পর্কে এক প্রকার দুঃখবোধ-হাহুতাশের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটেছে সমীরের প্রবন্ধের। মৌলবাদীর সঙ্গে প্রকৃত যুক্তিবাদী মৌলবাদবিরোধীর কোনও যথার্থ কথোপকথন আদৌ কখনও সম্ভবপর কিনা, সে প্রশ্ন তিনি এই প্রবন্ধে কোথাও তোলেননি, সেরকম ভাবনার কোনও ছাপও তাঁর লেখায় পড়তে দেখা যায় নি। যদিও এই বিষয়টি নিয়েই আমাদের আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারত, তবে এই প্রসঙ্গে বরং পরেই আসা যাবে।

মৌলবাদবিরোধী যুক্তিবাদ সম্পর্কে সমীরের আপত্তির প্রধান কারণ হল এই যুক্তিবাদের কয়েকটি উপাদানের সঙ্গে তাঁর নিজের মতে 'মৌলবাদ-সুলভ বিশ্বাসের কোনো পার্থক্য নেই' (পৃ ৯০), মৌলবাদের মতই এই যুক্তিবাদেরও কেন্দ্রবিন্দুতে আছে বিশ্বাস, মৌলবাদের মতই এই যুক্তিবাদও দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের নড়বড়ে ভিতের উপর। সমীর জানিয়েছেন, এখানে আধুনিক-যুক্তিবাদ বলতে তিনি সেই বিশেষ ধরনের যুক্তিবাদের কথাই বলছেন, 'যার স্বরূপ অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের "আলোকপ্রাপ্ত যুগান্তরের" (এনলাইটেনমেন্ট) পর্ব থেকে উদ্ঘাটিত হতে দেখা যাচ্ছে' (পৃ ৯০) এবং '...এই সময়ে যাকে যুক্তি বলে উপস্থিত করা হল তা কিন্তু আর যাই হক, স্থান্-কাল-পাত্রের ওপরে নির্ভরশীল নয়। কোনো বিশেষ পরিস্থিতি-ভেদে যুক্তির যে তারতম্য হতে পারে—একথা পরিষ্কার অস্বীকার করা হল। যা যুক্তিসম্মত তার একটা সাধারণ আবেদন রয়েছে। আজ যাকে যুক্তিসম্মত বলে মনে করছি কালও তা যুক্তিসম্মত হতে বাধ্য।...দেশভেদে বা কালভেদে যুক্তির কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। বলা বাহুল্য, এখানে বিশেষ পরিস্থিতির কোনো গুরুত্ব

নেই। যুক্তির এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মৌলবাদের একটা চমৎকার মিল রয়েছে'। (পৃ ৯০)। সমীর এখানে যুক্তিবাদের যে রূপের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হল আধুনিক যুক্তিবাদের আদি রূপ, যান্ত্রিক রূপ, যেখানে যুক্তি স্থান-কাল-পাত্রের উপর নির্ভরশীল নয়, যেখানে যুক্তি স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ, যেখানে দেশভেদে বা কালভেদে বা পাত্রভেদে যুক্তির কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু এটাই তো যুক্তিবাদের একমাত্র রূপ নয়। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে যুক্তিবাদেরও বিবর্তন ঘটেছে। যুক্তিবাদেরও রূপভেদ আছে, যে রূপভেদকে এখানে অস্বীকার করা হয়েছে। যুক্তিবাদের রূপভেদে যুক্তিবাদ স্থান-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ নয়, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার উপর নির্ভরশীল। মার্কসবাদ তো দাঁড়িয়ে আছে যুক্তির ভিতের উপরে, আর এই মার্কসীয় যুক্তিবাদ স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ নয়, মার্কসের লেখায় যখন reason ('যুক্তি') কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন তা স্থান-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। মস্কোর প্রগতি প্রকাশন থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত **A Dictionary of Philosophy**[২]-তে লেখা হয়েছে : '...Rationalism means belief in reason, in the reality of rational judgement, in the force of argument In this sense Rationalism is opposed to irrationalism.'[৩] আর এই প্রসঙ্গেই ঐ অভিধানে লেখা হয়েছে :

> The limitation of Rationalism lies in its denial of the thesis that universality and necessity came into being through experience. Rationalism absolutises the indisputable nature of these logical attributes, does not recognise the dialectics of transition of knowledge from the lesser universality and necessity to the greater and alosolute ones. This limitation of Rationalism was overcome by Marxism, which examines knowledge in its unity with practice.[৪]

মার্কসবাদে জ্ঞান প্রয়োগের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ, তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মার্কসবাদে যুক্তিবাদ সংযুক্ত হচ্ছে dialectics-এর সঙ্গে, আর তখনই যুক্তিবাদ হারাচ্ছে তার যান্ত্রিকতা, যুক্তি হয়ে উঠছে স্থান-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ। এই প্রসঙ্গেই Antonio Gramsci-র **The Modern**

Prince and other Writings[৫] -এর অন্তর্ভুক্ত 'Critical Notes on an Attempt at a Popular Presentation of Marxism by Bukharin'[৬] থেকে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> It is noteworthy, , that Marx never called his conception "materialist", and how when speaking of French materialism, he criticised it and stated that the criticism ought to have been more exhaustive. Thus he never uses the formula of "materialist dialectic", but spoke of "rational" as opposed to "mystic", which gives the term 'rational' a very precise significance.[৭]

আর এই প্রসঙ্গেই কার্ল মার্কসের Capital-এর প্রথম খণ্ডের তাঁর নিজের লেখা 'Afterword' to the Second German Edition-এর শেষ অনুচ্ছেদটির (প্যারাগ্রাফ) ঠিক আগের অনুচ্ছেদটি[৮] এবং মার্কসের Theses on Feuerbach-এর অষ্টম থিসিসটিও[৯] দেখে নেওয়া যেতে পারে। যুক্তিবাদের নানা রূপভেদ সহ এ সমস্ত বিষয়ই তো সমীরের ভালরকমই জানা, তবুও তিনি যুক্তিবাদ ও যুক্তির বিরুদ্ধে স্বীয় বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে আধুনিক যুক্তিবাদের এই বিভিন্ন রূপভেদকে বেমালুম অস্বীকার করে যুক্তিবাদকে নির্দিষ্ট একরূপী ধরে নিয়ে সমগ্র যুক্তিবাদ ও যুক্তিকেই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে নিলেন। বিচারটা বোধ হয় ন্যায্য হল না।

অন্যত্র অধ্যাপক দাস লিখেছেন, 'যুক্তিবাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল : যুক্তি একবার অকাট্য বলে প্রমাণিত হলে আর কোন কথা নেই ; চরম অসহিষ্ণুতায় ভ্রান্ত যুক্তির পথ পরিহার করাই হল যুক্তিবাদী মনের ধর্ম। এ থেকেই পল ফেয়েরাবেন্ড সিদ্ধান্ত করেছেন, যুক্তির এক "সর্বময় কর্তৃত্ব" (ইউনিভার্সাল অথরিটি) আছে।' (পৃ ১৪)। এই প্রসঙ্গে আমার বিনীত নিবেদন হল, যুক্তি যদি অকাট্য বলে একবার প্রমাণিতই হয়, তবে সেই অকাট্য যুক্তি মানা এবং সেই যুক্তির পথ অনুসরণ করাটা কিভাবে চরম অসহিষ্ণুতা হল, সেটা ঠিক পরিষ্কার হল না। সত্য যে মিথ্যার চেয়ে শ্রেয়:, এটা কি ঠিক কোনভাবে কোন পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে প্রমাণ করা সম্ভব? এবং তার প্রয়োজনও হয় না, কারণ এটা তো স্বতঃসিদ্ধই (axiom), প্রমাণসাপেক্ষ নয়। সেক্ষেত্রে মিথ্যার পরিবর্তে সত্যের পথ অনুসরণ করাটাও কি চরম অসহিষ্ণুতা বলে

গণ্য হবে ? স্বতঃসিদ্ধ (axiom) বলে তো কিছু থাকবেই। অন্ধবিশ্বাসের তুলনায় যুক্তির শ্রেষ্ঠত্বও এই স্বতঃসিদ্ধের পর্যায়েই পড়ে। এটা কেউ না মানতেই পারেন, তবে সেটা তাঁর নিজের দায়িত্ব, তাঁর ব্যাপার। পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, অন্ধবিশ্বাসের জোরে এটাও তো কেউ কেউ এখনও না মানতেও পারেন, এবং সেই মতের লোকও একেবারে নেই, এমনও নয়। তবে কি চরম সহিষ্ণুতা দেখিয়ে সেই মতকেও মূল্য দিতে হবে ? আর অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তির পথ অনুসরণ করাটা যদি চরম অসহিষ্ণুতাই হয়, তাহলে সেই অপরাধে আমরা যারা নিজেদের মৌলবাদ-বিরোধী যুক্তিবাদী বলে মনে করি এবং সেইভাবে পরিচিত, অপরাধী তো বটেই, এমন কি স্বয়ং লেখকও সেই অপরাধের স্পর্শ থেকে মুক্ত নন। এই প্রসঙ্গটিতেও পরে আসছি।

লেখক তাঁর প্রবন্ধে যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে 'যুক্তির আড়ালে জাতিরাষ্ট্রের জয়গান' (পৃ ৯১) গাওয়ার অভিযোগ এনেছেন, 'জাতিরাষ্ট্রের অযৌক্তিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন' (পৃ ৯১) তাঁরা তোলেন না বলে তাঁদের অভিযুক্ত করেছেন। লেখক কি এখানে সাধারণভাবে 'জাতিরাষ্ট্রের জয়গান' গাওয়ার অভিযোগ এনেছেন, না কি তাঁর অভিযোগ শুধুমাত্র 'ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের জয়গান' গাওয়ার ক্ষেত্রে ? লেখক অত্যন্ত সঠিকভাবেই লিখেছেন, 'জাতি এবং জাতিরাষ্ট্রের উত্থান ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্যায়েই ঘটে থাকে।' (পৃ ৯১)। রাষ্ট্র যতদিন থাকবে, তার একটা ভিত্তি থাকবেই, আর সেই ভিত্তিটা হল জাতি। রাষ্ট্র এক জাতির ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে, বহু জাতির ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে, একজাতিক রাষ্ট্র হতে পারে, বহুজাতিক রাষ্ট্র হতে পারে। প্রশ্নটা হল ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের তথা ভারতীয় জাতির যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা নিয়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় এবং তার প্রয়োজনে জাতীয়তাবাদীদের তরফ থেকে ভারতীয় জাতি এবং তার ভিত্তিতে ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের তত্ত্বটি খাড়া করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জাতি তত্ত্বটির কোনও বাস্তব ভিত্তিই নেই, ভারতীয় জাতি বলে কিছু ছিল না, নেইও, ভারতীয় জাতির ধারণাটিকেই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভারত হচ্ছে বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র, যেখানে প্রতিটি জাতিরই আত্মনিয়ন্ত্রণের ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকার থাকা উচিত। স্বাধীনতার পর ভারতীয় জাতির এই

অলীক তত্ত্বটি ফেরি করে থাকে কংগ্রেস, বি জে পি প্রভৃতি শাসকশ্রেণীর দলগুলি এবং তাদের তাত্ত্বিকেরা। এর মধ্যে আবার বি জে পি সহ সমগ্র হিন্দু মৌলবাদী 'সংঘ পরিবার' এই বিষয়টিকে আরও কয়েক কাঠি চড়িয়ে ভারতীয় জাতি ও 'হিন্দু জাতি'কে সমার্থক করে 'হিন্দু জাতি' ও তার ভিত্তিতে 'হিন্দু রাষ্ট্র'-এর মারাত্মক তত্ত্বটি ফেরি করে থাকে। কমিউনিস্টরা তত্ত্বগতভাবে ভারতীয় জাতির তত্ত্বে বিশ্বাসী নন, কিন্তু বর্তমানে ভারতের কমিউনিস্টদের একটা বড় অংশই নিজেদের প্রয়োজনে 'জাতীয় সংহতি'র নামে এই তত্ত্বে তাল মিলিয়ে থাকেন। কিন্তু মৌলবাদবিরোধী যুক্তিবাদীদের একটা বড় অংশই ভারতীয় জাতির ও ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের জয়গান তো গানই না, বরং এই চাপিয়ে দেওয়া অলীক তত্ত্বটির বিরোধিতাই করে থাকেন। এ সব তথ্য লেখকের নিশ্চয়ই অজানা নয়, তা সত্ত্বেও তিনি সাধারণভাবে যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে যুক্তির আড়ালে ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের জয়গান গাওয়ার এই বাস্তববিবর্জিত অভিযোগটি আনলেন কেন? এই প্রসঙ্গেই একটি প্রশ্ন মনে জাগছে। লেখক কি যুক্তিবাদীকে শাসকগোষ্ঠীর বা শাসকশ্রেণীর প্রতিশব্দ ধরে নিয়েছেন? লেখক এই ক্ষেত্রে যেভাবে নেহ্‌রুর প্রসঙ্গ এনেছেন, তাতে এই রকম একটা সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। প্রবন্ধের অন্যত্রও লেখকের এই রকম একটি ধারণার আভাস পাওয়া যায়, কারণ সে সব ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে লেখক রাষ্ট্রশক্তি ও শাসকগোষ্ঠী বা শাসকশ্রেণীকে আক্রমণ করতে গিয়ে যুক্তি, যুক্তিবাদ, যুক্তিবাদী প্রমুখকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে নিয়েছেন। যদি তাই হয়, তবে সেক্ষেত্রে যুক্তিবাদীকে শাসকগোষ্ঠীর বা শাসকশ্রেণীর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে আমার তীব্র আপত্তি জানিয়ে রাখি। অপরাপর যুক্তিবাদীরাও নিঃসন্দেহে এই আপত্তির শরিক হবেন।

লেখক অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই 'যুক্তি এবং বিজ্ঞানের নামে,' 'বিজ্ঞানের উন্নতির নামে', 'বিজ্ঞানের অগ্রগতির দোহাই দিয়ে,' 'প্রগতির স্বার্থে' রাষ্ট্র-শক্তির যাবতীয় অমানবিক ও জনবিরোধী কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন। (পৃ ১১)। এই বিষয়ে লেখকের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু যুক্তি ও বিজ্ঞানের নামে রাষ্ট্রশক্তির ও রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসকশ্রেণীর এই অমানবিক ও জনবিরোধী কার্যকলাপের জন্য যুক্তি ও বিজ্ঞানকে দায়ী করা কেন? শাসকশ্রেণী ও তার রাষ্ট্রশক্তি যুক্তি ও বিজ্ঞানকে

নিজেদের যাবতীয় অপকর্মের দোহাই হিসাবে ব্যবহার করতেই পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে এই অপকর্মের দায়িত্ব যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর বর্তায় না, যুক্তি ও বিজ্ঞান নিজেরাই কখনও এর জন্য সমালোচনার ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না। আর যুক্তি ও বিজ্ঞানের নামে এই সমস্ত অমানবিক ও জনবিরোধী কাজকর্ম চালানোর জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রও যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক হিসাবে প্রতিপন্ন হয় না। 'মৌলবাদ-বিরোধিতা ··এক শক্তিশালী কর্তৃত্ব-কাঠামোর জন্ম' দিয়েছে (পৃ ২৫), 'যুক্তিবাদ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতই এক বিপজ্জনক হিংসাযন্ত্রে পরিণত হয়েছে' (পৃ ২৭) ইত্যাদি সমস্তই লেখকের নিজস্ব মনগড়া ধারণা যার বশবর্তী হয়ে তিনি মৌলবাদবিরোধী যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর যাবতীয় সমালোচনা ও আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছেন। ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র মৌলবাদবিরোধী, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক কোনওটাই নয়, মৌলবাদ তোষণ এবং মৌলবাদের সঙ্গে আপস আমাদের রাষ্ট্রের শুরু থেকে আজ অবধি ইতিহাস। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, আমাদের দেশে 'মৌলবাদের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের এক আশ্চর্য গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে' (পৃ ২৮)। মারণাস্ত্র ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধোপকরণ নির্মাণকারী বিজ্ঞানের প্রতি হিন্দু মৌলবাদের অনুরাগ ও সমর্থন প্রথম থেকেই ছিল, এখনও আছে, এবং তা ক্রমশ বাড়ছে। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

'প্রজানুরঞ্জক রামের কল্পিত রাজধর্মের আদলে সাভারকর সাজিয়ে নেন তাঁর অভিষ্ট রাষ্ট্রধর্ম—হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থান, এই পুণ্যত্রয়ীর সম্মিলনে সৃষ্ট সে-ধর্ম। তাঁর মতাদর্শে অর্থনৈতিক সাম্যের যেমন কোনো জায়গা ছিল না, তেমনি সব প্রকারের আন্তর্জাতিকতাবাদী চিন্তার প্রতি তাঁর ছিল গভীর বিরাগ। ১৯৬১ সালের ১৫ই জানুয়ারি, প্রকাশ্য সভায় দেওয়া জীবনের শেষ অভিভাষণে সাভারকর বলেন : কেবলমাত্র সামরিক সামর্থ্যের বাটখারা দিয়েই দেশীয় মহত্ত্বের পরিমাপ করা যায় ; যে গণতন্ত্র ভীরু এবং পদে-পদে শত্রুর সামনে মাথা নোয়াতে কুণ্ঠিত হয় না তা তাজ্য—নপুংসক গণতন্ত্রের চেয়ে হিটলার শতগুণে শ্রেয় ; ভারতের উচিত, তার সামরিক বাহিনীকে আরো আধুনিক ও জোরদার করে তোলা ; ভারতের কর্তব্য, ক্রমাগত নতুন ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধোপকরণ বানিয়ে চলা—যথা, হাইড্রোজেন বোমা।'[১০]

বর্তমানেও ভারতকে পরমাণু শক্তিধর এক আগ্রাসী শক্তি বানিয়ে তোলার সবচেয়ে বড় সমর্থক বি জে পি সহ সমগ্র হিন্দু মৌলবাদী শক্তি।

আর এই আলোচনা প্রসঙ্গেই আমাদের মনে রাখা দরকার, বিজ্ঞানকে মারণাস্ত্র ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের উপকরণ হিসাবে দেখে ও ব্যবহার করে রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসকশ্রেণী, বিজ্ঞানকে অমানবিক ও জনবিরোধী রূপ দেয় তারাই, কিন্তু বিজ্ঞানের এই শাসকশ্রেণীর দেওয়া রূপ আমরা গ্রহণ করব কেন? আমাদের কাছে তো বিজ্ঞানের মানে অন্য। আমাদের কাছে বিজ্ঞান একটা চেতনা, একটা দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গী। 'বিজ্ঞান মানে সাধারণ বুদ্ধির অগম্য তত্ত্বচর্চা নয়; বিজ্ঞান মানে মারক-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কৃৎকৌশল নয়। বিজ্ঞান মানে যাবতীয় সমস্যার সমাধান-কারী কোনো অলৌকিক বটিকা নয়; বিজ্ঞান মানে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের বিচারবুদ্ধিহীন প্রতিযোগিতা নয়।

বিজ্ঞান হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান, যা দিয়ে মানুষ নিজের চারপাশকে আরও ভালোভাবে বুঝতে ও ব্যবহার করতে পারে।'[১১]

লেখকের কাছে কি বিজ্ঞানের এই রূপ, এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়?

সমীর তাঁর এই প্রবন্ধে সুরজিৎ দাশগুপ্তের একটি পুস্তিকাকে তুলে সমালোচনা করেছেন। সমীর আমাদের জানিয়েছেন, 'গোটা পুস্তিকায় শ্রী দাশগুপ্তের উচ্চমন্যতার নজির অজস্রভাবে ছড়িয়ে আছে' (পৃ ৯৬) এবং 'এইভাবে মৌলবাদীকে পরিহাস করেই একজন যুক্তিবাদী তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন' (পৃ ৯৭)। অর্থাৎ সুরজিৎ দাশগুপ্তের পুস্তিকায় যুক্তিবাদী মৌলবাদবিরোধিতার যে রূপ উন্মোচিত হয়েছে, তা তিনি মেনে নিতে পারেননি, কারণ তাঁর মতে এই রূপ যুক্তিবাদী উচ্চমন্যতার পরিচয় বহন করে। কোনও বিশেষ একজন বা কয়েকজন যুক্তিবাদীর লেখায় বা কথাবার্তায় উচ্চমন্যতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার জন্য সমগ্র যুক্তিবাদকেই উচ্চমন্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না, যা সমীর তাঁর প্রবন্ধে করেছেন। যেহেতু সুরজিৎ দাশগুপ্তের পুস্তিকাটি আমার পড়া নেই, সেহেতু এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আর তা ছাড়া এটা সুরজিৎ দাশগুপ্তের দায়িত্ব। আমি শুধু এই প্রসঙ্গে দুটি কথা বলতে চাই। প্রথমত, যুক্তিবাদী মূল্যায়নের এবং মৌলবাদী মূল্যায়নের কোনও সাধারণ মানদণ্ড (বা নিয়ম) নেই, থাকতে পারে না। যুক্তিবাদী মূল্যায়ন এবং মৌলবাদী মূল্যায়নের মানদণ্ড ভিন্ন হতে বাধ্য এবং সেই কারণেই উভয় মূল্যায়ন পরস্পরবিরোধী হতে বাধ্য। আমার সংযোজনের

এইটিই মূল প্রতিপাদ্য। দ্বিতীয়ত, সমীর মনে করেন, যেহেতু মূল্যায়নের কোনও সাধারণ মানদণ্ড নেই এবং যুক্তিবাদী মূল্যায়ন ও মৌলবাদী মূল্যায়ন দুই ভিন্ন ধরনের মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, সুতরাং সুরজিৎ দাশগুপ্ত রাম চরিত্রের জনপ্রিয় মূল্যায়নের বিরুদ্ধে যে 'প্রশ্ন'গুলি তুলেছেন, সেই 'প্রশ্ন'গুলি তোলা বৃথা। কেন বৃথা হবে? সুরজিৎ দাশগুপ্তের মূল্যায়ন সর্বজনগ্রাহ্য না হতে পারে, জনপ্রিয় না হতে পারে, তবে তিনি 'প্রশ্ন' তুলতে পারবেন না কেন? তাঁর মত মৌলবাদীরা মেনে নেবে, বা এমন কি সাধারণ মানুষও সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেবেন, এমন কোনও কথা নেই, তবে তিনি চেষ্টা করবেন না কেন? স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটা যাবে না, সব সময় স্রোতের সঙ্গেই সাঁতার কাটতে হবে? একজন যুক্তিবাদী তো স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটবেনই, অন্তত চেষ্টা করবেন। সমীর মৌলবাদী উচ্চমন্যতা এবং যুক্তিবাদী উচ্চমন্যতা উভয়েরই প্রবল বিরোধী, কিন্তু যেভাবে তিনি সুরজিৎ দাশগুপ্তের 'প্রশ্ন'গুলিকে বৃথা বলে তাঁর মূল্যায়নকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন, তা তো সমীরেরও উচ্চমন্যতার পরিচয় বহন করে।

সমীর অত্যন্ত সঠিক ভাবেই সঙ্গত ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন, '৬ই ডিসেম্বরের (১৯৯২) ঘটনা সমস্ত সচেতন ভারতবাসীর মুখে চুনকালি ঢেলে দিয়েছে' (পৃ ৮৭)। কিন্তু যে হিন্দু মৌলবাদী শক্তি সেদিন বাবরি মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, এই লজ্জাজনক ঘটনার সমর্থনে তাদের নিজেদের মত যুক্তি আছে আর সেই যুক্তির মূলে আছে অন্ধবিশ্বাস। কাজটা হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশের সমর্থনও পেয়েছে। হিন্দু মৌলবাদী শক্তির অন্ধবিশ্বাস-ভিত্তিক যুক্তি আমরা মৌলবাদবিরোধী যুক্তিবাদীরা মানতে পারি নি, মানতে পারি না, সমীরও মানতে পারেন নি, তাই তিনি কাজটিকে লজ্জাজনক হিসাবে অভিহিত করে তীব্র সমালোচনা করেছেন। চরম সহিষ্ণুতা দেখিয়ে আমরা যে হিন্দু মৌলবাদী শক্তির বক্তব্য গ্রহণ করতে পারলাম না, মত মানতে পারলাম না, 'জনসমর্থন' আছে এরকম একটি কাজের বিরোধিতা করলাম, তার জন্য কি আমরা মৌলবাদবিরোধী যুক্তিবাদীরা উচ্চমন্যতার অপরাধে অপরাধী হব? আর তাহলে একই অপরাধে সমীরও তো আমাদের মতই অপরাধী। এ বিষয়ে সমীর কি বলেন?

সমীর তাঁর প্রবন্ধে যুক্তিকে দেখেছেন গণতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে (পৃ ৯৭)। তিনি মনে করেন, 'যুক্তিবাদ চলতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি সমান্তরাল

প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে' উঠেছে (পৃ ১৬)। এতদিন তো জানতাম যুক্তির বিরোধী হচ্ছে অযুক্তি, যুক্তিবাদের বিরোধী হচ্ছে অযুক্তিবাদ, আর গণতন্ত্রের বিরোধী হচ্ছে একনায়কতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ। আর এই ফ্যাসিবাদ হচ্ছে যুক্তির বিরোধী, যুক্তিবাদের বিরোধী, দাঁড়িয়ে থাকে অযুক্তিবাদের উপর। ফ্যাসিবাদ এবং অযুক্তিবাদ—একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এই মত বদলানোর এখনও কোনও কারণ দেখছি না। এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন, 'এখন সারা পৃথিবী জুড়েই ধর্মীয় মৌলবাদের মতো অযুক্তি-বাদের একটা আঁধি বইছে। পরিষ্কার বিষয়নিষ্ঠ ভাবনার জায়গায় আসছে একেবারেই ব্যক্তিসর্বস্ব মনগড়া ধারণা। তথ্য জানার কোনো দরকার নেই, হাওয়ায় তৈরি তত্ত্ব দিয়েই যেন সব বোঝা যাবে। তবে তত্ত্বটা বেশ ঝাঁঝের, যথেষ্ট অবোধ্য আর কেতাদুরস্ত হওয়া চাই।'[১২] তাঁর মতে 'অযুক্তিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিটা শুধু দার্শনিক নয়, রাজনৈতিকও',[১৩] কারণ অযুক্তিবাদই নিয়ে যায় ফ্যাসিবাদের পথে। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের লেখাতেই পাচ্ছি, 'শূন্য দর্শন আর অযুক্তিবাদের সঙ্গে ফ্যাসিবাদের সম্পর্কটা তাই একই সঙ্গে আধার ও আধেয়র, একে অন্যকে আশ্রয় করেই বাঁচে।'[১৪] তাঁর এই প্রবন্ধেই উদ্ধৃত হয়েছেন রবিন জর্জ কলিংউড: '...আমি জানি, ফ্যাসিবাদ মানে স্বচ্ছ চিন্তার অবসান আর অযুক্তিবাদের জয়। আমি জানি, আমার সারা জীবন নিজের অজান্তে আমি একটা রাজনৈতিক যুদ্ধে নিরত ছিলুম, এইসব জিনিসের বিরুদ্ধে লড়ছিলুম অন্ধকারে। এবার থেকে আমি দিনের আলোয় লড়ব।'[১৫]

সমীরের প্রবন্ধ থেকে জানতে পারছি, ১৯৭৮ সালে ইরাণে যে মৌলবাদী বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা মিশেল ফুকোর অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিল। কারণ প্রগতির যাবতীয় বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারকে নাকচ করা, প্রগতির পাশ্চাত্য প্রতীকগুলিকে তীব্র অসহিষ্ণুতায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করাই ছিল ইরাণের ঐ মৌলবাদী বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য। আর ঐ বিপ্লবের মধ্যে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের একটা বিকল্প দেওয়ার প্রচেষ্টাও নিহিত ছিল, হোক না সেই বিকল্প মধ্যযুগীয় ঐশ্বরিক চিন্তাধারা থেকে গৃহীত। (পৃপৃ ১৮-৯)। সমীর নিজেও মনে করেন, 'মৌলবাদ যদি এই পর্যায়ে নিজেকে উত্তীর্ণ করতে পারে তাহলে মৌলবাদ-বিরোধিতার চাইতে মৌলবাদই শ্রেয়:' (পৃ ১৯)। তাহলে সাম্রাজ্যবাদ-

বিরোধিতা মানে কি প্রগতির যাবতীয় বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারকে বিলকুল বর্জন করা? মার্কসবাদ প্রগতির যাবতীয় বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারকে এইভাবে পুরোপুরি যান্ত্রিকভাবে খারিজ করে না। সোভিয়েত বিপ্লব, চীন বিপ্লব কোথাও এই উত্তরাধিকারকে এইভাবে খারিজ করা হয় নি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার মডেল হিসাবে এতদিন তো ভিয়েতনাম-কিউবাকেই জানতাম। সত্তেও, আপসহীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার সাথে সাথে ভিয়েতনাম-কিউবাও প্রগতির যাবতীয় বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারকে এইভাবে বর্জন করেনি, আর মধ্যযুগ থেকেও পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের বিকল্পের সন্ধান করে নি। ভিয়েতনাম-কিউবার বদলে তাহলে কি ইরাণকেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার মডেল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে? আর মৌলবাদের যে প্রতিবাদী রূপ নিয়ে রূপে-সমীর এত উচ্ছ্বসিত, তা একান্তই সাময়িক ব্যাপার। মৌলবাদের আসল উদ্দেশ্য হল ক্ষমতা দখল, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা, আর তার পরই উন্মোচিত হয় মৌলবাদের চরম নিপীড়ক রূপ। মৌলবাদ নির্বিচারে দমন করে সমস্ত প্রতিবাদ, পদদলিত করে সব প্রতিবাদী শক্তিকে, কণ্ঠরোধ করে সকল বিরোধিতার। আমরা ইরাণে এই ঘটনাই ঘটতে দেখেছি, অন্যত্রও এই ঘটনাই ঘটতে দেখছি এবং দেখব। আর তাই সালমন রুশদি-তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে মৌলবাদ জারি করে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা। ভারতে বাল থ্যাকারে খেয়ালখুশিমত যাঁর-তাঁর বিরুদ্ধে জারি করে দেয় তার ফতোয়া। এই হচ্ছে মৌলবাদের প্রকৃত রূপ—রক্তপিপাসু নিপীড়ক রূপ, প্রতিবাদী রূপ যদি থেকেও থাকে, তা একান্তই সাময়িক। আর প্রতিবাদী রূপ থাকলেও কিছু এসে যায় না, সেও তো ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যেই ঐ রূপ গ্রহণ। মৌলবাদ যে পর্যায়েই নিজেকে উত্তীর্ণ করুক না কেন, কখনও কোন অবস্থাতেই মৌলবাদবিরোধিতার তুলনায় মৌলবাদ শ্রেয়ঃ বলে গণ্য হতে পারে না।

আর এই সংযোজনটি শেষ করতে চাই যে কথাটি লিখে, তা হল মৌলবাদ এবং মৌলবাদবিরোধী যুক্তিবাদের মধ্যে কোনও কথোপকথন (ডায়ালগ) সম্ভবপরই নয়। কয়েকটি শব্দ ঘটনাক্রমে উভয়ের দ্বারাই ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু উভয়ের ভাষা নিঃসন্দেহে আলাদা। মৌলবাদ এবং মৌলবাদবিরোধী যুক্তিবাদের মধ্যে পার্থক্যটা গুণগত। মৌলবাদীর অন্ধবিশ্বাস যুক্তিবাদীর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়, আবার যুক্তিবাদীর যুক্তি মৌলবাদী কখনই মানবে না। সুতরাং কথোপকথন অসম্ভব। আর মৌলবাদবিরোধী যুক্তিবাদীর

কাছে প্রশ্নটা মৌলবাদের সঙ্গে কথোপকথনের নয়. প্রশ্নটা মৌলবাদ-বিরোধিতার। এটা কোনও হাসির ব্যাপার নয়, এটা জীবনমরণের প্রশ্ন। 'The Commitment of the Intellectual'[১৮] নামে Paul A Baran-এর একটি প্রবন্ধ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে আমার এই আলোচনা শেষ করব। Paul A Baran লিখেছেন :

> It may be well to mention one further argument which is advanced by some of the most consistent "ethical neutralists." They observe, sometimes haltingly and blushingly, that after all it is by no means establishable on grounds of evidence and logic that there is any virtue in being humanitarian. Why shouldn't some people starve if their suffering enables others to enjoy affluence, freedom, and happiness? Why should one seek a better life for the masses instead of taking good care of one's own interests? Why should one worry about the proverbial 'milk for the Hottentots', if such worry causes discomfort or inconvenience to oneself? Isn't the humanitarian position in itself a "value judgment" for which there is no logical base? Some thirty years ago I was asked these questions in a public meeting by a Nazi student leader (who eventually became a prominent SS man and functionary of the Gestapo), and the best answer that I could think of then is still the best answer I can think of now: **a meaningful discussion of human affairs can only be conducted with humans; one wastes one's time talking to beasts about matters related to people.**[51] (গুরুত্ব আরোপ আমার)

* Paul Baran তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছিলেন এই আশা প্রকাশ করে :
All that can be hoped for now is that our country too-

> will produce its "quota" of men and women who will defend the honor of the intellectual against all the fury of dominant interests and against all the assaults of agnosticism, obscurantism, and inhumanity.[১৮]

আমি এই অভিমতের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। মৌলবাদবিরোধিতাই আমার কমিটমেন্ট।

সূত্রনির্দেশ

(১) অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কয়েক দিনব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা এবং এই বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত বর্তমান সংযোজনটি লেখার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমি অবশ্য কর্তব্য বলেই বিবেচনা করি।

(২) M Rosenthal and P Yudin (ed.), **A Dictionary of Philosophy**, Progress Publishers, Moscow, 1967, pp. 494 (translated from the Russian).

(৩) Ibid., p. 379.

(৪) Ibid., pp. 378-9.

(৫) Antonio Gramsci, **The Modern Prince and other writings**, International Publishers, New York, 1967, pp. 192.

(৬) Ibid., pp. 90-117.

(৭) Ibid., pp. 116-7.

(৮) Karl **Marx**, **Capital : A Critical Analysis of Capitalist Production**, translated from the third German edition, Volume I, Progress Publishers, Moscow, 1965, 'Afterword to the Second German Edition', (London, January 24, 1873), p, 2).

(৯) Karl Marx and Frederick Engels, **Feuerbach. Opposition of the Materialist and Idealist Outlooks**, (New Publication of Chapter I of **The German Ideology**), Progress Publishers,

Moscow, 1975; Addenda: Karl Marx, **Theses on Feuerbach**, (Original version, 1845), p. 98, and (Edited by Engels, 1888), p. 101; Frederick Engels, **Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy**, With an Appendix: Karl Marx, **Theses on Feuerbach**, Progress Publishers, Moscow, 1978, p. 67.

১০ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, '"পুনর্" বিষয়ে পুনর্বিবেচনা,' বারোমাস, পঞ্চদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শারদীয়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, অক্টোবর, ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ ৪০। লেখক এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন নিম্নোক্ত গ্রন্থ থেকে: ধনঞ্জয় দাশ, বীর সাক্ষাৎকার, ১৯৮৬, পৃ ৫২২।

১১ ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩ থেকে ২ জানুয়ারি ১৯৯৪ হাতিবাগানে অনুষ্ঠিত চেতনা গণ সাংস্কৃতিক সংস্থার দশ বছরে পঞ্চম বার্ষিক বিজ্ঞান মেলা উপলক্ষে যে আমন্ত্রণ পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যা আমার বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে।

১২ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, 'দর্শন ও রাজনীতি,' অনুষ্টুপ, অষ্টবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শারদীয়, ১৪০০ বাংলা সন (বা.স), ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ ৩৬।

১৩ তদেব।

১৪ তদেব, পৃ ৩৮।

১৫ তদেব, পৃ ৩৭। উদ্ধৃতিদ্বয়: আর জি কলিংউড, অ্যান অটোবায়োগ্রাফি, অক্সফোর্ড: ক্ল্যারেনডন প্রেস, ১৯৮৯, পৃ ১৬৭।

(১৬) Paul A Baran, 'The Commitment of the Intellectual', **Monthly Review**, edited by Paul M Sweezy and Leo Huberman, Vol. 16, No. 11, March, 1965, New York, pp. 1-11 Paul A Baran-এর এই প্রবন্ধটি **Monthly Review**-এর ১৯৬১ সালের মে সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর থেকে এটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। **Monthly Review**-তে এটি ছিল প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণ।

(১৭) Ibid., pp. 8-9.

(১৮) Ibid., p. 11.

প্রসেনিয়মের বিচার

মাস্তবর ভুল করছেন।

নাটক : বিষ্ণু বসু। প্রযোজনা : গণকৃষ্টি আলোচিত অভিনয় : শিশির মঞ্চ, জুলাই ২১, '৭৩

কলকাতার নাট্যপ্রযোজনার বিপুল ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত ভূগোলে যখন নতুন কোনো দল কোনো বিশেষ অঞ্চলে নিজের সার্বভৌমত্বের দাবি পেশ করতে চায়, তখন স্বভাবতই তাকে নানা কঠিন পরীক্ষায় ধাতসহতার প্রমাণ দিতে হয়। কারণ, কলকাতার মাননীয় নাট্য ঐতিহ্য নূতন আবির্ভাবকে স্বীকৃতি দিতে চায় নিশ্চয়, কিন্তু তা কেবল নূতনত্বের জন্যই নয়, কোনো প্রকৃত সম্ভাবনা যদি শৈশবেই তার আয়ত্তগত থাকে, তারই জন্য। এ প্রশ্নকে অবহেলা করে, অতএব, আজকের কলকাতায় কোনো গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে আমাদের মতামত তৈরি হতে পারে না।

নূতন একটি দল হিসেবে 'গণকৃষ্টি' যে উপরোক্ত প্রশ্নটি অবহেলা করে নি, তার প্রমাণ ছিল দলটির আন্তরিকতায়। যাত্রায়ত্তে তাঁরা যেমন এখনকার সকল স্বীকৃত কোনো নাট্যকারের সকল কৌশলে রপ্ত জনপ্রিয়তার মায়াকে এড়িয়েছেন, তেমনি এড়িয়েছেন দলেরই কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক নাট্যকর্মীর নেহাৎ কাঁচা কোনো 'স্ক্রিপ্ট'-কে অসহায় দর্শকদের গিলতে বাধ্য করার একাধিক-দশক-ব্যাপী এক বিরক্তিকর রীতিকে।

বরং দল হিসেবে তাঁদের বয়স্ক কৌতুকবোধেরই পরিচয় পাই আমরা, যখন নাট্যকার হিসেবে তাঁরা বেছে নেন বিষ্ণু বসুকে, বেশ কিছুকাল যাবৎ গভীর গভীর নাট্যসমালোচক হিসেবে যিনি কলকাতার নাট্যসংস্কৃতির চৌহদ্দীতে নিজেই হয়ে উঠেছেন 'মাস্তবর'।

বসুমশাই, বোঝা গেল, পরিস্থিতির এই নিহিত কৌতুক বিষয়ে অনবহিত ছিলেন না। ফলে সযত্নেই আমাদের সাম্প্রতিক কালের প্রচলিত নাটক-গুলির কিছু বদভ্যাসকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। অর্থাৎ দর্শকমনস্তত্ত্বে গভীর অভিজ্ঞতার সুবাদে বিবিধ ক্লিশের ব্যবহারে হাততালি পাবার যে

অভ্যাস আজ অনেক তাদেরকনাট্যকারের সহজসাফল্যের চাবিকাঠি,লোভনীয় হওয়া সত্ত্বেও সে পথে পা বাড়ান নি তিনি। বরং কৌতুকমণ্ডিত সিরিয়াসনেসে তিনি আধুনিক জীবনেরই একটি বড় জিজ্ঞাসাকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। মধ্যবিত্তের বহুপ্রাধান্যিত বিবেকের একটি স্বরূপউদ্ঘাটনক্ষম আলেখ্য রচনা করে আমাদের তার সামনে বসিয়ে তীব্র আত্মজিজ্ঞাসায় প্রণোদিত করতে চেয়েছেন। এমন কি এ কাজে তাঁর প্রেরণা যে রেজিনাল্ড রোজ-এর 'টুয়েলভ এ্যাংগ্রিমেন', সেকথা গোপনের চেষ্টাও করেননি তিনি। ফলে, এ ঝুঁকি রয়েই গেছে যে, অতঃপর বঙ্গীয় বিজ্ঞজন এর সুকৃতির জন্য রোজ সাহেবকে ধন্য ধন্য করলেও, দুর্বলতাগুলোর জন্য বিষ্ণু বসুকে দু-চারহাত নিতে ছাড়বেন না।

যে 'বিচারকক্ষ নাটক'-এর ধারার সঙ্গে আমরা সচরাচর পরিচিত, তার সঙ্গে এটির মূল পার্থক্য এই যে, এটি 'জুরিকক্ষ নাটক'। ফলে বিচার্য বিষয় নয়, এক্ষেত্রে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে জুরি চরিত্রগুলির বৈচিত্র্য, যারা তথাকথিত ধর্মাবতারের মত নির্বিকার নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিস্বভাবের প্রকাশহীন প্রায় বিমূর্ত এক প্রতীক মাত্র নয়, জীবনের নানা স্তর থেকে উঠে আসা সমস্যা সংকট ও তীব্র নানা ব্যক্তিস্বভাবে মণ্ডিত মানুষ মানুষী। এই মানুষগুলির স্বভাববৈশিষ্ট্যের বিবিধ রঙই বর্তমান নাটকটির মানবিক কৌতূহলকে অক্ষুণ্ণ রাখে।

জনকহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত এক অতি তরুণ আসামীর বিচারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বর্তমান নাটক। সেই গড়ে ওঠায় একদিকে যেমন থাকে প্রচলিত বিচারব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত অন্ধতা বিষয়ে বিদ্রূপ, তেমনি মাননীয় জুরিদের অবলম্বন করেও বেরিয়ে আসে মানবস্বভাবের নানা সযত্নউন্মোচিত দিক। আমরা দেখি সংখ্যাগরিষ্ঠতা কীভাবে আমাদের মতামতকে প্রভাবিত করে, নিহিত ধর্ষকামী প্রবণতারই দাপটে আমাদের স্বাভাবিক বিচারশক্তি অকেজো হয়ে পড়ে, অন্তর্নিহিত হিংস্রতার অবচেতন প্রয়াসে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে অন্ধ বিশ্বাসের সহজ প্রবণতা।

এমন নাটকে পর্যায়ক্রমিক কাহিনীস্রোত থাকে না, বলাই বাহুল্য। থাকে না বলেই সমন্বয়কারী বা প্রয়োগ নিয়ামকের দায়িত্বটা কঠিন হয়ে পড়ে। নায়ক-নায়িকা, প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রের বিন্যাসে তৈরি নাটকে দু-চারজন শক্তিমান অভিনেতাই টেনে নেওয়ায় কাজটা দিব্যি চালিয়ে যেতে পারেন।

কিন্তু বর্তমান নাটক, যেখানে পর্যায়ক্রমিক সংঘাতমুখর কাহিনীর পরিবর্তে রয়েছে প্রতি মুহূর্তে বিস্ফোরক নাট্যপরিস্থিতির বিন্যাস এবং আগাগোড়া সে বিন্যাসে জড়িত এক ডজন কুশীলব, সমন্বয়কারীকে প্রতি লহমায় একাগ্র চেতনায় প্রতিটি সংলাপ ও নাট্যক্রিয়াকে টান টান করে তুলতে প্রাণপাত প্রয়াস পেতে হয়।

নূতন হওয়া সত্ত্বেও, সন্দেহ নেই, একাজ শ্রী অমিতাভ দত্ত যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করতে চেয়েছেন। সম্পূর্ণ তৈরি আর চৌকস অভিনেতাদের একটা দল যে তিনি পেয়ে গেছেন, তা মোটেই নয়। তবে দু-তিনজন যে তাঁকে ভালোই সাহায্য করেছেন, তাতেও সন্দেহ নেই।

প্রথমেই মনে পড়ে কৌমিয়া সিরাজের নাম। সমগ্র নাটকটির একমাত্র অভিনেত্রী। এর আগে তাঁর অভিনয় তেমন দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। তবে আয়ত্তেই যে অভিনয়-ব্যক্তিত্ব তাঁর আয়ত্তাধীন দেখি, তাতে অন্তত নেপথ্যপ্রস্তুতি যে তাঁর যথেষ্ট, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

মঞ্চে জুরিকুলের ভেতর হিংস্র মনস্তত্ত্বের যে প্রতাপ, তার বিপরীতে মায়া মমতা ও মানবিক বিবেচনার প্রবল স্বর নাট্যকার নিয়ে এসেছেন এই চরিত্রটিকেই অবলম্বন করে। রেজিনাল্ড রোজ-এর মূল নাটক থেকে এখানেই তিনি সরে এসেছেন, মানবিক মায়ামমতার সুরটি উত্থাপন করতে নারীচরিত্রের আশ্রয় নিয়ে তিনি সম্ভবত সচেতনভাবেই নারীজাতির প্রতি পক্ষপাত একটি বক্তব্য পেশ করতে চেয়েছেন।

এমন একটি জরুরি কাজে, মঞ্চে উপস্থিত অন্য সকলের বিরুদ্ধতাটি প্রবলতার সঙ্গে তুলে ধরা, তাকে চারিয়ে দেওয়া ও শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করে ফেলার মত কাজের জন্য যে পরিমাণ সক্ষমতা ও নাট্যব্যক্তিত্ব দরকার, আনন্দের কথা, শ্রীযুক্তা সিরাজের তার অনেকটাই আছে। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি কলকাতার অভিনয়জগতে নিজেকে একজন বিশিষ্ট অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

এর বিপরীতে বিচারবোধহীন অন্ধ ফ্যাসিস্ট-হিংস্রতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন ব্রাত্যব্রত বসু, প্রবল জাত্যবাদী প্রৌঢ় জুরির ভূমিকায়। নিজে বয়সে অতি তরুণ হওয়ার ফলে তাঁর ক্ষমতার অনেকটাই তাঁকে খরচ করতে হয়েছে অতি তারুণ্য আর পরিণত প্রৌঢ়তার মধ্যে সেতুবন্ধনে। অভিনীত চরিত্র সম্পর্কে তাঁর নিষ্ঠায় কোথাও ন্যূনতা না থাকায় চরিত্রটির নাট্যপরিস্থিতিগত

যোগ্যতা ভালো ফুটেছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও অভিনেতা হয়ে উঠতে গেলে তাঁকে মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র রূপায়িত চরিত্রের নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি অনুকরণের যথাযথতাই নয়, অভিনেতার কাছে দর্শক খোঁজেন এর ওপরেও আরো কিছু,—বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের সামর্থ্যে অভিনীত চরিত্রের বাস্তবতানির্ভর স্বতন্ত্র শিল্পরূপ নির্মাণ। সে কাজটির জন্য তাঁকে এখনো অনেক পরিশ্রম যে করতে হবে,—সেটা নিশ্চয় তাঁর পক্ষে নেহাৎ লজ্জার কথা নয়।

উক্ত দুটি চরিত্রের ওপরেই তার ছিল নাটকের বাদী ও বিবাদী স্বর উপস্থাপনার। অন্য সব অভিনেতাও আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন প্রদত্ত ভূমিকাটির প্রতি সনিষ্ঠ থাকার। কিন্তু তার প্রায় কোনো ভূমিকারই রীতিমত চরিত্র হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল না, ফলে নিজের অভিনয়ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ অল্পই ছিল। তার ভেতরে প্রায় প্রত্যেকেই যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, সেটা অবশ্যই আনন্দের কথা। তবে, সম্ভবত সাধারণভাবে বলা চলে যে, সমগ্র দলটির জন্যই এখনো স্বরক্ষেপণের ব্যাপারে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে।

সমগ্র প্রযোজনাটির যে বিভাগটিকে তারিফ না করে পারা যায় না, সেই আলোকসম্পাতের দায়িত্বে ছিলেন সুব্রত মজুমদার। সাধারণভাবে সফল মঞ্চমায়াতো রচিত হয়েছে, কোথাও কোথাও আলোই হয়ে উঠেছে একটি নির্দিষ্ট নাট্যমুহূর্তের প্রাণ। —

'গণকৃষ্টি' সংস্থা সম্ভবত বিপুল কোনো উচ্চাশা নিয়ে আসেন নি। 'তাই আসি আসিয়াছি, আমার মতন কেউ নাই আর'—এমন ঘোষণার স্পর্ধাও তাঁরা দেখাতে চান না। বিনীত নিষ্ঠার জীবনের গভীর গভীর যে জিজ্ঞাসাগুলির রূপায়ণ মঞ্চে দেখতে সাধ যায় আমাদের, আশা ক'রব, আগামী দিনগুলোতে তাঁরা সে সম্পর্কে দায়বদ্ধ থাকবেন।

সেদিক থেকেই তাঁদের পরবর্তী নাট্যনির্বাচন ও প্রযোজনা বিষয়ে, আমাদের উৎসুক কৌতূহল বজায় থাকবে।

শুভ বসু

একটাই যখন জীবন ও অন্যান্য কবিতা

সময়টা তখন ছিল সত্যিই দামালো। সেই ঝোড়ো দিনগুলির সেরা ছেলেরা কখনো কেরিয়ারের পিছনে ছোটার কথা ভাবে নি। বরং কেরিয়ার ছেড়ে কেউ রাজনীতি করেছে, কেউ পত্রিকা বের করেছে আবার কেউ কেউ গল্প কবিতায় হাত পাকিয়েছে। একটা বিশ্বাসের দৃঢ় ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করত বলে এদের জীবনে কোন ধস নামে নি। জীবন কেবল একটাই এই সত্যটা তাদের যেমন জানা ছিল তেমনি অন্যের প্রয়োজনে এই জীবনকে কাজে লাগাতে এদের কোন দ্বিধা ছিল না। এরা অনেকেই আজ বিস্মৃত। বিশেষ করে পথ চলতে চলতে স্বেচ্ছায় বা অভিমানে যারা সরে গিয়েছিল তাদের কথা কেউ মনে রাখতেও চায় নি। অথচ ইতিহাসের খাতিরেই এদের মর্যাদা পাওয়ার কথা ছিল। তবে সবাই যে ভোলেন না, দেরিতে হলেও চল্লিশের দশকের হারানো মুখগুলির কথা এখনো কেউ কেউ যে মনে করিয়ে দেন আলোচ্য সংকলনটিই তার প্রমাণ। কবি রোহীন্দ্র চক্রবর্তীর অনুজ এবং অনুরাগীরা কেবল কবিকেই নন, কবিকে গড়ে তোলার দিনগুলিকেও স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। তারা যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

শিলচরের মেধাবী ছাত্র রোহীন্দ্র চক্রবর্তী/কলকাতায় আর. জি. কর কলেজে ডাক্তারি পড়তে আসেন ১৯৪৫ সালে। আর তিনি যে যুগের প্রতিনিধি তাঁর সময়সীমা ১৯৪৮-৫০। রোহীন্দ্র সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'ডাক' পত্রিকার আয়ুকালও এই তিন বৎসর। এই সময়টা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিরও টালমাটালের কাল। রাজনীতি এবং সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই তখন রণদিভের উগ্র বামপন্থীর প্রাধান্য। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তখন [illegible] করা শুরু হয়ে গেছে। রোহীন্দ্ররা সদলবলে তখন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত। তাঁর ক্ষেত্রে ক্রমশ ডাক্তারি সত্তার থেকে রাজনৈতিক সত্তা বড় হয়ে ওঠে আর বোধ হয় রাজনৈতিক সত্তার চেয়েও কবিসত্তা বড়

হয়। আর এই দুইয়ের বিরোধে কিভাবে শিল্পীসত্তা বিদীর্ণ হয়ে যায় যোহীন্দ্রের জীবনই তার অন্যতম উদাহরণ।

যোহীন্দ্র বেঁচেছিলেন ১৩৮৫ সাল পর্যন্ত। ডাক্তারি পাশ করার পর আসামে চাকরি নিয়ে তিনি চলে যান ১৩৫৪ সালে। অথচ তাঁর কবিজীবন-টুকু কেবল কলকাতা বাসপর্বেই সীমিত (১৩৪৫-৫৩)। যাঁর হাত দিয়ে একটাই যখন জীবন, 'পঁচিশে বৈশাখ, 'চতুর্দশপদী' বা "বেপথুমানের" মতো কবিতা তখনই বেরিয়ে গেছে তিনি হঠাৎই কবিতা লেখা বন্ধ করে দিলেন কেন তা আপাতদৃষ্টিতে সহজবোধ্য নয়। যাঁর একদা মনে হয়েছিল 'সাম্যবাদ জীবনের মরণকে জয়করা বাণী', যাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে কবির দায়িত্ব হল, "মৃত্যুভয়কে ঠেলে ফেলে দিয়ে / অনাগত এক পৃথিবী গড়ার কাজ" তিনি এত সহজে হার স্বীকার করে নেবেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন। তখনও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের ক্ষেত্রে কোন বিপর্যয় দেখা দেয় নি; দেশের মাটিতেও কবির স্বপ্ন সফল হবার সম্ভাবনা ছিল। পারিপার্শ্বিক বা আর্থিক সঙ্কটও তাঁর জীবনে তেমন কিছু ছিল বলে মনে হয় না। আসামে চিকিৎসক হিসাবে তিনি সফল ছিলেন। সুতরাং তাঁর আকস্মিক নীরবতার উৎস অন্যত্র। অনুরাগীরা অনেকেই এই নীরবতার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ এড়িয়েও গেছেন। চিকিৎসক যোহীন্দ্রর কাছে কবি যোহীন্দ্র হেরে গেছেন এটাই অনেকের মনের কথা। কিন্তু কেরিয়ার তৈরি করাতে যাঁর প্রথমাবধি একটা অনীহা ছিল, এমনকি সফল ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও যিনি সুখী ছিলেন না তিনি এত তাড়াতাড়ি কবিতাকে ভুলে যাবেন কেন?

হয়তো জীবনানন্দের সেই বিখ্যাত 'বোধ'ই কবির নিস্তব্ধতার অন্যতম কারণ। জীবনানন্দের মতো যোহীন্দ্রও বোধ হয় বলতে পারতেন, 'আমি তারে পারি না এড়াতে''। যার বন্ধুর স্মৃতিচারণে এই বোধের ইঙ্গিত আছে, "নিঃসঙ্গ যোহীন্দ্র সকল অর্থে মেটাফিজিক্যাল ছিলেন, অস্তিত্বের সংকটে দীর্ণ, তার জীবন মৃত্যুর সুদীর্ঘ প্রস্তুতি।" নিঃসঙ্গতা এবং বিষণ্ণতা হয়তো এই কবির স্বভাবজাত কিন্তু সবটার জন্য তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে বোধহয় দায়ী করা যাবে না। 'অস্তিত্বের সংকট''টি তৈরি হয়েছিল ওই ১৩৪৮/৪৯ সালের কমিউনিস্ট পার্টি প্রচারিত বক্তব্য বা আবার্গ-তত্ত্বের প্রতিক্রিয়ায়। ডঃ শক্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলে উড়িয়ে

দেওয়ায় পার্টিনির্দেশকে মোহীন্দ্র মোটেই মানতে পারেন নি। তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল এই ভাষায়—

বিগত দিনের ক্ষতবাঙা সেই মুহূর্তগুলো
ইতিহাস তার দুই চোখে লাল আগুন জ্বালায়,
বকুল বনের পাতায় দোলনে বাড়ের আভাষ
বজ্রের বাণী মানুষের কানে পাঁচিশে শোনায়,

ধনঞ্জয় দাশ তাঁর লেখায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মোহীন্দ্র সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'ডাক' পত্রিকায় শিল্পসাহিত্য প্রসঙ্গে পার্টির তৎকালীন লাইনের বিরোধী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তখনকার দিনে এতে ঝুঁকি কিছু কম ছিল না। এই ঝুঁকি নেওয়ার জন্য মোহীন্দ্রকে মূল্যও দিতে হয়েছে। 'ডাক' পত্রিকার প্রকাশ শেষ পর্যন্ত বন্ধই হয়ে যায়। এই সমস্ত কারণেই কবিসত্তার প্রকৃত অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছিল, তাই প্রতিভার বিপুল সম্ভাবনা নিয়েও তিনি বিষণ্ণ বেদনায় নীরব থেকে গেছেন। এইজন্যই বোধ হয় অন্যান্য কবিবন্ধুদের বই প্রকাশে তিনি আগ্রহী নিজের সম্পর্কে ততটাই উদাসীন,"আমাদের ভালোর জন্য আগ্রহী, নিজের প্রতি উদাসীন (রাম বসু)।"[১] অথচ যেটুকু কবিতা তিনি লিখেছিলেন তাতে কোথাও কোন নৈরাশ্য বা উদাসীনতার ছাপ ছিল না। সেক্ষেত্রে তিনি প্রবল আশাবাদী—

কবিতার প্রাণে গানে নদীর স্রোতেতে খুঁজি মিল
অস্ফুট শব্দের মত কানে আসে সাগরের ভাষা
আগামী দিনের নীলে আছে সেই বিরাট নিখিল
তারই পরিক্রমা করি। অনির্বাণ হৃদয়ের আশা।

যখনই হৃদয়ের অনির্বাণ আশায় জোয়ারে ভাঁটার টান দেখা দিতে লাগল তখনই কবি নিজের কাছে সৎ থাকার জন্যই যেন কলমটি নামিয়ে রাখলেন। লেখকের কলম তুলে নেওয়া এবং নামিয়ে রাখার কাহিনীই এই সংকলনে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

মোহীন্দ্র চক্রবর্তী। স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন। ভূমিকা ও সম্পাদনা: সুধীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী। শ্যামবাজার বুকস্টল। পনেরো টাকা।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন ঃ সরকারি নথি

প্রবীরকুমার লাহা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর স্মৃতিচারনা, গবেষণা ও সহায়ক গ্রন্থের সমাহার ঘটতে থাকলেও প্রাথমিক বা সূত্র গ্রন্থের প্রকাশ এখনও তেমন যথেষ্ট নয়। ফলে এবিষয়ের এখন অনেক তথ্য এখনো অজানার অন্ধকারে রয়ে গেছে। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' নিয়ে সরকারী নথিপত্র প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে জাতির কাছে দায়বদ্ধতা পালন করেছেন। বইটি 'Golden Jubice Volume—THE QUIT INIA' MOVEMENT, 1942—A collection of docurment শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

লেখক হলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারের অধিকর্তা ডঃ লাভলীমোহন রায়চৌধুরী। উৎসর্গীত হয়েছে ১৯৪২ এর 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' যাঁরা প্রভূত ত্যাগ ও আত্মত্যাগ করেছেন তাদের উজ্জল ভূমিকার হলেন প্রবীন স্বাধীনতাসংগ্রামী ও পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমিসংস্কার মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী। তিনি পশ্চিমবঙ্গে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির সভাপতি। গ্রন্থটির মুদ্রন সংখ্যা ১,১০০ কপি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমি সহ নথির বিষয়বস্তুতে রয়েছে—

২৮.৪.১৯৪২ তারিখে গৃহীত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তিনটি প্রস্তাবের মূলপাঠ ও সংক্ষিপ্তসার ১৯.৬.১৯৪২তে লিনলিথগোকে লেখা জে হেরার্টের জবাবী চিঠি ১৪.৭.১৯৪২ ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের প্রস্তাব, ৩০–৩১ জুলাই তারিখের রুজভেল্ট ও চাচিলের মধ্যে গোপন বার্তার নথি. ৭.৮.১৯৪২ তারিখে লিনালিথগোর সেনাবাহিনীকে পাঠানো তার বার্তা, ৮-৮-১৯৪২তে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির গৃহীত প্রস্তাব, ১৯৪২-এর আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলার (অবিভক্ত) স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে মাসিক রিপোর্ট (প্রতিবেদন) সহ অতিরিক্ত প্রতিবেদন, DIR আইনে আটক ও গ্রেফতার হওয়া নেতাদের তালিকা, সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়ের প্রচারপত্র, প্রাচীরপত্র,

সারকুলার, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ওয়ার ক্যাবিনেট, ইণ্ডিয়া অফিস সহ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সংক্রান্ত তিনটি সরকারী দলিল এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে, এগুলি হল—কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কে নীতি ও অনসৃত নীতির মেমোরাণ্ডম, কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পুরাণচাঁদ যোশীর বিবৃতি। CPI পলিটবুরোর প্রস্তাবলী।

এ গ্রন্থে সংযোজিত প্রচারপত্রগুলির প্রতিচ্ছবি রয়েছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীর প্রতি, ছাত্রদের প্রতি মহাত্মাজীর বাণী। ইংরাজ রাজত্বের অবসান, বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মপন্থা, তাম্রলিপ্ত মহকুমা কংগ্রেস কমিটি, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন, একক্ষে আঘাত করো। বলশেভিক লেনিনবাদী পার্টি, AICC'র নির্দেশ। BPCC কর্তৃক প্রকাশিত কংগ্রেসের আবেদন। গান্ধীজীর কমন্দে ইয়া মরকে, ছাত্রদের প্রতি উপদেশ প্রভৃতি প্রচারপত্র।

গ্রন্থটিতে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উপর খুবই সীমিত পরিসরে নির্বাচিত লেখ্যাগার (ARCHIVAL MATERIAL) সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও গ্রন্থটির নথি নির্বাচনে ও পরিবেশনায় সততা অবিকৃত থাকলেও, নথি নির্বাচনে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিত বিদ্যমান। এই আন্দোলন সম্পর্কে আর, এস, পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, সুভাষচন্দ্র বসু, ওয়ার্কার্স পার্টি, মুসলীম লীগ সহ তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কি ভূমিকা অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রস্তাব ও সরকারী নথি প্রকাশিত না হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এব্যতীত কিছু এসংশ্লিষ্ট সরকারী নথি ও এসম্পর্কে নথির তালিকা না থাকায় ফলে এগ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ আর্কাইভাল ডকুমেন্ট হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় কি ?

এসম্পর্কে আরও সংরক্ষিত নথি, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে রয়েছে সেগুলির উল্লেখ থাকা দরকার ছিল।

উল্লেখ্য এগ্রন্থে ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের রিপোর্ট এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি—এটি বিস্ময়কর।

প্রসঙ্গতঃ অর্থাৎ এরাজ্যে যেসব নথি চল্লিশ বছরের বেশি পুরানো তা গবেষকদের কাছে এখনও উন্মুক্ত নয়, অথচ দিল্লীতে জাতীয় অভিলেখ্যাগারে তা উন্মুক্ত। প্রশ্ন উঠে সরকারী নথি উন্মুক্ত করার এ বৈষম্য কেন ?

গবেষণার স্বার্থে এব্যাপারে একটি সার্বিক জাতীয় নীতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থটিতে এইসব তথ্যগুলি থাকলে এটি পূর্ণাঙ্গ দলিল গ্রন্থের মর্যাদা পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

আশা দ্বিতীয় সংকলন বা মুদ্রণে কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে নজর দেবেন।

মুদ্রণের পরিপাট্য সম্পর্কে কিছু বলার অবকাশ রাখে না। গ্রন্থটির কম দাম সাধারণের পক্ষে এটি কেনা সম্ভব হবে। পাঠক, গবেষক ও সাধারণ অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে। একে ইতিহাস গবেষণার নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলা যায়। প্রত্যাশা সরকারের এরূপ প্রচেষ্টায় যেন ছেদ না ঘটে।

গোল্ডেন জুবিলি অ্যালবাম : কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট : এ কালেকশান অব্ ডকুমেন্টস : সম্পাদনা—অঞ্জলি মোহন রায়চৌধুরী, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দাম ১০ টাকা।

রেজাউল করীম

৫ই নভেম্বর, ১৯৯৩ রেজাউল করীমের জীবনাবসান ঘটল। এ যুগের এক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, মননশীল লেখক, স্বদেশব্রতী, আদর্শ শিক্ষক, সমাজসচেতন, বিবেকবান, সত্ প্রকৃতির ব্যক্তি ও রেনেসাঁস যুগের সম্ভবতঃ শেষ প্রতিনিধি প্রয়াত হলেন। প্রায় শতাব্দীকাল বিস্তৃত তাঁর জীবন। বিশের দশক থেকে তিনি শিক্ষাব্রতী, স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও লেখক হিসাবে তাঁর বৈচিত্র্যময় কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ পরমায়ু ও শারীরিক অপটুতার জন্যই হোক বা তাঁর অনাড়ম্বর আত্মপ্রচারবিমুখ স্বভাবের জন্যই হোক তিনি জীবদ্দশায় শেষদিকে বিস্মৃতপ্রায় হয়েই ছিলেন। যদিও বিগত দশ বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিক ডি-লিট ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বিদ্যাসাগর পুরস্কারে ভূষিত করেন।

রেজাউল করীমের নাম বহুজন পরিচিত কিন্তু তাঁর সম্যক পরিচয় বিদ্বজ্জন এবং মুর্শিদাবাদ জেলা ও বহরমপুর শহরের কাছের মানুষজন ছাড়া, বোধ হয় অনেকেরই জানা নেই।

তাঁর জন্ম ১৯০০ (মতান্তরে ১৯০২) বীরভূমের শালপুর গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে। তাঁর পৈতৃক বাসভূমি বীরভূমের মাড়গ্রাম। তাঁর পড়াশোনা মাড়গ্রামের পাঠশালা, মিড্‌ল ইংলিশ স্কুল, পরে কলকাতায় তালতলায় হাইস্কুল মাদ্রাসায়। সেখান থেকেই ১৯২০ তে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। ১৯২১-এ গান্ধীজীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। কলেজের পড়ায় ছেদ পড়ে। আন্দোলনের শেষে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯২৮ এ ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯৩০ এ ইংরেজিতে অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর দারিদ্র্যের কারণে তাঁকে কিছুদিন প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করতে হয়। তারপর ১৯৩৪-এ ইংরেজিতে এম, এ, ও পরের বছর আইন পরীক্ষা পাশ করেন।

এই বহুমুখ প্রকৃতির মানুষটির জীবনের ঘটনা অতি বিচিত্রগতি। তিনি ওকালতি করেছেন, শিক্ষকতা করেছেন, সাংবাদিকতা করেছেন, মসজিদে নামাজ পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করেছেন, বিভিন্ন দোকানে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হিসাব রক্ষার কাজ করেছেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত বহরমপুর পার্ল'স কলেজে ইংরেজির অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৩৪ সালে তাঁর বিবাহ হয়। বারো বছরে চারটি অপ্রাপ্ত সন্তান ও স্ত্রী বিয়োগ হয়।

রেজাউল করীম একদিকে নিঃসঙ্গ, আত্মমগ্ন, দ্বেষহীন ঋষিপ্রতিম মানবতাবাদী অন্যদিকে কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ন, যুক্তিবাদী ও নিজ আদর্শ রক্ষায় আপোষহীন সংগ্রামী। তাঁর জীবনে কয়েকটি নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারা লক্ষ করা যায়। আজীবন তিনি স্বদেশসেবী, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ বিধান পরিষদের সদস্য, স্বল্পকালের জন্য প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও একবার লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্রে নির্বাচন প্রার্থীও ছিলেন। প্রথম জীবনে যে গান্ধীবাদকে গ্রহণ করেন আজীবন সে আদর্শে স্থিতিবান থেকেছেন। অহিংসা তাঁর কাছে ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োগযোগ্য এক রাজনৈতিক মতবাদ মাত্র নয়—জীবনের সর্বক্ষেত্রে আচরণীয় ধর্ম। চিরদিন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি হয়েও সমস্ত রকম দলাদলি, সংকীর্ণতা ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে, দলমত নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে থাকা এ যুগে প্রায় এক নজিরবিহীন ঘটনা।

রেজাউল করীমের সমধিক পরিচিতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রবক্তা, সংস্কৃতি সমন্বয়ের সাধক হিসাবে। এ বিষয়ে তিনি অগণিত প্রবন্ধ রচনা করেছেন। (ভারতে ধর্মসমন্বয় ও রামকৃষ্ণ পরমহংস; ভারত-আরব সম্পর্কের গোড়ার কথা; ভারতীয় মুসলমানদের উপর হিন্দু প্রভাব; কোরান চর্চায় বিনোবাজী; ফারসী চর্চায় হিন্দু সুধী, দীন এলাহি; মরমী লেখক দারা শিকোহ; শহীদ সরমদ; সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে গান্ধীজীর দান; ইন্দোইরাণীয়ান সাহিত্যে জাতীয় অনুভূতি; বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট মুসলমানদের ঋণ; ও আরও অনেক)। প্রথমাবধি রেজাউল করীমের রাজনৈতিক অবস্থান জাতীয়তাবাদী মুসলিম হিসাবে। এ জন্য তাঁকে শারীরিক আঘাতসহ নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ১৯৪৭ এ দেশভাগের পর তিনদিন মুর্শিদাবাদ জেলা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। পাকিস্তানের পতাকা তুলে স্বাধীনতা উদ্‌যাপিত হয়েছিল। তিনদিন পর

যখন এই জেলা ভারতভুক্ত হয় তখন রেজাউল করীম ছিলেন মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে। মুসলিম প্রধান সেই গ্রামে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে ভারতের পতাকা উত্তোলনের ভার দেওয়া হয় তাঁকে। তিনি যখন এই কাজ সম্পন্ন করেন তখন সমবেত জনতা ক্ষোভে নীরবে থাকে। তিনি পতাকা তুলে একাই হাততালি দিলেন, বন্দে মাতরম্, জয়হিন্দ্ বললেন—তা প্রতিধ্বনিত হল না। তখন তিনি সকলকে উদ্দেশ করে বলেন, আজ তোমরা চুপ থাকলে কিন্তু একদিন এই পতাকাকে তোমরা মানবে, এর জয়ধ্বনি করবে। সব রকম সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম করে গেছেন, কিন্তু মনে হয় সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী এই মুখ্য পরিচয়টি তিনি গ্রহণ করেছেন বাস্তব প্রয়োজনবোধে। নতুবা মানুষটি ছিলেন সর্বার্থে মানবতাবাদী। সমস্ত ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবতার আদর্শ লোকে তাঁর বিচরণ। রেজাউল করীমের জীবন মননসমৃদ্ধ। তিনি সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাস ও দর্শন ছিল তাঁর বিশেষ অধ্যয়নের বিষয়। অধীত বিষয়কে আত্মস্থ করে জীবনের সঙ্গে তা একাত্ম করে নেওয়ায়, কথায়, কাজে চিন্তায় তাকে বলবান করে তোলায় এক দুর্লভ শক্তি ছিল রেজাউল করীমের। নানাবিধ নামী ও অনামী পত্রিকায় নিরন্তর তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় বৈচিত্র্য ও পরিধি বিস্ময়কর। ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন গ্রন্থ, বিভিন্ন লেখকের উপর তাঁর অগণিত লেখা। তিনি লিখেছেন ইওরোপীয় দর্শন ও দার্শনিকদের নিয়ে। শিক্ষানীতি বিষয়ে বিবেকানন্দ, ডিউই ও রাসেল প্রভৃতির উপর লিখেছেন। উদ্বোধন পত্রিকায় স্বামীজীর আদর্শ ও দেশপ্রেম বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিহাস-বিষয়ক বহু রচনার মধ্যে আছে তুর্কীবীর কামাল পাশা; মোগল সম্রাট আকবরের দূরদর্শিতা; প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্র। ফরাসী বিপ্লবের উপর একটি বাংলা বই তিনিই প্রথম রচনা করেন। এ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র, গান্ধীজী, অরবিন্দ ঘোষ, চৈতন্যদেব, দেশবন্ধু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি অগণিত ব্যক্তি ও বিষয়ের উপর তাঁর প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

গ্রন্থকার হিসাবে রেজাউল করীমের অবদান কম নয়। বাংলায় তাঁর লেখা চোদ্দটি বই ও ইংরেজিতে ছয়টি বইয়ের কথা জানা যায়। তাঁর রচিত 'নয়া ভারতের ভিত্তি' বইটি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল।

তিনি বিভিন্ন সময়ে পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। তার মধ্যে সৌরভ, দূরবীন, নবযুগ উল্লেখযোগ্য।

রেজাউল করীম সর্বাংশে একজন শিক্ষাব্রতী। সুদীর্ঘকাল তিনি ইংরেজি-সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। অধ্যাপনার ব্যাপারেও তাঁর নিজস্ব একটি আদর্শ ও স্টাইল ছিল। তাঁর অধ্যাপনায় পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর ছিল না। পাঠ্য বিষয়কে সহজে, কোন কৌশলে সরল ও আকর্ষণীয় করে ছাত্রদের মনে মুদ্রিত করে দেওয়া যায়—তাই ছিল তাঁর নিরন্তর প্রয়াস।

ক্লাশঘরে তাঁর শিক্ষকতার একমাত্র ক্ষেত্র ছিল না। কলেজের বিভিন্ন সভায়, নানাবিধ সাংস্কৃতিক সভাসমিতিতে প্রদত্ত ভাষণগুলিতে তাঁর মৌলিক চিন্তা, যুক্তিবাদী মনন ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর সম্যক অধিকারের পরিচয় পাওয়া যেত। শ্রোতার চিন্তাকে জাগিয়ে তোলা ছিল তাঁর ভাষণগুলির বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া অন্তরের উপলব্ধি থেকে উচ্চারিত তাঁর সাধারণ কথাও অসাধারণ এক মাত্রা লাভ করত ও শ্রোতাদের মনকে স্পর্শ করে যেতো।

অশিক্ষাকে তিনি মনে করতেন সমাজ জীবনের মূল ব্যাধি। এ জন্য শিক্ষা, আরও শিক্ষা, প্রকৃত শিক্ষার প্রসার—এ ছিল তাঁর সকল কথার সারবস্তু। বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কিত এক সভায় তিনি বলেন—adult franchise without adult education is an anachronism. সার্বিক শিক্ষা ছাড়া সার্বিক ভোটাধিকার অর্থহীন—তার দ্বারা কখনও গণতন্ত্র আসে না। ছাত্রদের কাছে তাঁর সর্বক্ষণের আহ্বান ছিল বই পড়ায় চিন্তাকে মুক্ত ও উন্নত করায় ও অধীত বিদ্যাকে জীবনে সফল করে তোলায়।

রেজাউল করীমের সান্নিধ্যই ছিল শিক্ষাপ্রদ। তাঁর সহজাত সৌজন্য, সরল বাহুল্যবর্জিত জীবনযাপন ছোট বড় সকলের প্রতি এক প্রসন্ন উদার ভালবাসা তাঁর ধারে কাছের মানুষদের মধ্যে নিঃশব্দেই এক মূল্যবোধ গড়ে তুলত।

বস্তুতঃ রেজাউল করীম জীবনে যা করেছেন তার থেকেও তিনি যা ছিলেন তা বোধহয় আরও অনেক বড় ও মহৎ।

রেজাউল করীমের মৃত্যু একজন ব্যক্তির প্রয়াণমাত্র নয়—তা এক যুগের পরিসমাপ্তি।

পূর্ণিমা দাশগুপ্ত

সুবীর রায়চৌধুরী

উনিশশো পঞ্চাশ সালের প্রেসিডেন্সি কলেজ। সাম্মানিক বাংলা বিভাগে একটা কবিতাসভার আয়োজন হয়েছে একদিন। চর্যাগানের 'সোনে ভরিতী করুণা নাবী' থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' পর্যন্ত প্রবহমান বাংলা কবিতার একটা নির্বাচন: কালপরম্পরায় সেটা পড়ে শোনাবে ছেলেমেয়েরা। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে 'বিশেষ বাংলা' পড়ে যারা, তাদেরও দু-একজনকে খুঁজে নেওয়া হলো এই আসরের জন্য। প্রথম বর্ষে এসে পৌঁছেছে শীর্ণকায় একটি ছেলে, তারও নাম রইল তালিকায়। বুঝিয়ে দেওয়া হলো কোন্ কবিতা পড়তে হবে তাকে।

অনুষ্ঠানের দিনে দেখে নেওয়া হচ্ছে, এসে গেছে কি না সবাই। হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে, ফিটফাট শাদা পাঞ্জাবি আর শাদা পাজামায় সেই ছেলেটিকেও কিছু আগেই দেখা গেছে করিডরে। ছোটো একফালি ঘরে সমবেত সবাই। যারা পড়বে, টেবিলের ধারে গুছিয়ে দাঁড়াচ্ছে তারা। কিন্তু সেই ছেলেটি কোথায়? নতুন ছেলেটি? এদিকওদিক খুঁজে শেষ মুহূর্তে কোথাও আর পাওয়া গেল না তাকে। সভাসূচনার আগেই, অস্ত লাজুকতায় পালিয়ে গেছে সে কলেজ ছেড়ে।'

এই ছিল সেদিনকার ছেলেমানুষ সুবীর রায়চৌধুরী, আমাদের অনুজ বন্ধু, কাজের জীবনে পৌঁছে কত বড়ো বড়ো সভার পরিচালনায় দেখেছি যে-সুবীরকে, কত সভাতেই উঁচু গলায় কথা বলতে হয়েছে যাকে। তেতাল্লিশ বছরের পুরোনো ওই পালিয়ে-যাওয়া ছবিটির থেকে তাই কত ভিন্ন হয়ে গেছে বছর দশেক আগেকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা দিন। কর্মী আর ছাত্রদের মধ্যে বিকট এক রাজনৈতিক সংঘর্ষ হয়েছিল সেদিন, আত্মরক্ষার জন্য অফিস-বাড়ির সমস্ত দরজা-জানলা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছেন কর্মীরা। সেসব ভেঙে মারমুখী আর মরিয়া ছাত্রদল প্লাবনের মতো ঢুকে যাচ্ছে ঘরে। ছাত্রদের সম্বিৎ ফেরাবার জন্য অল্প দু-একজন মাস্টারমশাই তখন শুয়ে পড়েছেন দরজার মুখে, নিজেদের বুকে তুলে নিচ্ছেন আঘাত—সেই অল্পকজনের মধ্যে একজন ছিল আমাদের এই সুবীর।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপক ছিল সে। কিন্তু ওপরে-বলা ওই ঘটনা থেকে নিশ্চয় বোঝা যায় যে অধ্যাপনার দায়িত্বকে

সে কেবল ক্লাসঘরের মধ্যে আটকে রাখেনি কখনো, কলেজপ্রাঙ্গণে সব সময়েই সে তুলে নিয়েছে আরো অনেক গুরুতার কাজ। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল প্রসারিত, স্বচ্ছন্দ; যে-কোনো ছেলেমেয়েই যে-কোনো সময়ে তাদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সমস্যা নিয়ে তার কাছে পৌঁছতে পারত অনায়াসে, আর সেসব দূর করবার কাজে সুবীরের নিজস্ব উদ্যম ছিল একেবারে অপ্রতিরোধ্য। সেই একইসঙ্গে ছিল তার অধ্যাপকসমিতির ভার বইবার ক্ষমতা, ছিল কর্মীদের সঙ্গে সহৃদয় বোঝাপড়ার নিরন্তর সম্পর্ক। বেশ কয়েক বছর ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনোরকমের আন্দোলনে অথবা কর্মসূচিতে তার ভূমিকা ছিল একেবারে সামনের সারিতে। বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে সালিশি করবার কাজে সব সময়েই ডাক পড়ত তার, কেননা সব পক্ষেরই বিশ্বাস ছিল সুবীরের দৃঢ়তায় আর সততায়, নিঃস্বার্থ স্বার্থবুদ্ধিহীন তার সর্বজনীন হিতাকাঙ্ক্ষায়।

সাহিত্যজগতেও ওই একই হিতাকাঙ্ক্ষায় সারাজীবন কাজ করে গেছে সে। বুদ্ধদেব বসু থেকে শুরু করে নিতান্ত তরুণ লেখক পর্যন্ত অনেকেই জানতেন যে তাঁদের কাজের কোনো পুঁথিগত সহায়তার জন্য হাতের কাছেই পাওয়া যাবে সুবীর রায়চৌধুরীকে, পাওয়া যাবে তাকে কোনো সুপরামর্শের জন্য। জীবিকাজীবনের বাইরে, ওই একই হিতাকাঙ্ক্ষা নিয়ে একসময়ে সে শ্রম দিয়েছে অনিলকুমার সিংহের 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায়, জ্যোতির্ময় দত্তের 'কলকাতা' বা সুমথের চক্রবর্তীর 'সারস্বত-প্রকাশ' পত্রিকায়। এসব কাজ করবার সময়ে তাকে আর সহায়ক বলে মনে হতো না, এসব পত্রিকার ভালো-মন্দের সঙ্গে লক্ষ্য-উপায়ের সঙ্গে আত্মস্থ জড়িয়ে যেত সে, তারপর একসময়ে ফুরিয়ে যেত কাজ, হয়তো তাকে আর মনেও রাখত না সবাই, অন্য কারও ভার নিয়ে তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে।

ফলে যে-কাজ তার নিজেরই করবার কথা ছিল উত্তরকালীন পাঠকদের জন্য, তার অনেকটাই করে উঠতে পারেনি সুবীর। উনিশ শতকীয় বাংলার সংস্কৃতি, আমাদের এই কলকাতা শহর, অথবা ব্যাকরণ-অভিধান-ভাষার নানা রূপরহস্য—এসব নিয়ে তার আগ্রহের শেষ ছিল না, এ নিয়ে কথা বলবার সুনিশ্চিত অধিকারও ছিল তার। আর তাই তার অবধারিত ডাক পড়ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের 'জাতীয় অভিধান' পরিকল্পনায় কিংবা নবপ্রতিষ্ঠিত

বাংলা অ্যাকাডেমির বানান-পর্যালোচনায়। এমনকী, তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে হলেও তার কোনো বন্ধুকে (জ্যোতির্ময় দত্ত) এসে পৌঁছতে হতো এইসব ভাবায় :

> এর অনেক কিছুই আমি জানতাম না একজনের সখ্যতা ছাড়া
> সে অবশ্য শিখিয়েছিল "সখ্যতা" ব্যাকরণ ভুল
> প্রবন্ধে হয়তো সচেতন সাধু "সখ্য"ই লিখবো
> কিন্তু এমনকি তারও মত অগ্রাহ্য ক'রে কবিতায় "সখ্যতা"
> পাখিরা এসবের মর্ম বুঝবে কী ক'রে
> তাদের মধ্যে যেমন নেই দেশপ্রেম কি মতবাদ
> নেই ভাষাও নেই ব্যাকরণ নেই অভিধান
> যতোই বাহারে হোক পুরুষ পাখির পালক
> ওদের মধ্যে কোনো সুবীর রায়চৌধুরী সম্ভব নয়

গত তিরিশ বছর ধরে নানা রকমের পত্রিকায় অনেক অনেক টুকরো লেখা ছড়িয়ে রেখেছে সুবীর, কখনো-বা 'সুগত সেন'-এর মতো কোনো ছদ্মনামে, কিন্তু একটা সংবদ্ধ চেহারা দিয়ে সেগুলিকে একত্র গ্রথিত করা হয়ে ওঠেনি আর। বন্ধুদের কাছ থেকে সে-কাজের জন্য কোনো তাড়া পৌঁছলে সবসময়েই জেগে উঠেছে তার অল্পবয়সের অন্তর্গত সেই লাজুকতা, খানিকটা অপ্রস্তুত করুণ হাসিতে বলেছে সে : 'গুছিয়ে তুলবার সময়ই করতে পারছি না ঠিক। দু-একটা লেখাও তো বাকি পড়ে আছে এখনো।'

সেই 'সময় করবার' আগে, বাকি দু-একটা লিখে ফেলবার আগে, সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি প্রবন্ধ তৈরি করে দেবার পর এক রাত্রিবেলায় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে হঠাৎ সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে তার নিঃসঙ্গ ঘরে, প্রায় দশ ঘণ্টা পরে সেটা জানতে পারেন অন্যেরা, জানলা ভেঙে দরজা ভেঙে উদ্ধার করা হয় তার অর্ধচেতন শরীর। কালহরণের এই ক্ষতিটাকে আর পূরণ করা যায়নি শেষ পর্যন্ত, দিনদশেক পরে নার্সিংহোম হাসপাতাল আর অনুরাগীদের সমস্ত উদ্যম তুচ্ছ করে দিয়ে তার মৃত্যু হলো, অক্টোবরের আট তারিখে, পি. জি. হাসপাতালে, সকাল ছটা দশ মিনিটের সময়ে।

১৯৩৪ সালের ৬ মে সুবীরের জন্ম হয়েছিল মেদিনীপুর শহরে, আদিদেশ বাগিরহাট, খুলনা জেলায়। যুদ্ধের সময়ে কলকাতায় চলে আসবার পর তার ছাত্রজীবন

শেষ হয় কলকাতায়, রানী ভবানী স্কুল আর প্রেসিডেন্সি কলেজে। বাংলা অনার্স নিয়ে ১৯৫৪ সালে বি. এ. পরীক্ষা দেয় সে, বাংলায় এম. এ. পাশ করে অবশ্য বেশ কয়েকবছর পরে, ১৯৬০ সালে। মধ্যে কিছুদিন তাকে কাজ করতে হয় এ. জি. বেঙ্গলের অফিসে। রাজনৈতিক কারণে সেখান থেকে চাকরি চলে যাবার পর মফস্বলের আর কলকাতার কয়েকটি স্কুল-কলেজে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে যুক্ত ছিল সে, বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও একসময়ে দায়িত্ব নিয়েছে ১৯৯১-৯২ সালে।

নানা পত্রিকায় সম্পাদনায় সাহায্য করে বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'ভারতকোষ' রচনায় সহ-সম্পাদনার কাজ করে সুবীরের প্রধান পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সম্পাদক। একদিকে ম্যাজের লেখা *Derozio* কিংবা রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের *The Early History and Growth of Calcutta,* অন্যদিকে "পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প,' জগদীশ গুপ্ত গিরিবালাদেবী বা জ্যোতির্ময়ী দেবীদের রচনা সম্পাদনা করে সুবীর আমাদের চোখের সামনে তুলে এনেছিল অনেক বিস্মৃতপ্রায় অথচ স্মরণযোগ্য সৃষ্টি। একথা বললে খুব অন্যায় হবে না যে আমাদের সাহিত্যসমাজে জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে পারল প্রায় সুবীর রায়চৌধুরীরই একক চেষ্টায়। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ সম্পাদনা করে দেবারও দায়িত্ব নিয়েছিল সে, তার বন্ধু অমিয় দেবের সঙ্গে, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখবার অসীম প্রবণতা দেখে অন্য প্রকাশক এক-খণ্ডের বেশি আর ভরসা রাখেননি তাদের ওপর। শেষ কয়েকবছর জুড়ে সুবীর ব্যস্ত ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাসংগ্রহ সম্পাদনার কাজে, এর তৃতীয় খণ্ডটির কাজ চলতে চলতেই সময় শেষ হয়ে এল তার।

সম্পাদনার বাইরে তার নিজস্ব বইও আছে কয়েকটি। ভারী ভারী নানা কাজের পাশে নিছক ছোটোদের সঙ্গে অনাবিল আনন্দময় একটা মেলামেশা ছিল তার, আর তারই ফলে কখনো কখনো তাদের জন্য তৈরি হয়ে উঠত লঘুকৌতুকে ভরা কিছু লেখা, 'মেলা থেকে বামেলা' 'গোলন্দাজ থেকে গোয়েন্দা' বা 'অজ থেকে অহ্লাদ'-এর মতো বই, তার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে যার ডাকনাম ছিল 'থেকে-সিরিজ'। বন্ধু মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাড়নায় 'টোকোলোশ' বইটির সুন্দর একটা অনুবাদও করেছিল সুবীর।

'সেযুগের কোম্পা একালের ইতিহাস' 'বিজাতি যাত্রা থেকে যাত্রী'

থিয়েটার' (স্বপন মজুমদারের সঙ্গে) আর ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত 'হেনরি ডিরোজিও : তাঁর জীবন ও সময়' : এই হলো তার উনিশশতক বিষয়ে কয়েকটি বই। হাসপাতালে শুয়ে এই শেষ বইখানার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় ছিল সে, পোছাতর্য়া বই শেষ পর্যন্ত পৌঁছল এসে তার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পর। সে-বইয়ের শেষ অধ্যায়ে, প্রায় যেন আত্মনির মতো, এই কথাগুলি লিখে রেখেছিল সুবীর : 'মৃত্যু সবসময়ে অনিশ্চিত, কিন্তু ডিরোজিওর ক্ষেত্রে মৃত্যুকে অতর্কিতে আততায়ীর আক্রমণের মতো মনে হয়।' অনেক কাজের মধ্যে ব্যাপৃত, স্বপ্নদেখা অনেক অসম্পন্ন কাজের মুখোমুখি, অকৃতদার স্বভাব-লাজুক আর পরহিতৈষী সুবীরের মৃত্যুও ওইরকম অতর্কিত আততায়ীর আক্রমণের মতোই পৌঁছল আমাদের অনেকের কাছে, চিরদিনের মতো আমাদের কাছে ফাঁকা হয়ে গেল নির্ভরযোগ্য বন্ধুজনের একটা স্নেহময় জায়গা, আমাদের সামনে থেকে সরে গেল বিশাল একজন ভালোমানুষ।

শঙ্খ ঘোষ

---

* বইয়ের সম্পূর্ণ তালিকা

সম্পাদনা ॥ 'পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প' (১৩৫৯ / সংস্করণ ১৩৬০, ১৩৮০), *Henry Derozio the Eurasian Poet and Reformer* ; E W. Madge (১৩৬৭ / সংস্করণ ১৩৮২), 'বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ' প্রথম খণ্ড / অমিয় দেবের সঙ্গে (১৩৭৫), *Early History and Growth of Calcutta* : Raja Binaya Krishna Dev (১৩৭৭), জগদীশ ভট্টাচার্য (১৩৭৭ / সংস্করণ ১৩৮০, ১৩৯১), 'মায়বাড়ি' : গিরিবালা দেবী (১৩৯১), 'জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সঙ্কলন' (১৩৯১), 'কবিতাসংগ্রহ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়' প্রথম খণ্ড (১৩৯২), দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৯৩)।

অনুবাদ ॥ 'নানালাল' (১২৮৫), 'টোকোলোশ' (১৩৮৬)।

ছোটোদের উপন্যাস ॥ 'মেলা থেকে ঝামেলা' (১৩৭৬ / সংস্করণ ১৩৮২), 'গোলন্দাজ থেকে গোয়েন্দা' (১৩৮০/সংস্করণ ১৩৯২), 'জল থেকে জাহাজ' (১৩৯৩)।

গবেষণা ॥ 'সেযুগের কেচ্ছা একালের ইতিহাস' (১৩৭০), 'বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার' / স্বপন মজুমদারের সঙ্গে (১৩৭২), 'হেনরি ডিরোজিও : তার জীবন ও সময়' (১৩৯৩)।

গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ
শ্রী সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রখ্যাত রবীন্দ্র-গবেষক
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের
প্রয়াণে আমরা শোকাহত

PARICHAYA November—December 1993 Reg. No. 13732
WB/EC—265

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দাম : বার টাকা